স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার

সাহাদত হোসেন খান

স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার

www.pathagar.com

স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার

সাহাদত হোসেন খান

আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক ❑ আসমা আরা বেগম
আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৮০৩৫

অক্ষর বিন্যাস ❑ ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১০ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

মূল্য ❑ ৩৫০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70116-0053-1

Swarnojuge Muslim Bigganider Abishker By Shahadat Hossain Khan,
Published by Asma Ara Begum, Afsar Brothers,
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication : February 2012.
Price : 350 Tk. Only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার ভাগিনী রোজির একমাত্র মেয়ে
স্নেহের তানিয়াকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইসলামের স্বর্ণযুগ/ ১১
যেভাবে গ্রীক বিজ্ঞান আরবদের কাছে পৌঁছেছে/ ৪৭
মুসলমানদের ২০টি স্মরণীয় আবিষ্কার/ ৮২
রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান/ ৯২
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ আল-বেরুনি/ ১১৫
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা/ ১৪০
হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল আবিষ্কারক ইবনুল নাফিস/ ১৫৪
বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারিজমি/ ১৬৫
পদার্থ বিজ্ঞানে শূন্যের অবস্থান নির্ণয়কারী আল-ফারাবি/ ১৮৬
আলোক বিজ্ঞানের জনক ইবনে আল-হাইছাম/ ১৯৯
এনালিটিক্যাল জ্যামিতির জনক ওমর খৈয়াম/ ২১৫
সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারকারী আল-কিন্দি/ ২৩০
গুটিবসন্ত আবিষ্কারক আল-রাজি/ ২৪৬
টলেমির মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণকারী আল-বাত্তানি/ ২৫৮
ত্রিকোণমিতির জনক আবুল ওয়াফা/ ২৬৭
স্টাটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ছাবেত ইবনে কোরা/ ২৭৬
পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ধারণকারী বানু মুসা/ ২৮৫
মিল্কিওয়ের গঠন শনাক্তকারী নাসিরুদ্দিন তুসি/ ২৯৪
এলজাব্রায় প্রথম উচ্চতর পাওয়ার ব্যবহারকারী আবু কামিল/ ৩১৩
ল' অব মোশনের **পথ প্রদর্শক** ইবনে বাজ্জাহ/ ৩২০
এরিস্টোটলের দর্শন উদ্ধারকারী ইবনে রুশদ/ ৩৩০
ঘড়ির পেন্ডুলাম আবিষ্কারক ইবনে ইউনূস/ ৩৪১
পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়কারী আল-ফরগানি/ ৩৪৭
পৃথিবীর প্রথম নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনকারী আল-ইদ্রিসী/ ৩৫৪
বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারক আল-জাজারি/ ৩৭২

www.pathagar.com

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতার গতি প্রমাণকারী আল-জারকালি/ ৩৮২
মানব জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণেতা আবুল ফিদা/ ৩৮৯
বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অগ্রদূত ইবনে আল-শাতির/ ৩৯৫
ভূগোলে বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-বাকরি/ ৪০৩
প্ল্যানেটারি কম্পিউটার আবিষ্কারক আল-কাশি/ ৪০৭
বীজগণিতের প্রতীক উদ্ভাবক আল-কালাসাদি/ ৪১৬
এশিয়া ও আফ্রিকা সফরকারী নাসির-ই-খসরু/ ৪২২
অঙ্কনে ব্যবহৃত কম্পাসের উদ্ভাবক আল-কুহি/ ৪৩১
বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা/ ৪৩৬
ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান/ ৪৪৮

www.pathagar.com

বইটি কেন লিখতে গেলাম

বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় নিজের অজান্তে বিজ্ঞান নিয়ে প্রায়ই ভাবতাম। চারদিকের সকল বাস্তবতা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। প্রতি বছর নাবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় মুসলমানদের নাম দেখতে না পেলে মনটা আরো ভারি হয়ে উঠতো। তখন ভাবতাম শুরু থেকেই কি মুসলমানদের এ দুরবস্থা?

এ প্রশ্নের জবাবে তেমন কিছু জানা না থাকলেও আমার দশম শ্রেণীতে পাঠ্য সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের দু'একটা নাম ও বিষয় অস্পষ্টভাবে মনে পড়তো। বিশেষ করে আল-জাবির ও আল-কেমি শব্দ দু'টি বেশি মনে আসতো। ছাত্রজীবন থেকে শুনে আসছিলাম বীজগণিত ও রসায়নের জনক মুসলমানরা। মুসলমান হিসাবে গর্ব করতে গিয়ে অনেক সময় উল্টা পাল্টা বলতে গিয়ে বলতাম, মুসলিম গণিতজ্ঞ আল-জাবির হলেন বীজগণিতের জনক। আর আরবী আল-কেমি হলো রসায়নের উৎস। বইটি লিখতে গিয়ে আমার ভুল ভাঙ্গে। জানতে পারি আল-জাবির আদৌ কোনো লোকের নাম নয়। আল-জাবর হলো একটি বইয়ের নাম। এ বইয়ের নামানুসারে আমাদের অতি পরিচিত এলজাব্রা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আল-জাবর বইটি লিখেছেন মোহাম্মদ মুসা আল-খাওয়ারিজমি। খাওয়ারিজমি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। মুসলমানদের এত মেধা থাকতে পারে তা আগে ভাবতে পারিনি। এ বইয়ে যেসব মুসলিম বিজ্ঞানীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে ছিল আমার একই অনুভূতি।

যতই লেখার গভীরে প্রবেশ করেছি ততই আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। বইটি লিখতে গিয়ে বুঝতে পারি মধ্যযুগের আরব মুসলমানদের কাছে বিশ্ব সভ্যতা কতটা ঋণী। মধ্যযুগে কোনো কারণে মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন থাকলে মানব সভ্যতা অন্ধকারে তলিয়ে যেতো। বিজ্ঞানকে আমার কাছে মনে হয়েছে একটি মশালের মতো। প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিজ্ঞানের এ মশাল প্রজ্বলিত করেছিল। মধ্যযুগে মুসলমানরা এ মশাল নিজেদের হাতে তুলে নেয়। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ মশাল ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্থানান্তরে অনুবাদের ভূমিকা কতটুকু তা লিখে শেষ করা যাবে না। মুসলমানরা অনুবাদের মধ্য দিয়েই গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। একইভাবে ইউরোপীয়রাও অনুবাদের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

আরবদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শুষে নিয়েছে। মুসলমানরা শুধু প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করেছে তাই নয়, নিজেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মৌলিক প্রতিভার প্রমাণও রেখেছে।

আমরা অনেক সময় অনির্বাচিত রাজতন্ত্রের সমালোচনা করি। কিন্তু বইটি লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি অনির্বাচিত আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ এবং তার সুযোগ্য পুত্র আল-মামুনই হলেন মধ্যযুগে আরব জাহানে বিজ্ঞান সাধনার অগ্রপুরুষ। এ দুই মুসলিম শাসক একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করা না হলে মুসলিম ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে কোনো অধ্যায়ের সংযোজন ঘটতো কিনা সন্দেহ। একটি লাইব্রেরি একটি জাতির ইতিহাসকে কিভাবে পাল্টে দিতে পারে বায়তুল হিকমাহ তার প্রমাণ। আমি বিশ্বাস করি, খলিফা হারুন ও মামুনের মতো শাসকের আবির্ভাব ঘটলে এবং বায়তুল হিকমাহর মতো শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠলে প্রতিটি যুগে বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটবে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বিজ্ঞান হচ্ছে শক্তির মূল। জাতি হিসাবে মর্যাদার আসন লাভ করতে হলে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। জাতি হিসাবে মুসলমানরা যেন হারানো আসন পুনরুদ্ধার করতে পারে এমন একটি তাগিদ থেকে আমি বইটি লিখেছি। আমি আশা করি, আমাদের আজকের শিশু এবং আগামী প্রজন্ম বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের চালিকা শক্তি হিসাবে গ্রহণ করবে।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ **সাহাদত হোসেন খান**

www.pathagar.com

ইসলামের স্বর্ণযুগ

প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে মুসলিম দেশগুলো পেছনে পড়ে যাওয়ায় পাশ্চাত্য তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কোনো মুসলমানের কাছে কাম্য হতে পারে না। আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যেখানে একটি মুসলিম শিশু মুসলমানদের দুর্দিন ছাড়া আর কিছু দেখছে না। শুধু শিশু নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার মধ্যে এমন একটি ধারণা কাজ করছে যে, বিজ্ঞান মানেই ইউরোপ আর আমেরিকা। তাদের কাছ থেকে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান শিখতে হবে। কিন্তু আমাদের অনেকেই জানে না যে, মুসলমানরাই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা। আজকের এ অধঃপতিত মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। বিশ্ব সভ্যতা মুসলমানদের কাছে ঋণী। মুসলমানরাই বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম ঐতিহাসিক মোহাইনি মোহামেদের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। মোহাইমিনি তার 'গ্রেট মুসলিম ম্যাথমেটিশিয়ান' শিরোনামে গ্রন্থের ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'In the seventh century, Western Europe was declining while the Byzantine and Persian empires were manifestly bent upon mutual destruction. Likewise, India was greatly divided. However, China was steadily expanding, the Turkish in central Asia were disposed to work in an accord with China. During this period, the world was saved by the rise of the Islamic civilization.'*

অর্থাৎ 'সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের পতন ঘটছিল। অন্যদিকে বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য একে অন্যের ধ্বংস সাধনে ছিল সুস্পষ্টরূপে বদ্ধপরিকর। একইভাবে ভারত ছিল মারাত্মকভাবে দ্বিধাবিভক্ত। তবে দৃঢ়তার সঙ্গে চীনের সম্প্রসারণ ঘটছিল। মধ্য এশিয়ায় তুর্কিরা চীনের সঙ্গে একটি সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। এসময় ইসলামী সভ্যতার উত্থানে বিশ্ব রক্ষা পায়।'

মুসলমানদের অবস্থা আজকের মতো এত শোচনীয় ছিল না। তারা ছিল একসময় বিশ্বের প্রভু। অতীত নিয়ে একটি মুসলিম শিশু গর্ব করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকাকে লক্ষ্য করে বুক ফুলিয়ে সে বলতে পারে, আমরাও তোমাদের মতো ছিলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানে আমরা তোমাদের পেছনে নই। এমন কথা বলার আগে তাকে জানতে হবে তার নিজের পরিচয়। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস প্রতিটি মুসলিম শিশু ও তার অভিভাবককে হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করতে পারে। এবার এ মহিমান্বিত যুগের বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

স্বর্ণযুগকে আড়াল করার অভিসন্ধি

৭৫০ থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত সময় ইসলামের স্বর্ণযুগ বা ইসলামী রেনেসাঁ হিসাবে পরিচিত। এই আলোকিত যুগ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছে। একটি গভীর চক্রান্ত থেকে মধ্যযুগকে অন্ধকার ও বর্বর যুগ হিসাবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রগতির পথে একটি অন্তরায় হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু চাইলেই সব পারা যায় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মধ্যযুগে মুসলমানদের অগ্রগতির পেছনে ইসলাম ছিল মূল চালিকাশক্তি। স্বর্ণযুগে মুসলমানরাই ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নয়; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সংস্কৃতিতে মুসলমানরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সত্য আড়াল করার জন্য মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুগের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করার মানে হলো বিজ্ঞানে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়া। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনাকারীদের পরবর্তী প্রজন্ম অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে মধ্যযুগের সত্যিকার ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করছে। অধ্যাপক জি. সারটন অকপটে তা স্বীকার করেছেন। তিনি 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এ লিখেছেন, *'To sum up, mediaevalists have given us an entirely false idea of the scientific thought of the Middle Ages because of their insistance upon the least progressive elements and their almost exclusive devotion to Western thought; when the greatest achievements were accomplished by Easterners .Thus did they succeed not in destroying the popular conception of the Middle Ages as `Dark Ages'. But on the contrary in re-enforcing it. The Middle Ages were dark indeed when most historians showed us only (with the exception of Art) the darkest side; these Ages were never so dark as our ignorance of them.'*

অর্থাৎ *'সংক্ষেপে বলতে গেলে অত্যন্ত দুর্বল সূত্রের ওপর জোর দেয়ায় এবং পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার প্রতি একান্তভাবে অনুগত থাকায় ইতিহাস বিশারদগণ মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদেরকে পুরোপুরি মিথ্যা ধারণা দিয়েছেন। মধ্যযুগেই প্রাচ্যবাসীরা শ্রেষ্ঠতম অগ্রগতি অর্জন করেছিল। ইতিহাস বিশারদগণ মধ্যযুগকে একটি 'অন্ধকার যুগ' হিসাবে আখ্যায়িত করার প্রচলিত ধারণা বাতিল করার পরিবর্তে বরং তারা এ ধারণাকে আরো জোরালো করতে সফল হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগ ছিল অন্ধকার। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক আমাদের কাছে এ সময়ের কেবলমাত্র অন্ধকারময় দিকটিই তুলে ধরেছেন (শিল্প হলো একমাত্র ব্যতিক্রম)। এ যুগ কখনো আমাদের অজ্ঞতার চেয়ে বেশি অন্ধকার ছিল না।'*

অধ্যাপক জি. সারটন একই গ্রন্থে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরো লিখেছেন, *'It will suffice here to evoke a few glorious names without contemporary equivalents in the West: Jabir ibn Haiyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, al-Fargani, al-Razi, Thabit ibn Qurra, al-Battani, Hunain ibn Ishaq, al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, al-Masudi, al-Tabari, Abul Wafa, Ali*

www.pathagar.com

ibn Abbas, Abul Qasim, Ibn al-Jazzari, al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Yunus, al-Kashi, Ibn al-Haitham, Ali Ibn Isa al-Ghazali, al-Zarqab, Omar Khayyam. A magnificent array of names which it would not be difficult to extend. If anyone tells you that the Middle Ages were scientifically sterile, just quote these name to him, all of whom flourished within a short period, 750 to 1100 A.d.'

অর্থাৎ *'এখানে মুষ্টিমেয় কিছু নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। সমসাময়িককালে পাশ্চাত্যে তাদের সমতুল্য কেউ ছিল না। তারা হলেন: জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-কিন্দি, আল-খাওয়ারিজমি, আল-ফরগানি, আল-রাজি, ছাবেত ইবনে কোরা, আল-বাত্তানি, হুনায়ন ইবনে ইসহাক, আল-ফারাবি, ইব্রাহিম ইবনে সিনান, আল-মাসুদি, আল-তাবারি, আবুল ওয়াফা, আলী ইবনে আব্বাস, আবুল কাসিম, ইবনে আল-জাজারি, আল-বেরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে ইউনূস, আল-কাশি, ইবনে আল-হাইছাম, আলী ইবনে ইসা আল-গাজালি, আল-জারকাব, ওমর খৈয়াম। গৌরবোজ্জ্বল নামের তালিকা দীর্ঘ করা মোটেও কঠিন হবে না। যদি কেউ আপনার সামনে উচ্চারণ করে যে, মধ্যযুগ ছিল বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অনুর্বর তাহলে তার কাছে এসব নাম উল্লেখ করুন। তাদের সবাই ৭৫০ থেকে ১১০০ সাল পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।'*

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানি পদার্থ বিজ্ঞানী ড. আবদুস সালাম, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিজ্ঞানের অধ্যাপক জর্জ সালিবা এবং ঐতিহাসিক জন. এম. হবসন বলেছেন, মধ্যযুগে মুসলিম বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটেছিল। ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ রবার্ট স্টিফেন ব্রিফল্ট 'দ্য মেকিং অব হিউমেনিটি' (The Making of Humanity) শিরোনামে বইয়ে ইসলামী বিজ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আমেরিকান দার্শনিক উইল ডুরান্ট, আমেরিকান মেডিকেল হিস্টরিয়ান ফিল্ডিং হাডসন গ্যারিসন, ইরানি দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হোসেন নাসির এবং ব্রিটিশ-আমেরিকান ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুই-ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে গবেষণামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেছেন।

ইসলামী সভ্যতাকে সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি

লুকোচুরি করলেও পাশ্চাত্য ইসলামী সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে। ২০০১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসের মিনেসোটায় হিউলেট প্যাকার্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মিসেস কার্লি ফায়ারিনার ভাষণ তার প্রমাণ। ইসলামী সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকার করে তিনি 'টেকনোলজি, বিজিনেস এন্ড আওয়ার ওয়ে অব লাইফ: হোয়াটস নেক্সট' শিরোনামে তার ভাষণে বলেন, *'There was once a civilization that was the greatest in the world. And this civilization was driven more than anything but invention. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created the algebra and algorithms that would enable the building of computers and the*

www.pathagar.com

creation of encryption. Its doctors examined the human body and found new cures for disease. Its astronomers looked into the heavens, named the stars and paved the way for space travel and exploration. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it on others. While modern Western civilization shares many of these traits, the civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo and enlightened rulers like Suleiman the Magnificent. Although we are often unaware of our indebtedness to this civilization, its gifts are very much part of our heritage. The technology industry would not exist without the contributions of Arab mathematicians.'

অর্থাৎ 'একসময় পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট একটি সভ্যতা ছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছিল এ সভ্যতার চালিকাশক্তি। এ সভ্যতার স্থপতিগণ এমনভাবে ভবনের নকশা প্রণয়ন করতেন যাতে অভিকর্ষ ছিল না। এ সভ্যতার গণিতজ্ঞগণ বীজগণিত ও এলগোরিদম উদ্ভাবন করেছিলেন যা কম্পিউটার নির্মাণ এবং সাংকেতিক বার্তা লিখনে সহায়ক হয়েছিল। এ সভ্যতার ডাক্তারগণ মানব দেহ পরীক্ষা এবং রোগ নিরাময়ে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। এ সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ এবং তারকার নামকরণ করেছিলেন। তারা মহাকাশ যাত্রা ও অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে সময় অন্যান্য জাতি নতুন নতুন ধ্যান ধারণায় ভীত ছিল তখন এ সভ্যতা তাতে সমৃদ্ধি লাভ করছিল এবং সেগুলো জীবিত রেখেছিল। যে সময় পরীক্ষকগণ অতীত সভ্যতার জ্ঞান নির্মূলের হুমকি দিচ্ছিলেন তখন এ সভ্যতা জ্ঞানকে সজীব রেখেছিল এবং অন্যদের কাছে এসব জ্ঞান স্থানান্তর করেছিল। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় আমি সেই সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এ সভ্যতা হলো অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব। অটোমান সাম্রাজ্য, বাগদাদের রাজদরবার, দামেস্ক, কায়রো এবং মহান সুলায়মানের মতো আলোকিত শাসকগণ এ সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। এ সভ্যতার কাছে আমাদের ঋণ সম্পর্কে আমরা কখনো কখনো অসচেতন হলেও তার আর্শীবাদ আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ। আরব গণিতজ্ঞদের অবদান ছাড়া প্রযুক্তি শিল্প টিকে থাকতো না।'

ল্যাটিন অনুবাদে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম পরিবর্তন

স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সবগুলো বই ল্যাটিনসহ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তবে অনূদিত গ্রন্থগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নামও ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয়। অন্য যে কোনো ভাষায় কোনো লেখকের বই অনুবাদ করার সময় কেবলমাত্র বইয়ের বিষয়বস্তু অনুবাদ করা হয়। কখনো লেখকের নাম অনুবাদ করা হয় না। লেখকের নাম অনুবাদ করার এমন অদ্ভূত উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সব দেশের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নাম অক্ষত রেখে অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করা হলেও স্বর্ণযুগের মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের নাম অক্ষত রাখা হয়নি। ল্যাটিন ভাষায় মুসলিম পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের নাম বিকৃত করার এই হীন প্রচেষ্টা অধ্যাপক সারটনের উক্তিকে সত্য বলে প্রমাণ করছে। আরবী গ্রন্থগুলো ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হলেও গ্রন্থকারের ল্যাটিন নাম দেখে বুঝার উপায় নেই যে, তারা মুসলমান। প্রত্যেক মুসলমান গ্রন্থকারের নাম আরবীতে লম্বাচুরা হলেও ল্যাটিন ভাষায় তাদের নাম দেয়া হয়েছে একটি মাত্র শব্দে। ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় তার নাম 'আভিসিনা' (Avicenna)। বীজগণিতের জনক খাওয়ারিজমির পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি। ল্যাটিন ভাষায় তার নাম 'এলগোরিজম' (Algorism)। ইবনে বাজ্জাহর পুরো নাম আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আল-সায়িগ। কিন্তু তার ল্যাটিন নাম 'অ্যাভামপেস' (Avempace)। আল-ফরগানি আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির হলো আল-ফরগানির পূর্ণ নাম। কিন্তু ল্যাটিনে তার নাম 'আলফ্রাগানাস' (Alfraganus)। পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অঙ্কনকারী আল-ইদ্রিসীর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস আল-শরীফ আল-ইদ্রিসী। কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'দ্রেসেস' (Dreses) নামে পরিচিত। শুধু ইবনে সিনা, খাওয়ারিজমি, ইবনে বাজ্জাহ, আল-ফরগানি কিংবা আল-ইদ্রিসী নয়, সব মুসলিম বিজ্ঞানীর প্রতি ল্যাটিন ইউরোপ এ অবিচার করেছে।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের শুধু নামের বিকৃতি নয়, খোদ তাদের পরিচয় নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, তারা আদৌ মুসলমান নন, জরোস্ট্রীয় অথবা ইহুদী কিংবা ইউরোপীয়। রসায়নের জনক জাবির হাইয়ান এমন এক অপপ্রচারের শিকার। ইউরোপের কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করছেন, জাবির ইবনে হাইয়ান ছাড়া আরেকজন জাবির ছিলেন। তার নাম 'জিবার' এবং এ জিবার হলেন ইউরোপীয়। বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারিজমি সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হচ্ছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে জরোস্ট্রীয় হিসাবে দাবি করছেন। খাওয়ারিজমির বিপরীতে আরেকজন 'খাওয়ারিজমি'র অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে দ্বিতীয় খাওয়ারিজমি হলেন গণিতে প্রথম শূন্য ব্যবহারকারী। পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়কারী আল-ফরগানিও ষড়যন্ত্রের শিকার। তার পরিচয় নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বলা হচ্ছে, ফরগানি হলেন দু'জন। এমনি আরো কতভাবে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান অস্বীকার অথবা তাদের অবদানকে খাটো করার হীন চক্রান্ত চালানো হচ্ছে তার শেষ নেই। আমরা সবাই একনামে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের মতো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চিনি। চিনি না কেবল তাদের গুরু ইবনে বাজ্জাহ, ইবনে রুশদ অথবা নাসিরুদ্দিন তুসিকে। আমরা না চিনলেও ইতিহাস থেকে তারা হারিয়ে যাবেন না। বিজ্ঞান যতদিন টিকে থাকবে মুসলিম বিজ্ঞানীরাও ততদিন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

লেখালেখিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব

ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। সে সময় বিজ্ঞানের সবগুলো শাখা ছিল পরস্পর সম্পর্কিত। তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের সবগুলো শাখায় বিচরণ করতেন। যিনি গণিত নিয়ে সাধনা করতেন তিনি আবার জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাধনায়ও নিয়োজিত হতেন। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যদি বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় একসঙ্গে বিচরণ না করে কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় নিজেদের সবটুকু মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগাতে পারতেন তাহলে তাদের প্রত্যেকের উন্নতি সব রেকর্ড ভঙ্গ করতো। এ রেকর্ড কোনোকালে কারো পক্ষে কখনো ভাঙ্গা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তারপরও তাদের কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিতে এমন বিস্ময়কর রেকর্ড করেছেন যা আমাদের প্রচলিত বুদ্ধি বিকল করে দেয়। রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান লিখেছেন তিন হাজার বই, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা লিখেছেন সহস্রাধিক, আল-রাজি লিখেছেন ২৮৯ টি, আল-কিন্দি লিখেছেন ২৭০টি, ইবনে আল-হাইছাম লিখেছেন ২০৮টি বই। অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীর বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখিত বিজ্ঞানীদের চেয়ে কম নয়। বইগুলো কোনো গল্প উপন্যাস নয়। প্রতিটি বই বিজ্ঞান নয়তো দর্শনের ওপর লিখা। আধুনিক বিজ্ঞানে বইগুলোর মূল্য কত তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি ছত্র তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যেন এগুলো সোনার খনি। মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে পাশ্চাত্যে কত বই লিখা হয়েছে তা হিসাব করে বের করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক মূল্য না থাকলে মুসলিম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের বইগুলো আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করতো না। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেকেই ছিলেন তাদের যুগের নিউটন, এরিস্টোটল কিংবা আলবার্ট আইনস্টাইন।

বিশ্বে বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

স্বর্ণযুগের অভাবিত উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে আরব দেশের ভৌগোলিক সুবিধা একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। প্রাক-ইসলাম যুগে মক্কা নগরী ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ ঐতিহাসিক নগরীর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার বাণিজ্যিক রুটগুলোতে আরব বণিকদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে কার্যকরভাবে বিশ্বায়নের অভূতপূর্ব সূচনা হয়। বাণিজ্যিক অর্থনীতির ভিত্তিতে ইসলামী সভ্যতার দ্রুত প্রসার ঘটে। অন্যদিকে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় খ্রিস্টান সভ্যতা, ভারত ও চীন তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

বিশ্ব ইতিহাসে দশম বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

হযরত মোহাম্মদের (সা.) মক্কা বিজয়ের এক শতাব্দীর মধ্যে দিগ্বিজয়ী মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী দক্ষিণ দিকে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম দিকে আটলান্টিক উপকূলে ফ্রান্সের পিরেনিস পর্বতমালা, উত্তর দিকে কাস্পিয়ান সাগর এবং পূর্ব দিকে ভারতের

www.pathagar.com

সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল পদানত করে। একসময় দূরপ্রাচ্যে চীন সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ব ইতিহাসে দশম বৃহত্তম সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে। ভারত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের দৈর্ঘ্য ছিল ৬ হাজার মাইল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশ জুড়ে ছিল ইসলামী সাম্রাজ্য। ৭১১ সালে তারিক বিন জিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালী পাড়ি দিয়ে স্পেনের উপকূলে পৌঁছে সব জাহাজ পুড়িয়ে দেন। জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে তিনি তার সৈন্যদের উদ্দেশে আবেগময় ভাষায় ভাষণ দেন। তার ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম সৈন্যরা রাজা রডারিকের সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করে স্পেন জয় করে। তখন জিব্রাল্টার প্রণালীর নাম ছিল মোন্স কাল্পি। তারিকের স্পেন বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য মোন্স কাল্পি প্রণালীর নামকরণ করা হয় 'জাবালুত তারিক' বা তারিকের পাহাড়। স্পেন বিজয় সম্পন্ন করে সেনাপতি তারিক ফ্রান্সসহ গোটা পশ্চিম ইউরোপে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছিলেন। ঠিক তখন খলিফা আল-ওয়ালিদ তাকে দামেস্কে ডেকে পাঠান। তারিককে দামেস্কে ডেকে পাঠানো না হলে তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারতেন। ৭৩২ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে তুরসের যুদ্ধে ইউরোপে মুসলিম অগ্রাভিযান থেমে গেলেও স্পেন ও পর্তুগাল নিয়ে গঠিত আইবেরীয় উপদ্বীপে মুসলিম শাসন প্রায় ৯ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

ইসলামী সাম্রাজ্যের মতো পৃথিবীতে আর কোনো সাম্রাজ্য এত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। আদর্শ হিসাবে ইসলামই ছিল মুসলমানদের বিজয়ের চাবিকাঠি। ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড আর. টার্নার অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় তা স্বীকার করেছেন। 'সায়েন্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম: এন ইলাসট্রেটেড ইন্ট্রডাকশন'-এর ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, '*Early Muslim conquests were accelarated by the weakened conditions of the Byzantines and Persians, long afflicted with political oppression, dissension and widespread civil disarray. Perhaps the time invited some new and compelling force, idea or spirit. Such was forthcoming. The religious zeal of Muhammad's followers, the strengthening bonds of their new faith, their commander's capabilities of leadership and their soldier's concerted military skills, superior to those of opposing tribal groups, were all crucial factors in the Muslim's conquests as they expanded both eastward and westward.*'

অর্থাৎ' *বাইজান্টাইনীয় ও পার্সীদের দুর্বল দশা প্রাথমিকভাবে মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত করেছিল। বাইজান্টাইনীয় ও পার্সীরা ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নিপীড়ন, বিবাদ ও ব্যাপক সামাজিক বিশৃঙ্খলার শিকার। সম্ভবত বিরাজমান সময় নতুন একটি অজেয় শক্তি, আদর্শ অথবা চেতনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অনুরূপ আদর্শের উত্থান ছিল আসন্ন। মোহাম্মদের (সা.) অনুসারীদের উদ্দীপনা, তাদের নয়া বিশ্বাসের জোরালো ঐক্যের বন্ধন, নেতৃত্বদানে তাদের কমান্ডারদের সামর্থ্য এবং তাদের সৈন্যদের সম্মিলিত সামরিক দক্ষতা ছিল প্রতিপক্ষ উপজাতীয় গ্রুপগুলোর তুলনায়*

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতর। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকে মুসলিম সম্প্রসারণকালে তাদের বিজয়ের মূলে এসব উপাদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।'

বিজ্ঞানের পথে অগ্রযাত্রা

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম হয়। বংশানুক্রমিক বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলেও শাসকগণ ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। প্রথমেই ক্ষমতায় আসে উমাইয়া বংশ। উমাইয়া আমলে দামেস্ক ইসলামী খিলাফতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

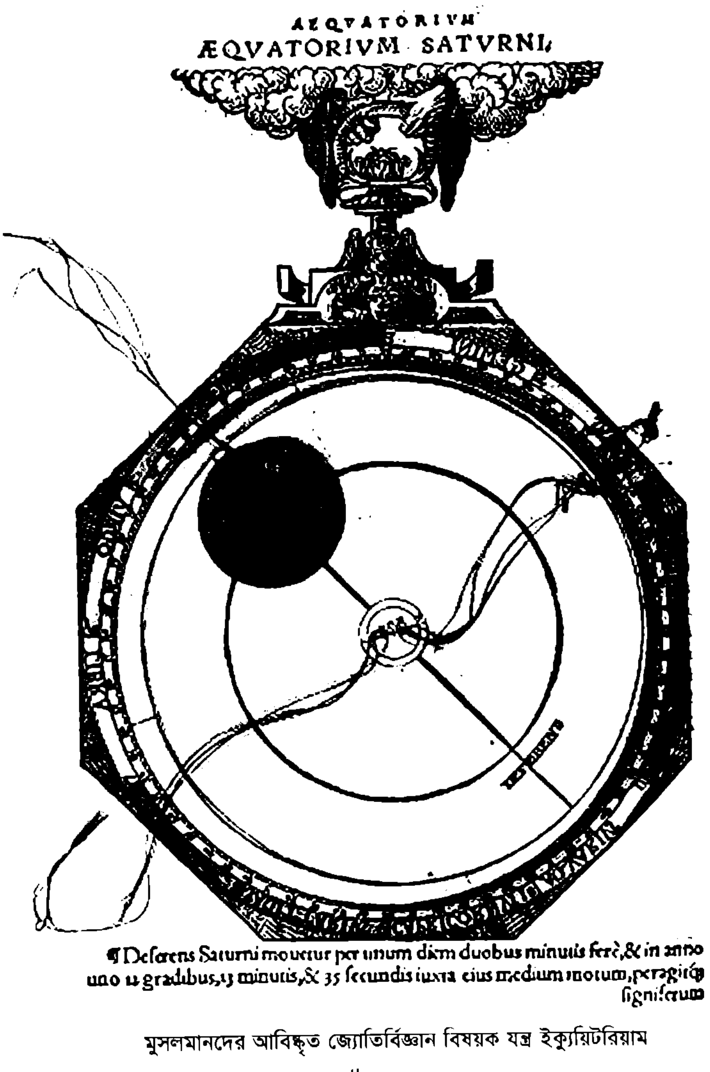

মুসলমানদের আবিষ্কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্র ইক্যুয়িটরিয়াম

www.pathagar.com

এসময় আরবরা আলেক্সান্ড্রিয়া, নিসিবিস ও জুন্দি-শাহপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। রাজধানী দামেস্ক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অদূরে থাকায় আরবরা প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পায়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ এক হাজার পর্যন্ত বিশ্বে জ্ঞানের মশাল ছিল গ্রীক গণিতজ্ঞদের হাতে। বাইজান্টাইনীয়রা নিরানন্দ গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাওহীদবাদী মুসলমানরা কার্যত বহুত্ববাদী গ্রীক দর্শনের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। গ্রীকদের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের মিল না থাকলেও তাদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো বিরোধ ছিল না। অন্যদিকে ইউরোপ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে ধর্মীয় একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের সব সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ইউরোপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গ্রীক ও প্রাচ্যের মুসলমানদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। তাতে উভয় সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে গ্রীক ও পার্সী জ্ঞান ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে প্রাচীন জ্ঞান নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে।

ক্যাথলিক চার্চ খ্রিস্টান ইউরোপকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, মুসলমানরা হলো 'নাস্তিক'। মুসলমানদেরকে 'স্যারাসিন', 'মুর,' প্যাগান,' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হতো। চার্চের প্রচারণার তোড়ে ইউরোপীয়রা মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে তাদের চেয়ে নিকৃষ্টতর হিসাবে ভাবছিল। অনুরূপ ভুল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে একাদশ শতাব্দীর আগে খ্রিস্টান ইউরোপ ইসলামী বিশ্বে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। অজ্ঞতার জন্য ইউরোপ অন্ধকার যুগে বাস করতে থাকে। অন্যদিকে চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা বিকশিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীতে সেন্ট পলের গীর্জা ছিল ইউরোপের বৃহত্তম লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিতে ছিল মাত্র ৩৬টি বই। বিপরীতে মুসলিম শাসিত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা লাইব্রেরিতে ছিল ৫ লাখ বই। স্পেনের সেভিল থেকে এশিয়ার সমরকন্দ পর্যন্ত জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠে। জ্ঞাত সব জ্ঞান বিজ্ঞানকে মুসলমানরা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন যে, গণিত হলো সব বিজ্ঞানের মূল। প্রাথমিকভাবে মুসলমানরা এরিস্টোটলের এ যুক্তি মেনে নেয়। মুসলিম পণ্ডিতগণ গ্রীক গণিত গ্রন্থ অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আরব ছিল পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক গণিত প্রবেশে একটি মূল প্রবেশদ্বার। এ সম্পর্কে ডেভিড ই. স্মিথ 'হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্স'-এ লিখেছেন, *'The world owes a great debt to Arabs scholars for preserving and transmitting to posterity the classics of Greek mathematics.....their work was chiefly that of transmission, although they developd considerable ingenuity in algebra and showed genius in their work in trigonometry.'*

অর্থাৎ *'ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রাচীন গ্রীক গণিত সংরক্ষণ ও হস্তান্তরে বিশ্ব আরব পণ্ডিতদের কাছে বহুলাংশে ঋণী। তাদের কাজ ছিল মূলত হস্তান্তর যদিও তারা*

www.pathagar.com

বীজগণিতে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি করেছেন এবং ত্রিকোণমিতিতে তাদের কর্মে মেধার পরিচয় দিয়েছেন।'

এ সম্পর্কে হেলেন সেলিনের একটি উদ্ধৃতিও উল্লেখযোগ্য। গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসাবে মুসলমানদের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড মেডিসিন' শিরোনামে বইয়ের ৮২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*With the rapid expansion of Arabian tribes into western Asia and northern Africa in the early seventh century, the Islamic world fell heir to the documentary remains of Greek science and mathematics. Scientific research had ground to a halt in the Byzantine empire; and in a very real sense the intellectual center of gravity was transferred to the East, where, despite occasional upheavels, learning flourished under a* series of enlightened patrons for over five hundred years.'

অর্থাৎ '*সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় আরবীয় গোত্রগুলোর দ্রুত বিস্তার ঘটায় ইসলামী বিশ্ব গ্রীক বিজ্ঞান ও গণিতের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্থবির হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত অর্থে প্রাচ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভরকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও প্রাচ্যে বেশ ক'জন গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ শ' বছরের অধিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে।'*

গণিতের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলেও মুসলমানরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেনি। মুসলিম শাসকদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় শুরু হয় ইসলামী বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিজ্ঞান সাধনা একটি সর্বব্যাপী আন্দোলনে রূপ নেয়। আরবরা শুধু গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন নয়, আরবীয় বিজ্ঞান উদ্ভাবনেও আত্মনিয়োগ করে। বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সূচনাকালে ৭০৭ সালে দামেস্কে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার গ্রীকভাষী দার্শনিক হিরনের গ্রন্থাবলী প্রথম আরবীতে অনুবাদ করা হয়। মুসলিম অপরসায়বিদরা প্রথম ধাতু রূপান্তর বা 'ফিলসোফার্স স্টোন' তত্ত্ব প্রচার করেন। তাদের কারো কারো গবেষণাগারে কৃত্রিম প্রাণী তৈরির প্রণালী ছিল। কিন্তু নবম শতাব্দী থেকে পরবর্তীতে বাস্তববাদী মুসলিম বিজ্ঞানীরা অপরসায়নের এসব তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিম রসায়নবিদরা পানীয় ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহারের জন্য গোলাপ পাতনের মধ্য দিয়ে গোলাপ জল তৈরি করেন। তারা প্রথম পানি সরবরাহ এবং দীর্ঘ যাত্রায় ব্যবহারের জন্য পরিস্রুত পানি ও পরিশোধিত পানি উৎপাদন করেন। মুসলিম বিশ্বে একটি উৎকৃষ্ট পানীয় হিসাবে শরবত ছিল খুবই জনপ্রিয়। এ পানীয় লর্ড বায়রনের মতো ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। মুসলমানরা শরাব তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি জুস উদ্ভাবন করে। স্বর্ণযুগে মুসলিম বিশ্বে তরল সিরাপ তৈরি করা হতো। এ সিরাপ রেফ্রিজারেটরের বাইরে কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যেতো। মুসলিম বিজ্ঞানী আব্বাস ইবনে ফারনাস আদর্শ কাঁচ ও স্ফটিক কাঁচ আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথম বালি কণা ও পাথর থেকে কাঁচ তৈরি করেন। একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনে স্বচ্ছ কাঁচের আয়না তৈরি হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বে প্রথম কাঁচের

www.pathagar.com

কারখানা স্থাপন করা হয়। আরব রসায়নবিদরা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা, টিন, পারদ, আর্সেনিক, আলকালি, আলকালি লবণ, ভিনিগার, সোহাগা, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার, সাল এমোনিয়াক, পরিশোধিত সাল এমোনিয়াক, সাল নাইট্রাম, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম সালফার, ভিট্রিওল, ইথানল, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, এমোনিয়া, কর্পূর, সুগন্ধি তেল, সীসা, কার্বন, এন্টিমনি, একোয়া রিজিয়া, এলাম, মূল্যবান পাথর, সালফার, লবণ, স্পিরিট ইত্যাদি রসায়নিক পদার্থগুলো আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে প্রাচীন গ্রীসে ভিনিগার ছাড়া আর কোনো এসিড উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম অপরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল উৎপাদন করেন। দাহ্য তেল উৎপাদনে আধুনিক আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর আশপাশের খনিগুলো কাজে লাগানো হয়। এসব তেলখনির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল শত শত জাহাজ বোঝাই করার সমপরিমাণ। স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম জলপাই ও এরোমেটিক তেল এবং সোডিয়াম থেকে সত্যিকার সাবান তৈরি করেন। নাবলুস, কুফা ও বসরায় সাবান তৈরি করা হতো। কোনো কোনো সাবান ছিল তরল। আবার কোনোটি ছিল কঠিন। শেভিংয়ের জন্য তৈরি সাবান প্রতিটি বিক্রি করা হতো তিন দিরহামে।

৭৪৯ সালে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে শুরু হয় মুসলিম খিলাফতে বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার আরেকটি নয়া অধ্যায়। উমাইয়া শাসনামলে গাণিতিক বিজ্ঞানের সব শাখায় অগ্রগতির সূচনা ঘটলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ। পরবর্তীতে আব্বাসীয় রাজবংশের শাসনামলে সংকীর্ণতার অবসান ঘটলে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগ বলতে বুঝায় মূলত আব্বাসীয় আমলকে।

আব্বাসীয় বংশ

৭৪৯ সালে আবুল আব্বাস উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের উত্থান ও পতনের মধ্যবর্তী সময় হলো স্বর্ণযুগ। এ সময় মুসলিম দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীগণ ইতিপূর্বের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অবদান রাখেন। আব্বাসীয়রা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের শাশ্বত বাণী অনুসরণ করতেন। হাদিসে বলা হয়েছে, *'বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র এবং জ্ঞানার্জনে তোমরা প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।'* পবিত্র হাদিসের এসব বাণী এবং ভৌগোলিক ঐক্য, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আদর্শগত তাগিদ আরবদের বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে উদ্বুদ্ধ করে। পরমত সহিষ্ণুতা ছিল উন্নতির আরেকটি কারণ।

ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি

ইসলামের স্বর্ণযুগে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়কে গ্রাহ্য করা হয়নি। সব ধর্মের মানুষের যোগ্যতাকে সমান মূল্য দেয়া হতো। ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় সমাজ পরিচালিত হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজ করতো। ধর্মীয় স্বাধীনতা

www.pathagar.com

আন্তঃসাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনা করে। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে আমেরিকার সুপরিচিত লেখক ড্রেপারের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, '*During the period the learned men of the Christians and Jews were not only held in high esteem but were appointed to posts of great responsibility, and were promoted to the high ranking positions in the government. Haroon al-Rashid appointed John, the son of Maswaih, the director of Public Instruction and all the schools and colleges were placed under his charge. He (Haroon) never considered to which country a learned person belonged nor his faith and belief, but only his excellence in the field of learning.*'

অর্থাৎ '*এসময় খ্রিস্টান ও ইহুদী বিদ্বান ব্যক্তিরা শুধু উঁচু মর্যাদা ভোগ করতেন তাই নয়, তাদেরকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেয়া হতো। হারুনুর রশীদ মাসিয়াহর পুত্র জনকে গণশিক্ষা বিভাগের পরিচালক পদে নিযুক্তি দেন এবং সব স্কুল ও কলেজ তার দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। বিদ্বান ব্যক্তি কোন দেশ বা ধর্মের তা তিনি (হারুন) কখনো বিবেচনা করেননি, তিনি শুধু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা বিচার করতেন।*'

স্বর্ণযুগে সবার সম্মিলিত সহাবস্থানের প্রশংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড আর. টার্নার 'সায়েন্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম'-এ লিখেছেন, '*Muslim artists and scientists, princes and labourers together made a unique culture that has directly and indirectly influenced societies on every continent.*' অর্থাৎ '*মুসলিম শিল্পী ও বিজ্ঞানী, যুবরাজ ও শ্রমিক সম্মিলিতভাবে একটি বিস্ময়কর সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল যা প্রতিটি মহাদেশের সমাজগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।*'

'দি ইসলামিক খালিফা এন্ড ইটস ইলাস্ট্রিয়াস গোল্ডেন এজ'-এ ড্রেপারের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা হয়, '*Islam safeguarded the rights of non-Muslims and generally they were not oppressed under the Khalifah. The heads of non-Muslim communities ensured that the terms of the dhimma between the state and the non-Muslim citizens were honoured. Non-Muslims participated in all aspects of civic life. The Coptic Christians in Egypt worked within the financial servic— whilst the Jews commonly worked within the medical profession. Relations between Muslims and Jews in Umayyad Spain and the Muslims and the Nestorian Christians in Abbasid Baghdad were close and easy. The Jews were at ease with living alongside Muslims in the holy land and elsewhere in the Khilafat. The following example illustrates this point. When the Crusaders conqured Jerusalem in 1099 and mercilessly slaughtered Jews, Christians and Muslims, the Jews sided with Muslims. A Jewish pilgrim to Jerusalem wrote to a relative in 1100. 'The Franks arrived and killed everybody in the city whether of Ismael or Israel. Now all of us had anticipated that our sultan- may God bestow glory upon his victories- would set out against the Franks with his troops and would chase them away.'*

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'ইসলাম অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে এবং খিলাফত আমলে সাধারণত তারা নির্যাতিত হয়নি। অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানদের এ নিশ্চয়তা দিতে হতো যে, রাষ্ট্র এবং অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যকার জিম্মার শর্তের প্রতি সম্মান জানানো হবে। অমুসলিম নাগরিকরা জীবনের সবকিছুতে অংশগ্রহণ করতো। মিসরের কপটিক খ্রিস্টানরা যেভাবে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত হতো ঠিক সেভাবে ইহুদীরা সাধারণত চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হতো। উমাইয়া শাসিত স্পেনে মুসলমান ও ইহুদী এবং বাগদাদে আব্বাসীয় শাসনে মুসলমান ও নেস্টোরীয় খ্রিস্টানদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। পবিত্র ভূমি বা জেরুজালেম এবং খিলাফতের অন্যান্য জায়গায় ইহুদীরা স্বাচ্ছন্দ্যে মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করতো। নিচে উল্লেখিত একটি ঘটনা তা প্রমাণ করছে। ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করতে শুরু করলে ইহুদীরা মুসলমানদের পক্ষ নেয়। ১১০০ সালে জেরুজালেমে একজন ইহুদী তীর্থযাত্রী তার আত্মীয়ের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিল, 'ফ্রাঙ্করা এ নগরীতে এসে পৌঁছানোর পর মুসলমান ও ইহুদী নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে। এখন আমাদের সবাই প্রত্যাশা করছি যে, আমাদের সুলতান (ঈশ্বর তাকে জয়যুক্ত করুন) ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে তাদেরকে বিতাড়িত করবেন।'

স্বর্ণযুগে ইসলামী খিলাফতে সব ধর্মের স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল বলে ঐতিহাসিক করোনা ব্রিজাইনা-ও স্বীকার করছেন। তিনি তার 'আল খাওয়ারিজমি: দি ইনভেন্টার অব এলজাব্রা' শিরোনামে বইয়ের ১৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Following the examples set by Muhammad, the caliphs encouraged a degree of religious tolerance. Non-Muslims were allowed to worship as they chose and go about their business in complete freedom as long as they paid tax and promised not to carry weapons.*' অর্থাৎ '*মোহাম্মদের (সা.) আদর্শ অনুসরণে খলিফাগণ ধর্মীয় স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করতেন। অমুসলিমরা নিজেদের ইচ্ছামতো ধর্ম পালন করতে পারতো এবং রাজস্ব পরিশোধ করলে এবং হাতিয়ার বহন না করার প্রতিশ্রুতি দিলে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারতো।*'

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

স্বর্ণযুগে ইসলামী সভ্যতার বিকাশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আধুনিক গবেষকরা এ সত্য স্বীকার করছেন। এ ব্যাপারে 'ফরমেশন অব ইসলামিক ম্যাথমেটিক্স'-এর ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়, '*Islam kept better free of ethnocentrism as well as culturocentrism than many other civilizations.*' *অর্থাৎ 'ইসলাম বহু সভ্যতার চেয়ে অধিক জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছে।'*

মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকায় বেশ কয়েকজন মুসলিম দার্শনিক ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ দর্শন প্রচার করার সুযোগ পান। কেউ কেউ এরিস্টোটলের

www.pathagar.com

দর্শনের সঙ্গে ইসলামী দর্শনের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। মুসলিম শাসকগণ ছিলেন তাদের প্রতি সহিষ্ণু। তবে ইমাম গাজ্জালি (র.) পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলিষ্ঠভাবে তাদের মোকাবিলা করেছেন। দর্শন নিয়ে তুমুল বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হয়েছে। কিন্তু কোথাও রক্তপাত হয়নি। অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মি হিসাবে জিজিয়া কর পরিশোধ করলেও তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হয়নি। নিচের একটি ঘটনা তার প্রমাণ।

খলিফা আল-মামুনের চাচাতো ভাই আল-হাশেমী ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে এক অমুসলিমের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিতে অন্যের মত প্রকাশের প্রতি সহিষ্ণুতার উত্তম আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। 'দ্য রাইজ এন্ড ফল অব দি ইসলামিক সায়েন্স: দ্য ক্যালেন্ডার এজ অ্যা কেস স্টাডি'তে ঐতিহাসিক আই. এ. আহমদ সেই চিঠিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। আল-হাশেমী অমুসলিমের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন, *'Bring forward all the arguments you wish and say whatever you please and speak your mind freely. Now that you are safe and free to say whatever you. Please appoint some arbitrator who will impartially judge between us and lean only towards the truth and be free from the empary of passion, and that arbitrator shall be rational, whereby God makes us responsible for our own rewards and punishments. Herein I have dealt justly with you and have given you full security and am ready to accept whatever decision arbitrator may give for me or against me. For `There is no compulsion in religion' (Qur`an 2:256) and I have only invited you to accept our faith willingly and of your own accord and have pointed out the hideousness of your present belief. Peace be with you and the blessings of God.'*

অর্থাৎ *'আপনার সব যুক্তি উপস্থাপন করুন এবং যা খুশি তাই বলুন। খোলা মনে কথা বলুন। এখন আপনি নিরাপদ এবং যা খুশি তা বলার স্বাধীনতা আপনার আছে। অনুগ্রহ করে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করুন যিনি নিরপেক্ষভাবে আমাদের মধ্যকার মতবিরোধ মীমাংসা করবেন এবং কেবলমাত্র সত্য হবে তার মানদণ্ড এবং তিনি সব ধরনের আবেগ থেকে মুক্ত থাকবেন। সেই মধ্যস্থতাকারীকে অবশ্যই যুক্তি অনুযায়ী বিচার করতে হবে। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী। সৎ কাজের জন্য তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। আমি আপনার সঙ্গে ন্যায়ানুগ আচরণ করেছি এবং আমি আপনাকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছি। মধ্যস্থতাকারীর রায় যা-ই হোক না কেন, আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। 'ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই' (কোরআন ২.২৫৬)। স্বেচ্ছায় এবং আপনার সম্মতিতে আমাদের ধর্ম গ্রহণে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আপনার বর্তমান ধর্মের ত্রুটিগুলো আপনার কাছে উল্লেখ করেছি। আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।'*

www.pathagar.com

নবম শতাব্দীতে বিশ্বে একচেটিয়াত্ব কায়েম

নবম শতাব্দী ছিল একান্তভাবে ইসলামী শতাব্দী। এ শতাব্দীর সঙ্গে আর কোনো শতাব্দীর তুলনা হয় না। স্বর্ণযুগে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও শিক্ষায় একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতরা বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত জ্ঞানগুলো তারা আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী ও ফারসিতে অনুবাদ করা না হলে প্রাচীন বিশ্বের বহু জ্ঞান পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতো। পরবর্তীতে আরবী ও ফারসিতে অনূদিত গ্রন্থগুলো ল্যাটিন, হিব্রু ও তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এসময় মুসলিম বিশ্ব ছিল সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাচীন রোম, চীন, ভারত, পারস্য, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, গ্রীক ও বাইজান্টাইন থেকে আহরিত জ্ঞান এগিয়ে নিয়ে যান। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য, গ্রীস, পারস্য ও ভারতের জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা কাজে লাগান। দুর্লভ ধাতু সংগ্রহে আব্বাসীয়রা ভারত থেকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে অগ্রসর অপরিশোধিত ইস্পাত আমদানি করে। দামেস্ক ও টলেডোর মতো অস্ত্র উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলোতে এসব ধাতু প্রক্রিয়াকরণ করা হতো। আব্বাসীয়রা ইউরোপ থেকে লোহা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও মালয়েশিয়া থেকে টিন এবং উত্তর ইরান, আফগানিস্তান ও ককেশাস অঞ্চল থেকে রূপা আমদানি করে। বিজিত অঞ্চলের বিশাল স্বর্ণ ভাণ্ডার কাজে লাগানোর পাশাপাশি আরবরা সম্পদের নতুন নতুন উৎস খুঁজতে থাকে। হেজাজের স্বর্ণ খনি ছিল এরকম একটি উৎস। ৭৫০ সালে এখানকার স্বর্ণ খনিগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। স্বর্ণযুগে সিরামিক, গ্লাস, ধাতু শিল্প, বস্ত্র, প্রচ্ছদে দৃশ্য সম্বলিত পাণ্ডুলিপি, কাষ্ঠ শিল্প প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। বর্ণিল প্রচ্ছদ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়। জলছাপ ও পেইন্টিং এবং ক্যালিগ্রাফি উন্নতি লাভ করে। আরব সাগর ও বাহরাইন উপকূলে দাহলাক দ্বীপে মুক্তা শিল্পের বিকাশ ঘটে।

গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন, কার্থেজের নাগরিক কন্সটান্টাইন দি আফ্রিকান, ইহুদী দার্শনিক মুসা ইবনে ময়মনসহ আরো অনেকে গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো আরবীতে অনুবাদ করেন। মুসলিম স্পেনে আরবী দার্শনিক সাহিত্য হিব্রু, ল্যাটিন, লাডিনো ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। মধ্যযুগে খ্রিস্টান ইউরোপে ল্যাটিন ও গ্রীক অনুবাদগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের ইউরোপ গালেন ও হিপোক্রেটসের মতো গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়। ইসলামী শাসনের আওতায় মধ্যযুগের বহু মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান বিশ্বে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান স্থানান্তরে

www.pathagar.com

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা খ্রিস্টান ইউরোপে এরিস্টোটলকে পরিচিত করে তোলেন। এছাড়া ইউক্লিড ও ক্লডিয়াস টলেমির মতো মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞ, জ্যামিতিবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ জ্ঞান পুনরুদ্ধার করা হয়। পার্সী বিজ্ঞানী আল-বেরুনি ও আবু নাসের মনসুরের মতো খ্যাতনামা মুসলিম পণ্ডিতগণ পুনরুদ্ধারকৃত এসব জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করেন। পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ গ্রীক পাণ্ডুলিপি ক্রয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তার আমলে আরব পণ্ডিত আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সর্বপ্রথম ৮২৯-৩০ সালে ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' (Elements) এবং টলেমির 'আলমাগেস্ট' (Almagest) আরবীতে অনুবাদ করেন।

আলমাগেস্টের মূল গ্রীক নাম ছিল 'ম্যাথমেটিকি সিনটাক্সিস' (Mathematike Syntaxis)। আল-হাজ্জাজ বইটির আরবী নামকরণ করেন 'কিতাব আল-মাজেস্তি'। 'আলমাজেস্তি' থেকে বইটির নামকরণ করা হয় 'আলমাগেস্ট' (Almagest)। 'আলমাগেস্ট' শব্দটির অর্থ হলো 'বিশাল'। এ গ্রন্থ অধ্যয়নে আরব পণ্ডিতগণ উজ্জীবিত হন এবং অনুরূপ গ্রন্থ লিখার জন্য উৎসাহ বোধ করেন। আল-হাজ্জাজ দু'বার ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' আরবীতে অনুবাদ করেন। প্রথমবার অনুবাদ করেছিলেন খলিফা হারুনুর রশীদের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়বার তার পুত্র খলিফা আল-মামুনের নির্দেশে। আল-মাহানি ইউক্লিডের পঞ্চম পুস্তকের ভাষ্য, সমানুপাত, ইউক্লিডের প্রথম পুস্তকের ২৬ সম্পাদ্য, নক্ষত্রের অক্ষরেখা এবং ইউক্লিডের দশম গ্রন্থের আলোচনা করেন। টলেমির 'জিওগ্রাফিয়া'র (Geographia) সিরীয় অনুবাদ এবং মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির সঙ্গেও আরবরা পরিচিত ছিল। জিওগ্রাফিয়া'র মডেলে আরবরা 'কিতাবুস সুরাত আল-আরদ'-এর মতো ভূগোল বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে। 'কিতাবুস সুরত আল-আরদ' অবলম্বনে পরবর্তীকালে আরব ভূগোলবিদরা আরো উন্নত মানের গ্রন্থ রচনা করে। খলিফা আল-মামুনের সময় রচিত 'কিতাব সুরত আল-আরদ আল-খাওয়ারিজমি' হলো এমনি একটি বই।

পার্সী গণিতজ্ঞ মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি তার ঐতিহাসিক 'কিতাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা'য় বীজগণিতের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটান। তার গ্রন্থ 'মুকাবালা' থেকে 'এলজাব্রা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তাই তাকে বীজগণিতের জনক হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। 'এলগোরিজম' (Algorism) ও 'এলগোরিদম' (Algorithm) শব্দ দু'টি এসেছে আল-খাওয়ারিজমির ল্যাটিন নাম থেকে। ইবনে আল-হাইছাম তার 'বুক অব অপটিক্স' (Book of Optics)-এ আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত একটি পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন। ব্রাডলি স্টিফান ইবনে আল-হাইছামকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়নে প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্বের সব বড় শহরে হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কায়রোর কালায়ুন হাসপাতালের স্টাফের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসাবিদ, ফার্মাসিস্ট ও নার্স। ডিসপেনসারি ও গবেষণা কেন্দ্রের দ্বার ছিল অবারিত। কেবলমাত্র বাগদাদেই ডাক্তার ছিলেন ৮শ'। এনাটমি এবং রোগ নির্ণয়ে মৌলিক সাফল্য অর্জিত হয়। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল-রাজি গুটিবসন্ত ও হামের মধ্যে ক্লিনিক্যাল পার্থক্য নির্ধারণ করেন। ইবনে সিনা 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন' (The Canon of Medicine) এবং 'দ্য বুক অব হীলিং' (The Book of Healing) নামে পরিচিত দু'টি বিশ্ববিখ্যাত বই রচনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। ইবনে সিনার 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং এ চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষের ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদে গোটা পশ্চিম ইউরোপ ছেয়ে যায়। কেবলমাত্র পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন' ৩০ বারের বেশি প্রকাশিত হয়। তার এ গ্রন্থ রেনেসাঁ যুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

বাস্তব তাগিদ আরবীতে গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদে আরবদের বাধ্য করে। দামেস্ক ও বাগদাদের মতো শহরগুলোতে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত খ্রিস্টান ও ইহুদী পণ্ডিতদের সঙ্গে মুসলিম পণ্ডিতদের তর্ক বিতর্ক হতো। গ্রীক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় মুসলিম পণ্ডিতগণ খ্রিস্টান ও ইহুদী পণ্ডিতদের সঙ্গে এসব তর্কে হেরে যেতেন। তাই নিজেদেরকে অগ্রসর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে খলিফাগণ গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ওপর জোর দেন। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদের সংখ্যা এত ব্যাপক ও ধারাবাহিক ছিল যে, আজকের যুগে ইউরোপের যে কোনো ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের চেয়ে তার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য সাফল্য

ধর্মীয় তাগিদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতিতে মুসলমানদের অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরজ। ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামী শাসন সম্প্রসারিত হলে মক্কার সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপথই ছিল মক্কা আসার একমাত্র ভরসা। তাই সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভে মুসলমানরা ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 'আলমাগেস্ট-'এ চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে টলেমির বর্ণনা খুঁজে পান। আলমাগেস্টে টলেমি বলেছিলেন, তিনি চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য বর্ণনায় গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপারকাসকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। আলমাগেস্টে ক্রান্তিবৃত্তের আনতির (Inclination of ecliptic) মান নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৩.৫১.২০ ডিগ্রি এবং ভারতীয় সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল ২৪ ডিগ্রি।

www.pathagar.com

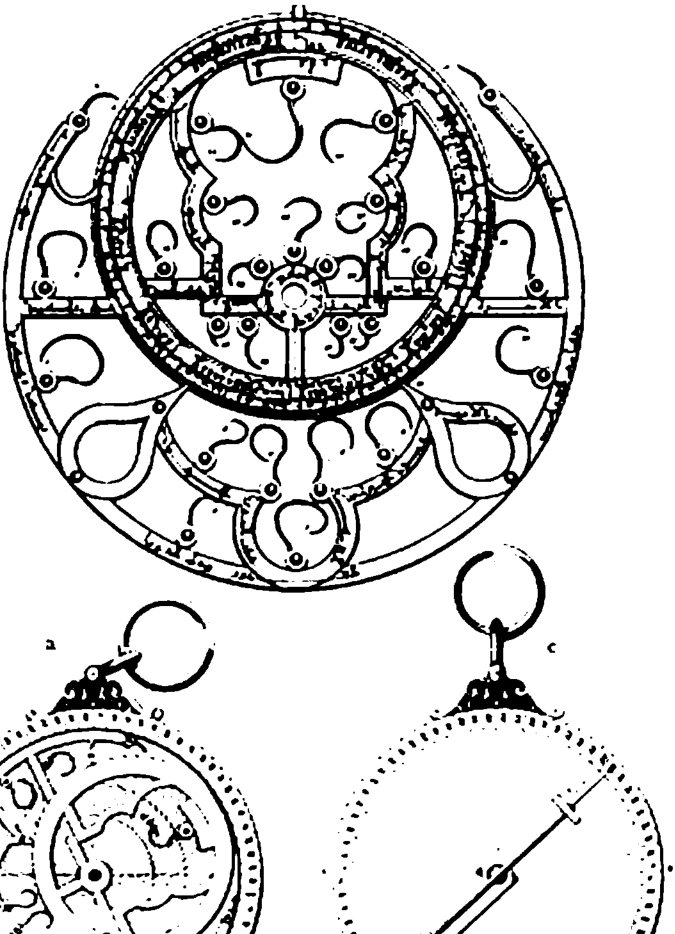

Arabisches Astrolabium, 1208.

nach Sarrus

এস্ট্রোল্যাব

www.pathagar.com

নবম শতাব্দীতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে টলেমির ভুল ধরা পড়ায় তারা ক্রান্তিবৃত্তের আনতির মান ২৩.৩০ ডিগ্রি হিসাবে উল্লেখ করেন। মানচিত্র অঙ্কনে অধিকাংশ আরব মানচিত্রবিদ টলেমির দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতেন। টলেমির দিকনির্দেশনার সঙ্গে মুসলমানরা অনুসন্ধান ও ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজেদের অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম বণিকরা স্থল ও জলপথে পূর্ব দিকে সুদূর চীন, দক্ষিণ দিকে জাঞ্জিবারসহ আফ্রিকা মহাদেশের দূরবর্তী উপকূল, উত্তর দিকে রাশিয়া এবং পশ্চিম দিকে বিপদ সংকুল অজানা আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছায়। এসব ভৌগোলিক জ্ঞান মানচিত্র অঙ্কনে তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসারিত করে। সমসাময়িক বিশ্ব তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। গ্রীসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে আলো জ্বলে উঠেছিল আরবদের কল্যাণে পুনরায় তা জেগে উঠে। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দামেস্ক ও বাগদাদের মানমন্দিরে আকাশ ও পৃথিবী পর্যবেক্ষণে মনোযোগ দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় তারা কম্পাস ও রুলার ব্যবহার করতেন। আল-বাত্তানি জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। তিনি পৃথিবীর অক্ষের অয়নচলন পরিমাপে উন্নয়ন ঘটান। আল-বাত্তানি, ইবনে রুশদ, নাসিরুদ্দিন তুসি, মহিউদ্দিন উর্দি ও ইবনে শাতির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনের তত্ত্ব বা 'জিওসেন্ট্রিক মডেল' (Geocentric model) সংশোধন করেন। তাদের এ সংশোধনী সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনে কোপার্নিকাসের মডেল বা 'হেলিওসেন্ট্রিক মডেল'-এ (Heliocentric model) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক 'এস্ট্রোল্যাব' (Astrolabe) যন্ত্রটি মূলত গ্রীকরা আবিষ্কার করলেও মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। খলিফা আল-মনসুরের রাজত্বকালে পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইব্রাহিম ইবনে হাবিব আল-ফাজারি সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রের উচ্চতা নির্ণয়ে সর্বপ্রথম নতুন মডেলের এস্ট্রোল্যাব তৈরি করেন। তিনি আরবীয় বর্ষ গণনা সুনিয়ন্ত্রিত করে দিনপঞ্জি প্রণয়ন করেন। মুসলমানরাই ইউরোপে এস্ট্রোল্যাব নিয়ে যায়। ৯৭০ সালে তাদের কাছ থেকে ফরাসি পোপ গার্বার্ট এ যন্ত্রটি লাভ করেন। জাবির ইবনে হাইয়ানের মতো মুসলিম রসায়নবিদ ও আলকেমিস্টদের গ্রন্থ মধ্যযুগে ইউরোপীয় রসায়নবিদ ও আলকেমিস্টদের পথ প্রদর্শন করেছে। পাতন প্রণালীর মতো রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে মুসলিম বিশ্বে এবং মুসলিম বিশ্ব থেকে এ জ্ঞান ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

আরব বিজ্ঞানী কুতুবি প্রথম ঘড়ি নির্মাণ করেন। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত মুস্তানসারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিচিত্র ঘড়ি ছিল। এ ঘড়ির ডায়াল ছিল আকাশের মতো নীল এবং ডায়ালের ওপরে ছিল সূর্য। সময় নির্দেশ করার জন্য সূর্যটি অনবরত ঘুরতো। ৭৯৯ সালে আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ ফরাসি সম্রাট শার্লিমেনকে একটি জলঘড়ি, একটি হাতি, হাতির বক্র শিং, স্বর্ণের তৈরি কলসি, এক সেট দাবার ঘুটি এবং পিতলের মোমদানি উপহার দেন। জলঘড়ির ডায়ালে দিনের ১২ ঘণ্টার প্রতীক হিসাবে ১২টি ছোট দরজা ছিল। প্রত্যেক ঘণ্টায় সেই ঘণ্টার প্রতীক দরজাটি খুলে যেতো। এই

www.pathagar.com

জলঘড়ি দেখে ইউরোপীয়রা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। শার্লিমেন ও হারুনুর রশীদ একে অন্যকে শক্তিশালী সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শার্লিমেন উপহার হিসাবে বাগদাদে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন ও ফ্রিশিয়ান জামাকাপড় পাঠিয়েছিলেন। শার্লিমেন আরবী দিনারের আদলে রৌপ্য মুদ্রা তৈরি করেছিলেন। খলিফা হারুন ৭০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে 'আল-ইয়াতিমা' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মুক্তা ক্রয় করেছিলেন।

খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে মেসোপটেমিয়ায় সিজারের ময়দান, বাগদাদ ও শামসিয়ায় তিনটি মানমন্দির স্থাপন করা হয় এবং এ তিনটি মানমন্দিরের নিরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক 'আল-জিজ আল-মুমতাহান' বা 'আল-মামুন' তালিকা তৈরি করা হয়। 'আল-জিজ আল-মুমতাহান' তৈরিতে যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী সহায়তা করেছিলেন আবু আলী ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর ছিলেন তাদের অন্যতম। পার্সী আবি মনসুর খলিফা মামুনের দরবারে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। খলিফা মামুনের নির্দেশে ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (Obliquity of Ecliptic) নির্ধারণ করা হয়। বাগদাদ মানমন্দিরের পদার্থ বিজ্ঞানী আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। মামুনের রাজত্বকালে পৃথিবীর পরিধি, মেরিডিয়ান রেখা, বিষুব রেখা ও আয়ন মণ্ডলের সংযোগস্থল (Equinox), চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এবং ধূমকেতুর ছায়া নির্ণয় করা হয়। আল-খাওয়ারিজমি এবং আবুল আব্বাস ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির আল-ফরগানি ছিলেন খলিফা মামুনের আমলের দু'জন খ্যাতনামা পণ্ডিত।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ

ষষ্ঠ বাইজান্টাইন সম্রাট লিও প্রণীত সামরিক গ্রন্থ 'ট্যাকটিকা' এবং অন্যান্য গ্রীক সামরিক ও নৌ ম্যানুয়েলগুলো আরবীতে অনুবাদ করা হয়। স্বর্ণযুগে ইসলামী সাম্রাজ্য একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সিন্ধু ও স্পেন বিজয়ে মুসলিম নৌবাহিনী ছিল মূল শক্তি। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং ভ্রমণের কলা কৌশল নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। আরবীয় অঞ্চলে শুধু নীল নদ নয়, দজলা ও ফোরাতের মতো বহু নদী নেভিগেশনাল বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রাখে। মুসলিম বিশ্বের পোতাশ্রয়গুলোতে জাহাজ ও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক যান নির্মাণ করা হয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত স্পেনে জাহাজ নির্মাণ শিল্প ছিল অর্থনীতির একটি শক্তিশালী খাত। উপকূল রক্ষায় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের আমলে নৌ-বাহিনীকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো ছিল (১) সিরীয় বাহিনী (২) তিউনিসীয় বাহিনী (৩) আলেক্সান্দ্রীয় বাহিনী (৪) বেবিলনীয় বাহিনী এবং (৫) মিসরীয় বাহিনী। মিসরের জন্য যুদ্ধজাহাজ ও যন্ত্র নির্মাণ কারখানা ছিল বেবিলন ও ক্লিসমায়। ত্রিপোলিতে ছিল ১ হাজার ৮ শত রণতরী। স্পেনে আলমেরিয়া ছাড়া আরো কয়েকটি নৌঘাঁটি ছিল। এসব ঘাঁটিতে মোতায়েন যুদ্ধজাহাজকে বলা হতো 'দার আল-ইনসা' অথবা 'দার সিনাত আল-মারাকিব'। 'দার আল-ইনসা'র ওজন ছিল

www.pathagar.com

এক হাজার টন এবং পরিবহন ক্ষমতা ছিল দেড় হাজার সৈন্য। মুসলিম যুদ্ধজাহাজ 'দার আল-ইনসা' থেকে ইংরেজি 'আরসেন্যাল' বা অস্ত্রাগার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত চীনা এডমিরাল ঝেং হি ফুটবল মাঠের সমান আয়তনের যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে একটি নৌবহর গঠন করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সব সমুদ্রের নকশা অঙ্কন করেন। অল্প বয়সে তিনি হজ করতে মক্কা নগরীতে এসেছিলেন। তার পূর্ণ নাম হাজী মোহাম্মদ শামসুদ্দিন। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি সমুদ্র যাত্রায় ছিলেন। তার বহরে ছিল ৩১৭টি যুদ্ধজাহাজ। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ৭০ বছর আগে তিনি আমেরিকা পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পোতাশ্রয়ে তার নৌবহর ধ্বংস হয়ে গেলে তার আমেরিকা আবিষ্কারের রেকর্ড বিনষ্ট হয়ে যায়। শুধু আমেরিকা নয়, এডমিরাল ঝেং পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাগিলানের এক শো বছর আগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসেন। এন্টার্টিকা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। ইংরেজ ক্যাপ্টেন জেমস কুকের সাড়ে তিন শো বছর আগে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পৌঁছেছিলেন। ভারত মহাসাগরে অভিযান চালিয়েছিলেন ৭ বার। শেষ সমুদ্র যাত্রায় তিনি ইন্তেকাল করলে তাকে সমুদ্রে সমাহিত করা হয়।

ইংরেজি 'এডমিরাল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবী 'আমির আল-বহর' এবং আরবীয় বোট 'কারিব' থেকে 'ক্যারাভেল' নামে পরিচিত দ্রুতগামী সামুদ্রিক যানের নামটি এসেছে। স্বর্ণযুগে নৌপথে চলাচলের জন্য 'কামাল' নামে একটি দিকদর্শন যন্ত্র ব্যবহার করা হতে থাকে। বিস্তারিত মানচিত্র থাকায় আরবীয় বণিকগণ উপকূলের পরিবর্তে সাগর ও মহাসাগরে পাল তুলতে সক্ষম হন। মুসলিম বণিকগণ ভূমধ্যসাগরে বিশাল মাস্তুলের তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হন। স্বর্ণযুগে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ রক্ষায় সুয়েজ খালের সঙ্গে নীল নদের একটি সংযোগ খাল খনন করা হয়। ৬৫৫ সালে আরবীয় নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলি ও রোডসে আক্রমণ চালিয়ে বাইজান্টাইন নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করে। উমাইয়া আমলে মুসলিম নৌবাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল অবরোধ করে। বাইজান্টাইনীয়রা অগ্নিনিক্ষেপক ব্যবহার করায় মুসলমানদের নৌ অবরোধ ব্যর্থ হয়। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌশক্তি ছিল অদ্বিতীয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র

আরবীতে জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বলা হতো 'ইলম আল-নুজুম'। ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামে এ শাস্ত্রের কোনো স্থান ছিল না। জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুমানসিদ্ধ হওয়ায় উমাইয়া যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রকে নিরুৎসাহিত করা হতো। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এ শাস্ত্র নিয়েও গবেষণা শুরু হয়। খলিফা ও সভাসদদের ভাগ্য গণনার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেয়া হয়। যুদ্ধযাত্রা, বিয়ে শাদি, জন্ম মৃত্যু ও অভিষেক থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি কাজে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর

www.pathagar.com

নির্ভর করা হতো। আরবরা বিশ্বাস করতো যে, মহান আল্লাহ আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তার হুকুমে গ্রহ নক্ষত্র পরিচালিত হচ্ছে। মরু অঞ্চলের লোক হিসাবে রাতে তাদের ভ্রমণ করতে হতো। ভ্রমণের দিকনির্দেশনার জন্য গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান জানার প্রয়োজন হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদের নামাজ আদায়ের সময় নির্ধারণ, কেবলামুখী হয়ে নামাজ আদায়, কেবলামুখী করে মসজিদ নির্মাণ এবং নয়া চাঁদ দেখে রোজা রাখতে হতো। এসব দৈনন্দিন প্রয়োজনে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। আরবরা বিশ্বাস করতো যে, গ্রহ নক্ষত্র জাগতিক বিষয় এবং মানব দেহ এমনকি ফসলের ওপর তারা প্রভাব বিস্তার করে। আবু মাশার, কুতুব আল-দীন শিরাজী ও উলুগ বেগ ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম জ্যোতিষী। অন্যদিকে আল-ফারাবি, ইবনে হাইছাম, ইবনে সিনা, আল-বেরুনি ও ইবনে রুশদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরোধিতা করতেন। তারা বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে অদৃশ্যের ঘটনা জানা সম্ভব নয়।

নিজস্ব জ্ঞান বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ইসলামের স্বর্ণযুগে স্থলপথে দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে চীন থেকে মুসলিম বিশ্বে কাগজের ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়। চীনারা কখনো কারো কাছে কাগজ তৈরির রহস্য প্রকাশ করতো না। তালাসের যুদ্ধ মুসলমানদের সে সুযোগ এনে দেয়। বন্দি চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির গোপন রহস্য উদ্ধার করা হলে মুদ্রণ জগতে বিপ্লব ঘটে। কাগজ উৎপাদিত হওয়ার আগে লেখকগণ পেপিরাস অথবা পশুর চামড়া ব্যবহার করতেন। পশুর চামড়া ব্যয়বহুল হওয়ায় মুদ্রণ শিল্পে স্থবিরতা বিরাজ করতে থাকে। ইসলামী বিশ্বে প্রথমে ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এবং পরে ৮৫০ সালে মিসরে কাগজ কল বসানো হয়। ইসলামী বিশ্বে পেপার মিল স্থাপিত হওয়ায় সুলভে বই পুস্তক ছাপানো শুরু হয় এবং লাইব্রেরির প্রসার ঘটে। কালি শুষে নিতে সক্ষম কাগজ দিয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ এবং কোরআন মুদ্রণ সহজতর হয়। ইউরোপীয় খ্রিস্টান সভ্যতা মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে লিনেন থেকে কাগজ তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করে। ৯৫০ সালে মরক্কোর ফেজ নগরী থেকে কাগজ গিয়ে পৌঁছায় মুসলিম নিয়ন্ত্রিত স্পেনের আল-আন্দালুসে। স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার কাছে যাতিবায় কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। স্পেনীয় মুর মুসলমানরা ইউরোপে প্রথম কাগজের মিল প্রতিষ্ঠা করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল-আন্দালুস থেকে মূল ইউরোপে কাগজ পৌঁছে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪৫০সালে জার্মানিতে গুটেনবার্গ আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। মানব সভ্যতায় মুসলিম বিশ্বে উৎপাদিত কাগজ উৎপাদনের গুরুত্ব কতটুকু ছিল জোসে মারিয়া মিলাসের একটি উক্তি উল্লেখ করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি 'অ্যা শেয়ার্ড লেগ্যাসি: ইসলামিক সায়েন্স ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, *'The introduction and spread of the paper making industry in the Near East and Western Meditarranean was one of the main technological achievements of Islamic*

www.pathagar.com

civilization. It was a milestone in the history of mankind.' অর্থাৎ *'নিকট প্রাচ্য ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কাগজ উৎপাদন এবং এ শিল্পের বিস্তার ছিল ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রযুক্তিগত সাফল্য। কাগজ উৎপাদন ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক।'*

স্বর্ণযুগে বরেণ্য আরব বিজ্ঞানীরা আত্মপ্রকাশ করেন এবং তারা বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগে বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, রসায়ন, আলোক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। ৮৪৭ সালে সুউচ্চ গম্বুজ সম্বলিত হিপোস্টাইল স্থাপত্যে ইরাকের সামারায় একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মুর মুসলমানগণ ৭৪৫ সালে স্পেনের কর্ডোভায় আরেকটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। আকর্ষণীয় অভ্যন্তরীণ খিলানের জন্য এ মসজিদ ছিল বিখ্যাত। গ্রেট মস্ক অব কর্ডোভার নির্মাণ কাজ ছিল স্পেনে ইসলামী স্থাপত্যের সূচনা। স্পেনের আলহামরা প্রাসাদ বা গ্রানাডার দুর্গ নির্মাণের মধ্য দিয়ে মুরীয় স্থাপত্য উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌছে। খোলা ও বায়ু চলাচল উপযোগী এ প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে ছিল লোহিত, নীল ও সোনালী রংয়ের কারুকাজ। দেয়ালগুলো গুচ্ছ স্তম্ভ এবং আরবী ক্যালিগ্রাফি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এছাড়া দেয়ালে বসানো হয় ঝকঝকে টাইলস। মুরীয় কবিরা আলহামরা প্রাসাদকে রত্নরাজিতে তৈরি একটি মুক্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। মুসলিম শাসিত স্পেনের সমৃদ্ধি আশপাশের প্রতিটি দেশকে ছাড়িয়ে যায়।

আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপে পৌছতে স্পেন একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। মুসলমানরাই ইউরোপে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এ. সালমান তার 'রাইজ এন্ড ফল অব দি অ্যারাব ডোমিনেশন'-এ লিখেছেন, *'The Arabs were the first to introduce Greek writers to the notice of the world. They kindled the lamp of a learning which illuminated the dark pages of history and it may be safely assumed that were it not for the Arabs, it would have been long before Europe, the present centre of civilization and progress, would have been irradiated by the bright light of knowledge.'*

অর্থাৎ *'আরবরাই বিশ্বের কাছে প্রথম গ্রীক গ্রন্থকারদের পরিচিত করে তোলেন। তারা জ্ঞানের বাতি প্রজ্বলন করে যা ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠাগুলোকে আলোকিত করেছেন এবং খুব স্বাচ্ছন্দ্যে একথা বলা যায় যে, আরবরা জ্ঞানের এ মশাল প্রজ্বলিত না করলে আজকের সভ্যতা ও অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্র ইউরোপকে জ্ঞানের শিখায় আলোকিত হতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো।'*

স্বর্ণযুগে মুসলমানদের সর্বব্যাপী অগ্রগতির বিবরণ দিতে গিয়ে টিবি ই. হাফ 'দ্য রাইজ অব আর্লি মডার্ন সায়েন্স: ইসলাম, চায়না এন্ড দ্য ওয়েস্ট'-এ লিখেছেন, *'Virtually in every field of endeavor- astronomy, alchemy, mathematics, medicine, optics and so forth- Arab scientists were in the forefront of scientific advance.'* অর্থাৎ *'দৃশ্যত বিজ্ঞানের* সব ক্ষেত্র বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান,

www.pathagar.com

আলকেমি, গণিত, চিকিৎসা, আলোক বিজ্ঞান ইত্যাদিতে আরব বিজ্ঞানীরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার সামনের সারিতে।'

ঐতিহাসিক ফিল্ডিং এইচ. গ্যারিসন-ও একথা স্বীকার করছেন। 'হিস্টরি অব মেডিসিন'-এ তিনি লিখেছেন, *'The Saracens themselves were the originators not only of algebra, chemistry and geology, but of many of the so-called improvements or refinements of civilization such as street lamps, window-panes, firework, stringed instruments, cultivated fruits, perfumes, spices etc.'* অর্থাৎ *'মুসলমানরা নিজেরা শুধু বীজগণিত, রসায়ন ও ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আবিষ্কারক তাই নয়; তারা রাস্তার বাতি, জানালার পাত, আঁতশবাজি, বাদ্যযন্ত্র, আবাদযোগ্য ফলমূল, প্রসাধনী, মসল্লা ইত্যাদির মতো সভ্যতার সৌন্দর্য বর্ধন ও উন্নতিতে অবদান রেখেছেন।'*

ইসলামী সভ্যতা শুধু আরব ভূখণ্ড নয়, গোটা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অন্তত কয়েক শত বছর তার কোনো তুলনা ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্যাক লিখেছেন, *'For five hundred years Islam dominated the world by its power, its learning and its superior civilization. Heir to the scientific and philosophical treasure of the Greeks, Islam passed on this treasure, after enriching it to the Western Europe. Thus it was able to widen the intellectual horizon of the Middle Ages and make a profound impression on the European life and thought.'*

অর্থাৎ *'ইসলাম তার ক্ষমতা, শিক্ষা এবং শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার জোরে বিশ্বে পাঁচ শত বছর আধিপত্য করেছে। গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসাবে এ জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে পাশ্চাত্যের কাছে হস্তান্তর করেছে। এভাবে ইসলাম মধ্যযুগে জ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত করতে এবং ইউরোপীয় জীবন ও চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।'*

মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে মুসলমান বিশেষ করে আরবদের অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের উক্তিগুলো সত্যি যথার্থ। সে সময় আরবী ছিল সভ্যতার একমাত্র বাহন। পবিত্র কোরআনের ভাষা তদানীন্তন বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আরবী ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রুতেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। তবে সেসব আলোচনা ছিল আরবী গ্রন্থ অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বায়তুল হিকমাহ

বায়তুল হিকমাহ (House of Wisdom) ছিল আব্বাসীয় যুগে বাগদাদের একটি লাইব্রেরি ও অনুবাদ কেন্দ্র। বায়তুল হিকমাহ শব্দটি ছিল ফারসি 'খানি-আয়ে দানিশ'-এর একটি প্রতিশব্দ। পারস্যে সাসানীয় আমলে লাইব্রেরিকে 'খানি-আয়ে দানিশ' বলা হতো। ফারসি থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ এবং অনূদিত গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করা ছিল

www.pathagar.com

বায়তুল হিকমাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। বায়তুল হিকমাহ্ প্রতিষ্ঠা করা না হলে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে কোনো গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা ঘটতো কিনা সন্দেহ। মানব জাতির ইতিহাস হতো ভিন্নতর। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও লেখক জোনাথন লিয়ন্সের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি তার 'দ্য হাউজ অব উয়িজডম: হাউ দি অ্যারাবস ট্রান্সফরমড দ্য ওয়েস্ট' শিরোনামে পুস্তকের ১৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'The classical works of Greek and other ancient philosophers and scientists might have been lost to the European if they had not been preserved in the Arabic language through the House of Wisdom. Muslims translated them and also wrote comments and explanations and added their own ideas.'*

অর্থাৎ *'হাউজ অব উয়িজডমের মাধ্যমে গ্রীক ও অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর প্রাচীন গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় সংরক্ষণ করে রাখা না হলে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে সেগুলো হারিয়ে যেতো। মুসলমানরা প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেছেন এবং অনূদিত গ্রন্থগুলোর ওপর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং তার সঙ্গে নিজেদের* ধারণা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

বায়তুল হিকমাহ

গণিতের ঐতিহাসিক করোনা ব্রিজাইনা-ও একই কথা বলেছেন। তিনি তার 'আল-খাওয়ারিজমি: দি ইনভেন্টার অব এলজাব্রা' শিরোনামে গ্রন্থের ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'The scholars of the House of Wisdom were instrumental in translating scientific texts from various cultures such as ancient Greece and*

www.pathagar.com

India into Arabic and preserved them for future generations.' অর্থাৎ 'হাউজ অব উয়িজডমের পণ্ডিতগণ ছিলেন গ্রীস ও ভারতের মতো বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপিগুলো আরবীতে অনুবাদের সহায়ক শক্তি এবং তারা এসব অনুবাদ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।'

৭৬২ সালে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে তাকে রাজধানীর মর্যাদা দেন। তিনি নয়া রাজধানীকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উমাইয়া আমলের রাজধানী দামেস্ক দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণীদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হলেও বাগদাদ সফল হয়।

বাগদাদের সরকারি নাম ছিল 'মদিনা তুস-সালাম'। পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-নওবখত এবং মিসরীয় ইহুদী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাশাল্লা ইবনে আসারি আল-বাসরির পরামর্শ অনুযায়ী নগরীর নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাচীন বেবিলন নগরী যেখানে ছিল ঠিক সেখানে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী বাগদাদের লোকসংখ্যা ছিল ১০ লাখের বেশি। লোকসংখ্যার বিচারে এ নগরী ছিল বিশ্বের বৃহত্তম শহর। বাগদাদের রাজপথগুলো ছিল পীচঢালা। ঐশ্বর্য, বৈভব, প্রাচুর্য ও সুষমায় বাগদাদ রূপকথার স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়। এ নগরীর অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে রচিত হয় অমর সাহিত্য কর্ম 'আরব্য রজনী'। খলিফা আল-মনসুর প্রতিষ্ঠিত গোলাকার বাগদাদের এক-তৃতীয়াংশের ওপর নির্মিত সুরম্য রাজপ্রাসাদ, সুসজ্জিত হেরেম, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার কক্ষ, নয়নাভিরাম মিলনায়তন এবং আমির উমরাহদের প্রাসাদ সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল খলিফার প্রাসাদ 'দার আল-খলিফা' এবং বসরা, কুফা, খোরাসান ও সিরিয়া অভিমুখী ছিল চারটি প্রবেশদ্বার। আব্বাসীয় খলিফাদের পারস্যের প্রতি ঝোঁক থাকায় পার্সী সাসানীয় সাম্রাজ্যের বহু রীতিনীতি গ্রহণ করা হয়। বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করা ছিল এসব ঝোঁকের অন্যতম। এ উদ্দেশ্যে খলিফা আল-মনসুর সাসানীয় রাজকীয় লাইব্রেরির অনুকরণে একটি প্রাসাদ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগে বায়তুল হিকমাহকে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হতো। আল-মনসুরের পৌত্র আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ বাগদাদে এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বায়তুল হিকমাহর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তার সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী খলিফা আল- মামুন। মামুনের আমলে এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ৮২৮ সালে খলিফা মামুন বাগদাদে শামসিয়া মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল হিকমাহর সঙ্গে শামসিয়া মানমন্দিরের সম্পর্ক ছিল। মামুন ছিলেন আব্বাসীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খলিফা। তিনি প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ এবং বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বায়তুল হিকমাহয় একত্রিত করেন। তার রাজত্বকালে বায়তুল হিকমাহ ছাড়া আরো অনেক লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে নিগৃহীত পণ্ডিতদেরও সসম্মানে ঠাঁই দেয়া হয়।

www.pathagar.com

স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অমুসলিমদের প্রতি উদারতা

মাশাল্লা ইবনে আসারি আল-বাসরি, সহল ইবনে বিসর, আবুল তায়েব, হুনায়ন ইবনে ইসহাক, সহল ইবনে তাবারি, ইয়াহিয়া ইবনে সারাফিউন, জিবরাইল ইবনে বুখতায়িশু, ইউহান্না ইবনে মাসিয়াহ, ইসহাক ইবনে ইমরান ও ময়মনিদাসের মতো বহু অমুসলিম বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। ১৯৩৫, ১৯৭০, ১৯৭৬ ও ১৯৯৫ সালে মোট চার দফায় স্বর্ণযুগের ২৪ জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে চাঁদের ২৪টি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। যে ২৪ জন আরব বিজ্ঞানীর নামে চাঁদের গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে ইহুদী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাশাল্লা হলেন তাদের অন্যতম। চাঁদের ৩৯ দশমিক ২ এন দ্রাঘিমাংশ এবং ৬০ দশমিক শূন্য পাঁচ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ১২৫ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। সহল ইবনে বিসরও ছিলেন বিজ্ঞানী মাশাল্লার মতো একজন ইহুদী। তার পূর্ণ নাম সহল ইবনে বিসর ইবনে হাবিব ইবনে হানি আবু ওসমান। ইহুদী হলেও তিনি বাগদাদের রাজদরবারে সমসাময়িক মুসলিম বিজ্ঞানীদের সমান মর্যাদা ভোগ করতেন। বাগদাদে আসার আগে তিনি খোরাসানে অবস্থান করছিলেন। সেখানেও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। আবুল তায়েব প্রথম জীবনে ইহুদী হলেও পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পূর্ণ নাম আবুল তায়েব সনদ ইবনে আলী। হুনায়ন ইবনে ইসহাক ছিলেন একজন খ্রিস্টান আরব চিকিৎসক। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। অনুবাদক হিসাবে তার কোনো জুড়ি ছিল না। তার পূর্ণ নাম আবু সাঈদ হুনায়ন ইবনে ইসহাক আল-ইবদী। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'হুমাইনাস' (Humainus) হিসাবে পরিচিত। হুনায়ন ৯৫টি গ্রীক পাণ্ডুলিপি সিরীয় ভাষায় এবং ৩৯টি আরবীতে অনুবাদ করেন।

বায়তুল হিকমাহ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ

বায়তুল হিকমাহ তৎকালীন বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনায় একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলকেমি, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা ও ভূগোল নিয়ে গবেষণা করা হতো। আরবগণ দু'টি সূত্র থেকে তাদের গাণিতিক জ্ঞান লাভ করেন। একটি সূত্র ছিল ভারতীয় হিন্দু এবং আরেকটি ছিল গ্রীক। গ্রীক পাণ্ডুলিপি হস্তগত করতে আব্বাসীয় খলিফাগণ কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেননি। আব্বাসীয় আমলে যেসব গ্রীক পণ্ডিতের গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন পিথাগোরাস, প্লেটো, এরিস্টোটল, হিপোক্রেটস, প্লটিনাস, গালেন, ইউক্লিড, টলেমি, এন্টোলিসকাস, এরিসটারকোস, আর্কিমিডিস প্রমুখ। যেসব ভারতীয় মনীষীর গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন সুশ্রুতা, চরাকা,

www.pathagar.com

আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইব্রাহিম আল-ফাজারির উৎসাহে খলিফা আল-মনসুরের দরবারে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কঙ্কের 'সিন্দহিন্দ' নিয়ে আসা হয়। 'সিন্দহিন্দ'-এর আরেক নাম ছিল 'সূর্যসিদ্ধান্ত'। ৭৬৭ সালে মনসুরের দরবারে কঙ্কের সঙ্গে আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াকুব ইবনে আরিফের সাক্ষাৎ হয়। ৭৭২ সালে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল-ফাজারি সংস্কৃত থেকে আরবীতে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অনুবাদ করেন। গণিতজ্ঞ জি. সারটনের মতে, এ অনুবাদের মধ্য দিয়ে হিন্দু সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ভারত থেকে ইসলামে স্থানান্তরিত হয়। চিকিৎসাবিদ আবু ইয়াহিয়া টলেমির 'টেট্রাবিবলোস' (Tetrabiblos) অনুবাদ করেছিলেন। ইউক্লিডের মৃত্যুর পর গণিতের ওপর তার লিখিত কর্মগুলো চামড়ার কাগজে শুকনো পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ছোট ছোট খণ্ডে (Biblia) বইগুলো লিখা হয়। আরব অনুবাদক আল-মাহানি সর্বপ্রথম ইউক্লিডের পঞ্চম ও দশম খণ্ড অনুবাদ করেন। তিনি ইউক্লিডের দুর্বোধ্য কর্মগুলো অনুবাদ না করলে তার নাম ইতিহাস থেকে মুছে যেতো।

বায়তুল হিকমাহয় প্রথম অনুবাদ করা হয়েছিল পাহলভী ভাষার গ্রন্থ। পরে সিরীয় এবং আরো পরে গ্রীক ও ভারতীয় গ্রন্থ। বায়তুল হিকমাহর পণ্ডিতগণ গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনূদিত বইগুলোর মধ্যে জলঘড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থও ছিল। এছাড়া পারাসার নিকোমাকাসের 'অন দ্য ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি' (On the Mathematical theory), ত্রিপোলির থিওডোসিয়াস, এপোলনিয়াস পারগাসাস, থিওন ও মেনিলাসের মতো গণিতজ্ঞদের গ্রন্থও অনুবাদ করা হয়। নবম শতাব্দীর শেষ নাগাদ অধিকাংশ গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়। বায়তুল হিকমাহয় কর্মরত মুসলিম পণ্ডিতগণ বেবিলনীয় ও হিন্দু গণিতের ওপর প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিও অনুবাদ করেন। আরব পণ্ডিতগণ বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের এক বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। এ জ্ঞান ভাণ্ডারের সহায়তায় তারা নিজস্ব উদ্ভাবনে সক্ষম হন। বায়তুল হিকমাহ এবং অন্যান্য লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ ধারণা চালু করা হয়। লাইব্রেরিগুলোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বইগুলো সাজিয়ে রাখা হতো। লাইব্রেরির আশপাশে বিপুলসংখ্যক স্টেশনারি দোকান খোলা হয়। স্টেশনারি দোকানগুলো বুকশপ হিসাবেও কাজ করতো। 'আল-নাকিম' ছিল বৃহত্তম দোকান। আল-নাকিমে প্রতিদিন হাজার হাজার বই বিক্রি হতো। বায়তুল হিকমাহ একটি শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত হয়ে উঠে। তবে আমাদের আজকের যুগের মতো তা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্ররা সরাসরি শিক্ষা লাভ করতো। নবম শতাব্দীতে বাগদাদে মক্তব গড়ে উঠতে থাকে। একাদশ শতাব্দীতে নিজাম উল-মুলক 'আল-নিজামিয়া অব বাগদাদ' প্রতিষ্ঠা করেন।

খলিফা আল-মামুন

খলিফা আল-মামুনের মা মারাজিল পার্সী হওয়ায় তিনি আরবদের বিজ্ঞান সাধনায় পারস্যের সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খলিফা হারুনুর

www.pathagar.com

রশীদের উপপত্নী মারাজিলকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে বাগদাদে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার পিতা বিদ্রোহী নেতা ওসতাছ সিজ খোরাসানে আব্বাসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে বাপ বেটি বন্দি হন। মারাজিলকে দাসী হিসাবে খলিফা হারুনুর রশীদের পাকশালায় পাঠানো হয়। একদিন সম্রাজ্ঞী জুবায়দা স্বামী হারুনুর রশীদের সঙ্গে দাবা খেলার সময় শর্ত দেন যে, খেলায় হেরে গেলে তাকে পাকশালার সবচেয়ে কুৎসিত ও কদাকার দাসীর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। খলিফা হারুন দাবা খেলায় হেরে যান। সম্রাজ্ঞী জুবায়দা খেলার শর্ত মেনে নিতে তাকে চাপ দেন। হারুনুর রশীদ অনেক পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তাকে সম্রাজ্ঞী জুবায়দার কাছে ঘাট মানতে হয়। সেদিন থেকে তিনি মারাজিলের সঙ্গে রাত কাটাতে থাকেন। অচিরে মারাজিল গর্ভবতী হয়ে পড়েন। হারুনুর রশীদের সিংহাসনে আরোহনের বছর মামুনের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় 'আবদুল্লাহ'। মামুনের জন্মের পরই মারাজিল ইন্তেকাল করলে পার্সী বারমাকি পরিবার তাকে লালন পালন করে। তার জন্মের ৬ মাস পর সম্রাজ্ঞী জুবায়দা পুত্র সন্তানের মা হন। এ পুত্রের নাম রাখা হয় আল-আমিন। জুবায়দা ছিলেন বিশুদ্ধ আরব। সম্পর্কে তিনি ছিলেন হারুনুর রশীদের চাচাতো বোন। স্বাভাবিকভাবে সিংহাসনের প্রতি আল-আমিনের দাবি ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু খলিফা হারুন আদর করতেন বেশি মারাজিলের পুত্র মামুনকে। পিতার স্নেহধন্য মামুন খলিফা হয়ে আরবদের চেয়ে পার্সীদের প্রাধান্য দিতে শুরু করেন।

এ. বারটোল্ড স্পালার 'দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড: দি এজ অব দ্য ক্যালিফ'-এর এক নম্বর ভলিউমে পার্সীদের প্রতি মামুনের গভীর অনুরাগের বর্ণনা দিয়েছেন। মামুনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, `*The Persians ruled for a thousand years and did not need us Arabs even for a day. We have been ruling them for one or two centuries and cannot do without them for an hour.*' অর্থাৎ '*পার্সীরা হাজার বছর শাসন করেছে এবং এসময় আমাদের আরবদের তাদের একদিনের জন্যও প্রয়োজন হয়নি। আমরা তাদের শাসন করছি মাত্র* এক কিংবা *দু'শো বছর ধরে এবং আমরা তাদের ছাড়া এক ঘন্টাও চলতে পারবো না।*'

পিতা হারুনুর রশীদের নির্দেশে মামুন পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেন এবং রাজদরবারে ধর্মীয় পণ্ডিতদের সামনে ছত্রে ছত্রে কোরআনের মুখস্থ পাঠ দেন। কোরআন হেফজ করায় মামুনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটে এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা জাগে।

৮৩০ সালে খলিফা আল-মামুন ২ লাখ দিনার ব্যয়ে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমাহর কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। মামুন দামেস্কের উপকণ্ঠে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হয় আরো ৩০ টি মানমন্দির। খলিফা আল-মামুন বাইজাইন্টান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি পূর্ব বাইজান্টাইন সম্রাট তৃতীয় মাইকেলের কাছে সন্ধির যেসব শর্ত দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে কন্সটান্টিনোপলের রাজকীয় লাইব্রেরি থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রীক পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করার শর্তও ছিল।

www.pathagar.com

মামুন বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে বাইজান্টাইন সম্রাট লিও দ্য আর্মেনিয়ানের কাছে ইবনে মাসাবাহ ও হুনায়ন ইবনে ইসহাকের নেতৃত্বে একটি কূটনৈতিক মিশন পাঠিয়েছিলেন। তিনি যাদের সঙ্গে লড়াই করতেন এবং লড়াইয়ে পরাজিত করে যাদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতেন তাদের কাছ থেকে নিঃশর্তে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। তার আমলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন।

ফারসি পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ওপর জোর দেয়া হয়। খলিফা আল-মামুন গ্রীক, সিরীয় ও কালদীয় ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন লিউকের পুত্র কোস্টাকে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন মানকাহ ও দুবান নামে দু'জন ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এবং ফারসি ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলো অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন ইসা বিন এহিয়া ও মুসা বিন খালিদকে। মামুন প্রত্যেক অনুবাদককে মাসে ৫০০ দিনার করে পারিশ্রমিক দিতেন। হুনায়ন ইবনে ইসহাককে দিতেন অনূদিত বইয়ের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা।

মামুনের আমলে বায়তুল হিকমাহ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন কবি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সহল ইবনে হারুন। লাইব্রেরির সঙ্গে আরো যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি, বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়, সিন্দ ইবনে আলী ও ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি। খলিফা মামুন খ্রিস্টান পণ্ডিত হুনায়ন ইবনে ইসহাকের কাছে অনুবাদের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন সাবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছাবেত ইবনে কোরা। এসময় অনুবাদের মান ছিল পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় উন্নততর। নতুন নতুন ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় অনুবাদের ওপর কম জোর দেয়া শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী অনুবাদ কর্মের কাজ স্থায়ী হয়। পরে শুরু হয় মৌলিক আরবী গ্রন্থ রচনা।

খলিফা মামুন নিজে বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞান সাধনায় বিজ্ঞানীদের সুযোগ করে দেন। ইরাটোসথেনিস ছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং প্রাচীনকালের একজন খ্যাতনামা ভূগোলবিদ। তিনি পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসার্ধ পরিমাপের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। ৮২৯ সালে খলিফা আল-মামুনের নির্দেশে ইরাটোসথেনিসের উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে খলিফা মামুনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন যে, সীনে (আসোয়ান) সূর্য যখন মধ্য দিগন্তে অবস্থান করে ঠিক তখন আলেক্সান্দ্রিয়ায় সূর্য মধ্য দিগন্তের ৭ ডিগ্রি ১২ˊ দক্ষিণে অবস্থান করে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ভূপৃষ্ঠে আলেক্সান্দ্রিয়ার অবস্থান সীনের ৭ ডিগ্রি ১২ˊ উত্তরে। দু'টি স্থানের মধ্যকার দূরত্ব ৫ হাজার স্টাডিয়া হওয়ায় ৩৬০ ডিগ্রি বৃত্তের এক-পঞ্চমাংশ হিসাব করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বের করেন যে, পৃথিবীর পরিধি ২০ হাজার ৪০০ মাইল এবং ব্যাসার্ধ সাড়ে ৬ হাজার মাইল। জটিল

www.pathagar.com

ভূমিতিক পরিমাপের সময় পৃথিবীর দৈর্ঘ্যের এ পরিমাপ করা হয়। এতে মেরিডিয়ানের এক ডিগ্রি পরিমাপ করা হয় ৫৬$\frac{২}{৩}$ মাইল। বর্তমান পরিমাপের চেয়ে এ পরিমাপ ছিল মাত্র আধা মাইল বেশি। মামুনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ক্রান্তিবৃত্তের আনতির মান ২৩ক্র ৩র্ত খুঁজে পান।

ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসূর ও আল-খাওয়ারিজমি খলিফা আল মামুনের নির্দেশে বাগদাদের মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ চালান। কিন্তু সূর্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতায় বিরাট পার্থক্য দেখতে পেয়ে মামুন তাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর মামুন দামেস্কের কাছে একটি পাহাড় দিয়ার মুরানে নতুন করে পর্যবেক্ষণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। খালিদ ইবনে আবদ আল মালিক আল-মারওয়ারুদ্দিনকে এক বছরের মধ্যে নয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালানোর দায়িত্ব দেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণে সময় একটু বেশি লেগে যায়। ৮৩১ সাল থেকে ৮৩৩ সালের মধ্যে দু'টি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। খলিফা মামুন এ পর্যবেক্ষণের ফলাফলে সন্তুষ্ট হন এবং তার ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সারণী তৈরির নির্দেশ দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এসব অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) তার নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করে।

বায়তুল হিকমাহর চূড়ান্ত উন্নতি

খলিফা মামুনের উত্তরসূরি আল-মুতাসিম ও আল-ওয়াছিতের আমলে বায়তুল হিকমাহর আরো উন্নতি হয়। তবে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে তার অবনতি ঘটে। খলিফা মামুন, আল-মুতাসিম ও আল-ওয়াছিত মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসী হলেও খলিফা মুতাওয়াক্কিল ছিলেন এ মতবাদের বিরোধী। কট্টর ইসলামের অনুসারী হওয়ায় খলিফা মুতাওয়াক্কিল মুতাজিলা মতবাদের উৎস গ্রীক দর্শনের বিস্তার রোধ করার চেষ্টা করেন।

বায়তুল হিকমাহ ধ্বংস

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের পরিচালিত ক্রুসেডে ইসলামী খিলাফত দুর্বল হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আকস্মিকভাবে পূর্বদিক থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতি বৃহত্তর হুমকি সৃষ্টি হয়। ১২০৬ সালে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মোঙ্গল সাম্রাজ্য পূর্বদিকে চীন এবং পশ্চিম দিকে রাশিয়া ও ইসলামী খিলাফতসহ ইউরেশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হয়। ১২৫৩ সালে চেঙ্গিস খাঁর নাতি হালাগু খাঁ একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পারস্য অভিযান শেষে গুপ্তঘাতকদের সুরক্ষিত আলামুত দুর্গ আক্রমণ করেন। এ অভিযানে তিনি বাগদাদের খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর সহায়তা কামনা করে তার কাছে একটি চিঠি

www.pathagar.com

পাঠান। খলিফা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে হালাগু খাঁ ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করেন এবং গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে ১২৫৮ সালের জানুয়ারিতে বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে আত্মসমর্পণের জন্য চরমপত্র দেন। মুতাসিম বিল্লাহ তার চরমপত্র উপেক্ষা করলে তিনি ৪০ দিন বাগদাদ অবরোধ করে রাখেন এবং প্রস্তর নিক্ষেপক ও জ্বলন্ত অগ্নির সাহায্যে এ সুরম্য নগরীর প্রাচীর বিধ্বস্ত করেন। হালাগু খাঁর বাগদাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইসলামের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে যায়। বাগদাদ অবরোধে এক থেকে ১৬ লাখ লোক নিহত হয়। তিনদিন পর্যন্ত বাগদাদে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ আত্মসমর্পণ করেন। হালাগু খাঁর নেস্টোরীয় খ্রিস্টান স্ত্রী দোকুজ খাতুনের নির্দেশে বাগদাদের খ্রিস্টান এবং পার্সী মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন তুসির অনুরোধে শিয়াদের রেহাই দেয়া হয়। খলিফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রতিষ্ঠিত হাউজ অব উয়িজডোমসহ সব লাইব্রেরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। বায়তুল হিকমাহর ধ্বংস শুধু স্বর্ণযুগের যবনিকাপাত ঘটায় তাই নয়, এ ঘটনা ছিল গোটা মানব জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

মোঙ্গলদের নিষ্ঠুরতা

মোঙ্গলরা লুণ্ঠন চালানোর পর ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে। মসজিদ, প্রাসাদ, লাইব্রেরি ও হাসপাতালগুলো ধ্বংস করা হয়। কয়েক প্রজন্মের শ্রমের ফসল বড় বড় অট্টালিকাগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। বন্দি খলিফার চোখের সামনে বাগদাদবাসীদের হত্যা করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে আব্বাসীয় বংশের রাজধানী জনশূন্য হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি আশংকা বিরাজ করছিল যে, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদের (সা.) চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আল-মুত্তালিবের সরাসরি বংশধর খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহর রক্তপাত ঘটলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। কিন্তু পারস্যের বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুক্তি দেন যে, কারবালার ময়দানে বিশ্বনবীর (সা.) প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেনের (রা.) হত্যাকাণ্ডের পর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেনি। অতএব বিজয়ী মোঙ্গলদের হাতে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ নিহত হলে আল্লাহর গযব নেমে আসবে না। তবে সতর্কতা এবং মোঙ্গলদের রীতি অনুযায়ী হালাগু খাঁ ১২৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে কার্পেটে মুড়িয়ে নেন এবং পরে তার ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। কনিষ্ঠ পুত্র এবং একটি মেয়ে হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায়। মুতাসিম বিল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্রকে মঙ্গোলিয়ায় প্রেরণ করা হয়। মেয়েকে বানানো হয় হালাগু খাঁর হেরেমের দাসী। মোঙ্গলরা মূল্যবান বইয়ের স্তূপ ফেলে টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে। বায়তুল হিকমাহয় সংরক্ষিত অগণিত বই পুস্তক টাইগ্রিস নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বিপুল পরিমাণ বইয়ের কালিতে নদীর পানি কালো হয়ে যায়। বায়তুল হিকমাহয় নিয়োজিত পণ্ডিতদের রক্তে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পানি

www.pathagar.com

লাল হয়ে উঠে। হালাগু খাঁ নেস্টোরীয় ক্যাথলিকোস মার মাকিখার কাছে খলিফার প্রাসাদ হস্তান্তর করেন এবং তার জন্য একটি গীর্জা নির্মাণের নির্দেশ দেন।

শুধু হালাগু খাঁ নয়, পরবর্তী মোঙ্গল নেতা তৈমুর লং-ও একই নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেন। তিনি বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ ধ্বংস, হাজার হাজার মানুষ হত্যা এবং প্রাচীন কৃষি প্রধান মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে পদানত করে পশ্চিমে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে স্থলপথে পূর্বদিকে চীনের পথে এগিয়ে গেলে মুসলিম সভ্যতা তাদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে নিস্তার পায়। পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসকারী মোঙ্গলদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের অনেকে তুর্কি মুসলমানদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ততদিনে স্বর্ণযুগ শেষ। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্রসর হয়। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে নেমে আসে স্থবিরতা।

স্বর্ণযুগের অবসান ঘটার কারণ

ইসলামের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটার কারণ সম্পর্কে একেক বিশেষজ্ঞ একেক রকম মন্তব্য করছেন। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক জি. সারটন 'দি ইনকিউবেশন অব ওয়েস্টার্ন কালচার ইন দ্য মিডল ইস্ট' শিরোনামে গ্রন্থে লিখেছেন, *'The achievements of the Arabic speaking peoples between the nineth and twelfth centuries are so great as to baffle our understanding. The decadence of Islam and of Arabic is almost as puzzling in its speed and completeness as their phenomenal rise. Scholars will forever try to explain it as they try to explain the decadence and fall of Rome. Such questions are exceedingly complex and it is impossible to answer them in a simple way.'*

অর্থাৎ *'নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী ভাষী জনগোষ্ঠীর সাফল্য এত বেশি যে, তা আমাদের বোধশক্তিকে স্তম্ভিত করে দেয়। ইসলাম ও আরবদের উত্থান যত দ্রুতগতিতে ঘটেছিল তাদের অবক্ষয় ও পতন ঠিক তত বিস্ময়কর গতিতে পূর্ণতা লাভ করে। পণ্ডিতরা রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন ঘটার কারণ যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন সেভাবে তারা চিরদিন ইসলামের স্বর্ণযুগের পতন ঘটার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন। এ ধরনের প্রশ্ন সত্যিই অত্যন্ত জটিল এবং সহজ ভাষায় তার জবাব দেয়া অসম্ভব।'*

সব বিশেষজ্ঞ একমত যে, মোঙ্গল হামলাই স্বর্ণযুগের পতন ডেকেছে। তবে স্বর্ণযুগের অবসানের জন্য মোঙ্গল হামলা ছাড়া আরো অনেক কারণ দায়ী। এগুলোর মধ্যে খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে ক্রুসেড ছিল আরেকটি কারণ। খিলাফতের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা আরব ও অনারব এ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক শত্রুতা বহিঃশক্তিকে ইসলামী খিলাফতের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে হামলা চালাতে উৎসাহ যোগায়। ইসলামের ইতিহাসে পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন তুসির অবদান অনস্বীকার্য হলেও তিনি মুসলমানদের অভিন্ন দুশমন মোঙ্গলদের পক্ষে কাজ করেছেন। তাদের মূল্যবান সহায়তা দিয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী তুসির মতো পার্সী ঐতিহাসিক আলাউদ্দিন আতা মালিক জুবায়নিও আত্মঘাতি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মুসলিম সভ্যতা বিনাশী হালাগু খাঁর আমন্ত্রণে তিনি বাগদাদের গভর্নর পদ গ্রহণ করেছিলেন। আশারী ও মুতাজিলা মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে আত্মকলহ মুসলিম শক্তিকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলে। মুতাজিলা মাযহাবের অনুসারীরা এরিস্টোটলের দর্শনের আলোকে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। তারা ইজতিহাদ বা স্বাধীন মতামতে বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে আশারী মাযহাবের অনুসারীরা তাকলীদ বা বিনা প্রশ্নে এবং বিনা বাক্যে ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু মেনে নিতেন। ইমাম গাজ্জালি (র.), আলোক বিজ্ঞানের জনক ইবনে আল-হাইছাম, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুনি, ইবনুল নাফিস, ইবনে খালদুন প্রমুখ ছিলেন আশারী মতবাদের অনুসারী। পক্ষান্তরে ইবনে সিনা, আল-কিন্দি, আল-রাজি, ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলিম মনীষী ছিলেন স্বাধীন দর্শনের পক্ষপাতী। দর্শন নিয়ে মতবিরোধে মুসলিম শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দ্বিধাবিভক্তি শুধু ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি মূলে আঘাত করেছে তাই নয়, স্বর্ণযুগের যবনিকাপাতও ডেকে এনেছে।

তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণকে স্বর্ণযুগের অবসানের জন্য দায়ী করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের আমলে তাহিরী বংশ খোরাসানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। পরবর্তীতে গোটা সাম্রাজ্যে ইদ্রিসীয়, সাফফারী, সামানীয়, বুয়েদীয়, সেলজুক, গজনভী, ফাতেমীয় প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী না থাকায় আব্বাসীয় খলিফা এসব স্বাধীন রাজ্যকে দমন করতে পারেননি। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও ধর্মমতের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্তি সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল করে ফেলে। খলিফা আল-মনসুর মিসরীয়, মুদারীয় ও খোরাসানী নামে তিনটি জাতিভিত্তিক সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। তুর্কিদের নিয়েও একটি বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তাতে সৈন্যদলের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক অনৈক্যের মতো জাতিগত বিভেদও স্বর্ণযুগের অবসানে ভূমিকা রেখেছে। হিমারীয়, মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমিটিক, বারবার বা আফ্রিকানদের মধ্যে তীব্র বিরোধে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায়। কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ খলিফাই ছিলেন অযোগ্য। আব্বাসীয় খিলাফত পুঁথিগতভাবে স্থায়ী হয়েছিল ৫ শত বছর। কিন্তু বাস্তবে এ খিলাফতের স্থায়িত্ব ছিল ৭৫০ থেকে ৮৪৭ সাল পর্যন্ত। ৮৪৭ সাল থেকে আব্বাসীয় খলিফাগণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব হারিয়ে আমির ও উজিরদের ক্রীড়নক হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফত থেকে আব্বাসীয়দের অধঃপতন শুরু হয়েছিল। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেয়ায় তিনি রাজধানী বাগদাদ রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ

www.pathagar.com

হন। আরব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, কোনো রাজবংশই এক শতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয় না। আব্বাসীয় রাজবংশের পতনে একথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচীন রোম ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের মতো ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনও ছিল একটি অনিবার্য ঘটনা।

মুসলিম বিজ্ঞান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা

স্বর্ণযুগের ইতিহাস এখন কেবলি স্মৃতি। এ ইতিহাস অতল অন্ধকারে চাপা পড়ে গেলেও তাকে পুনরায় উদ্ধারে ঐতিহাসিকগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। আরবী বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপিগুলোর ল্যাটিন অনুবাদ করা হয়েছে আক্ষরিকভাবে। মূল আরবী পাণ্ডুলিপিগুলো দুষ্প্রাপ্য। একেক সূত্র থেকে একেক রকম তথ্য পাওয়া যাওয়ায় মারাত্মক বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে 'অ্যা বিবলিওগ্রাফি অব স্কলার্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম'-এ ড. ইলিয়াস ফারনিনি লিখেছেন, '*It will be very unjust from our part to state that the history of Islamic science has been completely neglected. Scholars like H. Suter, C. Brockelmann, H.P.J. Renaud, M. Krause, G. Sarton, J. Sedilot, F. Woepeke, C. A. Nallino, O. Neugebauer, E. S. Kennedy, A.P. Youschkevitch, B. A. Rosenfeld, O. Gingerich, D. A. King, A. Sayili and many others have contributed a lot to our present knowledge of Muslim scholars of medieval times. Original manuscripts have been translated and analyzed after careful identifications by Muslim and non-Muslim historians. Many libraries and museums all over the world hold thousands of these manuscripts still awaiting detailed studies necessary to grasp the full importance of Islamic science. The task can be difficult for the historian of science since many of the works do not exist in their original Arabic forms. Some Latin translations are just pure literary translations without any regards to the scientific contents. This has brought about some scientific inconsistencies with what is known from different other sources putting in doubt the contribution of some important Muslim scholars.*'

অর্থাৎ '*ইসলামী বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পুরোপুরিভাবে অবহেলা করা হয়েছে, আমাদের পক্ষ থেকে একথা বলা অত্যন্ত অন্যায় হবে। এইচ. সুটার, সি. ব্রোকেলম্যান, এইচ. পি. জে. রিনাউ, এম. ক্রাউজ, জি. সারটন, জে. সেডিলট, এফ. উইপিক, সি. এ. নালিনো, ও. নিউজবয়ার, ই. এস. কেনেডি, এ. পি. ইউশকেভিটচ, বি. এ. রোজেনফেল্ড, ও. গ্রিনগ্রিচ, ডি. এ. কিং, এ. সেলি এবং আরো অনেকে মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাপারে আমাদের বর্তমান জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রচুর অবদান রেখেছেন। মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করার পর মূল পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারা বিশ্বের বহু লাইব্রেরি ও জাদুঘরে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। ইসলামী বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ গুরুত্ব অনুধাবনে এসব পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালানো জরুরি। অধিকাংশ মূল আরবী পাণ্ডুলিপির*

www.pathagar.com

অস্তিত্ব না থাকায় বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের জন্য এ কাজ করা অত্যন্ত দুরূহ হতে পারে। কয়েকটি ল্যাটিন অনুবাদ বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। এসব অনুবাদে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি। তাতে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম পণ্ডিতের অবদান সম্পর্কে অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে কিছু বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।'

একই গ্রন্থের ভূমিকায় ড. ফারনিনি আরো লিখেছেন, *'When still a graduate student, I was attracted by the history of science in medieval Islam because I felt that some injustice is being done to al-Biruni, al-Khwarizmi, Ibn al-Haytham, Nasir al-Din al-Tusi, al-Tabari, al-Farghani, Ibn al-Shatir, al-Kashi and so many others regarding thier contribution to our present knowledge of science. It is difficult to realize the place of Islamic science since the available sources are so widely spread and the information so widely different. When I started my research, I felt the need to have a document with all the answers to my questions, but I could not find one. Many important works exist on the contributions of Muslim scholars, but most of them are either outdated or in a language that can not help the reader to grasp the full import. nce of these scholars.'*

অর্থাৎ *'আমি যখন স্নাতকের ছাত্র তখনি মধ্যযুগের ইসলামী বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হই। কেননা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, বর্তমান বিজ্ঞানে আল-বেরুনি, আল-খাওয়ারিজমি, ইবনে আল-হাইছাম, নাসির আল-দীন আল-তুসি, আল-তাবারি, আল-ফরগানি, ইবনে আল-শাতির, আল-কাশি এবং অনেকের অবদানের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হচ্ছে। প্রাপ্ত সূত্রগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এবং তথ্যগুলোতে ব্যাপক গরমিল থাকায় ইসলামী বিজ্ঞানের অবস্থান উপলব্ধি করা দুরূহ। গবেষণা শুরু করার পর আমি আমার সব প্রশ্নের জবাব দানে সক্ষম একটি দলিলের প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু আমি কোনো দলিল খুঁজে পাইনি। মুসলিম পণ্ডিতদের অবদানের ওপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান। তবে এসব রচনার অধিকাংশই হয়তো সেকেলে নয়তো এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ যা তাদের অবদানের পুরোপুরি গুরুত্ব অনুধাবনে পাঠকদের কোনো উপকারে আসবে না।'*

www.pathagar.com

যেভাবে আরবদের কাছে গ্রীক বিজ্ঞান পৌঁছেছে

এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতায় এবং এক যুগ থেকে আরেক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান স্থানান্তরে আরবরা একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। দীর্ঘ পথ বেয়ে তাদের কাছে গ্রীক বিজ্ঞান হস্তান্তরিত হয়। তদানীন্তন বিশ্বের জ্ঞাত প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল গ্রীক ভাষা। আরব উপদ্বীপ থেকে ইউরোপের গ্রীসের দূরত্ব হাজার মাইল হলেও এ দু'টি ভূখণ্ডে হাজার বছরের ব্যবধানে দু'টি সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। ধর্মীয় ও ভৌগোলিক যোগাযোগ না থাকলেও জ্ঞানের জগতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। এই নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করতে হবে। প্রাচীন গ্রীস সভ্যতা শুধু মূল গ্রীক ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রীকদের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে এ সভ্যতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব দেশ গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান পাচারের রুট হিসাবে কাজ করে মিসর, পারস্য, সিরিয়া ও ভারত ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্ব পরিস্থিতি

বিশ্বনবীর (সা.) আবির্ভাবকালে হেলেনীয় সভ্যতা ছিল অস্তমিত। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালে সম্রাট আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হেলেনীয় সভ্যতা শুরু হয়। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ সালে রোমানরা গ্রীক উপদ্বীপ একীভূত করে নিলে এ সভ্যতার যবনিকাপাত ঘটে। ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ছিল নামমাত্র। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল পূর্ব রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মতো পূর্বাঞ্চলে সাসানীয় পারস্য সাম্রাজ্যও ছিল ইসলামের প্রতি হুমকি। আমরা মধ্যপ্রাচ্য বলতে বর্তমানে যে ভূখণ্ডকে চিনি সে সময় এ ভূখণ্ড ছিল বাইজান্টাইন অথবা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কয়েক দশকের মধ্যে এ দু'টি সাম্রাজ্য ইসলামের পদানত হয়।

প্রথমে মিসর ছিল গ্রীক সম্রাট আলেক্সান্ডারের অধীনস্থ। আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর তার সেনাপতি টলেমি প্রথম সোটার আলেক্সান্দ্রিয়াকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে মিসরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিন শতাব্দী পর্যন্ত দেশটিতে টলেমিদের শাসন স্থায়ী হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ শতাব্দীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস সিজার অগাস্টাস তার প্রতিপক্ষ মার্ক এন্টনি এবং এন্টনির প্রেমিকা কিংবদন্তী সুন্দরী রানী সপ্তম ক্লিওপেট্রাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মিসর দখল করলে টলেমি শাসনের অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

তারপর থেকে মিসর ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। রোমান প্রদেশ হলেও মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় বসবাসকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গ্রীকভাষী। মানব সভ্যতায় এখানকার পণ্ডিতদের অবদান মূল গ্রীসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্লেটো ও এরিস্টোটল

প্রাচীনকালে এক জাতি আরেক জাতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। পারস্যের আকামেদিন রাজবংশ একসময় গ্রীসের অংশবিশেষ দখল করে সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ করেছিল। এভাবে গ্রীক সভ্যতা প্রাচ্যে প্রসার লাভ করে। এছাড়া পারস্যে গ্রীক অভিযানকালে বহু গ্রীক সৈন্য বন্দি হয়েছিল। এসব বন্দি গ্রীক সৈন্য জ্ঞান

www.pathagar.com

পাচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সম্রাট আলেক্সান্ডার মিসরের মতো সিরিয়া ও পারস্যকেও পদানত করেছিলেন। পারস্য দখল করে তিনি সে দেশের সব প্রাচীন জ্ঞান ধ্বংস করে ফেলেন। তার আদেশে প্রাচীন পারসিক পাণ্ডুলিপিগুলো গ্রীক ভাষায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়। তিনি গ্রীক ভাষাকে পারস্যের সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। পারস্য বিজয় সুসংহত করে সম্রাট আলেক্সান্ডার মনোযোগ দেন ভারতের দিকে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ সালে তিনি রাজা পুরুকে পরাজিত করে ভারতের পাঞ্জাবকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি অগ্রাভিযান করে গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এশিয়ায় তার অগ্রাভিযানের পথে অন্তত ৭০টি গ্রীক শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব শহরের মধ্যে মিসরের আলেক্সান্ড্রিয়া ছিল অন্যতম। সম্রাট আলেক্সান্ডারের অভিযানের মধ্য দিয়ে মিসর, সিরিয়া, পারস্য ও ভারতের সঙ্গে গ্রীসের সেতুবন্ধ তৈরি হয়। বৈদেশিক আগ্রাসনের মতো অঘটনের মধ্য দিয়ে এসব দেশ গ্রীক জ্ঞানের সন্ধান পায়। বিজিত দেশগুলো ছিল গ্রীসের চেয়ে তুলনামূলকভাবে আরব উপদ্বীপের কাছাকাছি। ইসলামী খিলাফতকালে মূল ভারত ছাড়া বাকি দেশগুলো আরবদের পদানত হয়। মুসলমানরা ৬৩৬ সালে সিরিয়া, ৬৪১ সালে ইরান, ৬৪২ সালে মিসর এবং ৭১২ সালে সিন্ধুতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এসব বিজিত দেশের মধ্য দিয়েই আরবদের কাছে গ্রীক বিজ্ঞান হস্তান্তরিত হয়েছে। মুসলমানরা বিজিত দেশগুলোর সভ্যতার উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয় এবং এসব দেশের সংস্কৃতিকে তারা লালন পালন করে এবং পরবর্তীতে বাদবাকি বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের আগেও বিজিত দেশগুলোর সঙ্গে আরবদের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ যোগাযোগ কিভাবে ঘটেছিল তা নিয়ে আলোচনা করলেই আরবদের কাছে গ্রীক বিজ্ঞান হস্তান্তরের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। প্রথমেই তাদের মধ্যকার সমুদ্র যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সমুদ্র যোগাযোগ

প্রাচীনকালে গ্রীস থেকে সমুদ্র পথে ভারতে পৌঁছানো যেতো। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এসিরীয় সময় থেকে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। তবে সমুদ্র নাকি স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো তা স্পষ্ট নয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাইরাস দ্য গ্রেট পারস্য দখল করে নেয়ার পর থেকে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ঘটার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিস্টাপাসের পুত্র পারস্য সম্রাট দারিয়ুস উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভিযান চালান এবং সিন্ধু উপত্যকাকে তার সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত করেন। সিন্ধু উপত্যকাকে পারস্যের অংশ হিসাবে দাবি করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৫১২-৫১০ সালে সম্রাট দারিয়ুস পারস্য উপসাগর এবং সিন্ধু অববাহিকার প্রবেশদ্বারের মধ্যে সম্ভাব্য সমুদ্র পথ খুঁজে বের করার জন্য গ্রীক পাইলট স্কাইলাক্সকে পাঠান। এ ধরনের একটি সমুদ্র পথের সন্ধান পাওয়া মাত্র তিনি ভারত মহাসাগরে একটি নৌবহর প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

আলেকজান্ডারের অভিযান

গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার বেশ কয়েকটি উপনিবেশ রেখে যান। এসব উপনিবেশ গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসে পরিণত হয়। এছাড়া তিনি উন্নত সংস্কৃতি এবং অনুকরণীয় আদর্শও রেখে যান। বহু শতাব্দী পর্যন্ত তার আদর্শ স্থায়ী হয়েছিল। তাই নিকট প্রাচ্যের এশীয়রা গ্রীকদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতো। মুসলমানরা তার ব্যতিক্রম ছিল না। পবিত্র কোরআনে আলেকজান্ডারকে 'জুলকারনাইন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আলেকজান্ডারের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় মুসলমানরা গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান লুফে নিতে দ্বিধা করেনি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-৩২৪ সালে সম্রাট আলেকজান্ডার পারস্য পদানত করার পর এ প্রদেশের দূরবর্তী পূর্বাংশে অভিযান পরিচালনা করেন। ভারতের পর্বতময় সীমান্ত অতিক্রম করার আগে তিনি একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেন। পরবর্তীকালে ককাসাস অঞ্চলের এ ঘাঁটি 'আলাসান্দা' বা আলেকজান্ড্রিয়া নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এ জায়গাটি সম্ভবত কাবুল থেকে ৩০ মাইল উত্তরে। সম্রাট আলেকজান্ডার বহু আলেকজান্ড্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ককাসাসের আলেকজান্ড্রিয়া ছিল তাদের অন্যতম। বর্তমানে হিন্দুকুশ নামে পরিচিত জায়গাটিকে গ্রীকরা 'ককাসাস' নামে আখ্যায়িত করতো। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালে সম্রাট আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন। তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় সেনাপতিদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বেধে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩১২ সালে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাগাভাগিকালে এশীয় প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন সেলুকাস নিকাটার।

এশিয়ায় আলেকজান্ডার পরবর্তী শাসন

সম্রাট সেলুকাস সিরিয়ার এন্টিয়কে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ নগরীকে তিনি রাজধানীর মর্যাদা দেন। সম্রাট সেলুকাস এশিয়ার পশ্চাৎভূমির চেয়ে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে গ্রীক শাসকদের দ্বন্দ্বে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেলুকাসের মৃত্যু হলে পুত্র এন্টিয়কাস সোটার তার স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর তার ছেলে থিওস। এ তিন গ্রীক শাসক মিসরের টলেমিদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তারা পারস্যকে নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন। এ সুযোগে পূর্ব পারস্যের পার্থীয় গোত্র সেলুসীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খ্রিস্টপূর্ব ২১০ সালে সেলুসীয় রাজা তৃতীয় এন্টিয়কাস স্বাধীন রাজা হিসাবে পার্থিয়ার রাজা আরটাবানেসকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন। এসব পার্থীয় রাজা আকামেনিদ রাজ পরিবারের অংশ ছিলেন না। তারা ছিলেন মিওটিসের সিন্থীয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন একটি কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়ে যে, পার্থীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আরসাসেস ব্যাকট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

পূর্ব পারস্যের আধা অসভ্য উপজাতীয় বংশোদ্ভূত পার্থীয়দের স্থানীয় পারস্যবাসীরা ঘৃণা করতো। তাদেরকে নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য করা হতো। অন্যদিকে আকামেনিদ রাজাদের ঈশ্বরের বংশধর হিসাবে গণ্য করা হতো। তারা নিজেদের ঈশ্বরের পুত্র

www.pathagar.com

হিসাবে দাবি করতেন। পার্থীয় রাজারাও একই খেতাব ব্যবহার করতেন। এ খেতাব অনুযায়ী তারা মুদ্রায় 'যাগ আলোহিসন' শব্দটি খোদাই করতেন। পার্থীয় কর্মকর্তারা পারসিকদের সঙ্গে নিজেদের যতদূর সম্ভব মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। তাদের মতো পোশাক পরতেন এবং তাদের মতো আচরণ করতেন। কখনো কখনো পারসিকদের নাম গ্রহণ করতেন। পার্থীয়রা বেবিলন অথবা কাটেসিফনকে তাদের শীতকালীন রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলে। কাটেসিফন ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরের একটি শহর। পার্থীয়দের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল ইকবাটানা (হামাদান) অথবা রাগাস। পার্থিয়ার মধ্যবর্তী হিকাটোমপাইলসে একটি প্রাসাদ ছিল। হিকাটোমপাইলস শহরকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং সেলুকাস আংশিকভাবে এ শহর গড়ে তোলেন। পার্থিয়ার রাজা ষষ্ঠ আরসাচিদ মিথরিডাটেস পার্থীয় রাজ্যকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেন এবং টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এ রাজ্যের সীমান্ত বৃদ্ধি করে 'রাজাদের রাজা' খেতাব গ্রহণ করেন। আকামেনিদ রাজারা এ খেতাব ব্যবহার করতেন এবং তীর বহনকারী প্রাচীন রাজাদের মতো মুদ্রায় তাদের ছবি অঙ্কন করা হতো। তারা মাথায় মুক্তা খচিত টায়রা পরতেন। মিসরে গ্রীক ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করলেও পার্থিয়ায় গ্রীক ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। তবে পার্থীয় মুদ্রায় গ্রীক ভাষা ব্যবহার করা হতো। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের আমলে পার্থীয় মুদ্রায় গ্রীক রাজার পূর্ণাঙ্গ খেতাব অঙ্কন করা হতো।

প্রাচীনকালে আরবদের সঙ্গে গ্রীকদের যোগাযোগ

দীর্ঘ পথ বেয়ে প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান আরবদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। শুধু সিরিয়া কিংবা মিসরের মধ্য দিয়ে সরাসরি নয়, ভারত এমনকি পারস্যের মধ্য দিয়েও পরোক্ষভাবে গ্রীক প্রভাব আরবদের ওপর ছায়া ফেলে। প্রাচীনকালে ভারত ও বর্তমানে নিকট প্রাচ্য হিসাবে পরিচিত বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্যাপাডোসিয়ার হিট্টিট রাজাদের উৎকীর্ণ লিপি থেকে এ যোগাযোগের কথা জানা যায়। ঐ রাজাদের আর্য নাম ছিল এবং তারা আর্যদের দেব-দেবীর পূজা করতেন। তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের হিন্দুদের মিল ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উরের মন্দির এবং সম্রাট নেবুচাদনেজারের প্রাসাদে ভারতীয় সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৮৬০ সালে এসিরীয় সম্রাট তৃতীয় শালমানেসারের সমাধিস্তম্ভে বানর, ভারতীয় হাতি ও উটের ছবি অঙ্কন করা হয়। এসব জীব জন্তু হয়তো সমুদ্র পথে নয়তো স্থলপথে পরিবহন করা হয়েছিল। ঋগ বেদে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যেও তার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেছে। সিন্ধু নদের মোহনার কাছে প্রাচীন শহর গাদরোসিয়া বরাবর পারস্য উপসাগরে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। ব্যবসা বাণিজ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৪ সালে পারস্য উপসাগরের সেন্নাচিরিব বন্দরকে জলদস্যুমুক্ত করা হয়।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে পারস্য উপসাগরের ব্যবসা বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বসবাসকারী প্রাচীন ফোনিশিয়ানদের হাতে চলে যায়।

www.pathagar.com

ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলে ফোনিশিয়ানরা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস বা শাতিল আরবের জলাভূমিতে বসতি স্থাপন করে। পারস্য উপসাগরের প্রবেশমুখে বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জে ফোনিশিয়ানদের মন্দিরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। স্কাইলাক্সের অভিযাত্রা এমনকি সম্রাট আলেকজান্ডারের নৌ অধ্যক্ষ নীয়ারচাস এবং স্বয়ং আলেকজান্ডারের অভিযানের আগে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সমুদ্র যোগাযোগের পথ গ্রীকদের জানা ছিল। নীয়ারচাস গাদরোসিয়ার একজন গাইড পেয়েছিলেন। এ গাইড হরমুজ প্রণালীর উপকূল পর্যন্ত চিনতো। হরমুজ প্রণালীর পরবর্তী পানি সীমায় ছিল আরবদের একচেটিয়াত্ব। ইউফ্রেটিসের তীরে সেলুসিয়ায় স্থলপথে মাল পরিবহন করা হতো। তবে ইউফ্রেটিস থেকে এন্টিয়ক পর্যন্ত পথ ছিল বিপজ্জনক। সেলুসীয়রা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সিরিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়। এখানে গোলাযোগ দেখা দেয়ায় পারস্য উপসাগর এড়িয়ে যাওয়া হতো। পার্থীয়দের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে পারস্য উপসাগর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহন অনিশ্চিত হয়ে উঠে। আরবরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। ইয়েমেন উপকূলে এডেন বন্দরে ভারতীয় বণিকরা তাদের মাল খালাস করতো অথবা লোহিত সাগরে মিসরীয় বণিকদের কাছে হস্তান্তর করতো।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫ সালে পার্থিয়ার রাজা আগাথারচিডাসের আমলে এডেন অথবা মুসা বন্দরে আরব বণিকদের কাছ থেকে মিসর ভারতীয় পণ্য লাভ করতো। ভারতের সঙ্গে আরব দেশের যোগাযোগের পথ সম্পর্কে আগাথারচিডাসের কোনো ধারণা ছিল না। ভারতের সঙ্গে মিসরের সরাসরি কোনো বাণিজ্য হতো না। ইয়েমেনে পরিবাহিত ভারতীয় পণ্য হেজাজ অথবা পেট্রা বন্দরের মধ্য দিয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছাতো। টলেমীয়রা লোহিত সাগর অথবা একটি মিসরীয় বন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল লাভ করতো। তবে তারা ভারত ও আরব দেশের মধ্যে সমুদ্র যাত্রায় হস্তক্ষেপ করার কোনো চেষ্টা করেনি। লোহিত সাগরের জলপথ উন্নয়নে এরিস্টোনকে পাঠানো হয়। তার প্রচেষ্টায় লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর কয়েকটি বন্দর গড়ে উঠে। মিসরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফাস সুয়েজ খালের সঙ্গে নীল নদের সংযোগ সাধন করে সিসোরট্রিস খালে ব্যবসা বাণিজ্য স্থানান্তরের চেষ্টা করেন এবং লোহিত সাগরের প্রবেশপথে আরসিনিও বন্দর গড়ে তোলেন। কিন্তু নাব্যতা সংকট দেখা দেয়ায় এ বন্দর পরিত্যাগ করতে হয়। তারপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বারিনিস বন্দর। খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ সালে টলেমি ফিলাডেলফাস বারিনিসের উত্তরে মায়োস হারমোস স্থাপন করেন। এ বন্দরটি ছিল তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। কিন্তু জলদস্যুদের উপদ্রব শুরু হওয়ায় লোহিত সাগরের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। মিসরের পরবর্তী রাজা টলেমি ইউরগেটিসের আমল নাগাদ তাদের উৎপাত চলতে থাকে। ইউরগেটিস জলদস্যুদের দমনে একটি নৌবহর মোতায়েন করেন।

ভারতীয় পণ্য ইয়েমেনে এসে পৌঁছালে হেজাজের মধ্য দিয়ে সেগুলো দিদানে নেয়া হতো। একসময় ইয়াসরিব বা মদিনার মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা ছিল। কিন্তু খিস্টপূর্ব ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে ইয়াসরিবকে এড়িয়ে মক্কার মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করা

www.pathagar.com

হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মদিনার লোকজন ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদকে (সা.) আশ্রয় দেয়। সে সময় মদিনায় কোনো রাস্তা ছিল না। দক্ষিণ আরবে হেজাজে একটি রাস্তা ছিল। এ রাস্তা দিয়ে দারুচিনি, সুগন্ধি, ধুপ, মসল্লা ইত্যাদি বহন করা হতো। আরবে এসব সামগ্রী উৎপাদিত হতো। আরবদের কাছ থেকে এসব লোভনীয় সামগ্রী মিসরীয়, বেবিলনীয়, ইহুদী ও অন্যরা ক্রয় করতো। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে স্থলপথে দূরপ্রাচ্যের যোগাযোগ ছিল। এ রাস্তাটি ছিল সিরীয় সীমান্ত থেকে মার্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম এন্টিয়কাস একটি গ্রীক কলোনি হিসাবে মার্ভ শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ শহরের চারদিকে ছিল কৃষকদের বসতি। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক। পার্থীয় রাজাদের আমলে এ শহর একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এ বাণিজ্য কেন্দ্রে রোমানদের সঙ্গে চীনা বণিকদের দেখা সাক্ষাৎ হতো। আরবদের বিজয়ের সময় এ শহরের বিরাট সমৃদ্ধি ঘটে। এখানে সিল্ক ও মিহি কাপড় প্রস্তুত করা হতো। রোমান সাম্রাজ্যে এসব কাপড় ছিল দুর্লভ ও মহার্ঘ। আরবদের বিজয়ের আগে মার্ভের পশ্চিমাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আরবদের প্রাথমিক যুগে পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য স্থানান্তরিত হয়। পারস্যের রাজা তৃতীয় ইয়াজদিগার্ড পরাজিত হয়ে মার্ভে আশ্রয় নেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫১ সালে তিনি আরবদের হাতে ধরা পড়েন এবং রাজিক নামে নিকটবর্তী একটি গ্রামের মিলে তাকে হত্যা করা হয়। নেস্টোরীয় খ্রিস্টান বিশপ রাজার লাশ পা-ই-বাবানে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করেন। কোনো একটি ঘটনায় নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সুলতান কালা নামে পরিচিত কোয়ার্টারের উত্তরে ম্যাসারগাসানে একটি নেস্টোরীয় গীর্জা ছিল। এভাবে মার্ভ হেলেনীয় সভ্যতার একটি শিবির হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে বসবাসকারীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছিল নেস্টোরীয় ও মনোফিজিট খ্রিস্টান। পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু রোমান বন্দিদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য এখানে পাঠালে মার্ভের জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

মার্ভ, ব্যাকট্রিয়া ও সোগদিয়ানা ছিল হেলেনীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। বিদ্রোহ দেখা দিলে ব্যাকট্রিয়া, সোগদিয়ানা ও ফরগনা সেলুসীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভারত সীমান্তে ব্যাকট্রিয়ায় একটি গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যটির অস্তিত্ব ছিল। এন্টিয়ক ও মার্ভের মতো শহরগুলো ছিল সিরিয়া ও উত্তর মেসোপটেমিয়া থেকে আগত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শেষ প্রান্তে। ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে সোগদিয়ানা ও ফরগনার যোগাযোগ ছিল। মঙ্গোলিয়ার সাকরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেও এখানকার গ্রীক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়নি। মুসলিম শাসনে ব্যাকট্রিয়া বলখ নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। এই বলখই আরবদের কাছে গ্রীক জ্ঞান স্থানান্তরে একটি সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করেছে।

প্রাচীন আমলে ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকদের যোগাযোগ

ভারত ও দক্ষিণ আরবের মধ্যকার বাণিজ্য রুট সম্পর্কে গ্রীকরা তেমন কিছু জানতো না। সম্ভবত আরবরা নিজেদের বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এ

www.pathagar.com

রুটের বিস্তারিত বিবরণ গ্রীকদের কাছে গোপন রেখেছিল। তারা অন্যদের ভয় দেখানোর জন্য দৈত্য দানব ও বিপদের কথা প্রচার করতো। দক্ষিণ আরবে পণ্য এসে পৌঁছালে স্থলপথে সেগুলো আরবরা আইলা, গাজা এমনকি সিরিয়া পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতো। রোমান সম্রাট গাইয়াসের রাজত্বকাল শেষ হওয়া নাগাদ রোমানরা লোহিত সাগরের জলপথের উন্নতি সাধন করেনি। কেপ সায়াগরাস পর্যন্ত আরবীয় উপকূল বরাবর শুল্ক আরোপ করা হয়। সিন্ধু নদের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত খেজুর ব্যবসায়ীরা কেপ সায়াগরাস থেকে সংক্ষিপ্ত পথে সরাসরি ভারত মহাসাগরের ওপারে সিগারাসে পৌঁছাতো। রোমানরা বুঝতে পারে যে, তারা বর্ষাকালের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বর্ষাকালে সমুদ্র পথে ভারতের সঙ্গে দূরত্ব হ্রাস পেতো। পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত ৬ মাস বৃষ্টি হতো। গ্রীষ্মের প্রথম ৬ মাসে জাহাজ তারা ভারতে গিয়ে পৌঁছাতো এবং শীতের শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাসে ফিরে আসতো। মনে হচ্ছে, এসময় লোহিত সাগরের মুখ থেকে জাহাজ রওনা দিতো এবং ভারতের মালাবার বা দক্ষিণ ভারতের অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছাতো। খ্রিস্টপূর্ব ১১৮-১১২ সালে বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক নাবিক ইউডোক্সাস ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রথম শতাব্দীতে তার আমলেই ভারতে আসার জলপথ আবিস্কৃত হয়। ভারত মহাসাগর রোমানদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠে। অগাস্টাসের আগে মুষ্টিমেয় গ্রীক অথবা রোমান ভারত মহাসাগরে বাব এল মিন্দাব পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০-১৪০ সালে মঙ্গোলীয় সাকরা উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে এবং ব্যাকট্রিয়া বিধ্বস্ত করে। ক্রমে ক্রমে মঙ্গোলীয়রা বসতি স্থাপন করে এবং কয়েকটি সাক রাজ্য গঠন করে। এসব রাজ্যের মধ্যে কুশান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য।

কুশানের তৃতীয় রাজা কনিষ্কের আমলে পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। আলেক্সান্দ্রিয়ার সঙ্গে জলপথে কুশান রাজ্যের বাণিজ্য হতো। রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার রাজ্যে বহু বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয়। তার প্রাথমিক মুদ্রায় গ্রীক হরফ ও পারসিক শব্দ অঙ্কন করা হয়েছিল। কনিষ্কের রাজধানী পুরুশাপুরায় (পেশোয়ার) গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত একটি বিশাল টাওয়ার ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। একাদশ শতাব্দী নাগাদ এসব বৌদ্ধ কীর্তির অস্তিত্ব ছিল। এ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদ এসব বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংস করেন। চতুর্থ কুশান রাজা হুবিশকা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু তার উত্তরসূরি বাসুদকাব হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিবের পূজা করতে শুরু করেন। কুশান রাজাদের আমলে গ্রীক ও রোমান বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল সমুদ্র পথ। ভারতীয় মসল্লা ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী রোমান মুদ্রায় ক্রয় করা হতো। কুশান রাজারা রোমান মডেলে স্বর্ণ মুদ্রা চালু করেছিলেন। গোটা ভারতে অবাধে রোমান স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করা হতো।

তৃতীয় শতাব্দীতে কুশান রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হয় এবং রাজ্যটি সিন্ধু উপত্যকা ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মারকিউস আউরিলিয়াসের রাজত্ব শেষে

www.pathagar.com

ভারতের সঙ্গে রোমানদের বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং সমুদ্র পথ ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ২২৬ সালে সাসানীয়দের রাজত্ব শুরু হলে অধঃপতিত পার্থিয়ার স্থলে একটি নয়া ও শক্তিশালী পারস্যের জন্ম হয়। পারস্যের এ নয়া শক্তি ছিল রোমানদের প্রতি বৈরি। রোমান সম্রাট ডায়োসলেশিয়ান নয়া হুমকি মোকাবিলায় রোমান সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালান। তবে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩২৪ সাল নাগাদ সম্রাট কন্সটান্টাইনের নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য পুরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। তবে ততদিনে সময় বদলে যায়। কন্সটান্টিনোপল আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। লোহিত সাগরের নিরাপত্তার ওপর ভারত ও আলেক্সান্দ্রিয়ার মধ্যকার সমুদ্রপথের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমল পর্যন্ত রোমানরা লোহিত সাগর নিয়ন্ত্রণ করতো। ৩২০ সালে ভারতে একটি নয়া রাজবংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের নাম ছিল গুপ্তবংশ। চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন রাজা মগধে গুপ্ত রাজবংশের শাসনের ভিত রচনা করেন। গুপ্ত রাজবংশের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এ বংশের দ্বিতীয় রাজা সমুদ্র গুপ্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি ছিল না। সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত করা হলে স্থাপত্যে বৌদ্ধ রীতি পরিত্যক্ত হয়। হিন্দু মন্দিরগুলোর শোভা বৃদ্ধি পায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধারার মধ্য দিয়ে আগত গ্রীক প্রভাব তখনো বিদ্যমান ছিল। মুদ্রাগুলোতে রোমান মডেল বহাল ছিল। এ রাজবংশের তৃতীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র পশ্চিম ভারত জয় করেন এবং সাক রাজ্যগুলো পদানত করেন। এসব রাজ্য জয় করায় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মালব এবং মালবের রাজধানী উজ্জায়ন অধিকারের সুযোগ পান। উজ্জায়ন ছিল লোহিত সাগরের সঙ্গে সমুদ্র পথে ভারতের যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটা সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের মধ্যে কোনো জাত ভেদ প্রথা ছিল না। সমুদ্র যাত্রায় তাদের কোনো ধর্মীয় বিধি নিষেধও ছিল না।

ভারতীয়দের কাছ থেকে আরবদের কাছে জ্ঞান স্থানান্তর

গুপ্ত রাজাদের আমলে পাটলিপুত্র বিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট এখানে শিক্ষা দিতেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে গণিত নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বরাহমিহির 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তলিক' শিরোনামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পাঁচটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা অবলম্বনে তিনি এ সংকলন তৈরি করেন। বরাহমিহির ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলো সংক্ষিপ্ত করেন। পুস্তিকাগুলোর একটি ছিল বিজ্ঞান-পূর্ব যুগের। এ পুস্তিকাটির কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না। তবে অন্য চারটি পুস্তিকায় মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়াকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল। দু'টি পুস্তিকার নাম ভারতীয় ছিল না। একটির নাম ছিল 'রোমাক' এবং অন্যটির নাম 'পাউলিসা'। শেষোক্ত পুস্তিকাটিতে ক্লডিয়াস টলেমির জ্যায়ের সারণীর ভিত্তিতে একটি সারণী দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

এ দু'টি পুস্তিকায় বিজ্ঞানের মহান পথপ্রদর্শক হিসাবে যবন অথবা গ্রীকদের কথা উল্লেখ করা হয়। চারটি পুস্তিকার একটি ছিল পঞ্চম শতাব্দীর। পুস্তিকাটির নাম ছিল 'সূর্যসিদ্ধান্ত' বা সূর্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। এ পুস্তিকাটি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি অনুসরণীয় গ্রন্থে পরিণত হয়।

ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি উজ্জায়ন মানমন্দিরে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের প্রণেতা। এ গ্রন্থটি ছিল ব্রহ্মের সূর্যসিদ্ধান্তের সংশোধিত সংস্করণ। 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' ছিল আরবদের সিন্দহিন্দের ভিত্তি। গ্রন্থটিতে ছিল গণিতসহ ২১টি অধ্যায়। তাতে অজ্ঞাত সমীকরণ সমাধানের নিয়মও ছিল। গণিত অধ্যায়ে ব্রহ্মগুপ্ত অখণ্ড সংখ্যা, ভগ্নাংশ, বিনিময়, সরল সুদ, ছায়া গণনা বা অঙ্কের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার গণিতের ধরন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আলেক্সান্দ্রিয়া ও উজ্জায়নের মধ্যে সমুদ্র পথে যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগের সূত্রে তার গণিতে আলেক্সান্দ্রিয়াকেন্দ্রিক গণিতের প্রভাব পড়েছে। খলিফা হারুনুর রশীদের আমলে গ্রন্থটির সঙ্গে আরবদের পরিচয় ঘটে। ভারতে লিখিত 'সূর্যসিদ্ধান্ত' থেকে 'সিন্দহিন্দ' নামকরণ করা হয়।

পারস্যে সাসানীয় আমলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা এবং পর্যবেক্ষণগুলো সংরক্ষণ করে রাখা ছিল একটি রীতি। 'জিজ-ই-শাত্রোয়ার' বা রাজকীয় সারণী নামে নিয়মিত এসব পর্যবেক্ষণগুলো প্রকাশ করা হতো। আরবরা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সারণী প্রকাশ করা বন্ধ হয়নি। অথবা তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ফারসি ভাষা তখনো ব্যবহার করা হতো এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আরবী ভাষা চালু হয়নি। পর্যবেক্ষণের তারিখগুলো দেয়া হতো প্রাচীন ফারসি মাসের নামানুসারে। জুন্দি-শাহপুরে একটি মানমন্দির ছিল। এই মানমন্দির এবং অন্যান্য ফারসি মানমন্দিরে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হতো। তবে পর্যবেক্ষণের গোটা কাজটি ছিল পারস্যবাসীদের হাতে। আরবরা এখান থেকেই গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার কৌশল আয়ত্ত করে এবং পর্যবেক্ষণগুলো লিখে রাখতে শুরু করে। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল পারস্যের মানমন্দিরগুলোর অগ্রগতির ধারাবাহিকতা মাত্র। পারস্যের মানমন্দিরগুলোতে ভারতীয় গণিত ব্যবহার করা হতো। নিশ্চিতভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আরবরা ভারতীয় মাধ্যমের সহায়তায় গ্রীক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে গ্রীক জ্ঞান পারস্যের বিজ্ঞানীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

আরবরা 'আলমাগেস্ট' বুঝতে অক্ষম হওয়ায় তৎক্ষণাৎ বারমাকী মন্ত্রী জাফর ইবনে ইয়াহিয়া সমাধান দিতে সক্ষম হন। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ইউক্লিড ও ক্লডিয়াস টলেমির মূল বই পাঠ করেছিলেন। পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে আরবরা 'সিন্দহিন্দ' সংকলন করে এবং সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। 'সিন্দহিন্দ'ই ছিল আরবদের কাছে পরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক সমাধানও ছিল। বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতি ছিল গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি

www.pathagar.com

করছেন, খলিফা আল-মনসুরের আমলে 'সিন্দহিন্দ' অনুবাদ করা হয়েছিল। এ দাবির সমর্থনে এক ঐতিহাসিক বিবরণীতে বলা হয়, পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর ৭১২ সালে মোহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবরা সিন্ধু নদের ভাটি উপত্যকার সিন্ধু অঞ্চল জয় করেছিল। তবে সিন্ধু বিজয় কোনো স্থায়ী সুফল বয়ে আনেনি। সামরিক স্থাপনাগুলোতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য মুষ্টিমেয় আরব সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করে। এসব আরব অর্ধ স্বাধীনভাবে বসবাস করছিলেন। আব্বাসীয়রা বাগদাদের খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে সিন্ধুতে বসবাসকারী আরবরা স্বাধীনতা ঘোষণা করার সুযোগ পায়। তারা বাগদাদের নয়া রাজবংশকে স্বীকৃতি দানে অস্বীকৃতি জানায়। আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তাদের ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাদের দমন করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। এ বাহিনীর কাছে তারা বশ্যতা স্বীকার করে এবং চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনার জন্য বাগদাদে একজন দূত পাঠায়। এ দূতের সঙ্গে কঙ্ক নামে একজন ভারতীয় সাধুকেও পাঠানো হয়। কঙ্ক আরবদের কাছে ভারতীয়দের অর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করেন। তিনি যেসব জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতও ছিল। কঙ্ক আরবী অথবা ফারসি জানতেন না। একজন দোভাষী তার ভাষ্য ফারসিতে অনুবাদ করতেন। দ্বিতীয় আরেকজন দোভাষী ফারসি থেকে আরবীতে অনুবাদ করতেন। এভাবে তার প্রচারিত জ্ঞান আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং তা 'সিন্দহিন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভারত বিশেষজ্ঞ আল-বেরুনি এ উপাখ্যান শুনতে পেলেও বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, সিন্দহিন্দের অনুবাদ মানসম্মত না হওয়ায় এ ধরনের কথা প্রচার করা হয়েছিল। সিন্ধু থেকে বাগদাদে কোনো দূত পাঠানোর প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে আরবী 'সিন্দহিন্দ' হচ্ছে 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এর ফারসি অনুবাদের অনুকরণ। কেননা আরবীতে সিন্দহিন্দের ব্যবহার শুরু হওয়ার বেশ আগে জুন্দি-শাহপুরে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ব্যবহার করা হতো। 'সিন্দহিন্দ' পাঠ করলে স্পষ্টতই মনে হয় গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কোনো সাধু সন্ন্যাসির ভাষ্যের নোট নয়। বরং গ্রন্থটি হচ্ছে ভারতের উঁচু মানের পুস্তিকা ব্রহ্মগুপ্তের সংশোধিত 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এর অনুবাদ। দু'টি অনুবাদের স্তর পেরিয়ে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' আরবদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

জ্ঞান পাচারের রুট ছিল ভারত থেকে পারস্য এবং পারস্য থেকে আরব। আরবরা পারস্যের মাধ্যমে তাদের ভারতীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞান লাভ করেছিল। তবে এসব জ্ঞানের মূল উৎস ছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানীরা। গ্রীস থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান স্থানান্তরিত হয় মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায়। আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। গ্রীকরা সরাসরি ভারতে জ্ঞান পাচার করেনি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মস্থ করেন। তাদের হাতে বিজ্ঞান আরো উন্নতি লাভ করে। আল-বেরুনির লেখা থেকে জানা যায় যে, একই নামে দু'জন আর্যভট্ট ছিলেন। সম্ভবত প্রথম আর্যভট্ট মারা যান পঞ্চম শতাব্দীতে। দ্বিতীয় আর্যভট্ট কখন মারা যান তা স্পষ্ট নয়। জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট পাটলিপুত্রে কাজ করতেন, উজ্জায়নে নয়। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ

www.pathagar.com

রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'গীতিকা' হলো একটি। এ গ্রন্থটি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সারণীর একটি সংগ্রহ। তার দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'আর্যশাস্ত্র'। এ গ্রন্থটিতে 'গণিত' নামে পরিচিত একটি প্রবন্ধ এবং 'গোলা' নামে পরিচিত জ্যামিতি বিষয়ক আরেকটি প্রবন্ধ ছিল। আর্যভট্ট ঘন সমীকরণের সমাধান দিয়েছিলেন। তার আগে গ্রীক বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাসও ঘন সমীকরণের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি মাত্র একটি মূল শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞ হিরনও অনুরূপ সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি অজ্ঞাত সমান্তরাল সমীকরণের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন। গ্রীক গণিতজ্ঞ হিপসোকলস-ও এ সমীকরণ সমাধানের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং অবিরত ভগ্নাংশের সাহায্যে এ সাধারণ সমীকরণের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন।

সিরিয়া বিজয়

পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নদী উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। একটি টাইগ্রিস উপত্যকা এবং আরেকটি ইউফ্রেটিস। লোহিত সাগরের পূর্বদিকে নীল উপত্যকা হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপত্যকা। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকাকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে দু'টি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ দু'টি নদীর পানি ছিল আশপাশের অঞ্চলগুলোর কৃষির প্রধান অবলম্বন। এ উর্বর ভূখণ্ডের প্রতি আরবীয় মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে সিরীয় ভূখণ্ডে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠতে থাকে। হযরত মোহাম্মদের (সা.) বিদেশী ভূখণ্ড দখল করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতির তাগিদে মুসলমানদেরকে সিরিয়ার মতো দেশ জয় করতে হয়। ইসলামের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অঞ্চলগুলোতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এসব অঞ্চলে সবসময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। যুদ্ধে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তারা শান্তি প্রত্যাশা করছিল। তাদের মহৎ প্রত্যাশা পূরণে আরবদেরকে আশপাশের অঞ্চলগুলোতে অভিযান চালাতে হয়। অভিযানের সাফল্যে আরবরা বিজিত ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত হয়। তবে তারা কৃষি কাজে মোটেই আগ্রহী ছিল না। নিজেদেরকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জাতি হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সিরীয় ভূখণ্ডে অবস্থানকারী আরবরা পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এ দু'টি সাম্রাজ্যের সীমান্ত থেকে অমুসলিম আরবদের বিতাড়িত করা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য এ সমস্যার অভিন্ন সমাধান দেয়ার চেষ্টা করে। অমুসলিম আরবদেরকে সেখানে বসবাস করার অনুমতি এবং তাদেরকে ভর্তুকি দেয়া হয় এ শর্তে যে, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম আরবদের যে কোনো অগ্রাভিযান তারা প্রতিহত করবে।

মরুভূমির বেদুইন মুসলিম আরবরা নিজেদেরকে বঞ্চিত অবস্থায় দেখতে পায়। সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখে

www.pathagar.com

তারা অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পারস্য দখল করে নেয়। বিজিত অঞ্চলের অফুরন্ত সম্পদ মুসলিম আরবদের দখলে এসে যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) গোটা আরব দেশকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে সিরিয়া এবং পূর্বাঞ্চলে পারস্যের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি এ দু'টি ভূখণ্ডকে ইসলামের আওতায় নিয়ে আসার কথা ভাবছিলেন। পার্সীদের বিরুদ্ধে পারস্য সীমান্তে বসবাসকারী অমুসলিম আরবদের ক্ষোভ থাকায় তারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদের (সা.) ওফাতের পর তারা তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেয়।

ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) পূর্ব রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ সিরিয়ায় হারিস বিন উমাইয়াকে দূত হিসাবে পাঠান। কিন্তু তাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা সোহরাবিল বিন আমর গাচ্ছানি মুতায় হত্যা করে। দূত হত্যা করা ছিল আরবীয় রীতি নীতির মারাত্মক লংঘন। দূত হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক জবাব দানে হযরত মোহাম্মদ (সা.) তার পালিত পুত্র হযরত জায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ায় একদল সৈন্য পাঠান। সীমান্তে মোতায়েন অমুসলিম আরবরা রোমানদের বেতনভুক হওয়ায় তাদের সাহায্যে মূল রোমান বাহিনী এগিয়ে আসে। সিরিয়ার মুতা প্রান্তরে উভয়পক্ষের ভয়াবহ লড়াই হয়। লড়াইয়ে পর পর তিনজন মুসলিম সেনাপতি হযরত জায়েদ, জাফর ও আবদুল্লাহ শাহাদাৎ বরণ করলে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি ত্বরিত গতিতে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। সেদিনের লড়াইয়ে মহাবীর খালিদ ৯টি তরবারি ভেঙ্গে ছিলেন। দেড় লাখ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি মাত্র সাড়ে চার হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে লড়াই করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি সিরিয়া জয়ে ব্যর্থ হন। অন্যান্য যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আরবরা কয়েক বছর সিরিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। ৬৩২ সালে সিরিয়া আক্রমণে এক বিশাল মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত হযরত মোহাম্মদ (সা.) ওফাত লাভ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) প্রথম খলিফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬৩৩ সালে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। আমর ইবনুল আস, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান ও সোহরাবিলের নেতৃত্বে তিনটি মুসলিম বাহিনী তিন দিক থেকে এগিয়ে যায়। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে ছিল তিন হাজার করে সৈন্য। সেনাপতি আবু উবায়দা আরেকটি বাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। যুদ্ধে ফিলিস্তিনের শাসনকর্তা সারগিয়াসের বাহিনী পরাজিত হলে বাইজান্টাইন বাহিনী গাজার দিকে পালিয়ে যায়। সারগিয়াসের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী পাঠান। মুসলিম সেনাপাতি খালিদ বিন ওয়ালিদ হিরা থেকে সিরিয়া অগ্রসর হওয়ার পথে মারজহারিতে বাইজান্টাইন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ৪০ দিন পর

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসায় পরবর্তী অভিযানের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা সহজতর হয়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রা.) আমলে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে নেয়। তবে দামেস্ক পদানত করার কৃতিত্ব খালিদের। ৬৩৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা দামেস্ক দখল করে নেয়। নিকট প্রাচ্যের মর্যাদাপূর্ণ শহর দামেস্কের পতন ছিল বাইজান্টাইনীয়দের জন্য একটি মারাত্মক আঘাত। তারা এ শহর পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প হয়। ৬৩৬ সালের গ্রীষ্মে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে ২ লাখ ৪০ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী দক্ষিণ সিরিয়ায় অগ্রসর হয়। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় রণকুশলী সৈন্যাধ্যক্ষ খালিদ দামেস্ক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেন। আগস্টে উভয়পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষায় মুসলমানরা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার। তখন পর্যন্ত কেউ ভাবেনি যে, সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর এ অভিযান অতীতের মতো কোনো সাধারণ অভিযান নয়। আরবরা নিজেরাও তেমন চিন্তা করেনি। এসব আরব ধর্মান্ধ ছিলেন না। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম সিরীয়দের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়নি। হযরত ওমরের (রা.) দিকনির্দেশনা তারা অনুসরণ করে। বলা হয়ে থাকে, মুসলমানরা এক হাতে কোরআন এবং আরেক হাতে তরবারি নিয়ে বিজিত দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছেন। ধর্মান্তরিত না হলে তারা বিধর্মীদের হত্যা করতেন। কিন্তু একথা মোটেও সঠিক নয়। বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগ সঠিক হলে ২০১১ সাল নাগাদ আরব জাহানে অমুসলিমদের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লাখ থাকার কথা ছিল না। অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও এ সত্য স্বীকার করছেন। ডি ল্যাসি ও'লীরি ডি. ডি. তার 'হাউ গ্রীক সায়েন্স পাসড টু দি অ্যারাবস' শিরোনামে গ্রন্থে লিখেছেন, *'The picture sometimes given of a host of fanatical Arabs rushing forward with a sword in one hand and Qur'an in the other and forcing people to turn Muslims or be killed is very far from fact. The cynical Arab is not inclined to be a fanatic. There have been plenty of fanatical Muslims, but they were not Arabs but converts of other races who were converted to Islam at a later date. The Arabs did not force the people they conquered to embrace their religion, they left the conquered population to follow their own religion, laws, customs, and use their own languages.'*

অর্থাৎ *'কখনো কখনো আরবদের এমন ধর্মান্ধভাবে চিত্রিত করা হয় যে, একদল আরব এক হাতে কোরআন এবং অন্য হাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে এবং লোকজনকে মুসলমান হতে বাধ্য করছে এবং মুসলমান না হলে তাদের হত্যা করছে।* কিন্তু এ ধারণা মোটেই সত্যি নয়। রুক্ষ প্রকৃতির হলেও আরবরা ধর্মান্ধ ছিল না। বহু ধর্মান্ধ মুসলমান ছিল। *তবে তারা আরব ছিল না। পরবর্তীকালে অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত নও-মুসলিমরা ছিল ধর্মান্ধ। আরবরা বিজিত ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের তাদের ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেনি। তারা বিজিত অঞ্চলের জনগণকে নিজেদের ধর্ম, আইন, রীতিনীতি ও ভাষা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিল।'*

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড আর. টার্নার-ও একই কথার পুনরুক্তি করেছেন। 'সায়েন্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলামঃ এন ইলাসট্রেটেড ইন্ট্রডাকশন'-এর ৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, '*Christians and Jews were not required to convert if they paid suitable tribute; they were also freed from obligatory military service. Of course, many sects of panthesists and pagans still risked the death penalty if they refused to pay* tribute and refused conversion as *well, although punishment came to be applied less rigorously in inaccessible areas.*'

অর্থাৎ '*খ্রিস্টান ও ইহুদীরা উপযুক্ত জিজিয়া কর পরিশোধ করলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা হতো না; তারা সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলক ভর্তি হওয়া থেকে মুক্ত ছিল। অবশ্য জিজিয়া কর পরিশোধ এবং ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকৃতি জানালে বহুশ্বেরবাদী ও বিধর্মীদের জন্য তখনো মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল যদিও দুর্গম অঞ্চলে শাস্তি দান তত কঠোর ছিল না।*'

৬৬১ সালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যতম উৎসস্থল দামেস্কে তার রাজধানী স্থানান্তর করলে সিরিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। উমাইয়া শাসকগণ দামেস্কে ৮০ বছর অবস্থান করেন। আরবরা নিজেদেরকে এমন একটি ভূখণ্ডের শাসক হিসাবে দেখতে পায় যা ছিল একটি রোমান প্রদেশ। এই প্রদেশে রোমান আইন পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল এবং সেখানে ছিল অতি উঁচুমানের রোমান প্রশাসন। আরবরা বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেনি। যেসব রোমান কর্মকর্তা রোমান আইনের আওতায় অবস্থান করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাদেরকে তখনো রোমান শাসনের আওতাধীন যে কোনো জায়গায় স্থানান্তরের সব সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগে অনেকেই স্থানান্তরিত হন। তবে অন্যরা সন্তুষ্টির সঙ্গে আরব শাসনের আওতায় বসবাস করতে থাকেন। তাদের অনেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে সম্মানজনক পদ অলংকৃত করেন। প্রথম ২৫ বছর কিংবা তারও বেশি বছর ধরে গ্রীক ভাষায় সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হতো। সিভিল সার্ভিসের অধিকাংশ পদে ছিল খ্রিস্টানরা।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো ছিল খ্রিস্টান। সীমান্ত রক্ষী হিসাবে তারা বাইজান্টাইন সরকার থেকে ভর্তুকি পেতো। পুরনো অধিবাসী হিসাবে তারা সম্পদশালী হয়ে উঠে এবং নিজেদেরকে মরুভূমির আরব বেদুইন মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করতে থাকে। মুসলিম শাসকরা তাদের আভিজাত্যপূর্ণ মর্যাদা স্বীকার করে নেন। রাজপরিবারের কোনো কোনো মুসলিম সদস্য খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করেন। বেসামরিক প্রশাসনের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো খ্রিস্টানদের দখলে থাকায় খলিফা আবদুল মালিকের সময় অসন্তোষ দেখা দেয়। খলিফা খ্রিস্টানদের পদগুলোতে আরবীয় মুসলমানদের স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। আরব মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যের খুঁটিনাটি বুঝতে না পারায় খ্রিস্টান কর্মকর্তাদের পুনর্বহাল করা হয়। তবে খলিফা আবদুল মালিক গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আরবীতে সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণে সফল হন। মুদ্রায় তিনি আরবী

www.pathagar.com

চালু করেন। সপ্তম শতাব্দীতে গাউলের বিশপ আরকাফ জেরুজালেম সফর করেন। আরব শাসকগণ তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেন। তাকে তার ইচ্ছামতো ভ্রমণ করার সুযোগ দেয়া হয়। ক্রুসেড শুরু হওয়া নাগাদ সিরিয়া ও মিসর ছিল মুসলিম শাসনের আওতাধীন খ্রিস্টান প্রধান ভূখণ্ড। মুসলিম শাসকদের ভূমিকা কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দামেস্কে উমাইয়া খিলাফতের প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলামী রীতি নীতি ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ছিল একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। আবু মালিক গিয়াসউদ্দিন ইবনে সালত ইবনে তারিক আল-আখতালের কবিতা হচ্ছে তার প্রমাণ। ৬৪০ সালে তিনি হিরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭১০ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি জুশাস ইবনে বাকের গোত্রের তাঘলিব বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি তার ধর্ম পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ঘৃণা করতেন।

খ্রিস্টান কবি আবু মালিক আমির মুয়াবিয়ার (রা.) পুত্র ইয়াজিদের সম্মানে একটি কবিতা লিখেছিলেন। খলিফা আবদুল মালিক তাকে রাজকবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আবু মালিক তার কবিতায় উমাইয়া শাসনের উদার নীতির প্রশংসা করেন। তবে ইসলামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তিনি খ্রিস্টানদের ভর্ৎসনা করেন। ইসলাম বিদ্বেষী হলেও খলিফা আবদুল মালিক তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে খলিফা প্রথম ওয়ালিদ এ মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান কবিকে প্রশ্রয় দেননি।

রোমান ও পার্সী বাহিনীর সংস্পর্শে গিয়ে আরবরা তাদের রণকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। আরবরা বুঝতে পারে যে, মরুভূমির যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের জন্য রোমানদের কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। এ উপলব্ধি থেকে তারা রোমান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা অনুকরণ করতে শুরু করে। সিরীয় সীমান্তে বসবাসকারী খ্রিস্টান আরবরা রোমান বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসাবে গড়ে উঠেছিল। একই সময়ে পার্সীরাও রোমানদের সামরিক কৌশল অনুকরণ করতে থাকে। এসব যুদ্ধ কৌশলের মধ্যে অন্যতম ছিল শহর অবরোধে প্রকৌশল ব্যবহার এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দুর্গ গড়ে তোলা। মুসলিম আরবরা বর্গাকার সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণে রোমান সামরিক কৌশল অনুকরণ করে। রোমান পদ্ধতিতে তারা প্রতিটি বিজিত অঞ্চলে দুর্গ শহর প্রতিষ্ঠা করে। ফিলিস্তিনে জাবিয়া, মিসরে ফুসতাত, ইফ্রিকায়া ও কাইরিয়ান ছিল এ ধরনের দুর্গ নগরী। তবে ইরাকের বসরা ও কুফার মতো কোনোটাই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

৬৩৫ সালে উতবা ইবনে আজওয়ান বসরা এবং কিছুদিন পর সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ দু'টি নগরী ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে। উমাইয়াদেরকে ধর্মের প্রতি উদাসীন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং তাদের শৈথিল্য পবিত্র মক্কা ও মদিনায় বিস্তার লাভ করায় ধর্মীয় বিশ্বাসে কট্টরপন্থীরা

www.pathagar.com

ইরাকের এ দু'টি নগরীতে হিযরত করে। বসরা ও কুফার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারার মূলে ছিল কোরআন অধ্যয়ন এবং ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান। প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা ছিল কোরআনকেন্দ্রিক। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে। ইসলামী আইনশাস্ত্র, ঐতিহ্য ও দর্শন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। এসময় গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা শুরু না হলেও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, বসরা ও কুফায় ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। নেস্টোরীয় খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থান হিরা বসরা থেকে বেশি দূরে ছিল না। হিরার বহু লোক দুর্গ নগরী বসরায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা.) বন্ধু ও বিশ্বস্ত আবুল আসাদ আদ-দুয়ালির সহযোগিতায় বসরায় ব্যাকরণ ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ইরাকের বহু লোক শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণ করে। এসব লোক আরবীভাষী হলেও শুদ্ধরূপে কোরআন পাঠ করতে পারতো না। এতে হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হন। এ পরিস্থিতিতে তিনি আদ-দুয়ালিকে শুদ্ধরূপে কোরআন পাঠের নিয়ম নীতি লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ৬৬১ সালের পহেলা জানুয়ারি হযরত আলী (রা.) শাহাদাৎ বরণ করলে আদ-দুয়ালি তার নির্দেশ পালনে বাধাগ্রস্ত হন। গভর্নর জিয়াদ ইবনে আবিহি তার চাকরি হযরত আলীর (রা.) প্রতিদ্বন্দ্বী হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) অধীনে ন্যস্ত করায় তিনি তাকে সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানান। গভর্নর জিয়াদ হযরত আলীর (রা.) নির্দেশ পুনরায় জারি করলেও আদ-দুয়ালি কোনো সাড়া দেননি। একদিন আদ-দুয়ালি কোনো এক ব্যক্তিকে ভুলভাবে কোরআন পাঠ করতে শুনতে পান। কালামে পাকের ভুল পাঠে তিনি ভীষণ ব্যথিত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধের পদ্ধতি উদ্ভাবনে মনোযোগ দেন। ঘটনাক্রমে এ কাজ করতে গিয়ে তিনি গ্রীক ব্যাকরণ নয়, এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

আরবী ব্যাকরণে আবুল আসাদ আদ-দুয়ালির উত্তরাধিকারী হিসাবে বসরায় একদল ছাত্র ও শিক্ষক গড়ে উঠে। প্রায় এক শতাব্দী পর ৭২৩ অথবা ৭২৭ সালে কুফায় আবু মুসলিম মুয়াদ ইবনে মুসলিম আল-হারা ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। একসময় তিনি খলিফা আবদুল মালিকের পুত্রদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। বসরা ও কুফাতে পরস্পরবিরোধী ব্যাকরণ অনুসরণ করা হতে থাকে। হযরত হাসান বসরী ও আমির ইবনে উসমান আল-হারিছকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত ব্যাকরণবিদ শ্রেণীর জন্ম হয়। উসমান আল-হারিছ সাধারণভাবে 'সিবাবাই' নামে পরিচিত ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন পার্সী। প্রাথমিক আব্বাসীয় আমলে তিনি তার নিজস্ব ব্যাকরণ সংকলন করেন। বসরায় গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মুতাজিলা মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইরাকে রোমান আইনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সিরীয় মুসলমানরা ছিল খ্রিস্টান রোমানদের খুব কাছাকাছি। তাতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও ভাববিনিময় ঘটে। গ্রীক প্রভাব শুধু সিরিয়ায় নয়, বসরাতেও অনুভূত হয়। সম্ভবত হিরা শহরের মধ্য দিয়ে গ্রীক দর্শন এ শহরকে প্রভাবিত করেছিল।

www.pathagar.com

ভারতে প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ

সম্রাট অশোক বেশ কয়েকটি রাজাজ্ঞার মাধ্যমে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। এসব রাজাজ্ঞা জারিতে তিনি পারস্যের আকামেনিদ রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন। আকামেনিদ রাজারা বাহিস্তান ও আরো কয়েকটি জায়গায় পর্বতগাত্রে তাদের ডিক্রি খোদাই করে রাখেন। সম্রাট অশোকের ৩৪ টি রাজাজ্ঞার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব রাজাজ্ঞার মধ্যে ১৪ টি শিলাখণ্ডে, ৭ টি স্তম্ভে এবং বাদবাকিগুলো গুরুত্বহীন জায়গায় খোদাই করে রাখা। আফগানিস্তান থেকে মহীশুর পর্যন্ত অশোকের রাজাজ্ঞাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাকৃত অথবা মগধ ভাষায় এসব রাজাজ্ঞা খোদাই করা হয়। প্রাকৃত হলো সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী উন্নত সংস্করণ। সম্রাট অশোকের মৃত্যু নাগাদ তার রাজাজ্ঞাগুলো সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারোস্তি নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ভারতীয় হস্তলিখিত ভাষায় তার আজ্ঞাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। কারোস্তি ছিল প্রাচীন আরামিক লিখিত ভাষার সংশোধিত রূপ। এ সংশোধিত রূপ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পার্সীরা পাঞ্জাবে প্রচলন করে। তাতে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যেখানে যেখানে অশোকের আজ্ঞাগুলো খোদাই করা ছিল সেখানে বৌদ্ধ মন্দির কিংবা বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে ভিক্ষুরা সেগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার করতে পারে। তবে কদাচিৎ মধ্য এশিয়ার গোত্রগুলোর মধ্যে এসব রাজাজ্ঞা প্রচার করা হয়েছিল। উৎকীর্ণ লিপি ছাড়াও সম্রাট অশোক গুহার অভ্যন্তরে মন্দির ও পাথরে খোদাই করা বাণীও রেখে যান।

মুদ্রা ও স্মারকে বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র বস্তুগুলোর ছবি ছিল। এসব পবিত্র বস্তুর মধ্যে ছিল বুদ্ধের জন্মের আগে তার মা স্বপ্নে যে হাতি দেখেছিলেন সেই হাতি, যে গাছের নিচে বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে গাছ, তার শিক্ষার বহন চাকা এবং তার সমাধির মাটি ইত্যাদি। গ্রীকদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে এবং কতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল তা বলা কঠিন। আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রস্তর নির্মিত একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং অক্সামে একটি স্মৃতিস্তম্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। আলেক্সান্দ্রিয়া ও অক্সাম ছিল এমন দু'টি বাণিজ্যিক কেন্দ্র যাদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাতে মনে হয় এ দু'টি জায়গার কোনো একটিতে একজন ভারতীয় বণিক অথবা পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল। সম্রাট অশোক বিপুলসংখ্যক ইউনা অথবা গ্রীকদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং ধাম্মারাক্কিটা নামে একজন ইউনাকে একজন মিশনারী হিসাবে গুজরাটের পূর্ব উপকূলে ধর্মপ্রচারক হিসাবে পাঠিয়েছিলেন বলে সিলোন দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, 'ইউনা' বলতে সাধারণত বুঝায় একজন এশীয়কে যিনি গ্রীক শাসনাধীনে বসবাস করতেন। মেগাস্থেনিস ভারত ভ্রমণ করেন এবং পশ্চিম অঞ্চল সফরকারী বহু ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ থেকে ২৯৭ সাল পর্যন্ত মেগাস্থেনিস সেলুসীয় প্রতিনিধি হিসাবে মগধের রাজদরবারে অবস্থান করেন।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ১৮৪ সালে সুঙ্গা পৌষ্যমিত্র নামে একজন ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ মগধের শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথা মৌর্যকে হত্যা করলে মৌর্য রাজবংশের

www.pathagar.com

শাসনের অবসান ঘটে। পৌষ্যমিত্র সিংহাসন দখল করেন এবং বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। সেলুসীয় সম্রাট ভারতে তাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে সৈন্যবাহিনী পাঠালে বৌদ্ধরা গ্রীক আক্রমণকারীদের অভ্যর্থনা জানায়। সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দীতে মহাবংশ নামে পরিচিত সিলোনের বৌদ্ধ দিনপঞ্জিতে প্রাথমিক যুগের কয়েকটি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং একজন ইউনা থেরোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেরো ইউনা দেশের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়ার আশপাশের তিন হাজার ভক্তকে তার পাশে সমবেত করেছিলেন। এই আলেক্সান্দ্রিয়া মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল না। কেননা মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়াতে তখন ৩০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। ব্যাকট্রিয়া, সোগদিয়ানা ও গান্ধারায় আরো কয়েকটি আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ সাল পর্যন্ত এসব আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল গ্রীক শাসনাধীনে। তাই ভারতীয় লেখকগণ ইউনাকে গ্রীক ভূখণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মহাবংশে যে আলেক্সান্দ্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ককাসাস অঞ্চলের আলেক্সান্দ্রিয়া হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সম্রাট আলেক্সান্ডার সিস্তান থেকে উত্তরে কাবুল হয়ে হিন্দুকুশ অভিমুখে এগিয়ে যাবার সময় আলেক্সান্দ্রিয়া নামে একটি শহরের নামকরণ করেছিলেন। এই আলেক্সান্দ্রিয়া ও কাপিসা ছিল জমজ শহর। সে সময় এশিয়ায় এ ধরনের জমজ শহরের অস্তিত্ব অস্বাভাবিক ছিল না। মূল আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল পানশির-গোরাবান্দ নদীর পশ্চিম তীরে। খনন না করায় শহরটির প্রকৃত অবস্থান কোথায় তা জানা যায়নি। সম্রাট অশোকের আমলে এ এলাকায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। এ শহরটি দীর্ঘদিন বৌদ্ধপ্রধান হিসাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। আফগানিস্তানে বামিয়ানের কাছাকাছি বৌদ্ধদের বহু ভাস্কর্য বিদ্যমান। বলখের দক্ষিণে বামিয়ান হলো বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইয়াকুবের বর্ণনা অনুযায়ী বামিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে একটি বিশাল কামরায় বুদ্ধের দু'টি মূর্তি খোদাই করা হয়। একটি মূর্তির নাম ছিল 'সুষক বুধ' বা লাল বুদ্ধ এবং আরেকটির নাম ছিল 'খিং বুধ' বা ধূসর বুদ্ধ। এ দু'টি মূর্তি এখনো বিদ্যমান। অবশ্য আফগানিস্তানের তালেবান যোদ্ধারা ২০০১ সালে ডিনামাইট দিয়ে মূর্তি দু'টি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। দিগ্বিজয়ী মোঙ্গল অধিপতি চেঙ্গিস খাঁ বামিয়ান ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৪৫ সালে রোমানরা মৌসুমী জলবায়ুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় উপকূল বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। সে সময় এখানে ছিল সমৃদ্ধ কুশান রাজ্য। কুশান রাজ্যের বন্দরের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হয়। বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের বিপুল মালামাল ভারতে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় ভারত সাংস্কৃতিকভাবে লাভবান হয়। ভারতীয় দর্শনে গ্রীক চিন্তা বিশেষ করে এরিস্টোটলের প্রভাব পড়ে। ১২৩ সালে তৃতীয় কুশান রাজা কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহন করায় এ রাজ্য ধনবান ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা হিসাবে তিনি কাশ্মির জয় করেন এবং পুরুশাপুরায় তার রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মে

www.pathagar.com

দীক্ষিত হন এবং তার রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে প্রাপ্ত প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগান। তার প্রচেষ্টায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরাট অংশে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কুশান শাসনামলে ব্যাকট্রিয়া বা বলখ 'ছোট রাজগৃহ' নামে পরিচিত ছিল। মর্যাদায় জায়গাটি ছিল দ্বিতীয়। গৌতম বুদ্ধ যেখানে শিক্ষা দিতেন এবং বসবাস করতেন তার পরেই ছিল ব্যাকট্রিয়ার স্থান। বুদ্ধ কখনো বলখে বসবাস করেননি। কিন্তু এখানে এমন কয়েকটি আশ্রম রয়েছে যেগুলোতে তার দেহাবশেষ অথবা পরিধেয় বস্ত্র সংরক্ষিত। সম্রাট অশোক এসব আশ্রমের বেশ কয়েকটি নির্মাণ করেছিলেন। আশ্রমগুলোর ডিজাইনে গ্রীক স্থাপত্য বিদ্যমান। রাজা কনিষ্কের রাজদরবারের বহু ভাস্কর সীমান্তবর্তী রাজ্য গান্ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধারা রাজ্যের স্থানীয় শিল্পকলায় গ্রীক মডেল প্রাধান্য বিস্তার করতো। গান্ধারা-গ্রীক শিল্প চীনের তুর্কিস্তানের মধ্য দিয়ে খোদ চীন এমনকি জাপান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধ পুরোহিত আসভাঘোসাকে তার দরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আসভাঘোসা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেন।

ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের উত্থান ঘটায় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ ভেদ প্রথামুক্ত হওয়ায় এ ধর্ম আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উন্নয়নের একটি বাহন হিসাবে দীর্ঘদিন বহাল ছিল। কুশান শাসনামলে বলখ বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। চীন ও সিলোনের তীর্থযাত্রীরা এখানে সফরে আসতো। ৪০৫-৪১০ সালে চীনের বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়েন বৌদ্ধ ধর্মের নির্ভুল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে উত্তর ভারত সফর করেন। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। ফাহিয়েন লিখেছেন, *রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বসবাস করতো।* তিনি আরো লিখেছেন, *খোতানের সব লোক ছিল বৌদ্ধ এবং পাটলিপুত্রে ছিল দু'টি বৌদ্ধ আশ্রম।*

ফাহিয়েনের পর চীন এবং উত্তর ভারত ও বলখের মধ্যে সন্তোষজনক নিয়মিত যোগাযোগ ঘটতো। চীনা তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সফর করতেন। প্রাচীন সিল্ক রোড ধরে তারা যাতায়াত করতেন। পারস্যে মুসলিম অগ্রাভিযানের আগ পর্যন্ত তাদের এ সফর অব্যাহত ছিল। মুসলিম অগ্রাভিযানের আগে পারস্যে মাজদীন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং বলখে জরোস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারীদের কাছে কয়েকটি বৌদ্ধ আশ্রম হস্তান্তর করা হয়।

গুপ্ত রাজবংশ অন্ধকারে তলিয়ে গেলে ষষ্ঠ শতাব্দীর পর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লির উত্তরে থানেশ্বরে স্থানান্তরিত হয়। রাজা হর্ষ উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ত্রিশ বছর টিকে থাকেন এবং একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল রাজ্য গঠন করেন। এসময় গঙ্গার সমতলভূমিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলেও সংখ্যালঘুদের ধর্ম হিসাবে ভারতে এ ধর্ম তখনো শক্তিশালী ছিল। চীনা তীর্থযাত্রীরা তখনো মগধ ও বলখে

www.pathagar.com

তীর্থযাত্রায় আসতো। হিউয়েন সাং ছিলেন তাদের অন্যতম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রামাণ্য কপি সংগ্রহে তিনি ভারতে এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধের দেহ বা পরিচ্ছদের ১৫০টি চিহ্ন চীনে নিয়ে যান। হিউয়েন সাং তার ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। বলখকে তিনি পো-হো নামে আখ্যায়িত করেছেন। বলখের গভর্নর তাকে অভ্যর্থনা জানান। গভর্নর তাকে জানান যে, এ ভূখণ্ডকে 'ছোট রাজগৃহ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এখানে অপরিমেয় পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত। বিশাল নাউবাহার আশ্রম ছিল রাজধানী নগরীর পশ্চিমে। এ আশ্রমের নামকরণে বারমাকী সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বারমাকীরা ছিল আব্বাসীয় আমলের শক্তিশালী বারমাকী পরিবারের বংশধর। ধারণা করা হয় যে, মুসলিম আমলে নাউবহর আশ্রম ছিল মাজদীন। কিন্তু ঐতিহাসিক আল-ফকিহ্ বলেছেন, এ বিশাল মন্দির ছিল মূর্তি পূজারীদের একটি পীঠস্থান এবং ভারত, কাবুল ও চীনের তীর্থযাত্রীরা এখানে তীর্থ করতে আসতো। এটা মাজদীন মন্দির হয়ে থাকলে সেখানে কোনো মূর্তি থাকতো না অথবা যেসব ভূখণ্ডে অগ্নিউপাসনার কোনো ধারণা ছিল না সেখান থেকে কেউ তীর্থ করতে এখানে আসতো না। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিজয়ের আগে মাজদীন ধর্মের পুনরুজ্জীবনকালে নাউবাহার মন্দির অগ্নি উপাসনায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আই-সিং ছিলেন আরেকজন চীনা পরিব্রাজক। ৬৭১-৬৯৫ সালে তিনি তীর্থযাত্রা করেন এবং ১১ বছর নালন্দা আশ্রমে অবস্থান করেন। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খর্ব হওয়ায় এ ধর্ম আরো বেশি আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করে এবং দূরপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। ধর্মীয় বিষয়ে মগধ ও বলখের সঙ্গে চীনের সংযোগ ঘটে। শুধু তাই নয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হেলেনীয় সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম

সুফি দরবেশ আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে আদহামের ওপর বৌদ্ধ ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনি ছিলেন একজন তাপস। প্রাথমিক যুগের ইসলামে তার মতো এত কঠোর তপস্যা করতে কাউকে দেখা যায়নি। ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো সুযোগ না থাকলেও তিনি সে পথ বেছে নিয়েছিলেন। আনুমানিক ৭৮৩ সালের দিকে খ্রিস্টান কন্সটান্টিনোপলের বিরুদ্ধে নৌ অভিযানে তিনি শহীদ হন। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম ছিলেন বলখ বা ব্যাকট্রিয়ার যুবরাজ। শিকার করতে গিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সংসার জীবন ত্যাগ করে তিনি একাগ্র মনে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম সম্পর্কে বহু উপাখ্যান প্রচলিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে ইসলামের 'গৌতম বুদ্ধ' বলে মনে করেন। মার্ভ ছিল একসময় বৌদ্ধপ্রধান। এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন কায়েম হলে সেখানে প্রচলিত বৌদ্ধদের বহু আচার আচরণ মুসলিম জীবনে অনুপ্রবেশ করে। তাই ধারণা করা হয় যে, মার্ভের বৌদ্ধদের প্রভাবে ইব্রাহিম আদহাম সংসার বিরাগী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আব্বাসীয় বিপ্লব

৬৬১ সালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জেরুজালেমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি দ্রুত তার খিলাফত দামেস্কে স্থানান্তর করেন। ইতিপূর্বে তিনি সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে দামেস্কে অবস্থান করছিলেন। তার খিলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া শাসনের যুগ শুরু হয়। ৭৪৯ সাল পর্যন্ত উমাইয়া বংশের শাসন স্থায়ী হয়েছিল। ৬৮৪ সালে এক পরিবারের কাছ থেকে আরেক পরিবারে ক্ষমতার হাত বদল ঘটলে উমাইয়া শাসনে বিপর্যয় নেমে আসে। তবে নয়া পরিবার মারওয়ান উমাইয়া বংশের একটি শাখা হওয়ায় ক্ষমতা মূলত উমাইয়াদের হাতেই থেকে যায়। ৭৪৪ সাল পর্যন্ত মারওয়ান পরিবারের শাসন স্থায়ী হয়। তারপর উমাইয়া বহির্ভূত দ্বিতীয় মারওয়ান শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করেন। ৭২৪ সাল নাগাদ রাজদরবার ও প্রশাসন ছিল দামেস্কে। খলিফা হিশাম রাজধানীর বাইরে বসবাস করতে থাকেন। একসময় নামমাত্র খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি দামেস্কে যান। তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ৭৪৪ সালে দ্বিতীয় মারওয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া নাগাদ প্রশাসন রাজধানীতে থেকে যায়। খলিফা যেখানে যেতেন রাজদরবার তার সঙ্গে সেখানে যেতো। ৭৪৪ সালে শুধু রাজদরবার নয়, গোটা প্রশাসন হাররানে স্থানান্তর করা হয়। হাররানকে রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দামেস্ক একটি প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হয়। সিরিয়ার আরবরা এ পরিবর্তনে চরম ক্ষুব্ধ হয়।

উমাইয়া আমলে খিলাফত ছিল পুরোপুরি আরব রাষ্ট্র। এ আমলে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা পুরনো আমলের কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে সিরীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকের খারিজীরা বিদ্রোহ করে মসুলে অবস্থান গ্রহণ করে। খলিফা মারওয়ান তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হন। সিরিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আরেকটি খারিজী বিদ্রোহ দমনে তাকে আরবে সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়। পূর্ব পারস্যের খোরাসান থেকে তার প্রতি গুরুতর হুমকি দেখা দেয়। আরবরা পারস্য অধিকার করে নেয়ায় পারসিকরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। পারস্যবাসীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খিলাফতকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পারস্যবাসীরা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা.) পক্ষে অবস্থান নেয়। উমাইয়াদেরকে তারা অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী হিসাবে গণ্য করতে থাকে। তারা খিলাফতের ওপর হযরত আলীর (রা.) বংশধর ছাড়া অন্য কারো দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি তারা হযরত আলীকে (রা.) নবুয়তের প্রকৃত দাবিদার হিসাবেও ভাবতে থাকে। ইসলামের গৃহবিবাদে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়। শিয়ারা বহু দল উপদলে বিভক্ত হলেও আরবদের বিরুদ্ধে সবাই ছিল ঐক্যবদ্ধ। অবশেষে বিদ্রোহ শুরু হয়। খোরাসান ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু। গোপন চক্রান্তকারীরা গোটা ইসলামী বিশ্বে বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র স্পেন। মারওয়ানের পর যার খলিফা হওয়ার কথা ছিল বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নেয়া নাগাদ তার পরিচয় গোপন রাখা হয়। একসময় তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

কোরাইশ গোত্রের হাশেমীয় বংশের আবুল আব্বাস। এই আবুল আব্বাসই হলেন আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৭৪৯ সালের ২৮ নভেম্বর কুফার মসজিদে আবুল আব্বাস খলিফা হিসাবে অভিষিক্ত হন। অবশিষ্ট উমাইয়া এবং তাদের অনুসারীদের নির্মূল করা ছিল তার প্রথম কাজ। আবুল আব্বাস এ কাজ এত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন যে, তিনি বাগদাদের আস-সাফফাহ বা 'কসাই' হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেন। উমাইয়াদের মধ্যে মাত্র একজন রক্ষা পান। এই জীবিত উমাইয়া যুবক খলিফা হিশামের নাতি আবদুর রহমান বহু বিপদ আপদ অতিক্রম করে কোনো রকমে সুদূর স্পেনে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি একটি স্বাধীন দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। তার পরবর্তী বংশধরগণ আবুল আব্বাসের বংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও খলিফা খেতাব গ্রহণ করেন। উমাইয়াদের পতন ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। আব্বাসীয়রা ছিল উমাইয়াদের মতো আরব। তবে তারা ক্ষমতায় এসেছিলেন পার্সীদের সহায়তায়। আব্বাসীয় রাজবংশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পার্সী। আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকে পার্সী পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আন্তঃবিয়ের কল্যাণে তাদের অনেকের শরীরে ছিল পার্সী রক্ত। এভাবে পার্সী আদর্শ ও স্বার্থ পুনরুজ্জীবিত হয়। ইসলাম পার্সী রূপ ধারণ করে। তবে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল আরবদের হাতে।

বাগদাদ প্রতিষ্ঠা

প্রথমে আব্বাসীয় খলিফারা ইউফ্রেটিসের আনবারে বসবাস করতেন। সিরিয়া যাবার কোনো আগ্রহ তাদের ছিল না। সিরিয়ায় উমাইয়াদের প্রতি সমর্থন ছিল জোরালো। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আবুল আব্বাসের ভাই আল-মনসুর একটি নয়া রাজধানী খুঁজে বের করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বেশ কয়েকটি জায়গা দেখার পর তিনি বাগদাদে রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। বাগদাদ ছিল একটি প্রাচীন শহর। বেবিলনীয় আমলে বাগদাদ 'বাগ-দা-দু' নামে পরিচিত ছিল। এ নামের উৎস ছিল অজানা। পার্সী লেখকরা নয়া রাজধানীর একটি চমৎকার নাম দেন। এ নাম ছিল ফারসি শব্দ। যার অর্থ 'আল্লাহর বাগান'। বাগদাদকে রাজধানী হিসাবে বেছে নিতে খলিফা আল-মনসুরকে সহায়তা করেন তার বারমাকী মন্ত্রী খালিদ ইবনে বারমাক। খলিফা মনসুর রাজধানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তিনজন জ্যোতিষীকে তলব করেন। যে তিনজন জ্যোতিষীকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তলব করা হয়েছিল তারা হলেন আল-নওবখত, মাশাল্লা ইবনে আসারি ও ইব্রাহিম আল-ফাজারি। আল-নওবখত ছিলেন পার্সী এবং মাশাল্লা ছিলেন মিসরীয়। আল-নওবখত বাগদাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ৭৬২ সালের ২৩ জুলাইকে শুভ দিন হিসাবে নির্ধারণ করেন। আল-নওবখত প্রথম জীবনে ছিলেন জরোস্ত্রীয়। পরে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আল-মনসুরের প্রিয়পাত্র আল-নওবখত জ্যোতিষ বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সারণী সংকলন করেন। তবে তার কোনো গ্রন্থ স্থায়ী হয়নি। তার পুত্র আবু

www.pathagar.com

সহল আল-ফজল আল-নওবখত ছিলেন খলিফা হারুনুর রশীদের গ্রন্থাগারিক। তিনি ফারসি থেকে কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। দ্বিতীয় জ্যোতিষী মাশাল্লা ছিলেন মার্ভের একজন ইহুদী। তার মূল নাম ছিল মিশা। তার কয়েকটি হিব্রু ও ল্যাটিন অনুবাদ টিকে আছে। ইব্রাহিম আল-ফাজারি ছিলেন আরব। তিনি ছিলেন ফাজারি গোত্রের সন্তান।

৩ বছর পর নয়া রাজধানীতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার মতো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। সেখানে বসবাস করার জন্য কুফা ও বসরার মতো শহরগুলো থেকে লোকজন ছুটে আসে। নয়া শহরের একটি উপকণ্ঠের নাম ছিল কারখ। এ গ্রামটিতে আগে থেকেই পার্সীদের বসতি থাকায় তাদের কাছে তা হস্তান্তর করা হয়। খলিফা আল-মনসুর তার রাজধানীকে এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন যাতে ইসলামের ঔজ্জ্বল্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে তিনি গুণী পণ্ডিতদের এ শহরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এসব পণ্ডিতের সমন্বয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। পরবর্তীতে তাদেরকে রাজদরবারে উঁচু পদমর্যাদা দেয়া হয়। তাদের সঙ্গে আরব দেশের গোত্র প্রধান পুরনো অভিজাতদের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

উমাইয়া আমলে আরব গোত্র প্রধানদের প্রাধান্য ছিল। কুফা ও বসরার বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একটি একাডেমিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের আলোকছটায় বংশানুক্রমিক অভিজাতরা ম্লান হয়ে পড়েন। বংশানুক্রমিক অভিজাতরা দামেস্কের রাজদরবারের জন্য হুমকির একটি উৎস হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। আব্বাসীয় বংশের প্রতি তারা ছিলেন অসন্তুষ্ট। আব্বাসীয় বংশকে তারা অর্ধ পার্সী হিসাবে আখ্যায়িত করতেন।

বুখতায়িশু পরিবারের প্রভাব

আরবদের কাছে গ্রীক জ্ঞান হস্তান্তরে যে ক'টি প্রভাবশালী পরিবার অসামান্য অবদান রেখেছিল বুখতায়িশু পরিবার ছিল তাদের অন্যতম। বুখতায়িশু পরিবারের মধ্যে জুন্দি-শাহপুরের জিরজিস ইবনে বুখতায়িশুর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। তিনি খলিফা আল-মনসুরের দরবারে অবস্থান করছিলেন। ৭৬৫ সালে আল-মনসুর গ্যাস্ট্রিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য জুন্দি-শাহপুরের প্রধান নেস্টোরীয় চিকিৎসক জিরজিস ইবনে বুখতায়িশুকে ডেকে পাঠানো হয়। বাগদাদের রাজদরবার এবং বুখতায়িশু পরিবারের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম যোগাযোগ। পরবর্তীকালে বুখতায়িশু পরিবার আরবদের সাংস্কৃতিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় বুখতায়িশু খলিফা আল-হাদির দরবারের একজন চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বেগমের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের বিরোধিতায় তাকে জুন্দি-শাহপুরে ফিরে যেতে হয়। তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন এবং খলিফা হারুনুর রশীদ ও তার মন্ত্রী জাফর ইবনে বারমাক উভয়ের অধীনে কাজ করেন। ৮০১ সালে মৃত্যুর আগে তিনি তার পুত্র দ্বিতীয় জিবরাইলকে খলিফার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দ্বিতীয় জিবরাইল

www.pathagar.com

রাজদরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ৮০৮ সালে খলিফা হারুনুর রশীদের ইন্তেকালের পর তিনি তার পুত্র আল-আমিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে নিয়োজিত হন। আল-মামুন খলিফা হয়ে তাকে বন্দি করেন। ৮১৭ সালে উজির হাসান ইবনে সহলের চিকিৎসা করার জন্য তাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি শান্তিতে বসবাস করেন।

দ্বিতীয় জিবরাইল ছিলেন গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরাট ভক্ত। তবে তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করেননি। দ্বিতীয় জিবরাইল সিরীয় ভাষায় 'কুন্নাশ' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটিতে তিনি গালেন, হিপোক্রেটস এবং এজিনার পলের বইয়ের বহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। এ পুস্তিকাটি দীর্ঘদিন সিরীয়ভাষী চিকিৎসকগণ ব্যবহার করেন। এ বইটির মধ্য দিয়ে সিরীয়ভাষীরা গ্রীক চিকিৎসা জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। বইটি হারিয়ে গেছে। তবে 'বার বাহুল' নামে পরিচিত দশম শতাব্দীর একটি সিরীয় অভিধানে বইটির বহু তথ্য গ্রহণ করা হয়। মূলত দ্বিতীয় জিবরাইলের পরামর্শে খলিফা হারুনুর রশীদ প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে রোমান সাম্রাজ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন। দ্বিতীয় জিবরাইল এবং তার সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকগণ শুধু আরবী অনুবাদ নয়, উন্নতমানের সিরীয় সংস্করণেও উৎসাহ যোগান। তাদের উৎসাহে সিরীয় ভাষায় নতুন নতুন এবং উন্নতমানের অনুবাদ বের হতে থাকে। একই সময়ে সিরীয় অনুবাদগুলো আরবীতে অনুবাদের কাজও শুরু হয়। জুন্দি-শাহপুর একাডেমির অস্তিত্ব নাগাদ সিরীয় ভাষায় অনুবাদ অব্যাহত ছিল। গ্রীক সূত্র থেকে পুনরুজ্জীবিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে আরবদের পরিচিত করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইতিমধ্যে সিরীয়ভাষী খ্রিস্টানদের মধ্যে গ্রীক জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।

বারমাকী পরিবার

আব্বাসীয়রা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে খিলাফত দখল করে। আব্বাসীয় বিদ্রোহের উৎস ছিল খোরাসান। আব্বাসীয়রা এ প্রদেশ থেকে মূল সমর্থন পেয়েছিল। পূর্ব পারস্যের যেসব পরিবার আব্বাসীয় বিপ্লবে সহায়তা করেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ছিল বারমাকী পরিবার। এ পরিবার মূলত ছিল বলখ বা ব্যাকট্রিয়ার অধিবাসী। পরে তারা মার্ভে বসতি স্থাপন করে। মার্ভের বারমাকী পরিবার আব্বাসীয়দের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। বারমাকী মন্ত্রীরা আব্বাসীয় খিলাফতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন। মন্ত্রী জাফর ইবনে বারমাক বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হওয়ায় তার উপাধি ছিল 'বারমাক'। ৭০৫ সালে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম অভিযানকালে তিনি স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ বন্দি হন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। মার্ভের অধিবাসী হিসাবে তিনি ছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত দুর্বল। গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে আরব ও পার্সীদের পরিচিত করে তুলতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

জিবরাইল তাকে অমূল্য সহযোগিতা প্রদান করেন। মন্ত্রী জাফরের পুত্র খালিদ ইবনে বারমাক খলিফা আস-সাফফার আমলে ছিলেন অর্থমন্ত্রী। আল-মনসুর তাকে মেসোপটেমিয়ার গভর্নর হিসাবে নিযুক্তি দেন। খালিদের পুত্র ইয়াহিয়া আর্মেনিয়ার গভর্নর পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন এবং আল-মাহদি তাকে তার ছেলের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন। খলিফা মাহদির এই ছেলে হারুনুর রশীদ নাম গ্রহণ করেন এবং ৭৮৬ সালে খলিফা হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। মার্ভে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বারমাকী মন্ত্রী ইয়াহিয়ার প্রভাবে তিনি সারাজীবন পার্সীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি খলিফা হারুনুর রশীদের আগ্রহ ছিল তার পূর্বসূরিদের চেয়ে বেশি। তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামে হেলেনীয় বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন শুরু হয়। তার রাজত্বকাল ছিল স্বর্ণযুগের অংশ। কিন্তু তার খিলাফতে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গনের সূচনা ঘটেছিল। ৮০০ সালে তিনি লিবিয়ার কাইরিয়ানের গভর্নরের বাস্তব স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। এ প্রক্রিয়া তার সাম্রাজ্যকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। তিনি অথবা অন্য কোনো আব্বাসীয় খলিফা আন্দালুসে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাননি। স্পেনের আল-আন্দালুস ছিল উমাইয়াদের অধীনস্থ একটি প্রদেশ।

খলিফা হারুনুর রশীদ গভর্নর ইয়াহিয়াকে গোটা সাম্রাজ্যের উজির হিসাবে নিয়োগ দেন এবং তার হাতে অসীম ক্ষমতা অর্পণ করেন। এ পদে ইয়াহিয়া বিরল যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং তার সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। বারমাকী মন্ত্রী ইয়াহিয়া ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবনের বলিষ্ঠ সমর্থক। মার্ভে অবস্থানকালে তিনি গ্রীক বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছিলেন। জুন্দি-শাহপুরের নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতো। উজির ইয়াহিয়ার ছিল চার পুত্র। প্রথম পুত্র ফজল খোরাসানের গভর্নর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র জাফর উজির হিসাবে ইয়াহিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র মুসা ও মোহাম্মদ খলিফা হারুনুর রশীদের আমলে বিভিন্ন প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

বারমাকী মন্ত্রীদের প্রভাবে খলিফা হারুন বিজ্ঞানীদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন দিতেন। এসব বিজ্ঞানী গ্রীক বৈজ্ঞানিক কর্মগুলো অধ্যয়ন এবং অনুবাদ করেন। তবে বিপুল সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হলেও ৮০৩ সালে কয়েকটি কারণে বারমাকী পরিবারের পতন ঘটে। ৮০৬ সালে ইয়াহিয়া কারাগারে এবং জাফর ৮০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তার অন্য পুত্ররা মুক্ত ছিলেন। ৮০৮ সালে খলিফা আল-মামুন সিংহাসনে আরোহন করে বারমাকী পরিবারের সকল সদস্যকে মুক্তি দেন এবং তাদের সম্পদ ও সম্মান ফিরিয়ে দেন।

আরবীতে অনুবাদ

খলিফা হারুনুর রশীদের আমলে বাগদাদ জ্ঞান বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। উদার নীতি গ্রহণ করায় বাগদাদে গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি এসে জমা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু পণ্ডিত এসব পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা চালান এবং অনুবাদ

www.pathagar.com

করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর পাণ্ডুলিপি অনূদিত হয় এবং অনুবাদ কর্মগুলোর প্রতি জুন্দি-শাহপুরের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং অচিরে আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথমে আরবী সংস্করণ প্রকাশ করা হয় সিরীয় ভাষা থেকে। পরে সরাসরি মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে। ভাষ্য ও সারসংক্ষেপসহ সিরীয় ভাষায় এরিস্টোটলের কর্মগুলো অনুবাদ করা হয়। কতগুলো সংকলন করা হয় সিরীয় ভাষায় এবং অন্যগুলো গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়। প্রথমে এরিস্টোটলের কর্মগুলো দার্শনিক নিবন্ধে সীমাবদ্ধ ছিল। খলিফা হারুনুর রশীদের মৃত্যুর পর আরব পণ্ডিতগণ এরিস্টোটলের দর্শন নিয়ে একাগ্রচিত্তে গবেষণা চালান। সিরীয় সংস্করণ এবং ভাষ্যের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত এরিস্টোটলের শিক্ষার সঙ্গে নব্য প্লেটোবাদের সংমিশ্রণ ঘটে। পরবর্তীকালে এ দর্শন আরব দর্শনকে সমৃদ্ধ করে।

বাগদাদ শহরের প্রতিষ্ঠা এবং খলিফা হারুনুর রশীদের খিলাফত গ্রহণের মধ্যবর্তী ২৪ বছরে গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ওপর জোর দেয়া হয়। প্রথমেই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করা হয়। প্রাথমিক দিনগুলোতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ভারতীয় পুস্তিকা 'সিন্দহিন্দ' এবং আলেক্সান্দ্রিয়াভিত্তিক গণিত কর্মগুলো আরবীতে অনুবাদ করা হয়। সম্ভবত ফারসি সংস্করণের ভিত্তিতে 'সিন্দহিন্দ' আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদক ছিলেন ইব্রাহিম আল-ফাজারি এবং ইয়াকুব ইবনে তারিক। ঐতিহাসিক মাসুদি অনুবাদক আল-ফাজারিকে খলিফা আল-মনসুরের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল-ফাজারি হলেন প্রথম আরব যিনি এস্ট্রোল্যাব তৈরি করেছিলেন। ইব্রাহিম আল-ফাজারির পুত্র মোহাম্মদকেও কখনো কখনো অনুবাদক হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

ইয়াকুব ইবনে তারিক ছিলেন একজন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। তিনি ভূগোলকের ওপর একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি আর্কিমিডিসকে অনুসরণ করে 'কারাজা' বা '২২৫-এর বৃত্তচাপ' শিরোনামে আরেকটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ইয়াকুব ইবনে তারিক বৃত্তকে ৯৬ ডিগ্রিতে বিভক্ত করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সারণী তৈরি করেন। 'সিন্দহিন্দ' এত দ্রুত অনুবাদ করা হয়েছিল যে, আল-মনসুর তা দেখার সুযোগ পাননি। তবে বীজগণিতের জনক মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির কাছে এ পুস্তিকাটি ছিল অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি সিন্দহিন্দের ভিত্তিতে তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সারণী তৈরি করেছিলেন। অন্তত ৫০ বছর পর তার এ সারণী প্রকাশিত হয়। এখন তার অস্তিত্ব নেই। মাসলামা আল-মাজরিতি তার গ্রন্থে খাওয়ারিজমির সারণী অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এসব সারণী উল্লেখ করতেন।

কয়েকটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক গ্রন্থ ভারত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। গ্রীক সূত্রের ভিত্তিতে ভারতে এসব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। ফারসি অনুবাদের মধ্য দিয়ে গ্রন্থগুলো আরবদের কাছে পৌঁছে। তবে মূল ফারসি অনূদিত গ্রন্থগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আরবদের কাছে গ্রীক চিকিৎসা বিষয়ক

www.pathagar.com

জ্ঞান সঞ্চারিত হয়েছে সিরীয় অনুবাদের মাধ্যমে। সিরীয় ভাষায় গ্রীক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলো সরাসরি অনুবাদ করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক গ্রন্থগুলোও একইভাবে প্রথমে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন হুনায়ন ইবনে ইসহাক অথবা তার ছাত্ররা। ধীরে ধীরে সিরীয় সংস্করণগুলো আরবী অনুবাদে রূপান্তরিত হয়। আরবরা সিরীয় সূত্র থেকে এরিস্টোটলের জ্ঞানের সন্ধান পায়। সিরীয় ভাষায় এরিস্টোটলের যুক্তিশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো কেবলমাত্র অনুবাদ করা হয়। আনুমানিক ৮৩৫ সালের দিকে আবদ আল-মাসিহ ইবনে আবদুল্লাহ ওয়ামা আল-হিমসি নামে একজন খ্রিস্টান 'থিওলজি অব এরিস্টোটল' অনুবাদ করেন। একই সময়ে আবু রায়না আল-বাতরিক 'টেট্রাবিবলোস অব টলেমি' নামে এরিস্টোটলের আরেকটি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। ৮১৫ সালে ওমর ইবনে আল-ফারুখান এ গ্রন্থটির ওপর একটি ভাষ্য এবং মোহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-বাত্তানি একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।

আরবদের কাছে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান পৌঁছেছিল ভারতীয় সূত্রের মাধ্যমে, গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে নয়। তবে ভারতীয় গ্রন্থগুলো রচনা করা হয়েছিল গ্রীক জ্ঞানের আলোকে। প্রথমে গ্রীক ভাষা থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পরে নির্ভুল কপি সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে সিরীয় ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করা হয়। আল-খাওয়ারিজমির মতো প্রাথমিক আরব গণিতজ্ঞদের জ্ঞান চর্চায় গ্রীক প্রভাব ছিল না। ভারতীয় জ্ঞানে তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখানে জ্ঞান স্থানান্তরে একটি বিরাট ফাঁক লক্ষ্য করা যায়।

টলেমির আলমাগেস্ট ও ইউক্লিডের এলিমেন্টসের অনুবাদ

ভারতীয় 'সিন্দহিন্দ' ব্যবহার এবং উপলব্ধি করার জন্য ক্লডিয়াস টলেমির 'আলমাগেস্ট' এবং ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' অনুবাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দু'টি গ্রন্থ সরাসরি গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, 'আলমাগেস্ট' ও 'এলিমেন্টস' অনুবাদ করা হয়েছিল সিরীয় সংস্করণ থেকে। কোনো সিরীয় সংস্করণের অস্তিত্ব না থাকায় এ দাবি নাকচ করে দেয়া সম্ভব হয়নি। গাণিতিক কাজের জন্য সিরীয় ভাষা তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলোর সঙ্গে তুলনা করে আরবী সংস্করণগুলো বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছিল। তাতে মনে হয়, খলিফা হারুনুর রশীদের আমল শুরু হওয়ার আগে অথবা তার আমলের শুরুতে এ দু'টি গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। বারমাকী মন্ত্রী জাফরের পরামর্শে 'আলমাগেস্ট' এবং 'এলিমেন্টস' আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। ৮০৩ সালে বারমাকীদের পতন ঘটার পর এ দু'টি গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদের কাজ শেষ হয়। এক ভাষ্যে বলা হয়েছে, খলিফা আল-মনসুরের শাসনামলের প্রথমদিকে ব্রহ্মগুপ্তের 'সূর্যসিদ্ধান্ত'র সংশোধিত হিন্দু সংস্করণ 'সিন্দহিন্দ' আরবীতে অনুবাদ করা হয়। আরবরা মমার্থ উপলব্ধি করতে না পারায় 'সিন্দহিন্দ'-এর আরবী অনুবাদ কোনো কাজে আসেনি।

www.pathagar.com

বারমাকী মন্ত্রী জাফর ইবনে বারমাক বুঝতে পারেন যে, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা না থাকায় আরবরা 'সিন্দহিন্দ' আত্মস্থ করতে পারছে না। তার পরামর্শে খলিফা হারুনুর রশীদ ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' এবং টলেমির 'মিগেল' (Megale) আরবীতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।

আরবরা 'মিগেল' শব্দটিকে 'মেগিস্টি' (Megiste)-তে রূপান্তরিত করে। মেগিস্টির আগে আরবী 'আল' শব্দটি বসিয়ে দেয়ায় টলেমির মিগেলের নাম হয়ে যায় 'আলমাগেস্টি' (Al-Magisti)। একসময় আরবীতে বইটির নাম হয়ে যায় 'কিতাব আলমাগেস্ট'। ৮৯১ সালের এক লেখায় ইয়াকুবী এ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আল-মাগেস্টি'র মানে হলো 'বিশাল বই'। মধ্যযুগে ল্যাটিন সংস্করণে বইটির নামকরণ করা হয় 'মাগাসিস্টি'। হারুনুর রশীদের মৃত্যু নাগাদ ইউক্লিড ও টলেমির গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত না হওয়ায় একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বারমাকী মন্ত্রী জাফর ইবনে বারমাকের পরামর্শে বই দু'টি অনুবাদ করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, আলমাগেস্টের অনুবাদক হলেন আল-হাজ্জাজ ইবনে তুসুফ ইবনে মাতার আল-হাসিব। আল-হাজ্জাজ আনুমানিক ৮২৭ সালে বইটির অনুবাদ শেষ করেন। এ সময়ের অনেক আগে বারমাকীদের পতন এবং খলিফা হারুনুর রশীদের মৃত্যু ঘটেছিল। একই অনুবাদক একটি অধ্যায় বাদে ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' আরবীতে অনুবাদ করেন। আনুমানিক ৯১০ সালে সাঈদ আল-দামেস্কি ভাষ্যসহ বাকি অধ্যায় অনুবাদ করেন। আল-নাজিরীও টলেমির আলমাগেস্টের একটি ভাষ্য লিখেছিলেন।

আনুমানিক ৮৩৩ সালে আল-আব্বাস আল-জাওয়াহিরি প্রথম ইউক্লিডের বইয়ের ওপর ভাষ্য লিখেছিলেন। মার্ভের অধিবাসী সহল ইবনে রব্বান আল-তাবারি আলমাগেস্টের আরেকটি অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদী। ইবনে রব্বান নামের অর্থ 'রাবাই' বা ইহুদী যাজকের ছেলে। গ্রীক বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল মার্ভে বহু ইহুদী বসবাস করতো। এসব ইহুদী তাদের ধর্মের রীতি অনুযায়ী দলবদ্ধভাবে বসবাস করতো। মার্ভ ও বলখের মধ্যবর্তী শহরের নাম ছিল মায়মনা। ঐ সময় মায়মনাকে বলা হতো 'ইয়াহুদিয়া' বা ইহুদীদের শহর। ইহুদীদের সঙ্গে বসবাসে অনাগ্রহীদের অনুরোধে এ শহরের নামকরণ করা হয় 'মায়মনা' বা শুভাগমন। খলিফা হারুনুর রশীদের আমলে সহল ইবনে রব্বান বাগদাদ গিয়ে আলমাগেস্টের অনুবাদ করেছিলেন। সহল ছিলেন মার্ভের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে 'বারবুন' বলে সম্বোধন করা হতো। আরেকটি ভাষ্যে বলা হয়েছে, আলমাগেস্টের অনুবাদ করেছিলেন সহল ইবনে রব্বান এবং সংশোধন করেছিলেন আল-হাজ্জাজ। পরবর্তীতে আরবীতে অনূদিত আলমাগেস্টের প্রাথমিক সংস্করণ হুনায়ন ইবনে ইসহাক, আরো পরে ছাবেত ইবনে কোরা এবং মোহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-বাত্তানি আরো সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। আল-হাজ্জাজের ইউক্লিডের অনুবাদ কুস্তা ইবনে লুকা সংশোধন করেছিলেন।

www.pathagar.com

পার্সীদের প্রভাব

আরবদের কাছে গ্রীক জ্ঞান হস্তান্তরে পার্সীদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্ঞানের একটি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল পূর্বদিকে খোরাসানের মার্ভ থেকে এবং আরেকটি পারস্যের জুন্দি-শাহপুর থেকে। খোরাসানের মার্ভ বেশ দূরে হলেও বাগদাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। বহু পার্সী বিশেষ করে খোরাসানীরা বিপ্লবের সুফল ভোগ করার জন্য পশ্চিমে এসে ভিড় জমায়। তারা তাদের অংশীদারিত্ব দাবি করে। আব্বাসীয় দরবারে পার্সীদের প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে, আরবরা প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বেধে যায়। উদ্ধত আরবদের জবাব দানে পার্সীরাও পাল্টা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। আরবদেরকে তারা মরুভূমির অর্ধ বর্বর বেদুইন হিসাবে ঘৃণা করতে থাকে। এ সময়ের বিখ্যাত পার্সী ব্যক্তিত্ব হলেন আবু মোহাম্মদ ইবনে আল-মুকাফা। মুকাফা প্রথম দুই আব্বাসীয় খলিফার চাচা ইসা ইবনে লু'র সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি 'কালিলগ ওয়া-দিমনাগ' নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ফারসি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। 'কালিলগ ওয়া-দিমনাগ' ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ। খ্রিস্টান চিকিৎসক বুধ ভারত থেকে গ্রন্থটি নিয়ে এসেছিলেন। ওষুধ সংগ্রহে তাকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। ভারত থেকে তিনি ওষুধের সঙ্গে এ গ্রন্থ এবং দাবা খেলার ধারণা নিয়ে আসেন। ভারতীয় বই অবলম্বনে ইবনে আল-মুকাফা এ বইটি আরবীতে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ কর্মটিকে একটি উঁচুমানের আরবী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ বইটি এখনো স্কুলে অধ্যয়ন করা হয়। আল-মুকাফা ফারসি 'খোদাই-নামা'-ও অনুবাদ করেন। পারস্যের রাজ রাজড়াদের জীবনী নিয়ে বইটি লিখা হয়েছিল। ইবনে মুকাফা তার আরবী অনুবাদের নাম দেন 'সায়ার মুলুক আল-আযম'। এ বইটির অস্তিত্ব নেই। তবে বইটি মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামার ভিত্তি রচনা করে এবং ইবনে কুতাইবি তার 'ইয়ুন আল-আখবার'-এ এ গ্রন্থের বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আরবীতে তিনি 'আদ দুরা আল-ইয়াতিমা ফিতাতা মুলক' শিরোনামে অন্য একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। এছাড়া তিনি সরকারি কর্মচারিদের আদব কায়দা সম্পর্কে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন। বসরায় বসবাস করায় এবং শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকদের আওতায় থাকায় তিনি দামেস্কের গভর্নর আবু সুফিয়ান ইবনে মুয়াবিয়ার প্রতি অসংযত আচরণ করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি তাকে 'ইবনে আল-মুঘিয়ালিনা' (অসৎ মায়ের সন্তান) বলে ঠাট্টা করতেন। মুয়াবিয়া সবকিছু নীরবে সহ্য করতেন।

খিলাফত নিয়ে হযরত আলীর (রা.) সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে হযরত মুয়াবিয়া তার চাচা আবদুল্লাহকে ক্ষমা করে দিতে সম্মত হন। ক্ষমা ঘোষণার আনুষ্ঠানিক পত্র লিখার নির্দেশ দেয়া হয় ইবনে আল-মুকাফাকে। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, *'কোনো সময় বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক কখনো তার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে আলীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কোনো কাজে লিপ্ত হলে তার সব স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়াগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে, তার দাসদের মুক্ত করে দেয়া হবে এবং মুসলমানরা তার ওপর থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করবে।'*

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ এ খসড়া পাঠ করে জানতে চান কে এই খসড়া মুসাবিদা করেছে। তিনি যখন জানতে পারেন যে, ইবনে আল-মুকাফা চিঠির এ খসড়া তৈরি করেছেন তখন তিনি কিছুই বলেননি। তবে তিনি মুয়াবিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে বলেন যে, তার সচিবের প্রতি যা সঠিক বলে মনে করেন তিনি যেন তাই করেন। হযরত মুয়াবিয়া আল-মুকাফাকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া গেছে। একটি বর্ণনায় বলা হয়, হযরত মুয়াবিয়া তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

পারস্যে সাসানীয় আমলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যেসব রেকর্ড সংরক্ষণ করা হতো আরবদের আমলে সেসব রেকর্ড সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা হয়। তবে রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ করা হতো আরবীতে নয়, ফারসি ভাষায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলোর প্রাথমিক অনুবাদকরা ছিলেন মার্ভের লোক। দেখা যাচ্ছে যে, খোরাসানের রাজধানী মার্ভের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক গ্রন্থগুলো বাগদাদে এসে পৌঁছে। বারমাকী মন্ত্রী এবং মার্ভের অধিবাসী সবাই বাহন হিসাবে কাজ করেছেন।

জুন্দি-শাহপুর থেকে বাগদাদে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান স্থানান্তর

জুন্দি-শাহপুরের মধ্য দিয়ে বাগদাদে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো প্রবেশ করে। পারস্যের সাসানীয় রাজা প্রথম শাহপুর ২৬০ সালে আলেকজান্দ্রিয়া ও এন্টিয়কের আদলে বর্তমান ইরানের খুজিস্তানে এ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। একাডেমিতে একটি মানমন্দিরও ছিল। আহমদ আল-নাহাবন্দির আমলে জুন্দি-শাহপুর মানমন্দিরে গাণিতিক কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতো এবং এসব যন্ত্রপাতি ছিল সিরীয়। তার আমল শুরু হওয়ার আগে জুন্দি-শাহপুর মানমন্দিরের কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ভেলেরীয় যুদ্ধে বন্দি সৈন্যদের আটক রাখার জন্য জুন্দি-শাহপুরকে কারাগার হিসাবে গড়ে তোলা হয়। ধীরে ধীরে এ কারাগার একটি শহরে পরিণত হয়। এ শহরের বাসিন্দারা গ্রীক, সিরীয় ও ফারসি ভাষায় কথা বলতে পারতো। ৬৩০ সালে জুন্দি-শাহপুর শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। খলিফা হারুনুর রশীদের মৃত্যুর কয়েক বছর পর আল-নাহাবন্দি সেখানে পর্যবেক্ষণ চালান। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদের পরেই ছিল এ একাডেমির অবস্থান। জুন্দি-শাহপুর একাডেমিতে সিরীয় ভাষায় অনূদিত গ্রীক গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও যুক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়া ভারতীয় ও প্রাচীন পারসিক জ্ঞান বিজ্ঞানও শিক্ষা দান করা হতো। নেস্টোরীয় উপকথা বিশ্বাস করায় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট জিনো এডেসা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করলে সেখানকার নেস্টোরীয় পণ্ডিতগণ পারস্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আশ্রয়প্রার্থী নেস্টোরীয় পণ্ডিতদের জুন্দি-শাহপুরে নিয়োগ দেয়া হয়। এসব পণ্ডিত যোগদান করায় জন্দি-শাহপুরে গ্রীক জ্ঞানের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

জুন্দি-শাহপুর ছিল বাগদাদের কাছাকাছি এবং আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে সেখান থেকে বিখ্যাত চিকিৎসকদের রাজদরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় এসব চিকিৎসক রাজদরবারের চিকিৎসক হিসাবে বাগদাদে অবস্থান করার সুযোগ পান। বাগদাদে অবস্থান করায় এসব চিকিৎসক প্রতিপত্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। তাদের সফলতা অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আরব চিকিৎসকগণ মার্ভের চিকিৎসকগণের সঙ্গে মিলে একটি বিরাট গ্রুপ গঠন করেন। তাদের পেছনে ছিল বাগদাদের রাজদরবারের আর্শীবাদ। এসব পণ্ডিতের সম্মিলিত গ্রুপ একটি একডেমির রূপ গ্রহণ করে। জুন্দি-শাহপুরের পণ্ডিতগণ সিরীয় ভাষায় গ্রীক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় অভ্যস্ত ছিলেন। কালক্রমে পারস্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিরীয় ভাষায় শিক্ষা দান শুরু হয়।

আরবদের সঙ্গে নেস্টোরীয় খ্রিস্টানদের যোগাযোগ

আরবদের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান স্থানান্তরে নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা একটি বাহন হিসাবে কাজ করেছে। তবে এ পথ ছিল বেশ দীর্ঘ। নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা যীশু বা হযরত ইসার (আ.) স্বর্গীয় ও মানবিক উভয় গুণে বিশ্বাস করতো। তবে তারা যীশুর মা মেরি বা বিবি মরিয়মের 'থিওটোকেস' উপাধির বিরোধিতা করতো। থিওটোকেস শব্দটির মানে হলো 'ঈশ্বরের মাতা'। অন্যদিকে, মনোফিজিটরা যীশুর শুধুমাত্র স্বর্গীয় গুণে বিশ্বাস করতো। একটি মাত্র গুণে বিশ্বাস করায় তাদেরকে বলা হতো 'মনোফিজিট'। তবে খ্রিস্টানদের উভয় গ্রপই আরব মুসলমানদের কাছে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে নেস্টোরীয়রা ছিল এক ধাপ অগ্রসর। মুসলিম শাসনে নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা ছিল তুলনামূলকভাবে সুখী। অন্যদিকে খ্রিস্টান শাসকদের অধীনে তারা ছিল উৎপীড়িত। ঐতিহাসিক আহসান মাসুদ 'সায়েন্স এন্ড ইসলাম' শিরোনামে গ্রন্থে লিখেছেন, '*Christians in the Islamic empire on the whole found that they were treated better by the Muslims than they had been by their former Byzantine rulers. Byzantium adhered to a form of christianity which insisted on a single interpretation of the nature of Christ and they persecuted dissidents such as the Nestorians, who gradually escaped from Syria through Persia, eventually reaching China.*'

অর্থাৎ '*মোটের ওপর ইসলামী সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খ্রিস্টানরা দেখতে পায় যে, মুসলিম শাসকগণের আচরণ তাদের সাবেক বাইজান্টাইনীয় শাসকগণের চেয়ে উত্তম। বাইজান্টিয়াম (কন্সটান্টিনোপল) খ্রিস্টধর্মের এমন একটি মতবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল যেখানে খ্রিস্টের প্রকৃতির একটি একক ব্যাখ্যার ওপর জোর দেয়া হতো। বাইজান্টিয়াম নেস্টোরীয়দের মতো ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর উৎপীড়ন চালায়। উৎপীড়িত নেস্টোরীয়রা ধীরে ধীরে পারস্যের মধ্য দিয়ে সিরিয়া থেকে পালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত চীনে গিয়ে পৌছায়।*'

www.pathagar.com

সিরিয়ার এডেসার স্কুল থেকে যেসব গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান পারস্যের নিসিবিসের স্কুলে স্থানান্তরিত হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল এরিস্টোটলের 'দ্য ক্যাটাগরিস', 'দ্য হারমিউনিটিকা', 'দ্য প্রায়র এনালিটিক্স', 'দ্য পোস্টারিয়র এনালিটিক্স', 'দ্য টপিক্স', 'দ্য সফিসটিকা', 'দ্য রিটরিক' ও 'দ্য পলিটিক্স' এবং পরফাইরির 'আইসাগোগ'। নেস্টোরীয় অনুবাদক হিবহা সিরীয় ভাষী খ্রিস্টানদের মধ্যে এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যার অধ্যয়ন চালু করেন। তিনি এরিস্টোটলের 'দ্য প্রায়র এনালিটিক্স' ও 'হারমিউনিটিকা' এবং পরফাইরির 'আইসাগোগ' অনুবাদ করেন।

পরফাইরি ছিলেন একজন সিরীয়। তার মূল নাম ছিল মালছাস। 'মালছাস' শব্দের অর্থ 'রাজা' বা 'রাজকীয়'। বাসিলানের শিক্ষকের পরামর্শে পরফাইরি তার নাম পরিবর্তন করেন। সিসিলিতে ভ্রমণ শেষে তিনি রোমে ফিরে আসেন এবং প্লটোনিয়াসের দর্শনের ওপর ভাষণ দিতেন। শিশুদের শিক্ষাদানে তিনি তার বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়ে করেন। তার 'আইসাগোগ' ও এরিস্টোলের 'ক্যাটাগরিস' প্রাচ্য ও পাশ্চ্যত্যে বহু বছর ব্যবহার করা হয়। সিরিয়ার ল্যাম্বলিকাস ছিলেন পরফাইরির ছাত্র। নব্য প্লেটোবাদীদের নেতা হিসাবে ল্যাম্বলিকাস পরফাইরির স্থলাভিষিক্ত হন। কন্সটান্টিনোপলের বাসিন্দা প্রোকাস আলেক্সান্দ্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করেন। এপোলনিয়াস ছিলেন প্রোকাশের ছাত্র। এপোলনিয়াস পরফাইরির আইসাগোগের ওপর একটি ভাষ্য সংকলন করেন। নেস্টোরীয়রা তার ভাষ্য গ্রহণ করে। জন ফিলোপিনাস ছিলেন এমোনিয়াসের ছাত্র। তিনিও এরিস্টোটলের একটি ভাষ্য লিখেছিলেন। মনোফিজিটরা তার ভাষ্য লুফে নেয়। প্রোকাসের ভাষ্যসহ দ্রুত অনূদিত বহুগুলো প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে নেস্টোরীয়রা গ্রীক ভাষ্যকার এমোনিয়াসের ভাষ্য চালু করে। তবে মনোফিজিটদের পছন্দ ছিল জন ফিলোপিনাসের ভাষ্য। প্রাথমিকভাবে এডেসার নেস্টোরীয় বিশপ হিবহা থিওডোরের দার্শনিক শিক্ষা প্রচার ও ব্যাখ্যা করার জন্য এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা চালু করেন। এভাবে সকল নেস্টোরীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দর্শন অধ্যয়নে এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা একটি স্থায়ী আসন গেড়ে বসে।

এরিস্টোটলের দর্শনের সঙ্গে গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত আরবদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। নিবিবিসের. বিশপ বারসুমা ছন্দোবদ্ধ ধর্মোপদেশ, স্তোত্র ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির রীতিনীতি রচনা করেন। ক্যাথলিকোস আকাসিয়াসের কাছে লিখিত তার ৬টি চিঠি হলো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম। জে. শেবট তার সংরক্ষিত চিঠিগুলো অনুবাদ করেন। বিশপ বারসুমা সিরীয় কবি ও ধর্মতত্ত্ববিদ নারসাইকে নিসিবিস স্কুল দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। একজন বিশাল মাপের লেখক হলেও নারসাইয়ের কর্মের খুব সামান্য অংশ টিকে রয়েছে। ৫০০ থেকে ৫২০ সালের মধ্যে নারসাই পরলোকগমন করলে তার ভাগিনা আব্রাহাম তার স্থলাভিষিক্ত হন। আব্রাহামের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন নিসিবিসের জন এবং জোসেফ হুজায়া। ৫৭৫ সালে সিরীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ জোসেফ হুজায়া পরলোকগমন করেন। নিসিবিসের জন ছিলেন ধর্মগ্রন্থ এবং আরো বহু দার্শনিক কর্মের ভাষ্যকার।

www.pathagar.com

ক্যাথলিকদের শাসনামলে নিসিবিসে ইপ্সিত সংস্কার চালু করা হলে খ্রিস্টানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হ্রাস পায়। জুন্দি-শাহপুর ও সেলুসিয়ার নেস্টোরীয় একাডেমিগুলোতে এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা চালুর জন্য নিসিবিস স্কুল সরাসরি দায়ী না হওয়ায় মুসলিম বিজয়ের সময় এ স্কুল উন্নতি লাভ করে। আরবরা মূলত জুন্দি-শাহপুরের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। মনোফিজিটদের প্রতি বৈরি প্রচারণায় নেস্টোরীয়দের মধ্যে শুধু জ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটে তাই নয়, বরং আশপাশের যেসব দেশে বিধর্মী আরবদের ধর্মান্তরিত করার মধ্য দিয়ে মনোফিজিটদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিজয়ী হচ্ছিল সেখানেও নেস্টোরীয়দের সম্প্রসারণ ঘটে। এভাবে নেস্টোরীয়দের মিশনারী কার্যক্রম শুরু হয় এবং অচিরেই তাদের কার্যক্রম দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এমনকি মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে তা দূরপ্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করে।

কূফার দক্ষিণে প্রাচীন নগরী হিরা ছিল পারস্য সীমান্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরব শহর। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে হিরার রাজা নুমান খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাকে অনুসরণ করে বহু আরব খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। হিরার এসব আরব অভিজাত শাসকে পরিণত হয়। এ রাজ্যের অধিকাংশ লোক ছিল আরামিক সিরীয় এবং তারা ছিল খ্রিস্টান। খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত আরবরা নেস্টোরীয় মতবাদ গ্রহণ করে। তারা সিরীয়ভাষী যাজকদের ধর্মোপদেশ মেনে নেয় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে সিরীয় ভাষা ব্যবহার করে। তখন পর্যন্ত আরবীতে কোনো বই কিংবা ধর্মগ্রন্থের কোনো আরবী সংস্করণ ছিল না। আরবী ভাষায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার কোনো রীতিও ছিল না। এমন এক পরিস্থিতিতে হিরার বাসিন্দা হুনায়ন ইবনে ইসহাক জীবনের শেষপ্রান্তে আরবী ভাষা শিখেন। হিরার শিক্ষিত লোকদের সবাই ছিল সিরীয়ভাষী।

নেস্টোরীয় মিশন দক্ষিণে প্রসারিত হয় এবং মদিনার পূর্বদিকে ওয়াদি-ই-কুরাতে পৌঁছে যায়। ওয়াদি-ই-কুরা ছিল রোমানদের একটি চৌকি। তবে এখানে কোনো রোমান সৈন্য ছিল না। রোমান সৈন্যদের সহযোগী কোদা গোত্রের সৈন্যরা এ চৌকিতে নিয়োজিত ছিল। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদের (সা.) আমলে গোটা ওয়াদি-ই-কুরা জুড়ে ছিল মন্দির ও সন্ন্যাসিদের আশ্রমের ছড়াছড়ি। ওয়াদি-ই-কুরা নেস্টোরীয় খ্রিস্টানদের রাজধানী হওয়ায় এখান থেকে নেস্টোরীয় সন্ন্যাসীরা গোটা আরব দেশে সফর করতেন। তারা বড় বড় মেলায় গমন করতেন এবং আগ্রহীদের ধর্মোপদেশ দিতেন।

মোহাম্মদের (সা.) নবুয়তপ্রাপ্তি সম্পর্কে নেস্টোরীয় সন্ন্যাসির ভবিষ্যদ্বাণী

১২ বছর বয়সে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একটি আরব কাফেলার সঙ্গী হিসাবে সিরিয়ায় যান এবং বসরায় বহিরা নামে এক নেস্টোরীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বহিরা দেখতে পান যে, আরব থেকে আগত কাফেলার কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে মেঘ ছায়াদান করছে। এ দৃশ্য দেখে আরব কাফেলাকে আপ্যায়ন করার জন্য তিনি আমন্ত্রণ করেন। কিশোর মোহাম্মদ ছাড়া সবাই খাবারে অংশগ্রহণ করে। বহিরা তাকে খেতে অনুরোধ করেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.)

www.pathagar.com

খাবার খেতে শুরু করার সময় বহিরা কুরাইশদের দেবতা লাত ও ওজ্জাহর দোহাই দিয়ে তাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) জবাব দানে অস্বীকৃতি জানান। বহিরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন। হযরত মোহাম্মদের (সা.) জবাবগুলো বহিরার সঙ্গে একশো ভাগ মিলে যায়। বহিরা হযরত মোহাম্মদের (সা.) কপালে নবুয়তের মোহর অঙ্কিত দেখে নিশ্চিত হন যে, তিনি হলেন প্রতিশ্রুত শেষ নবী। তারপর তিনি আবু তালিবের কাছে ছেলেটির পরিচয় জানতে চান। জবাবে আবু তালিব তাকে জানান যে, ছেলেটি তার পুত্র। বহিরা দ্বিমত পোষণ করে বলেন, ছেলেটি তার পুত্র নয়। তার পিতা জীবিত নেই। আবু তালিব হ্যাঁসূচক জবাব দিয়ে বললেন, ছেলেটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় তার মা ছিল অন্তঃসত্ত্বা। বহিরা আবু তালিবের কথা সত্য বলে মনে নেন এবং ভাতিজাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন। তাকে জানিয়ে দেন যে, তার ভাতিজা নবী হতে যাচ্ছে। ইহুদীরা তাকে হত্যার চক্রান্ত করবে। তাই ইহুদীদের প্রতি তিনি যেন নজর রাখেন।

বহিরার সঙ্গে ইসলামের নবীর সাক্ষাতকে নেস্টোরীয়দের সঙ্গে তার প্রথম যোগাযোগ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাজরান ছিল আরব দেশে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। কিন্তু এ শহর ছিল মূলত মনোফিজিটপ্রধান। একটি খ্রিস্টান গীর্জা ছিল 'কাবা' হিসাবে পরিচিত। তবে এসব প্রাথমিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি আরব দেশে প্রবেশ করেনি। জুন্দি-শাহপুরের মধ্য দিয়ে নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা আরব ভূখণ্ডে গ্রীক দর্শন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। আরবরা জুন্দি-শাহপুরের কাছাকাছি নবনির্মিত রাজধানী শহর বাগদাদে তাদের রাজদরবার স্থানান্তর করলে গ্রীক বিজ্ঞান সরাসরি তদের কাছে পৌঁছে যাবার সুযোগ পায়।

উপসংহারে বলতে হয় যে, প্রথম শতাব্দীতে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের একটি কেন্দ্র এবং প্রাচ্য, হেলেনীয়, গ্রীক ও প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার একটি মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল নয়া প্লেটোবাদের জন্মভূমি। নেস্টোরীয় ও মনোফিজিট খ্রিস্টানদের কল্যাণে এখান থেকে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান এন্টিয়ক, এন্টিয়ক থেকে নিবিবিস এবং সবশেষে এডেসায় স্থানান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানদের ২০টি স্মরণীয় আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা বিজ্ঞানের আর্শীবাদ হিসাবে যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের আবিষ্কার হলো এক হাজার একটি। ২০০৬ সালের ৮ মার্চ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মানচেস্টারে মিউজিয়াম অব সায়েন্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে 'ওয়ান থাউস্যান্ড ওয়ান ইনভেশন্স: মুসলিম হেরিটেজ ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড' (1001 Inventions : Muslim Heritage in our world) শিরোনামে একটি প্রদর্শনীতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয়। এখানে সবগুলো আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র লন্ডনের দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় যে ক'টি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো। ২০০৬ সালের ১১ মার্চ পল ভ্যালি পরিবেশিত হাউ ইসলামিক ইনভেন্টার্স চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড (How Islamic Inventors changed the world) বা কিভাবে ইসলামী বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছেন শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখিত ২০টি আবিষ্কারের বর্ণনা দেয়া হলো।

কফি

আজকাল আমরা ঘরে ঘরে আধুনিক সভ্যতার অনুষঙ্গ হিসাবে কফি নামে পরিচিত যে উপাদেয় পানীয় পরিবেশন করতে দেখি তার আবিষ্কারক হলো মুসলমান। উত্তর-পূর্ব ইথিওপিয়ার কাফা অঞ্চলের নাম থেকে কফি শব্দটি এসেছে। এখানে ব্যাপক পরিমাণ কফি উৎপন্ন হতো। তবে তা কারো জানা ছিল না। তার উপকারিতাও কেউ বুঝতে পারেনি। খালিদ নামে একজন আরব কাফা অঞ্চলে ছাগল চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে, এক ধরনের বীজ ভক্ষণ করায় তার ছাগলগুলোকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। তিনি এ বীজ সিদ্ধ করে প্রথম কফি তৈরি করেন। ইথিওপিয়া থেকে ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে কফি চাষ সম্প্রসারিত হয়। এ কফি বীজ থেকে পানীয় তৈরি করা হতে থাকে। আরব অঞ্চলে উৎপাদিত কফিকে বলা হতো কফিয়া আরাবিয়া (Coffea Arabia)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবে সুফিদের মধ্যে কফি পানের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পানীয় পান করে সারারাত জেগে মুসলিম সুফিরা এবাদত বন্দেগী করতেন। ১৬৪৫ সালে আরব থেকে কফি প্রথমে গিয়ে পৌঁছায় ইতালির ভেনিসে। পাসকুয়া রোসি নামে একজন তুর্কি ১৬৫০ সালে ইংল্যান্ডে কফি

www.pathagar.com

নিয়ে যান। রোসি লন্ডনের ল্যাম্বার্ড স্ট্রীটে প্রথম কফি হাউজ খোলেন। আরবী 'কাওহা' (Qahwa) তুর্কি শব্দ কাহভে (Kahve) পরিণত হয়। পরে এ নাম থেকে ইতালীয় 'কাফি' (caffe´) এবং পরে ইংলিশ 'কফি'তে (coffe) রূপান্তরিত হয়।

দাবা খেলা

আধুনিক দাবা খেলার জন্ম হয়েছে মুসলমানদের হাতে। প্রাচীন ভারতে চতুরঙ্গ (Chaturanga) নামে এক ধরনের দাবা খেলার প্রচলন ছিল। তবে আজকে আমরা দাবা খেলাকে যে পর্যায়ে দেখতে পাই তার বিকাশ ঘটেছিল পারস্যে। সাসানীয় পারস্যে ভারতের চতুরঙ্গ 'শাতরঞ্জ' (Shatranj) নামে প্রচলিত হয়। পারস্য থেকে দাবা খেলা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীতে মুর মুসলমানরা স্পেনে দাবা খেলা চালু করে। দাবা খেলায় ব্যবহৃত রুক (Rook) শব্দটি এসেছে ফারসি 'রখ' (Rokh) শব্দ থেকে। ফারসি রখ শব্দটির মানে হলো চার চাকার গাড়ি (Chariot)।

প্যারাশ্যূট

আমরা সবাই জানি অরভিল রাইট ও উইলভার রাইট নামে আমেরিকার দু'ভাই ১৯০১ সালে বিমান আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাদের এক হাজার বছর আগে আব্বাস ইবনে ফারনাস নামে একজন মুসলিম কবি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রকৌশলী একটি উড্ডয়ন যন্ত্র তৈরি করতে কয়েকবার চেষ্টা করেন। ৮৫২ সালে তিনি কাষ্ঠখণ্ডে একটি ঢিলা আলখাল্লা পেঁচিয়ে কর্ডোভার গ্রান্ড মসজিদের মিনার থেকে ঝাঁপ দেন। পাখির মতো উড়তে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থ হন। আলখাল্লা তার গতি শ্লথ করে দেয়। নিচে পতিত হওয়ার সময় তিনি সামান্য আহত হন। তবে তার স্বপ্ন বৃথা যায়নি। তার প্রচেষ্টার পথ বেয়ে আধুনিক প্যারাশ্যূটের জন্ম হয়েছে।

ফারনাসের জন্ম ৮১০ সালে স্পেনের কর্ডোভায়। ল্যাটিন ভাষায় তার নাম আরম্যান ফারমান (Arman Firman)। তার আকাশে উড্ডয়নের প্রচেষ্টা সম্পর্কে মরক্কোর ঐতিহাসিক আহমদ মোহাম্মদ আল-মাক্কারি সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে তিনি একজন কবি ছাড়া আর কোনো সূত্র উল্লেখ করতে পারেননি। নবম শতাব্দীর কবি মুমিন ইবনে সাঈদের একটি কবিতা ছিল তার সূত্র। প্রথম মোহাম্মদের আমলে কর্ডোভার এ রাজকবি তার কবিতায় লিখেছিলেন, *'He flew faster than the phoenix in his flight when he dressed his body in the feathers of a vulture.'* অর্থাৎ *'শরীরে শকুনের পাখা পেঁচিয়ে যখন উড্ডয়ন করেন তখন তিনি ফিনিক্সের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে সক্ষম হন।'* প্রথম বারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বার ৮৭৫ সালে ৭০ বছর বয়সে ইবনে ফারনাস রেশম ও ঈগলের পাখা দিয়ে একটি যন্ত্র তৈরি করে আবার একটি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন। তিনি বেশ উঁচুতে পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং ১০ মিনিট অবস্থান করেন। তবে তিনি অবতরণ করতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়েন। নির্ভুলভাবে তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পাখির মতো লেজ না লাগানোর জন্য অবতরণের সময়

www.pathagar.com

তিনি টাল সামলাতে পারেননি। লিন টাউনসেন্ড হোয়াইট জুনিয়র 'টেকনোলজি এন্ড কালচার'-এ সেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, '*Among other very curious experiments which he made, one is his trying to fly. He covered himself with feathers for the purpose, attached a couple of wings to his body, and, getting on an eminence, flung himself down into the air, when according to the testimony of several trustworthy writers who witnessed the performance, he flew a considerable distance, as if he had been a bird, but, in alighting again on the place whence he had started, his back was very much hurt, for not knowing that birds when they alight come down upon their tails, he forgot to provide himself with one.*'

পাহাড় থেকে ইবনে ফারনাসের ঝাঁপ

অর্থাৎ 'তিনি (ইবনে ফারনাস) যেসব অতি কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান সেগুলোর মধ্যে তার আকাশে উড্ডয়নের প্রচেষ্টা ছিল অন্যতম। এ উদ্দেশ্যে তিনি পালক দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে নেন, শরীরে এক জোড়া পাখা সংযুক্ত করেন এবং উঁচুতে পৌঁছে নিচে বাতাসে ঝুলতে থাকেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কয়েকজন বিশ্বস্ত লেখকের সাক্ষ্য অনুযায়ী এসময় তিনি পাখির মতো উল্লেখযোগ্য দূরত্ব অতিক্রম করেন। কিন্তু যেখান থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন পুনরায় সেখানে অবতরণ করতে গেলে পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড আঘাত পান। পাখিরা তাদের লেজের ওপর ভর করে নিচে নেমে আসে। একথা জানা না থাকায় তিনি লেজ ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

ইবনে ফারনাসের আরো কৃতিত্ব আছে। তিনি পাঠের অযোগ্য গোপন সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার করতে পারতেন। এছাড়া তিনি চশমা ও জটিল ক্রনোমিটার আবিষ্কার করেন। তিনি তার বাড়িকে একটি নক্ষত্রশালা হিসাবে নির্মাণ করেছিলেন। এ বাড়ি থেকে গ্রহ ও নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং মেঘ ও বজ্রপাত দেখা যেতো।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে ফারনাসকে বিশ্ব সম্মান দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেনি। ১৯৭৬ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয় তার নামে। ৬ দশমিক ৮ দ্রাঘিমাংশ এবং ১২২ দশমিক ৩ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ৮৯ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। লিবিয়ার একটি পোস্ট কার্ডে তার প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

শ্যাম্পু

অজু ও গোসলকে মুসলমানদের জন্য ফরজ কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজনে মুসলমানরা সাবান তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। এ সাবান এখনো আধুনিক পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। রোমানরা সাবানকে যেভাবে একটি সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করতো, প্রাচীন মিসরীয়রা ঠিক সেভাবে সাবান ব্যবহার করতো। তবে একমাত্র আরবরাই প্রথম সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও এরোমেটিক্সের সঙ্গে শাকসব্জির তৈল মিশিয়ে শ্যাম্পু তৈরি করে। আরবদের মতো ক্রুসেডাররা অজু ও গোসল করতো না। তাই তাদের শ্যাম্পুর তেমন একটা প্রয়োজন হয়নি। বাঙালি মুসলমান শেখ দীন মোহাম্মদ ইংল্যান্ডে শ্যাম্পু চালু করেন। তিনি ১৭৫৯ সালে ব্রাইটন সিফ্রন্টে 'মেহমুদের ইন্ডিয়ান ভ্যাপার বাথ' (Mahomed's Indian Vapour Baths) নামে শ্যাম্পুর একটি দোকান খোলেন। এ মুসলমানকে সম্রাট চতুর্থ জর্জ ও চতুর্থ উইলিয়াম শ্যাম্পুয়িং সার্জন (Shampooing Surgeon) হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

বর্ম

১২৬০ সালে আইন জালুতে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিসরীয় সৈন্যরা বর্ম হিসাবে প্রথম অগ্নিপ্রতিরোধক পোশাক পরিধান করে এবং গোলাবারুদ থেকে আত্মরক্ষায় তাদের হাতে প্রথম পিচ্ছিল পাউডার ব্যবহার করে। এছাড়া আরবরা বর্ম হিসাবে সেলাই করা এক ধরনের কাপড়ও ব্যবহার করতো। বর্ম তৈরির কৌশল মুসলিম বিশ্বে উদ্ভাবিত হয়েছিল নাকি চীন অথবা ভারত থেকে মুসলিম বিশ্বে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। তবে তা নিশ্চিতভাবে ক্রুসেডারদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে গিয়ে পৌঁছে। ক্রুসেডাররা মুসলিম যোদ্ধাদের এ কৌশল ব্যবহার করতে দেখেছিল। মুসলিম যোদ্ধারা প্রতিরক্ষা হিসাবে বর্মের পরিবর্তে খড় বোঝাই ক্যাম্বিসের শার্টও পরিধান করতো। ক্রুসেডারদের ধাতব বর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্যাম্বিসের এ মোটা শার্ট যুদ্ধে একটি কার্যকর কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয় এবং তা ছিল ব্যবহৃত সামগ্রীগুলো কার্যকরভাবে পৃথক করার একটি পদ্ধতি। এ কৌশল এত সফল বলে প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটেন ও হল্যান্ডের মতো শীতপ্রধান দেশগুলোতে তা একটি কুটির শিল্পে রূপান্তরিত হয়।

সার্জারি

আধুনিক যুগে শৈল্য চিকিৎসায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলো অবিকল দশম শতাব্দীতে মুসলিম শৈল্যবিদ আল-জাহরাবি উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির অনুরূপ। তিনি

www.pathagar.com

চোখের অস্ত্রোপচারে সাঁড়াশি, সূক্ষ্ম কাঁচি, ছুরি ও ছোট করাত ব্যবহার করতেন। এছাড়া তিনি আরো দু'শতাধিক যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। আধুনিক সার্জনরা তার উদ্ভাবিত এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। আল-জাহরাবির আবিষ্কারের মধ্যে আরো রয়েছে পেট সেলাই করার জন্য ব্যবহৃত এমন সূতা যা আপনাআপনি গলে যায় এবং যা ক্যাপসুল তৈরিতেও ব্যবহার করা যায়। একটি বানর তার বাঁশির তার খেয়ে ফেলার ঘটনা থেকে তিনি এ সত্য বুঝতে পারেন। মুসলিম চিকিৎসকগণ আফিম ও এলকোহলের মিশ্রণে এনেসথেশিয়া উদ্ভাবন করেন এবং চোখের ছানি অপসারণে ফাঁপা সূই আবিষ্কার করেন। এখনো চোখের ছানি কাটতে এ ফাঁপা সূই ব্যবহার করা হয়।

স্যুপ

স্যুপ তৈরি করার পদ্ধতি মুসলমান ছাড়া আর কেউ জানতো না। ইউরোপে এ পদ্ধতি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলী ইবনে নাফি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। নাফির ডাকনাম ছিল জারিয়াব বা কালো পাখি। নবম শতাব্দীতে তিনি ইরাক থেকে স্পেনের কর্ডোভায় গিয়ে সেখানে স্যুপ তৈরির ধারণা ছড়িয়ে দেন। পানি অথবা অন্য কোনো তরল পদার্থের সঙ্গে মাংস, শাকসব্জি, জুস ও মসল্লা মিশিয়ে স্যুপ বা উষ্ণ খাদ্য তৈরি করা যায়। নাফি প্রথমে মাছ অথবা মাংস দিয়ে স্যুপ তৈরি করতেন। পরে ফলমূল বা বাদাম দিয়ে। নাফি স্পেনে ক্রিস্টাল গ্লাসও চালু করেন।

পে চেক

আধুনিক চেক শব্দটি এসেছে আরবী সাক থেকে। সাক হলো মাল ডেলিভারি দেয়ার পর পণ্যের মূল্য পরিশোধের একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা। বিপজ্জনক জায়গায় অর্থ বহনের ঝুঁকি এড়াতে সাক-এর আশ্রয় নেয়া হতো। নবম শতাব্দীতে একজন মুসলিম ব্যবসায়ী বাগদাদের কোনো ব্যাংক থেকে নিজের নামে ইস্যুকৃত সাক সুদূর চীনে গিয়েও ভাঙ্গাতে পারতেন।

রকেট ও টর্পেডো

চীনারা যবক্ষার থেকে বারুদ আবিষ্কার করেছিল এবং আঁতশবাজিতে বারুদ ব্যবহার করতো। কিন্তু আরবরাই প্রথম সামরিক প্রয়োজনে পটাশিয়াম নাইট্রেটের সাহায্যে বারুদ পরিশোধন করে। মীর ফাতেহউল্লাহ খান হলেন বন্দুক ও বারুদের আবিষ্কারক। 'অ্যারাব সিভিলাইজেশন'-এ ড. লীবন লিখেছেন, '*Gunpowder was a great invention of the Arabs who were already using guns.*' অর্থাৎ '*গোলাবারুদ হলো আরবদের একটি শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার। বারুদ আবিষ্কারের আগে তারা বন্দুক ব্যবহার করছিল।*'

১৩৪০ সালে ফ্রাঞ্জডল আল-বাগুর অবরোধ করলে আরবরা এ শহর প্রতিরক্ষায় বন্দুক ব্যবহার করে। 'হিস্টরি অব দ্য মুরিশ এম্পায়ার ইন স্পেন'-এর লেখক স্কট আরবদের বন্দুক ব্যবহারের সত্যতা সমর্থন করেছেন।

আরবরা প্রাথমিক যুগে পটাশিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং খলিফা খালিদ ইবনে ইয়াজিদ-ও পটাশিয়াম নাইট্রেটের কথা জানতেন। তবে বিভিন্ন নামে এ

www.pathagar.com

রসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হতো। ধাতুর কাজকর্মে একটি ফ্লাক্স হিসাবে এবং নাইট্রিট এসিড ও একোয়া রিজিয়া তৈরিতে তা কাজে লাগানো হতো। জাবির ইবনে হাইয়ান, আবু বকর আল-রাজি ও অন্যান্য আরব রসায়নবিদের রচনাবলীতে এ রসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের রেসিপি খুঁজে পাওয়া গেছে। আরবরাই প্রথম সল্টপিটারকে পরিশোধন করে অস্ত্র তৈরির মানে উন্নীত করে। ১০২৯ সালে ইবনে বখতাওয়ারের 'আল-মুদ্দাদিমা'য় অস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সল্টপিটার পরিশোধন করার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ১২৭০ সালে সিরীয় সামরিক প্রকৌশলী ও রসায়নবিদ হাসান আল-রাম্মাহ তার 'আল-ফুরুসিয়া ওয়া আল-মানাসিব আল-হারবিয়া'য় (The Book of Military Horsemanship and ingenious war devices) বিস্ফোরক বারুদ ও বারুদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথম পটাশিয়াম নাইট্রেট পরিশোধন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। এছাড়া তিনি পটাশিয়াম নাইট্রেট থেকে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্ট অপসারণে পটাশিয়াম কার্বোনেট ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। ১২৭০-৮০ সালের মধ্যে তিনি বইটি লিখেছিলেন। বইটিতে ১০৭ প্রকারের বারুদ তৈরির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রকেট তৈরির বর্ণনা দেয়া হয়েছে ২২টি রেসিপিতে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী বারুদ তৈরির জন্য প্রয়োজন ৭৫ শতাংশ পটাশিয়াম নাইট্রেট, ১০ শতাংশ সালফার এবং ১৫ শতাংশ কার্বন। হাসান আল-রাম্মাহর রেসিপিতে ছিল ৭৫ শতাংশ পটাশিয়াম নাইট্রেট, ৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ সালফার এবং ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ কার্বন। ১২৬০ সালে মিসরীয় সৈন্যরা তাতার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আইন জালুতের যুদ্ধে ইতিহাসে প্রথম কামান থেকে গোলা ছুঁড়ে। স্পেনের আল-আন্দালুসে মুসলমানরা খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একইভাবে কামান ব্যবহার করে। অগ্নিউদগীরণকারী মুসলিম অস্ত্রগুলো ক্রুসেডারদের ভীত করে তোলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবরা রকেট ও টর্পেডো দু'টিই আবিষ্কার করে। রকেটকে বলা হতো 'তায়ার বুরাক' বা 'স্বয়ংক্রিয় ও জলন্ত ডিম।' আরবদের উদ্ভাবিত টর্পেডো ছিল সামনে বর্শা সজ্জিত নাশপাতির আকৃতি বিশিষ্ট একটি স্বয়ংক্রিয় বোমা। বোমাটি শত্রু জাহাজ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিস্ফারিত হতো।

টর্পেডো আবিষ্কারে মুসলমানদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে 'এনশিয়েন্ট ডিসকভারি, এপিসোড টুয়েলভঃ মেশিন অব দ্য ইস্ট'-এ বলা হয়, '*One of the most significant inventions in medieval warfare was the torpedo, invented in Syria by the Arab inventor Hassan al-Rammah in 1275. His torpedo ran in water with a rocket system filled with explosive gunpowder meterials and had three firing points. It was a very effective weapon against ships.*'.

অর্থাৎ '*টর্পেডো ছিল মধ্যযুগের যুদ্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি আবিষ্কার। ১২৭৫ সালে আরব আবিষ্কারক হাসান আল-রাম্মাহ সিরিয়াতে টর্পেডো উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত টর্পেডো বিস্ফোরক গোলাবারুদ পূর্ণ একটি রকেট নিয়ে পানির ভেতর ছুটে যেতো এবং তাতে ছিল গোলা বের হওয়ার তিনটি ছিদ্র। যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ছিল অত্যন্ত কার্যকর।*'

www.pathagar.com

২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড ডিসকভারি চ্যানেলে জেমি হ্যানিম্যান এবং এডাম স্যাভেজ আরব বিজ্ঞানী রাম্মাহর উদ্ভাবিত টর্পেডোর একটি নমুনা তৈরি করেন এবং কয়েক বার চেষ্টার পর নমুনাটি ছুঁড়তে সক্ষম হন। অস্ত্রটিকে তারা বিশ্বস্ত হিসাবে দেখতে পান।

এসব মারণাস্ত্র ব্যবহারের ফলাফল হয়েছিল বিস্ময়কর। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য। এ প্রযুক্তি স্পেনের খ্রিস্টানদের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে ক্রুসেডাররা কামান ব্যবহার করে। স্পেনের খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এ প্রযুক্তি পশ্চিম ইউরোপে গিয়ে পৌঁছে। ১৩৪২-৪৫ সালে ডারবি ও সলিসবেরির আর্লগণ আল-জাজিরা অবরোধে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা গোলাবারুদ ও কামান তৈরির রহস্য ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। তার মাত্র দু'এক বছর পর ১৩৪৬ সালে পশ্চিম ইউরোপে ক্রিসির যুদ্ধে ফরাসিদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কামান ব্যবহার করে।

ইউরোপীয়রা আতশবাজি তৈরি করতে জানতো না। মুসলমানদের কাছ থেকে তারা এ জ্ঞান লাভ করে। একজন ফরাসি বৈরুতে এসে লোকজনকে আতশবাজি করতে দেখেন। এ ফরাসির নাম ছিল বারট্রানডন দ্য লা ব্রকিয়েরি। ১৪৪২ সালে ব্রকিয়েরি ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে জেরুজালেম ও তুরস্কের আনাতোলিয়া সফর করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'লা ভয়েজ ডি'কোত্রি-মার' শিরোনামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বারগুন্ডির ডিউকের নেতৃত্বে আরেকটি ক্রুসেড পরিচালনা করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে তিনি ইসলামী দেশগুলো সফর করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ গুপ্তচর এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী পর্যটক। ব্রকিয়েরি তার যাত্রাপথের সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতেন। বর্তমান লেবাননের রাজধানী বৈরুতে এসে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ঈদ উদযাপন করতে দেখতে পান। লোকজন ঈদের আনন্দে আতশবাজি করছিল। জীবনে তিনি প্রথমবার আতশবাজি দেখেন। তিনি যুদ্ধে বারুদের সম্ভাব্য গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হন এবং ঘুষ দিয়ে বারুদের ব্যবহার শিখে নেন। ব্রকিয়েরি তার এ ধারণা ফ্রান্সে নিয়ে যান।

উইন্ডমিল

৬৩৪ সালে পারস্যের একজন খলিফার জন্য উইন্ডমিল বা বায়ুকল প্রস্তুত করা হয়। শস্য চূর্ণ এবং সেচের জন্য পানি উত্তোলনে তা ব্যবহার করা হতে থাকে। গ্রীষ্মকালে পানির উৎসগুলো শুকিয়ে গেলে আরব দেশের বিশাল মরুভূমিতে শক্তির একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়াতো বাতাস। কয়েক মাস পর্যন্ত একদিক থেকে অন্যদিকে দ্রুত বেগে বাতাস প্রবাহিত হতো। প্রতিটি উইন্ডমিল বা বায়ুকলে কাপড় অথবা খেজুর পাতায় আচ্ছাদিত পাল থাকতো ছয়টি কিংবা ১২টি। ইউরোপে বায়ুকল চালু হওয়ার ৫ শ' বছর আগে আরব দেশে তা ব্যবহার করা হয়েছিল।

পিন হোল ক্যামেরা

প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে, লেসারের মতো আমাদের চোখ থেকে রশ্মি বের হয়। এ রশ্মি বের হওয়ায় আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভুল। দশম শতাব্দীর মুসলিম বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আল-হাইছাম

www.pathagar.com

হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, চোখ থেকে রশ্মি বের হওয়ার পরিবর্তে বরং আমাদের চোখে রশ্মি প্রবেশ করে। জানালার শাটার ভেদ করে আলো প্রবেশ করতে দেখতে পেয়ে তিনি প্রথম পিন হোল ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন। তিনি অভিমত দেন যে, কোটর যত ছোট হবে ছবি তত বড় হবে। এ ধারণার ভিত্তিতে তিনি প্রথম ক্যামেরা অবসকিউরা নির্মাণ করেন। ইংরেজি অবসকিউরা (Obscura) শব্দটি এসেছে আরবী 'কামারা' (Qamara) শব্দ থেকে। ইবনে হাইছাম হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পদার্থবিজ্ঞানকে দর্শন থেকে আলাদা করতে সক্ষম হন।

শোধন

অষ্টম শতাব্দীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান শোধন ও পাতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। হাইয়ান আলকেমি থেকে রসায়নকে মুক্ত করেন এবং আজকাল আমাদের ব্যবহৃত বহু মৌলিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্ফটিকীকরণ, পাতন, শোধন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, গলন, বাষ্পীয়ভবন ইত্যাদি। সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডও তার আবিষ্কার। ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও তিনি এলকোহল আবিষ্কার করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর জোর দেন এবং তিনি হলেন আধুনিক রসায়নের জনক।

ঘূর্ণায়মান হাতল

ঘূর্ণায়মান হাতল আবিষ্কার করেছেন মুসলিম বিজ্ঞানী আল-জাজারি। ঘূর্ণায়মান হাতল হলো এমন একটি যন্ত্র যা রোটারি যন্ত্রকে পিস্টন ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করতে পারে এবং এ যন্ত্রটি আধুনিককালের বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে মূল দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে ঘূর্ণায়মান হাতল হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পানি উত্তোলনের জন্য আল-জাজারি যন্ত্রটি তৈরি করেন। ১২০৬ সালে প্রণীত বুক অব নলেজ অব ইনজীনিয়াস মেকানিক্যাল ডিভাইসেস ((Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices)-এ তিনি ভাল্ব ও পিস্টন নির্মাণের কলাকৌশল বর্ণনা করেন। তিনি পানি এবং ওজন চালিত কয়েকটি যান্ত্রিক ঘড়ি উদ্ভাবন করেন। তাকে রোবটের জনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

ছুঁচালো খিলান

ইউরোপে গথিক স্টাইলে নির্মিত গীর্জায় শোভিত ছুঁচালো খিলানের আবিষ্কারক হলো মুসলমানরা। এ তীক্ষ্ণ খিলান রোমান ও নরম্যানদের ব্যবহৃত খিলানের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। এ খিলান ভবনগুলোকে উঁচু, প্রশস্ত ও সুপরিসর করার সুযোগ দেয়। ঠেকনা দেয়া খিলান করা ছাদ, রোজ উইনডোজ ও গম্বুজ তৈরির কলাকৌশলের জন্য মানব জাতি আরব স্থপতিদের কাছে ঋণী। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের তৈরি উঁচু চূড়া, নিচু পাচিল, ফোকর ও বর্গাকৃতির টাওয়ার সম্বলিত দুর্গ নির্মাণের কৌশল হুবহু অনুকরণ করেছে। পঞ্চম হেনরির দুর্গ নির্মাণের স্থপতি ছিলেন একজন মুসলমান।

www.pathagar.com

টিকা

টিকা দানের কৌশল জেনার অথবা পাস্তুরের নয়, মুসলমানদের আবিষ্কার। ১৭২৪ সালে ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী তুরস্ক থেকে টিকা দানের কৌশল শিখে এসে ইউরোপে ছড়িয়ে দেন। তুর্কি শিশুদের গুটিবসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে গরুর বসন্তের জীবাণু সম্বলিত টিকা প্রদান করা হতো। ইউরোপে টিকা উদ্ভাবনের ৫০ বছর আগে মুসলিম দেশগুলোতে টিকা দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

ফাউন্টেন পেন

ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কারক হলো মুসলমান। ৯৫৩ সালে মিসরের সুলতান মোয়াদ আল-মুয়িজের নির্দেশে ফাউন্টেন পেন আবিষ্কৃত হয়। তিনি এমন একটি কলম তৈরির নির্দেশ দেন যেন তার হাত ও কাপড়ে দাগ না লাগে। তার নির্দেশে তৈরি ফাউন্টেন পেনে কালি একটি আধারে সংরক্ষণ করা হতো। খোলস থেকে নলের সংযোগ দিয়ে কলমের নিবে কালি নেমে আসতো। কাজী আল-নুমান আল-তামিনির 'কিতাব আল-মাজালিস ওয়াল-মুসাওয়ার্দ'-এ ফাউন্টেন পেন আবিষ্কারের এ কাহিনীর বিবরণ পাওয়া গেছে। আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়, ক্রুসেডের সময় মুসলমানরা ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতো। এসময় মুসলিম ভূখণ্ড থেকে ইউরোপে এ প্রযুক্তি স্থানান্তরিত হয়।

অসীম সংখ্যা লিখন

সারা পৃথিবী জুড়ে এখন সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। এমন একসময় ছিল যখন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখে থেমে যেতে হতো। শূন্যের ব্যবহার চালু করে আরব গণিতজ্ঞরা মানব জাতিকে এ জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সংখ্যা মূলত প্রাচীন ভারতে উদ্ভাবিত হলেও তা প্রথম ব্যবহার করেছিল আরবীয় মুসলমানরা। আনুমানিক ৮৩০ সালের দিকে মুসলিম গণিতজ্ঞ আল-খাওয়ারিজমি ও আল-কিন্দির গ্রন্থাবলীতে প্রথম সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। খাওয়ারিজমির গ্রন্থ 'আল-ইলম ওয়াল জাবর ওয়াল-মুকাবালা' থেকে এলজাব্রা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তার নামে এলজাব্রার নামকরণ করা হয়েছে। আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা'র অধিকাংশ বিষয়বস্তু এখনো প্রচলিত। তিন শ' বছর পর ইতালীয় গণিতজ্ঞ ফিবোনাসি ইউরোপে মুসলিম গণিতজ্ঞদের গ্রন্থাবলী ইউরোপে আমদানি করেন। এলজাব্রা ও ত্রিকোণমিতির অধিকাংশ ফর্মুলা এসেছে মুসলিম বিশ্ব থেকে। আল-কিন্দি ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণে সক্ষম হওয়ায় প্রাচীন বিশ্বের সব সংকেতের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং তার আবিষ্কার আধুনিক ক্রিপটোলজির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

কার্পেট

গালিচা বা কার্পেট ব্যবহারের জন্য আরবদের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। মধ্যযুগে আরব স্থাপত্য অগ্রগতির চরম শিখরে আরোহন করে। কার্পেট বুননে তাদের কৌশল এবং শৈল্পিক জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। ইসলামী রসায়নের বদৌলতে রঙ্গীন ও সুদৃশ্য কার্পেট তৈরি হতে থাকে। পক্ষান্তরে, ইউরোপের মেঝেগুলো ছিল তখন অনাবৃত। আরবীয় ও

www.pathagar.com

পার্সী কার্পেট না পৌঁছা পর্যন্ত ইউরোপের অবস্থা ছিল এমনি। ইংল্যান্ডে ঘরের মেঝেতে নলখাগড়া বিছিয়ে রাখা হতো। কোনো কোনো সময় মেঝেগুলো নবায়ন করা হতো। তবে তাও সাদামাটাভাবে। অন্তত ২০ বছর মেঝেগুলোর কোনো যত্ন করা হতো না। উন্মুক্ত মেঝেগুলো মানুষ ও কুকুরের মলমূত্র, বমি, পচা মাছ, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদিতে ভরে যেতো। কার্পেট বিস্ময়করভাবে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়।

গোলাকার পৃথিবীর ধারণা

নবম শতাব্দীতে অধিকাংশ মুসলিম বিজ্ঞানী স্বীকার করে নেন যে, পৃথিবী গোলাকার। প্রমাণ হিসাবে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে হাজাম বলেন যে, সূর্য বরাবরই পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্পট থেকে লম্বভাবে অবস্থান করে। ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পৃথিবীর গোলাকার তত্ত্ব প্রচার করার ৫ শ' বছর আগে ইবনে হাজাম একথা প্রচার করেছিলেন। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা এত নির্ভুল ছিল যে, নবম শতাব্দীতে তারা পৃথিবীর পরিধি ৪০ হাজার ২৫৩ কিলোমিটার হিসাবে নির্ধারণ করেন। তাদের নির্ধারিত পরিমাণ ছিল ২ শ' কিলোমিটার কম। ১১৫৪ সালে আল-ইদ্রিসী সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের দরবারে পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

বাগান

ইউরোপীয়রা বাগান করার ধারণা পেয়েছে মুসলমানদের কাছ থেকে। সৌখিন ও সৌন্দর্য পিপাসী জাতি হিসাবে আরবরা বাগান করতো। এছাড়া বাগান করার পেছনে একদিকে ছিল তাদের ধর্মীয় আবেগ এবং অন্যদিকে ছিল ভূ-প্রকৃতি। পবিত্র কোরআনে বাগানের বহু বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র হাদিসে ঈমানদার মুসলিম নর-নারীকে আখেরাতে জান্নাতের বাগানে ঠাঁই দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের মনে বাগান একটি বিরাট স্থান দখল করে থাকতো। আরব দেশের ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ ও মরুময় হওয়ায় আরবরা সুশীতল ছায়া লাভের আশায় বাগান করতো। বাগান তৈরিতে আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ ও তার পুত্র আল-মামুনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। বাগদাদে খলিফা আল-মামুনের প্রাসাদের মনোরম বাগানে দুর্লভ ফুল ছাড়াও যন্ত্রচালিত দু'টি পাখি ছিল। একটি ছিল রূপার এবং আরেকটি ছিল সোনালী রংয়ের। সুগন্ধিতে চারদিক আমোদিত হতো। একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসিত স্পেনে প্রথম রাজকীয় বাগান তৈরি করা হয়। আব্বাসীয়দের কাছে পরাজিত উমাইয়াদের একটি অংশ স্পেনের আন্দালুসিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। আন্দালুসিয়ার ভূমি ছিল বাগান করার জন্য আরব দেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট। সেখানকার বাগানে পারস্যের লাল গোলাপ ও টিউলিপসহ অসংখ্য ফুল ফুটতো। ক্রমে ক্রমে স্পেন থেকে গোটা ইউরোপে বাগান ও ফুলের প্রতি আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান

রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাবির ইবনে হাইয়ান একটি অতি পরিচিত নাম। তার মৌলিক আবিষ্কারের ওপরই বর্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান। তার পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ্ জাবির ইবনে হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আজদি আততুসি আস সুফি আল-ওমাবি। তিনি আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান নামেও পরিচিত। কেউ কেউ তাকে 'আল-হাররানি' এবং 'আস সুফি' নামেও আখ্যায়িত করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে তিনি 'জিবার' (Geber) নামে পরিচিত। জাবিরের পরিচিতি নিয়ে বিভ্রাট ঘটানোর জন্য তাকে ইউরোপে 'জিবার' নামে আখ্যায়িত করা হয়। জাবির ইবনে হাইয়ানের নাম খুব লম্বা। নাম লম্বা হওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ডজ অভিমত প্রকাশ করেন যে, খুব সম্ভব তার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'আবু আবদুল্লাহ' যুক্ত করেন। পরে অন্য পুত্র মুসার নামও নিজের নামের সঙ্গে যোগ করেন। ধারণা করা হয়, জাবিরের নামের শেষাংশ 'ওমাবি' আসলে 'আমী' শব্দের বিকৃত রূপ অথবা ভুলক্রমে এ শব্দটি তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তখনকার দিনে শিয়া সমাজে সুন্নি মুসলমানদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য 'আমী' বলা হতো। হয়তো এভাবে জাবির ইবনে হাইয়ানের নামের সঙ্গে 'আমী'র পরিবর্তে 'ওমাবি' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন রসায়নের জনক। রসায়নবিদ ছাড়াও তিনি ছিলেন আলকেমিস্ট, পদার্থ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী, প্রকৌশলী, ভূতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্ট। জাবির জ্ঞান সাধনায় তার পূর্ববর্তী লেখক ও মনীষীদের কাছে ঋণী। তিনি এপোলনিয়াসের আধ্যাত্মবাদ, প্লেটো, সক্রেটিস, এরিস্টোটল, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস প্রমুখের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি তার রচনাবলীতে মিসরীয় অপরসায়নবিদ জসিমাস ও হারমেস ট্রিসমেগিস্টাস এবং গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস, আগাথোডাইমন, প্লেটো, এরিস্টোটল, গালেন, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, সিমপ্লিয়াস, পরফাইরি প্রমুখের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

প্রাথমিক জীবন

স্বভাবে জাবির ছিলেন একজন দার্শনিক। তার পিতার নাম ছিল হাইয়ান আল-আজদি। তিনি ছিলেন আরবীয় আজদি গোত্রের লোক। আরবের দক্ষিণাংশে জাবিরের পূর্ব

www.pathagar.com

পুরুষগণ বাস করতেন। স্থানীয় রাজনীতিতে আজদি গোত্র সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। পরবর্তীতে জাবিরের পিতা হাইয়ান আল-আজদি আগের বাসস্থান ত্যাগ করে কুফায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন চিকিৎসক ও ওষুধ বিক্রেতা। উমাইয়া বংশের খলিফাদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক কার্যকলাপে হাইয়ান আল-আজদি তাদের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতেন। উমাইয়া শাসন উৎখাতে তিনি পারস্যের কয়েকটি প্রভাবশালী বংশের সঙ্গে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করার জন্য আব্বাসীয়দের দূত হিসাবে ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরীতে গমন করেন। এ তুস নগরীতেই ৭২১ সালে বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানের জন্ম।

জাবির ইবনে হাইয়ান

www.pathagar.com

হাইয়ান আল-আজদির ষড়যন্ত্রের কথা দ্রুত তৎকালীন খলিফার দৃষ্টিগোচর হয়। খলিফা তাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তার পরিবার পরিজনদের পুনরায় দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ আরবেই জাবির ইবনে হাইয়ান শিক্ষা লাভ করেন। হারবি আল-হিমারি ছিলেন তার শিক্ষক। তার কাছে তিনি হিমারি ভাষা ছাড়াও কোরআন, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা লাভের প্রতি ছিল তার পরম আগ্রহ। পিতার পেশা আলকেমি রসায়নের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে। একজন সন্ন্যাসির কাছে তিনি আলকেমির পাঠ গ্রহণ করেন। যে কোনো বিষয়ের বই পেলে তিনি তা পড়ে শেষ করে ফেলতেন এবং তার ওপর গবেষণা চালাতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এখানে গণিতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। শিক্ষা গ্রহণ শেষ হওয়ার পর জাবির ইবনে হাইয়ান পিতার কর্মস্থল কুফা নগরীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এ সূত্রেই তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের অনুপ্রেরণায় তিনি রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

রাজদরবারের সঙ্গে জাবিরের যোগাযোগ

খালিদ ইবনে বারমাকের নেতৃত্বে বারমাকী পরিবার ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের সমর্থক। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের আমলে খালিদ ইবনে বারমাক মেসোপটেমিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। একবার গভর্নর খালিদের সুন্দরী দাসী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হন। এ সময় ডাক পড়ে জাবির ইবনে হাইয়ানের। জাবির মাত্র কয়েক দিনের চিকিৎসায় তাকে সুস্থ করে তোলেন। এতে গভর্নর খালিদ খুব সন্তুষ্ট হন এবং জাবিরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি রাষ্ট্রীয় কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। তাতে তিনি রসায়ন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করার সুযোগ পান। মন্ত্রী ইয়াহিয়া এবং তার পুত্র জাবিরের নিকট রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য ও বিভিন্ন পদার্থ আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। খুব অল্প দিনের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন। জাবির ইবনে হাইয়ান প্রতিটি বিষয়ই যুক্তির সাহায্যে বুঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিখে রাখতেন। ৮০৩ সালে বারমাকীদের পতন ঘটলে জাবির ইবনে হাইয়ান বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদের আর্শীবাদ থেকে বঞ্চিত হন। তারপর তাকে কুফায় গৃহবন্দি করা হয়।

জাবিরের পূর্বসূরি প্রথম মুসলিম আলকেমিস্ট

জাবিরকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দু'জন মুসলিম আলকেমিস্টের নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাদের একজন হলেন ইমাম জাফর সাদিক এবং আরেকজন হলেন উমাইয়া যুবরাজ খালিদ ইবনে ইয়াজিদ। জাবির ছিলেন জাফর সাদিকের শিষ্য।

www.pathagar.com

উমাইয়া যুবরাজ খালিদের কাছে তিনি অধ্যয়ন করতেন। যুবরাজ খালিদ ইবনে ইয়াজিদ হলেন প্রথম মুসলিম রসায়নবিদ। ২০ বছর বয়সে তিনি আলকেমির জ্ঞান অর্জনে আলেক্সান্দ্রিয়ার উদ্দেশে দামেস্ক ত্যাগ করেন। সেখানে তিনি তার খ্রিস্টান শিক্ষক স্টেফানাস ও স্টেফানাসের আশ্রয়দাতা জেরুজালেমের সন্ন্যাসি মরিনাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মরিনাসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটার একটি কাহিনী আছে। আকস্মিকভাবে যুবরাজ খালিদ রহস্যময় একটি পাণ্ডুলিপি লাভ করেন। বিষয়বস্তু বোধগম্য না হওয়ায় তিনি বইটির গোপন তথ্য উদ্ঘাটনে পুরস্কার ঘোষণা করেন। ভুয়া আলকেমিস্ট ও প্রতারকরা এসে তার দরবারে ভিড় করে। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। খ্রিস্টান সন্ন্যাসী মরিনাস যুবরাজ খালিদ ও তার রহস্যময় পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির কথা লোক মুখে শুনতে পেয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মরিনাস বইটির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিভাবে পরশ পাথর তৈরিতে বইটির জ্ঞান ব্যবহার করা যায় তিনি যুবরাজ খালিদের কাছে তা ব্যাখ্যা করেন। তার ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ভুয়া আলকেমিস্টদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। খালিদ ইবনে ইয়াজিদ আলকেমির ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তার পরবর্তী আলকেমিস্ট ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক। জাফর সাদিকের পরবর্তী আলকেমিস্ট হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। এসময় ছিল আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকাল। খলিফার সঙ্গে জাবিরের তেমন কোনো পরিচয় বা সাক্ষাৎ হয়নি। তবে খলিফার বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইমাম জাফর সাদিকই জাবিরকে বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাচীন আলকেমি

'আলকেমি' হলো রসায়নের আদি উৎস। সর্বপ্রথম আলকেমি চর্চা কোথায় শুরু হয়েছিল সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের একটি অংশ দাবি করছেন, প্রাচীনকালে চীনে তাও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। আরেকদল বিজ্ঞানী বলছেন, চীনা তাও নয়, গ্রীক বিজ্ঞানী আরিয়াস হলেন আলকেমির উদগাতা। তিনিই প্রথম পরশ পাথর নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। পক্ষান্তরে জাবির ইবনে হাইয়ান প্রাচীন মিসরের হারমেস ট্রিসমেগিস্টাস, আগাথোডাইমন ও পিথাগোরাসকে আলকেমির প্রাণপুরুষ এবং সক্রেটিসকে সব দর্শনের পিতামাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার জন্য যাতে এ জ্ঞান ফাঁস হয়ে না যায় সেজন্য সক্রেটিস আলকেমি নিয়ে লেখালেখির বিপক্ষে ছিলেন। জাবির গালেনকেও আলকেমিস্ট হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মিসর হলো আলকেমির জন্মস্থান। মিসরীয় ধাতু শিল্পী ও জহুরিরা ধাতুকে এমন একটি রূপ দেয়ার চেষ্টা করতো যাতে তাকে স্বর্ণের মতো দেখায়। তারা ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরের ফর্মুলা গোপন রাখতো। এ ব্যাপারে ছিল তাদের একচেটিয়াত্ব। আলকেমির জন্মের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেও সবাই এ প্রশ্নে একমত যে, মিসর,

www.pathagar.com

সিরীয় ভাষায় অনূদিত গ্রীক গ্রন্থ এবং পারস্যের মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্বে এ ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। হায়ুলি, আতিস, ইয়াস, আছালিয়া, ইকসার, কাম্বার প্রভৃতি গ্রীক শব্দগুলো আরবীয় আলকেমিতে ঠাঁই পাওয়ায় বুঝা যাচ্ছে, আরবরা মূলত গ্রীক সূত্র থেকে তাদের আলকেমির জ্ঞান লাভ করেছে। তবে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা প্রথম আলকেমির সংস্পর্শে আসে।

মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর নগরী আলেক্সান্দ্রিয়া অভিযানকালে সেখানকার লাইব্রেরির সকল গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবদের হস্তগত হয়। ধারণা করা হয় যে, আরবদের হস্তগত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে আলকেমি সংক্রান্ত মিসরীয় পাণ্ডুলিপিও ছিল। আর তারই সূত্র ধরে মিসরীয় আলকেমি আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করে। রসায়নের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, প্রাচীন মিসরের হারমেস ট্রিসমেগিস্টাস হলেন আলকেমির জনক। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সম্রাট ডায়োক্রেশিয়ান মিসরের আলকেমি সংক্রান্ত সব কর্ম ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। আলকেমির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কেউ যাতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো ধন সম্পদের অধিকারী হতে না পারে সেজন্য তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্রাট ডায়োক্রেশিয়ানের ধ্বংসলীলা থেকে হারমেসের মাত্র দু'টি বই রক্ষা পায়। একটি বইয়ের নাম ছিল 'এমারয়াল্ড টেবলেট' এবং আরেকটি বইয়ের নাম 'ডিভাইন পিম্যান্ডার'।

'এমারয়াল্ড টেবলেট'কে আলকেমির মূল উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ল্যাটিন ভাষীদের কাছে বইটি 'স্মারাগদাইন টেবলেট' বা 'তাবুলা স্মারাগদিনা' শিরোনামে পরিচিত। বইটির ইংরেজি নাম 'সিক্রেট অব সিক্রেটস' এবং আরবী অনুবাদে বইটির নামকরণ করা হয় 'কিতাব সার আল-আসরার'। আরবী ভাষীদের কাছে হারমেস ছিলেন 'হারমেস আল-মুতালাত বি আল-হিকমা' নামে পরিচিত। পবিত্র কোরআনে হারমেসের নামের কোনো উল্লেখ নেই। তবে হযরত মোহাম্মদের (সা.) মদিনায় হিযরত করার পর মুসলমানরা হারমেসকে হযরত ইউসূফ (আ.) হিসাবে শনাক্ত করে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাকে হযরত ইদ্রিস (আ.) হিসাবে মনে করে। হারমেস ছিলেন হযরত মূসার (আ.) সমসাময়িক। তার দেশবাসী বেবিলন থেকে তাকে মিসরে নির্বাসনে পাঠায়। সেখানে তিনি রাজা হন। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালের দিকে তিনি মিসরের রাজা ছিলেন। মিসরে নির্বাসিত হয়ে সে দেশের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করছে যে, হারমেস হযরত ইউসূফ (আ.) ছাড়া আর কেউ নন। হারমেসের নামের অংশ 'ট্রিসমেগিস্টাস'-এর অর্থ হলো গোটা পৃথিবীর তিন ভাগ জ্ঞানের অধিকারী। ভাগগুলো হলো: আলকেমি, এস্ট্রলজি এবং থিওরজি বা অতিমানবীয় ক্ষমতা।

নবম শতাব্দীতে আরবীতে হারমেসের দুর্লভ বইটি অনুবাদ করেছিলেন ইয়াহিয়া ইবনে বাতরিক। মুসলিম রসায়নবিদ আল-রাজি 'কিতাব সার আল-আসরার' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তার বইটি হারমেসের বইয়ের অনুবাদ নয়। তবে জাবির ইবনে হাইয়ানের 'কিতাব উসতুকুস আল-উস আল-ছানি'তে (The Secret of

www.pathagar.com

Creation) হারমেসের বইটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার বইটি ছিল হারমেসের বইয়ের একটি ভাষ্য।

আলকেমির তত্ত্ব গোপন রাখার অভিনব কৌশল

জাবির আলকেমির তত্ত্ব গোপন রাখার অভিনব কৌশল হিসাবে তার বইগুলো দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রীক আলকেমিস্ট আরিয়াসকে অনুসরণ করেন। আরিয়াস তার আলকেমি বিষয়ক বইগুলো অত্যন্ত দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতেন। সাবধানতার জন্য তিনি এ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। জাবিরের গুরু ইমাম জাফর সাদিক তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আলকেমির রহস্য দুষ্ট লোকের হাতে হস্তান্তরিত হলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। যে কেউ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভে এ জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। তাই তিনি বই লিখার সময় সতর্ক থাকতেন। সতর্কতা অবলম্বনে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল তার ভাষায় 'তাবদিদ আল-ইলম' বা জ্ঞান গোপন রাখার নীতি। তিনি সব রহস্য একসঙ্গে একটি বইয়ে প্রকাশ করার নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। প্রতিটি বইয়ে একটু একটু করে রহস্য প্রকাশ করতেন। এজন্য তিনি বই লিখেছেন অসংখ্য। তিনি আলকেমির জ্ঞানকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যান। এজন্য তার বইয়ের পাঠোদ্ধার করা কঠিন। আলকেমির জ্ঞান গোপন রাখার উদ্দেশ্যে জাবিরের অনুসৃত নীতি তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ব্রিদ্রেন অব পিউরিটি' নামে শিয়া ইসমাঈলীয়দের একটি গোপন দল তার বইয়ের পরিচয় গোপন করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা তার অনেক বই ধ্বংস করে ফেলেছে। তাদের চক্রান্তে জাবিরের বইয়ের পরিচয় নিয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

আলকেমির প্রতি খ্রিস্টানদের সন্দেহ

আলকেমিকে খ্রিস্টানরা সুনজরে দেখতো না। তারা মনে করতো আলকেমির জ্ঞান অশুভ। তারা এ জ্ঞান ভুল হাতে পড়ার আশংকা করতো। অনুরূপ আশংকা থেকে খ্রিস্টানরা ৩৯১ সালে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার একটি বৃহত্তম লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়। আলেক্সান্দ্রিয়া ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলে 'কুইন সিটি' বা রানী সদৃশ শহর। গ্রীস ও মিসরীয় আলকেমির ধারণা ও তত্ত্বগুলো এ শহরে স্রোতের মতো ভেসে আসে। এখানকার লাইব্রেরিগুলোতে আলকেমিস্টদের প্রচুর বইপত্র সংরক্ষিত ছিল। খ্রিস্টানরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেও আলেক্সান্দ্রিয়া আলকেমির জ্ঞান থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

আলকেমি থেকে কেমিস্ট্রি

'আলকেমি' হলো রসায়নের পূর্বসূরি। একটি ভাষ্যে বলা হয়েছে, আরবী 'কেম' অথবা 'কিমিয়া' শব্দ থেকে 'আলকেমি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আরেকটি ভাষ্যে বলা হয়, মিসরীয় 'কেমি' থেকে আরবী 'আলকেমি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'কেমি' অর্থ হলো 'কৃষ্ণ'। মিসরে কালো ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করা হতো বলে সে দেশের

www.pathagar.com

আরেক নাম ছিল 'ব্ল্যাক ল্যান্ড' বা 'কৃষ্ণ ভূখণ্ড'। আরবী 'আল' শব্দটির ইংরেজি করলে অর্থ দাঁড়ায় 'দ্য' এবং 'কিমিয়া' শব্দটি 'কেমিস্ট্রি' বা 'রসায়ন'। 'কিমিয়া' শব্দের আরবী অর্থ হলো 'পরিমাণ'। প্রাথমিকভাবে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ধাতু পরিমাপে আরবীতে 'পরিমাণ' শব্দটিই ব্যবহার করতেন। তাই এ শাস্ত্র 'রসায়ন' বা 'কেমিস্ট্রি নামে পরিচিত হয়ে উঠে। রসায়নে মুসলিম যুগ শুরু হওয়ার আগে পুরাকালের রূপকথার ওপর এ শাস্ত্র নির্ভরশীল ছিল। তখন বিশ্বাস করা হতো, সস্তা ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা, সীসা ও টিনের মতো আলমেনটার্ক ধাতুগুলো একই প্রকৃতির এবং তাপ, ঠাণ্ডা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতার জন্য তাদের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব পঞ্চম ধাতু বা এলিক্সারের সহায়তায় একটি ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তর করা সম্ভব। কোনো কোনো প্রাচীন বিজ্ঞানী আরো ধারণা করতেন, ঐন্দ্রজালিক বস্তু 'ফিলসোফার্স স্টোন' বা পরশ পাথর তৈরি করা সম্ভব হলে জরা বার্ধক্য দূর হবে এবং জীবন দীর্ঘায়িত হবে। তুর্কি ভাষায় এলিক্সারকে বলা হতো 'আবে হায়াত'। আবে হায়াত তৈরি করাই ছিল আলকেমির লক্ষ্য। সে যুগের রসায়নবিদদের লক্ষ্য ছিল পরশ পাথরের সন্ধান লাভ। বিজ্ঞানীরা অন্ধভাবে এ রূপকথার বস্তুটির পেছনে ছুটেও কোনো কূল কিনারা করতে পারেননি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা রসায়নকে এ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন।

জাবিরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

জাবিরকে পরশ পাথরের মোহ পেয়ে বসেছিল। তবে তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো সূত্র দাবি করছে, তিনি তার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। জাবির এলিক্সারের গুণাবলী ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করলেও জিনিসটি দেখতে কেমন তিনি তার আভাস দেননি। আরবীতে নাইট্রিক (Nitric) শব্দটিকে বলা হতো 'নাট্রন'। জাবির 'কিতাবুল ইসতিতমাস'-এর ২৩তম অধ্যায়ে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করার ফর্মুলা বর্ণনা করেছেন। নাইট্রিক এসিড দিয়ে স্বর্ণ গলানোর ফর্মুলা এবং এসিড দিয়ে স্বর্ণ থেকে রৌপ্য পৃথক করার প্রণালী তিনিই আবিষ্কার করেন। সোনা একটি রাসায়নিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় সোনা পাওয়া যেতো না। অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যেতো। মিশ্রিত ধাতু থেকে সোনা পৃথকীকরণের কৌশল জাবিরের আগে অন্য কেউ বের করতে পারেননি। তিনিই প্রথম সীসার সঙ্গে মিশিয়ে সোনা বিশুদ্ধ করার উপায় খুঁজে বের করেন। এ উপায়কে বলা হতো 'কুপেলেশন' (Cupellation) প্রণালী।

জাবিরই সর্বপ্রথম দেখান যে, সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সঙ্গে সাধারণ লবণ যোগ করলে একটি ঘোলাটে অধঃক্ষেপ প্রস্তুত হয়। তা থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এভাবে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে বিদ্যমান রৌপ্যের অস্তিত্ব নিরূপণ করা সম্ভব। নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডে স্বর্ণ গলানোর পদার্থটির নাম 'একোয়া

www.pathagar.com

রিজিয়া' (Aqua Regia)। এ নামটি জাবিরের দেয়া। উপাদানটি স্বর্ণকে দ্রবীভূত করতে পারে। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, গলন, বাষ্পীভবন ইত্যাদি রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং তার ফলাফল তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির কস্টিক সোডা, চামড়া ও কাপড়ে রং করার প্রণালী, লোহা, ওয়াটারপ্রুফ কাপড়, বার্নিশ করার উপায়, সোনার পানিতে পুস্তকে নাম লেখার জন্য লোহার ব্যবহার ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। এলেমবিক ও বিশেষ ধরনের কাঁচের পাত্রসহ আধুনিক গবেষণাগারে ব্যবহৃত অন্তত ২০টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক হলেন তিনি। 'এলেমবিক' নামটি তার দেয়া। এলেমবিকের অংশ হিসাবে পাতনের জন্য তিনি বকযন্ত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালের মুসলিম বিজ্ঞানীরা তার যন্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন এবং ১৫৭০ সালে এ যন্ত্র ইউরোপে চালু করা হয়। ইমাম জাফর আল-সাদিকের আগ্রহে সাড়া দিয়ে জাবির আগুন প্রতিরোধে সক্ষম বিশেষ ধরনের কাগজ প্রস্তুত করেছিলেন। বিশেষ ধরনের একটি কালিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। এ কালির লেখা রাতের অন্ধকারে পাঠ করা যেতো। তামার যে কোনো যৌগিক পদার্থ আগুনের শিখায় উজ্জ্বল নীল আলো বিকিরণ করে। জাবির তামার এ বিশেষ গুণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

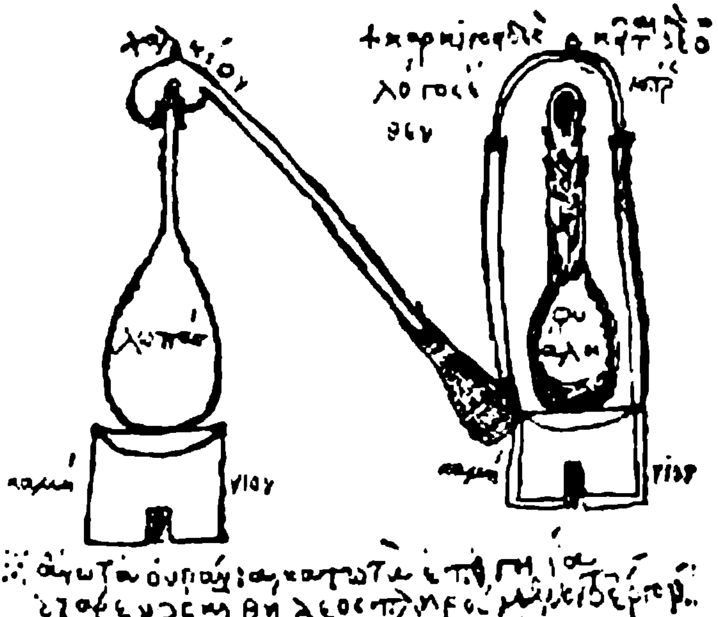

জাবির ইবনে হাইয়ানের আবিষ্কৃত বক্রনল

www.pathagar.com

তামার এ গুণ ব্যবহার করে তিনি উল্লেখিত কালি তৈরি করেছিলেন। নাইট্রিক এসিড সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যৌগিক পদার্থও তিনি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব যৌগিক পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিলভার নাইট্রেট ও মারকিউরিক ক্লোরাইড। জাবির প্রথম পাতন প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভিনিগার থেকে এসিটিক এসিড ঘনীভূত করেছিলেন। রৌপ্যের সঙ্গে নাইট্রিক এসিডের সংমিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থের নাম সিলভার নাইট্রেট। পারদের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় মারকিউরিক ক্লোরাইড। জাবিরের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায়, তিনি সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরাইড এসিড প্রস্তুত করেছিলেন এবং এসিডের নাম দিয়েছিলেন 'আলযাজাজ তেল'। জাবির গন্ধককে ক্ষারের সঙ্গে তাপ দিয়ে লিভার অব সালফার এবং মিল্ক অব সালফার তৈরি করেছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ভিট্রিওল, এলামস, আলকালি, নিশাদল, সল্টপিটার, লীড এসিটেট, বিষাক্ত অক্সাইড-ও প্রস্তুত করেছিলেন। অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্র স্বর্ণকে মীগারের সঙ্গে মিশিয়ে স্বর্ণ বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেন। তিনি রঞ্জক ও অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণে তার অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন। জাবির কাঁচ তৈরিতে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে রঙ্গীন কাঁচ তৈরির ৪৬ টি মৌলিক প্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। আর্সেনিক ও এন্টিমনি কিভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং ধাতু কিভাবে বিশুদ্ধ করতে হয় তিনি তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাবির প্রথম স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, সীসা, পারদ, লোহা ও তামা- এ ৭টি ধাতুকে শ্রেণীকরণ করেন। তিনি তার 'কিতাব আল-দুরা আল-মাকনুনা'য় (The Book of the Hidden Pearl) প্রথম কৃত্রিম মুক্তা ও মূল্যবান রত্ন উৎপাদন এবং বিবর্ণ মুক্তা পরিশোধন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। একই বইয়ে তিনি পনির থেকে সিরিশ তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন। জাবির বর্ম (জাওয়াসিন), শিরোস্ত্রান (বিদ) ও ঢাল (দারাক) হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্লেটযুক্ত শক্ত আচ্ছাদন উদ্ভাবন করেন। জাবির প্রসাধন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সুগন্ধি দিয়ে তিনি প্রসাধনী তৈরি করতেন। জাবিরের এসব আবিষ্কার আধুনিক রসায়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

গবেষণাগারে 'তাকউইন' বা কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করা ছিল আলকেমি নিয়ে জাবিরের গবেষণার লক্ষ্য। তার গবেষণাগারে বৃশ্চিক, সাপ এমনকি মানুষের মতো প্রাণী সৃষ্টির রেসিপি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়। জাবির এসব রেসিপি দিয়ে কী করতে চেয়েছিলেন তা অস্পষ্ট। আলকেমি নিয়ে তার গবেষণার ভিত্তি ছিল পিথাগোরাসীয় ও নব্য প্লেটোবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিউমারলোজি। তিনি আরবী বর্ণমালার সংখ্যার মানের সাহায্যে পদার্থের প্রকৃতি ও গুণের সংজ্ঞা দিতেন।

উষ্ণ পানীয় বা ওয়াইন সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল। আরবী 'আল-কোহল' থেকে 'এলকোহল' শব্দটি এসেছে। এলকোহল হলো ওয়াইন বা মদ তৈরির উপাদান। 'কিতাব আল-তারাফুক ফি আল-আতর' (দ্য বুক অব দ্য কেমিস্ট্রি অব পারফিউম)-এ জাবির ওয়াইন পাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। 'কিতাব ইখরাজ মাফি আল-ফিল'-এ

www.pathagar.com

তিনি বিশ্বে প্রথম এলকোহলের বর্ণনা দেন। ইসলামে মদ পান নিষিদ্ধ হলেও ওষুধ, রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পে ওয়াইন ব্যবহার করা হতো। আরব বিশ্বে বসবাসকারী অমুসলিমরা মদ পান করতো। মদ প্রস্তুতে জাবিরের অবদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুসলিম বিজ্ঞান লেখক আহমদ ওয়াই.হাসান লিখেছেন, *'The distillation of wine and the properties of alcohol were known to Islamic chemists from the eighth century. The prohibition of wine in Islam did not mean that wine was not produced or consumed or that Arab alchemists did not subject it to their distillation processes. Jabir Ibn Hayyan described a cooling technique which can be applied to the distillation of alcohol.'*

অর্থাৎ *'অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলিম আলকেমিস্টরা মদ ও এলকোহলের ধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।* ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার মানে এই নয় যে, মদ তৈরি অথবা পান করা হতো না কিংবা আরব আলকেমিস্টরা তাদের পাতন প্রক্রিয়ায় তা ব্যবহার করতেন না। জাবির ইবনে হাইয়ান একটি শীতলীকরণ কৌশলের বর্ণনা *দিয়েছিলেন যা এলকোহল পাতনে প্রয়োগ করা যেতো।'*

পরশ পাথর সম্পর্কে জাবিরের বর্ণনা

'কিতাবুল ইসতিতমাম'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জাবির পরশ পাথর নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পরশ পাথরের রাসায়নিক উপাদানকে *'দেহ'* হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, *'বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ সাদা ও লাল পরশ পাথরের কথা বলছেন। আমরা মনে করি এটা সত্যি। কেননা যে পরশ পাথর তৈরি করা হয় তা সাদা বা লাল যা-ই হোক, তাতে পারদ ও গন্ধক ছাড়া অন্য কিছু নেই। একটি অন্যটি ছাড়া কাজ করতে পারে না বা থাকতে পারে না। সেজন্য বিজ্ঞানীরা একে একটি পাথর বলে আখ্যায়িত করছেন যদিও বহু দেহ থেকে এ জিনিস তৈরি হয়। যে জিনিসের মধ্যে দেহ নেই তা থেকে পরশ পাথর তৈরি করার আশা বোকামী এবং আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো কোনো আত্মম্ভরী লোক এমনি বলে থাকে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু কোনোদিনই এমন কথা বলেননি যদিও তারা রূপকের মাধ্যমে অনেক কিছুই বলছেন। সব ধাতব বস্তুই পারদ ও গন্ধকে তৈরি। দৈবক্রমে তারা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হয়, তবে প্রকৃতিগতভাবে নয়। সেজন্য সুবিধা মতো তার মধ্য থেকে অবিশুদ্ধতা বের করে নেয়া যেতে পারে। কেননা দৈব ঘটনাকে কাজে লাগানো অসম্ভব নয়। প্রস্তুতিকরণের আসল কথা হলো দেহের পূর্ণতা। তার মধ্যে যেসব জিনিস অতিরিক্ত মাত্রায় আছে সেগুলো বের করে নেয়া আর যেগুলো কম আছে সেগুলো তার মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেয়া। প্রস্তুতিকরণের উপায়ের ভিন্নতা নির্ভর করছে জিনিসের ভিন্নতার ওপর। অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন উপায়ও বের হয়ে এসেছে। যেমন-ভস্মীকরণ, উর্ধ্বপাতন, ইসতিনজাল, দ্রবণ, ঘন জমান, ঘনীভূতকরণ এবং তাশমি। এসব কাজই প্রস্তুতিকরণে সাহায্য করে।'*

www.pathagar.com

জাবির বিশ্বাস করতেন, কোনো একটি ধাতুর গুণ পরিবর্তন করে ফেললে তা ভিন্ন একটি ধাতুতে পরিণত হবে। এজন্য প্রয়োজন এলিক্সারের মতো অনুঘটক। এলিক্সারের সহায়তায় মৌলিক পদার্থের গুণাবলী পরিবর্তন করা সম্ভব। ধাতুর এ ধরনের রূপান্তর ইউরোপীয় আলকেমিতে পরশ পাথর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। 'বুক অব স্টোন'-এ জাবির গভীর রহস্যময়তার আবরণে তার যুক্তি পেশ করেছেন। বইটিতে তিনি পরশ মনি লাভে মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নির্ভুলভাবে দীর্ঘ সময় বিশেষ ধরনের নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

রসায়ন নিয়ে গবেষণা

জাবির যে সময় জন্ম নিয়েছিলেন সে সময় রসায়নকে জাদুবিদ্যা অথবা আধ্যাত্মিকতাবাদের নিদর্শন বলে মনে করা হতো। এমন ধারণা থেকে তাকে সুফি বলে আখ্যায়িত করা হতো। আসলে সুফিরাই হলেন ইসলামে রসায়নের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। জাবির ইবনে হাইয়ানের মূল কাজ ছিল রসায়ন নিয়ে গবেষণা। তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর জোর দিতেন এবং আলকেমিকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তাকে একটি বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন। তিনি আলকেমির দীর্ঘ ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেন। জাবির ঘোষণা করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অনুকরণ করার সামর্থ্য মানুষের আছে। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বাগদাদে। বাগদাদে তার রসায়নাগার ছিল।

জাবিরের অবদান মৌলিক। তিনি বস্তুজগৎকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে স্পিরিট, দ্বিতীয় ভাগে ধাতু এবং তৃতীয় ভাগে যৌগিক পদার্থ। তার এ আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বস্তুজগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- গ্যাসীয়, বায়ুবীয় ও কঠিন। জাবির এমন সব বস্তু বিশ্ব সভ্যতার সামনে তুলে ধরেন যেগুলোকে তাপ দিলে বাষ্পায়িত হয়। এ পর্যায়ে রয়েছে কর্পূর, আর্সেনিক ও এমোনিয়া ক্লোরাইড। তিনি কিছু মিশ্র ও যৌগিক পদার্থকে অনায়াসে চূর্ণে পরিণত করে দেখিয়েছেন। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা প্রভৃতিকে তিনি নির্ভেজাল বস্তুর পর্যায়ে ফেলেছেন। তার মতে, সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর মৌলিকত্ব নেই। এসব ধাতু পারদ আর গন্ধকের সমন্বয়ে গঠিত। ধাতু খনিতে যে নিয়মে গঠিত হয় একই নিয়মে মানুষও ঐসব ধাতু তৈরি করতে পারে। সীসা থেকে সীসা তৈরি করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি তার 'কিতাবুল খাওয়াস'-এ লিখেছেন, *'আধা সের সীসাম্ল এবং এক পোয়া সোডা লও। দু'টি একসঙ্গে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নাও। এ দু'টির মিশ্রণকে তেল দিয়ে ভালো করে মেখে নাও। এবার তেলে মাখানো গুঁড়োগুলোকে তলায় ছিদ্রবিশিষ্ট একটি পাত্রে রেখে দাও। এই পাত্র অন্য একটি পাত্রের ওপর রেখে ভালো করে তাপ দিতে থাকো। খানিকক্ষণ তাপ দেয়ার পর দেখবে বিশুদ্ধ সাদা ধাতু নিচের পাত্রে জমা হচ্ছে।'*

www.pathagar.com

একই গ্রন্থে তিনি শ্বেত সীসা প্রস্তুত করার প্রণালী সম্পর্কে লিখেছেন, *'আধা সের সীসাম্ল লও। এগুলোকে ভালো করে গুঁড়ো করে দু'সের পরিমাণ ভিনিগার ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে থাকো। জ্বাল দিতে দিতে ভিনিগার কমে যখন এক সের আন্দাজ দাঁড়াবে তখন পাত্রটি নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। এখন অন্য একটি পাত্রে আধা সের আন্দাজ সোডা দু'সের পরিমাণ পরিষ্কার পানির সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দাও। জ্বাল দিতে দিতে যখন পানির পরিমাণ কমে আধা সের আন্দাজ দাঁড়াবে তখন তা নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। দু'টি পাত্রে রক্ষিত তরল পদার্থ এবার ফিল্টার করে নাও। প্রয়োজন হলে বারবার ফিল্টার করে নিতে হবে যাতে তরল পদার্থের মধ্যে কোনো রকম ক্লেদ বা ময়লা না থাকে। এবার দু'টি পরিষ্কার দ্রবণকে আস্তে আস্তে একত্রে মিশাতে থাকো। সোডার দ্রবণ আস্তে আস্তে সীসাম্লের মধ্য দিয়ে ঢেলে নিয়ে নাড়তে থাকো। এই মিশ্রণে একটি সাদা সুন্দর জিনিস তৈরি হবে। এ সাদা জিনিসটি দ্রবণকে ঘোলাটে করে ফেলবে। আস্তে আস্তে জিনিসটি তলায় থিতিয়ে যাবে। সবটুকু নিচে থিতিয়ে গেলে ওপরের পানি ধীরে ধীরে ঢেলে ফেলো। নিচের থিতানো জিনিসগুলো তুলে নিয়ে শুকাতে দাও। তখন তুষার শুভ্র একটি জিনিস পাওয়া যাবে। এই জিনিসটিই হলো শ্বেত সীসা।'*

পারদকে লাল কঠিন পদার্থে পরিণত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, *'একটি গোলাকার কাঁচের পাত্রে খানিকটা পারদ লও। অন্য একটি মাটির পাত্রে খানিকটা গুঁড়ো করা হলুদ গন্ধক নাও। পারদ সমেত কাঁচের পাত্রটিকে মাটির পাত্রের ভেতর গন্ধকের ওপর বসিয়ে দাও। এবার কাঁচের পাত্রটির চারপাশে আরো গন্ধক দিয়ে মাটির পাত্রটিকে ভর্তি করতে থাকো যতক্ষণ না গন্ধক কাঁচের পাত্রের গলা পর্যন্ত পৌঁছায়। এভাবে গন্ধক দিয়ে ভর্তি করার পর মাটির পাত্রের মুখ ভালো করে বন্ধ করে নাও। এবার পাত্রটিকে চুলার ওপর বসিয়ে দিয়ে এক রাত জ্বাল দাও। পরদিন পাত্রটিকে চুলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে মুখ খুললেই দেখতে পাবে পারদ একটি রক্তবর্ণ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়েছে। তার রং হবে টকটকে রক্তের মতো লাল। এ জিনিসটিকে লোকে রক্ত পারদ বলে।'*

জাবির নাইট্রিক এসিডের নাম দিয়েছিলেন 'মাআল নুলাল' বা দ্রাবক পানি। 'কিতাবুল ইসতিতমাম'-এ তিনি নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রণালী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, *'আধা সের পরিমান সাইপ্রাসের ভিট্রিওল নাও। তার সঙ্গে এক সের পরিমাণ সল্ট পিটার এবং সিকি পরিমাণ ইয়েমেনী ফিটকিরি নাও। সবগুলোকে একসঙ্গে একত্রে একটি পাত্রে ভালো করে জ্বাল দিতে থাকো যতক্ষণ না এলেমবিক লাল হয়ে যায়। এবার উদ্ভূত তরল পদার্থটিকে বের করে নাও। এ পদার্থটি সব জিনিসকে দ্রব করে।'*

আরবীয় রসায়নে নিশাদল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। জীবিত নিশাদল সাধারণত শুষ্ক পাতন প্রণালীতে তৈরি করা হয়। ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত জাবিরের অনূদিত বই 'দ্য ইনভেস্টিগেশনি পারফেকশনিস'-এ নিশাদল তৈরির বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিখেছেন, *'পাঁচ ভাগ বা দু'ভাগ মানুষের প্রস্রাব, এক*

www.pathagar.com

ভাগ মানুষের ঘাম, এক ভাগ লবণ ও দেড় ভাগ কাঠের ঝুল একসঙ্গে করে এগুলো থেকে কার্যকরী নিশাদল উৎক্ষেপ করে নাও। এই উৎক্ষেপ আবার ঘামে গলিয়ে নিয়ে জমিয়ে নাও। পরে আবার সাধারণ লবণ থেকে উৎক্ষেপ করো। তাহলেই ঠিকভাবে প্রস্তুত হবে। অথবা একে সাধারণ লবণের সঙ্গে চূর্ণ করে লম্বা এলুডেলে করে উৎক্ষেপ করো যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর যদি সম্ভব হয় তাহলে পানি দিয়ে স্বাভাবিক মুক্ত বায়ুতে একটি পারফিরি পাত্রে গলিয়ে রেখে দাও। অন্যথায় একে ভালোভাবে উৎক্ষেপ করে শুদ্ধ অবস্থায় রেখে দাও।'

জাবিরের রাসায়নিক মতবাদ

জাবির তার 'কিতাব ইলমেস সানাতিল ইয়াহিয়া ওয়াল হিকমাতিল ফালাসাফিয়াত'-এ রসায়ন শাস্ত্রের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী রসায়ন হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। এ শাস্ত্রে দ্রবণীয় বস্তু বা ধাতুগুলোর গঠন প্রণালী খুঁজে বের করা হয় এবং খনিতে কিভাবে আগুনের সাহায্যে ধাতু উৎপন্ন হয় সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হয়। জাবির 'কিতাব আল-রহমাহ'তে ধাতু নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটিতে তিনি রাসায়নিক বস্তুগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক প্রকারের রাসায়নিক বস্তু হলো 'জীবিত' এবং আরেক প্রকারের রাসায়নিক বস্তু হলো 'মৃত'। রুক্ষ মাটির মতো অপরিষ্কার জিনিসগুলো ছিল তার মতে মৃত। আর যেগুলো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ সেগুলো হলো জীবিত। তার মতে, প্রত্যেক রাসায়নিক বস্তুই অন্যান্য জীব জন্তুর মতো 'দেহ' ও 'আত্মা'র সমন্বয়ে গঠিত। তার একটি হলো দৈহিক আর অন্যটি হলো আধ্যাত্মিক অংশ। রসায়নবিদের কাজ হলো 'দেহ' ও 'আত্মা'কে ঠিক মতো ভাগ করা এবং যে দেহে যে রকম আত্মা খাপ খায় তাকে সেভাবে সেখানে স্থাপন করা। আত্মাকে যথোপযুক্ত দেহে স্থাপন করার মধ্য দিয়েই রাসায়নিক ধাতুকে রূপান্তরিত করা যায়। জাবিরের মতে, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো নাগাদ জীবনী শক্তিসম্পন্ন জিনিসগুলো হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে এবং এ অবস্থায় তাদের ক্রমবিকাশ ঘটে। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হয়। এগুলো প্রথমে থাকে একেবারে অশুদ্ধতম অবস্থায়। তারপর ধীরে ধীরে তাদের সংশোধন ঘটে। বহু বছর পর এগুলো স্বর্ণে পরিণত হয়। প্রথমত: যেগুলো শুকনো ও ধোঁয়াটে সেগুলো গন্ধকের মতো দ্রব্যে পরিণত হয়। যে জিনিসগুলো ভেজা ও বাষ্পীয় সেগুলো পারদের আকার নেয়। এমনিভাবে তাদের গঠনের কাজ চলতে থাকে। প্রত্যেক বস্তুই এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তাদের মধ্যে পারদ ও গন্ধক থাকে। বিজ্ঞানীর কাজ হলো ধাতুর এ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা।

জাবিরের বিভিন্ন বই পুস্তকে পারদ ও গন্ধকের থিওরি খুঁজে পাওয়া যায়। 'কিতাবুল ইজাহ'তে তিনি বলেছেন, *'ধাতুগুলো আসলে পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণ। একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ গুণের পার্থক্য। এদের অভ্যন্তরীণ গুণের পার্থক্যের জন্য গন্ধক দায়ী। আবার স্থান ও সূর্যের তাপের জন্য গন্ধকের গুণের*

www.pathagar.com

এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বহু ধরনের গন্ধক রয়েছে। তবে সবচেয়ে ভালো গন্ধক হলো সোনালী রংয়ের। সোনালী রংয়ের গন্ধকের সঙ্গে পারদ যুক্ত হলে সোনা তৈরি হয়। সোনা আগুনে পোড়ে না। এখানেই সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর পার্থক্য।'

'আল-কুতুব মিয়াত ওয়া এছনা আশার কিতাবান'-এর প্রথম খণ্ডে পারদ ও গন্ধক তৈরির থিওরি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে জাবির স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ৭টি দ্রবণীয় দ্রব্যের সমন্বয়ে পারদ ও গন্ধক গঠিত। 'কিতাবুল ইসতিতমাম'-এ তিনি বলেছেন, *সব ধাতুই গন্ধক ও পারদে তৈরি।* 'কিতাবুল খাওয়াস'-এর দশম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন, *সব খনিজ পদার্থই গন্ধক, পারদ, সোনা ও নিশাদলের সমন্বয়ে গঠিত।* তার মতে, ধাতুর মধ্যকার পারদের জন্যই তাকে গলানো, সংকোচন ও প্রসারণ করা সম্ভব হয়। পারদের ওপর ধাতুর ঔজ্জ্বলের তারতম্য নির্ভর করে। যে ধাতুতে পারদের পরিমাণ বেশি সে ধাতু তত বেশি উজ্জ্বল। পারদের আধিক্যের জন্য স্বর্ণ ও রূপাকে উজ্জ্বল দেখায়। গন্ধকের ভিন্ন মাত্রার জন্য স্বর্ণ ও রূপার বর্ণ ভিন্ন হয়। স্বর্ণে রয়েছে হলদে গন্ধক। তাই তার রং হলদে। অন্যদিকে শ্বেত গন্ধক থাকায় রৌপ্যকে শ্বেত বর্ণের বলে মনে হয়। পারদ সহজে অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশে যায়। মিশে যাবার ক্ষমতাই 'পারদ' নামে পরিচিত। জাবির মনে করতেন, পুড়ে যাবার মানে হলো রাসায়নিক বস্তু থেকে গন্ধক জাতীয় জিনিসের অপসারণ। অপরিষ্কার ধাতুগুলোকে পুড়িয়ে পরিষ্কার করার সময় যে ধোঁয়া তৈরি হয় সেই ধোঁয়াই গন্ধক জাতীয় জিনিস। জাবিরের মতে, গন্ধক এক জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ।

'উসকুকাসিল আস'-এ রসায়নে ব্যবহৃত জিনিসগুলো কিভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় তিনি তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, *'যারা আহজার (পাথর) ব্যবহার করার পক্ষপাতী তাদের মতে, রসায়নের জ্ঞান আহজারের মধ্যেই নিহিত। জীবিত বা উদ্ভিদ জাতীয় জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান বা ব্যবহারের মধ্যে নয়। তারা বলেন, রসায়নবিদরা আহজারের বর্ণনা দেয়ার সময় ধাতব পদার্থগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অন্য কোনো কিছুর প্রতি তারা খেয়াল রাখেন না। এ ধাতব পদার্থগুলো হলো গন্ধক, জারনিখ (আর্সেনিক সালফাইড), পারদ ও আজসাদ (বস্তু)। রসায়নবিদগণ ধাতব পদার্থগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো রুহ (আরওয়াহ), জিসম (আজসাম), নফস (নুফুস) ও জসদ (আজসাদ)। রসায়নবিদগণ পদার্থগুলোর ভেতরকার পার্থক্যও বর্ণনা করেছেন। যেসব জিনিস আগুনের তাপে উবে যায় সেগুলো হলো আরওয়াহ। ৬টি গন্ধক, জারনিখ, নিশাদল (সালএমোনিয়াক), কর্পূর, তৈল ও পারদের মধ্যে তিনটি বস্তু আগুনে পোড়ে এবং যেসব জিনিস তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরকেও তারা পোড়ায়। এই তিনটি পদার্থ হলো গন্ধক, জারনিখ ও তৈল। অন্য তিনটি জিনিস আগুনের তাপে উবে যায়। এ জিনিসগুলো নিজেরাও পোড়ে না এবং অন্য জিনিসকেও পোড়াতে সহায়তা করে না। এগুলো হলো নিশাদল, পারদ ও কর্পূর। রসায়নবিদরা রুহ (স্পিরিট) শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় তার অর্থ হলো কার্যকরী টিংচার। কেননা জিসমের ভেতর বেশ পরিমাণ রূহ অবস্থান করে। এ*

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে বলা হয়, আমাদের জিনিসগুলোতে জিসমের (জড় পদার্থ) অংশ কম এবং আত্মার অংশ বেশি। এজন্য আহজারের সামান্য অংশ অনেকখানি অজৈব পদার্থকে রঞ্জিত করতে পারে।'

ল্যাভুয়াশিয়েঁর গোচরে ধাতুর গঠন সম্পর্কে জাবিরের মতবাদ

ধাতুর গঠন সম্পর্কে জাবিরের মতবাদ ফরাসি বিজ্ঞানী এন্টোয়িন ল্যাভুয়াশিয়েঁর গোচরীভূত হয়েছিল। তবে সরাসরি জাবিরের মতবাদ হিসাবে নয়। ১৬৬৭ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী জোহান জোয়াসিম বেচার 'ফোজিস্টন' নামে একটি তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেন। জাবির এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ফোজিস্টন হলো এমন একটি ধাতু যার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ নেই। তাকে একটি মৌলিক ধাতু হিসাবে গণ্য করা হয়। জাবিরের যুগে বিশ্বাস করা হতো যে, ভূগর্ভ থেকে দু'টি নির্গমনের মধ্য দিয়ে পাথর ও ধাতু গঠিত হয়েছে। জাবির ধাতু গঠনের এ তত্ত্ব মেনে নেন। তবে মনে হয় তিনি এ তত্ত্বকে অপর্যাপ্ত হিসাবে ধারণা করছিলেন। তাই তিনি অস্পষ্টতা দূর করতে এ তত্ত্ব সংশোধন করেন। পর্যবেক্ষণ থেকে জাবির এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, যেসব পদার্থের সমন্বয়ে পারদ ও গন্ধক গঠিত সেগুলো সুপরিচিত পদার্থ নয়। বরং এগুলো হচ্ছে কাল্পনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভূগর্ভস্থ দু'টি নির্গমনে তাৎক্ষণিকভাবে খনিজ পদার্থ অথবা ধাতু গঠিত হয়নি। তাকে মধ্যবর্তী একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। ভূগর্ভ থেকে প্রথম নির্গমনে শুষ্ক অথবা ধোঁয়াটে বস্তু গন্ধক এবং দ্বিতীয়বার জলীয় বস্তু নির্গমনে পারদ তৈরি হয়। পরবর্তীতে কেবলমাত্র গন্ধক ও পারদের সমন্বয়ে ধাতু গঠিত হয়েছে। জাবিরের এ মতবাদ স্থায়ী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার মতবাদ আরো সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। তার এ সংশোধিত মতবাদই ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাভুয়াশিয়েঁর কাছে পৌঁছেছিল। এ ব্যাপারে ই. জে. হোমইয়ার্ড তার 'দ্য ওয়ার্কস অব জাবির' শিরোনামে গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, *'That this theory has all the bad qualities which Lavoisier found in the theory of phlogiston several hundred years later can not be denied, but it represented a distinct advance upon any theory which had preceeded it and satisfied the intellectual curiosity of many brilliant scientists for a very lengthy period. The Phlogiston theory itself has been described as the lamp and guide of chemists during the eighteenth century and the time-honoured and highest generalisation of physical chemistry for over half a century, was a direct descendent of Gabir's theory of the constitution of metals.'*

অর্থাৎ *'সব মন্দ গুণ সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী পরে ল্যাভুয়াশিঁয়ে ফোজিস্টন তত্ত্বে এ মতবাদ দেখতে পেয়েছিলেন। এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ মতবাদ ছিল*

www.pathagar.com

তার আগের যে কোনো তত্ত্বের চেয়ে একটি সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি। এ মতবাদ একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বহু মেধাবী বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল নিবৃত্ত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফোজিস্টন তত্ত্বকে রসায়নের একটি আলোকবর্তিকা ও চালিকা হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো এবং অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তা ছিল পদার্থবিদ্যা বিষয়ক রসায়নে সবচেয়ে সময়োচিত ও সর্বোচ্চ প্রয়োগযোগ্য। এ তত্ত্ব ছিল ধাতু গঠনে জাবিরের মতবাদের সরাসরি পরবর্তী মতবাদ।'

জাবিরের গুরু ইমাম জাফরের মতবাদ

জাবিরের যুগে এরিস্টোটলের পদার্থ বিজ্ঞান নয়া প্লেটোবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরিস্টোটলের মতবাদে প্রতিটি মৌলিক পদার্থের গঠনে কতগুলো অভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করা হতো। জাবিরের গুরু ইমাম জাফর সাদিক এরিস্টোটলের চারটি মৌলিক উপাদানের তত্ত্ব খণ্ডন করে আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি মৌলিক উপাদান বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গঠিত। তিনি মন্তব্য করেন, *'আমি ভেবে বিস্মিত হই যে, এরিস্টোটলের মতো কোনো ব্যক্তি কিভাবে বলতে পারেন যে, পৃথিবীতে কেবলমাত্র মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন- এ চারটি উপাদান থাকতে পারে? মাটি কোনো উপাদান নয়। বহু উপাদানের সমন্বয়ে মাটি গঠিত। প্রতিটি ধাতু এক একটি উপাদান। মাটিতে এমন বহু উপাদানের অস্তিত্ব বিদ্যমান।'*

ইমাম জাফর সাদিক একটি অণু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি তার অণু তত্ত্বে বলেন, *'একটি ক্ষুদ্র বস্তু কণা থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তাতে ছিল দু'টি বিপরীত মেরু। ঐ বস্তু কণা একটি অতি ক্ষুদ্র কণা বা এটম তৈরি করে। এভাবে পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। তারপর পদার্থ বিভক্ত হয়ে যায়। এটমের দুষ্প্রাপ্যতা অথবা ঘনত্বে এ বিভক্তি ঘটে।'*

জাফর সাদিক পদার্থের জড়তা ও স্বচ্ছতার ওপর আরেকটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি তার এ তত্ত্বে বলেন, যেসব বস্তু কঠিন ও শোষণক্ষম সেগুলো অস্বচ্ছ এবং যেসব পদার্থ কঠিন ও আকর্ষণহীন সেগুলো কম বা বেশি স্বচ্ছ। তিনি আরো উল্লেখ করেন, অস্বচ্ছ পদার্থ তাপ শোষণ করে।

মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জাবিরের ধারণা

জাবির উত্তাপ, শীতলতা, শুষ্কতা ও আদ্রর্তা-এ চারটি মৌলিক গুণের ভিত্তিতে এরিস্টোটলের উল্লেখিত প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণ করেন। তার মতে, প্রতিটি ধাতুতে দু'টি গুণ অভ্যন্তরীণ এবং অন্য দু'টি গুণ বাহ্যিক। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সীসা অভ্যন্তরীণভাবে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক। অন্যদিকে স্বর্ণ উত্তপ্ত ও আর্দ্র। জাবির বিশ্লেষণ করে বলেন যে, কোনো ধাতুর গুণাবলী পরির্বতন করা হলে একটি ভিন্ন ধাতুর জন্ম হবে। তিনি ভিন্ন পদ্ধতিতে তার তত্ত্ব প্রমাণ করেন। তিনি মনে করতেন, মৌলিক বা প্রাকৃতিক গুণাবলী চারটি। সেগুলো হলো: তাপ, শুষ্কতা, শীতলতা ও আর্দ্রতা। এ চারটি উপাদান বস্তুর সঙ্গে একত্রিত হলে প্রথম মানের মিশ্রণ তৈরি হবে।

www.pathagar.com

উপাদানগুলোর তিনটি একত্রিত হলে তৈরি হবে:

উষ্ণতা+ শুষ্কতা+ বস্তু= আগুন

উষ্ণতা+ আর্দ্রতা+ বস্তু= বাতাস

ঠাণ্ডা+ আর্দ্রতা+বস্তু= পানি

ঠাণ্ডা+শুষ্কতা+বস্তু= মাটি

জাবিরের বইয়ের পরিচয় নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি

জাবিরের জন্ম তারিখ নিয়ে গোলমাল দেখা দেয়ায় ল্যাটিন ভাষায় তার অনূদিত বইগুলোর পরিচয় নিয়ে বিভ্রাট ঘটে। সন্দেহবাদীদের একদলে রয়েছেন জার্মান পণ্ডিত জে. রুসকা ও পল ক্লাউস। অন্য দলে রয়েছেন ইংরেজ পণ্ডিত ই. জে. হোমইয়ার্ড ও গণিতের ঐতিহাসিক জি. সারটন। উভয়দলই জাবিরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং তিনি রসায়ন শাস্ত্রর ওপর প্রচুর বই লিখেছেন বলে স্বীকার করছেন। প্রথম দলের মতে, জাবির অষ্টম শতাব্দীর লোক নন। আর যদি অষ্টম শতাব্দীর লোক হয়েও থাকেন তাহলেও তার নামে যেসব বই পুস্তক দেখা যায় সেগুলোর সব তার লিখা নয়। দ্বিতীয় দলের মতে, জাবির অষ্টম শতাব্দীর লোক। গ্রন্থগুলো তার নিজের এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা।

জাবিরের জন্ম তারিখ নিয়ে বিভ্রাট ছাড়া আরো দু'টি কারণে এ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। একটি কারণ হলো মুসলিম পণ্ডিত ইবনে নাদিমের অভিমত এবং দ্বিতীয় কারণটি হলো ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত ৫টি বইয়ের মূল আরবী কপির অপ্রাপ্যতা। এ ৫টি বই হলো:

(১) লাইবার (জিবারি) দ্য ট্রান্সমিউটেশনি মেটালোরাম

(২) দ্য ইনভেস্টিগেশনি পারফেকশনিস

(৩) দ্য ইনভেনশনি ভেরিটাটিস

(৪) লাইবার ফোরনাকাম

(৫) টেসরামেন্টাম জিবারি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে আলোচিত বইগুলো সম্পর্কে কেউ কোনো উল্লেখ করেননি। ইবনে খাল্লিকান ও হাজী খলিফাও মূল আরবী গ্রন্থের কোনো উল্লেখ করেননি। এখান থেকে বইগুলোর পরিচয় নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিজ্ঞানী হেরম্যান কোপ প্রথম সন্দেহ ঢোকান। তিনি জার্মান রসায়নবিদ গুস্তাভ বাইলের সহায়তায় কথিত 'জিবার' ও জাবির ইবনে হাইয়ানের জ্ঞাত সব তথ্য সংগ্রহ করেন। হেরম্যান কোপ এবং গুস্তাভ বাইল উভয়ে ছিলেন আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, জিবারের নামে প্রচলিত সবগুলো বই জাবিরের কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তারা ধারণা করছিলেন যে, 'জিবার' ও জাবির এক ব্যক্তি নন, দু'জন। 'জিবার' ল্যাটিন এবং জাবির আরব। তাদের এ ধারণা মোটেই সঠিক ছিল না। মঁসিয়ে বার্থেলট

www.pathagar.com

তার 'লা চিমাই আউ মোয়েন এজ'-এ উল্লেখিত পণ্ডিতদের সন্দেহের প্রতি সায় দেন। বার্থেলট জাবিরের ৯টি বই সম্পাদনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলো জাবিরের নয়।

জাবিরের প্রতি বার্থেলটের এ অবিচারের প্রতিবাদে গণিতজ্ঞ ই. জে. হোমইয়ার্ড 'এ ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশন অব বার্থেলট ওয়ার্কস আপন এরাবিক কেমিস্ট্রি' শিরোনামে এক গবেষণাধর্মী লেখায় বলেছেন, *'Fortunately for chemistry, this man of genius and unbounded energy was drawn towards natural sciences and encouraged by Imam Jafar al-Sadiq turned his attention to the study of the composition of substances obtained from minerals, plants and animals. His writings prove that this study meant to him not merely the reading of books but the close investigation of Nature and a stern discipline in the laboratory. It has to be said that Berthelot, having made up his mind- on what seem to be insufficient grounds- that the Latin Jeber is not to be identified with the Arab Jabir Ibn Hayyan, appears deliberately to underrate the latter; he certainly gives an entirely false idea of Jabir's scientific ability.'*

অর্থাৎ *'রসায়নের জন্য সৌভাগ্য যে, এই মেধাবী ও অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী লোকটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ইমাম জাফর আল-সাদিকের উৎসাহে খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলোর গঠন অধ্যয়নে তার মনোযোগ নিবিষ্ট করেছিলেন। তার লেখালেখি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিছক বই পাঠ করা তার অধ্যয়নের লক্ষ্য* ছিল না বরং প্রকৃতির নিবিড় অনুসন্ধান এবং গবেষণাগারে কঠোর গবেষণা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। উল্লেখ করা *প্রয়োজন যে, বার্থেলট দৃশ্যত অপর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, ল্যাটিন জিবারকে আরব জাবির ইবনে হাইয়ানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তাতে মনে হচ্ছে, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে খাটো করছেন। তিনি জাবির ইবনে হাইয়ানের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য সম্পর্কে পুরোপুরি ভুল ধারণা দিচ্ছেন।'*

১৯২২ সালে পণ্ডিত ডার্মসটীডটার্স জিবারের নামে প্রচলিত ল্যাটিন গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। তবে তিনি জিবার সম্পর্কে অথবা কোন কোন বই অবলম্বনে ল্যাটিন ভাষায় বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেননি। জে. রুসকা-ও এ ৫টি বইয়ের মূল লেখক সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত বইগুলো জাবির ইবনে হাইয়ানের নয়। সম্ভবত পাশ্চাত্যের কোনো পণ্ডিত বইগুলো রচনা করেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করেও তিনি নিজের নামের পরিবর্তে জাবিরের ল্যাটিন নাম জিবারের নামে বইগুলো চালিয়ে দেন। কথিত ল্যাটিন 'জাবির' ও জাবির ইবনে হাইয়ান যে আসলে একই ব্যক্তি 'দ্য ওয়ার্কস অব জিবার' শিরোনামে গ্রন্থে গণিতজ্ঞ

www.pathagar.com

হোমইয়ার্ড তা অকপটে স্বীকার করেছেন। বইটির ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, *'It is certain that Geber is none other than the greatest chemist of Islam, Gabir Ibn Hayyan and that some of Gabir's books were translated into Latin in the Middle Ages.'* অর্থাৎ *'একথা নিশ্চিত যে, জিবার ইসলামের শ্রেষ্ঠতম রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ছাড়া আর কেউ নন এবং মধ্যযুগে জাবিরের কয়েকটি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়।'*

জাবিরকে রসায়নের জনক হিসাবে স্বীকৃতি

কেউ কেউ ফরাসি বিজ্ঞানী এন্টোয়িন লরা ল্যাভুয়াশিয়েঁকে আধুনিক রসায়নের জনক হিসাবে আখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বিশেষ করে জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন আধুনিক রসায়নের জনক। বিজ্ঞান লেখক ও ঐতিহাসিকগণ জাবিরকে এ শাস্ত্রের জনক হিসাবে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। ঐতিহাসিকদের অভিমতগুলো একে একে উল্লেখ করলেই রসায়নে জাবির ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে ইংরেজ দার্শনিক ব্যাকনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, *'Jabir Ibn Hayyan is the first to teach the science chemistry to the world, he is the father of chemistry.'* অর্থাৎ *'জাবির ইবনে হাইয়ান বিশ্বকে প্রথম রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি হলেন রসায়নের জনক।'*

এবার 'ওয়ার এন্ড দ্য কালচার্যাল হেরিটেজ অব ইরাক'-এর লেখক জন ওয়ারেন এবং 'অন ওয়াইন, চারালিটি এন্ড ক্রিস্টালোগ্রফি'র লেখক ডেরিওয়েন্ডারের অভিমত উল্লেখ করা হলো। এ দু'জন লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে উইকিপিডিয়াঃ দ্য ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া'য় 'হিস্টরি অব কেমিস্ট্রি' শিরোনামে একটি রচনায় বলা হয়, *'The development of the modern scientific method was slow and arduous, but an early scientific method for chemistry began emerging among early muslim chemists, beginning with the 9th century chemist Jabir Ibn Hayyan, who is considered as the father of chemistry. He introduced a systematic and experimental approach to scientific research based in the laboratory in contrast to the ancient Greek and Egyptian alchemists whose works were largely allegorical and often unintelligible. He also invented and named the alembic (al-anbiq), chemically analyzed many chemical substances, composed lapidaries, distinguish between alkalis and acids and manufactured hundreds of drugs. He also refined the theory of*

www.pathagar.com

five classical elements into the theory of seven alchemical elements after identifying mercury and sulphur as chemical elements.'

অর্থাৎ *'আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়ন ছিল ধীর এবং দুঃসাধ্য। তবে প্রাথমিক যুগের মুসলিম রসায়নবিদদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে রসায়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা হয়। নবম শতাব্দীর রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ানের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে রসায়নে এ অগ্রগতি ঘটে। জাবিরকে রসায়নের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি প্রাচীন গ্রীক ও মিসরীয় অপরসায়নবিদের বিপরীতে গবেষণাগারভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধারাবাহিক ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালু করেন। গ্রীক ও মিসরীয় অপরসায়নবিদদের কর্ম ছিল মূলত রূপক এবং কখনো কখনো দুর্বোধ্য। তিনি চোলাইযন্ত্র (আল-আনবিক) আবিষ্কার এবং এ যন্ত্রের নামকরণ করেছেন, বহু রসায়নিক উপাদান রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, রত্নপাথর তৈরি করেছেন, ক্ষার ও অম্লের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং শত শত ওষুধ তৈরি করেছেন। তিনি পারদ ও সালফারকে রাসায়নিক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তারপর তিনি ৫টি ক্লাসিক্যাল উপাদানের তত্ত্বকে ৭টি আলকেমিক্যাল উপাদানের তত্ত্বে রূপান্তরিত করেছেন এবং এভাবে তিনি এ তত্ত্বকে সংশোধনও করেছেন।'*

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টোটলের অবদান যতটুকু, আজকের রসায়নে জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদানও ঠিক ততটুকু। জাবিরকে এরিস্টোটলের সঙ্গে তুলনা করে ফরাসি পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্থেলট লিখেছেন, *'That Jabir in the chemistry of what Aristotle in logic.'* অর্থাৎ *'যুক্তিবিদ্যায় এরিস্টোটল যা রসায়নে জাবির হলেন তাই।'* রসায়ন বিজ্ঞানে জাবিরের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে ম্যাক্স মায়ারহোফ মন্তব্য করেছেন, 'ইউরোপে আলকেমি ও কেমিস্ট্রির পুরো ইতিহাসে তার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে।'

এরিক জন হোমইয়ার্ড তার 'আলকেমি' শিরোনামে গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের রসায়নের প্রাণপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন, *'The word alchemy and its modern formation, chemistry came directly from the Arabic and provide reminders that in the early Middle Ages the principal students of the Art·were Muslims.'* অর্থাৎ *'শব্দগতভাবে আলকেমি এবং আলকেমির আধুনিক রূপ রসায়ন সরাসরি* এসেছে আরবী থেকে এবং স্মারক হিসাবে রসায়ন প্রমাণ করছে যে, মধ্যযুগের সূচনাকালে মুসলমানরা ছিল এ বিদ্যার মূল অধ্যয়নকারী।'

রসায়নে আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবিস্মরণীয় অবদান তুলে ধরতে গিয়ে উইল ডুরান্ট 'দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশন ফোর: দি এজ অব ফেইথ'-এ লিখেছেন, *'Chemistry as a science was almost created by the Muslims; for in this field, where the Greeks (so far as we know) were confined to industrial experience and vague hypothesis, the*

www.pathagar.com

Saracens introduced precise observation, controlled experiment and careful records. They invented and named the alembic (al-anbiq), chemically analyzed innumerable substances, composed lapidaries, distinguished alkalis and acids, investigated their affinities, studied and manufactured *hundreds of drugs. Alchemy, which the Muslims inherited from Egypt, contributed to chemistry by a thousand incidental discoveries and by its method, which was the most scientific of all medieval operations.'*

অর্থাৎ *'বিজ্ঞান হিসাবে রসায়ন হলো মুসলমানদের সৃষ্টি। কেননা, যেখানে এ ক্ষেত্রে গ্রীকরা ছিল (এ পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি) শিল্প ও অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে মুসলমানরা নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সযত্ন রেকর্ড সংরক্ষণ করেছে। তারা এলেমবিক (আল-আনবিক) আবিষ্কার এবং তার নামকরণ করেছে, রাসায়নিকভাবে অসংখ্য উপাদান বিশ্লেষণ করেছে, মূল্যবান পাথর কাটার যন্ত্র তৈরি করেছে, আলকালি ও এসিডকে পৃথক করেছে এবং এ দু'টির সাদৃশ্য অনুসন্ধান করেছে, শত শত ওষুধ পরীক্ষা ও উৎপাদন করেছে। মিসর থেকে মুসলমানরা উত্তরাধিকারসূত্রে আলকেমি লাভ করে। ঘটনাক্রমে আলকেমি শত শত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রসায়নে অবদান রেখেছে। আলকেমির পদ্ধতি ছিল মধ্যযুগের সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক।'*

বিজ্ঞানের ইতিহাসের জনক জর্জ সারটন 'ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এ লিখেছেন, *'We find in his (Jabir) writings remarkably sound views on methods of chemical research, a theory on the geologic formation of metals (the six metals differ essentially because of different proportions of sulphur and mercury in them); preparation of various substances (e.g. basic lead carbonatic, arsenic and antimony from their sulphides).'*

অর্থাৎ *'আমরা তার (জাবির) লেখালেখিতে রাসায়নিক গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ দৃঢ় অভিমত, ধাতুর (সালফার ও পারদের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ৬টি ধাতু একে অন্য থেকে পৃথক) ভৌত গঠনের তত্ত্ব, বিভিন্ন উপাদানের প্রস্তুত (যেমন–সালফাইড থেকে মৌলিক সীসা কার্বন, আর্সেনিক ও এন্টিমনি) প্রণালী খুঁজে পাই।'*

রসায়নে মুসলমানদের মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে সর্বশেষ উল্লেখ করা হলো ড. রাগহেব ইলসারগানির একটি অভিমত। ইসলাম স্টোরি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'মুসলিমস এন্ড দি ইনভেনশন অব কেমিস্ট্রি' শিরোনামে একটি নিবন্ধে ড. ইলসারগানি লিখেছেন, *'Chemistry is considered an Islamic Science by all means, as the word chemistry had not even been invented in any language or civilization before the Islamic civilization;*

www.pathagar.com

neither the ancient Egyptian nor the Greek civilization. In European languages, the word `Chemistry' is written as `Alchemaie'. It is a well-known fact that every Latin word that starts with `Al' has an Arabic origin. An example of that would be `alcohol' and `algebra'... etc.'

অর্থাৎ *'যে কোনো বিচারে রসায়নকে একটি ইসলামী বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেননা ইসলামী সভ্যতার আবির্ভাবের আগে রসায়ন শব্দটি কোনো ভাষা অথবা সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি প্রাচীন মিসরীয় ও গ্রীক সভ্যতায়ও নয়। ইউরোপীয় ভাষায় 'কেমিস্ট্রি' শব্দটি লিখা হয় 'আলকিমিয়া' হিসাবে। একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, 'আল' দিয়ে যেসব ল্যাটিন শব্দ লিখা শুরু হয় তাদের প্রত্যেকটির উৎপত্তি আরবীতে। তার উদাহরণ হলো 'আলকেমি', 'এলজাব্রা' ইত্যাদি।'*

জাবিরের রচনাবলী

জাবির তিন হাজারের মতো গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা পেয়েছিলেন সেগুলোর ফলাফলই ছিল তার গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রসায়নে ২৬৭টি, যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক ৩০০টি, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ৫০০টি, দর্শনে ৩০০টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ৩০০ টি, দার্শনিক যুক্তি খণ্ডন করে লেখা আরো পাঁচ শত বই উল্লেখযোগ্য। তার গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হলেও কোনো কোনোটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দুই কিংবা চারের বেশি নয়। তার 'দ্য ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েলভ বুক' নামে পরিচিত একটি সংগ্রহ খলিফা হারুনুর রশীদের বারমাকী মন্ত্রীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। 'এমারাল্ড টেবলেট'-এর আরবী ভাষ্য হলো এ সংগ্রহের একটি অংশ। বইটিতে অপরসায়নের পুনঃপুন পরীক্ষা এবং উৎসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষায় বইটি প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে যায়। বইটি পাঠ করে ইউরোপীয় অপরসায়নবিদরা বিস্মিত হয়েছিলেন। জাবিরের 'কিতাব আল-সাবিন'-এর ইংরেজি শিরোনাম 'দ্য বুক অব সেভেনটি'। বইটিতে ৭০ টি প্রবন্ধ। ৩১ থেকে ৭০ পর্যন্ত প্রবন্ধগুলোয় খনিজ পদার্থ এবং প্রথম ৩০টি প্রবন্ধে প্রাণী ও শাক সবজি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'কিতাব আল-জহর' (Book of Venus) এবং 'কিতাব আল-আহজার' (Book of Stone) শিরোনামের দু'টি বইও উল্লেখযোগ্য। 'দ্য টেন বুক অন র‍্যাটিফিকেশন' (The Ten Book on Ratification)-এ পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটলের মতো আলকেমিস্টদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। 'দ্য বুক অব ব্যালেন্স' (The Book of Balance) নামে পরিচিত বইটিতে রয়েছে জাবিরের বিখ্যাত 'থিওরি অব দ্য ব্যালেন্স ইন ন্যাচার' (Theory of the Balance in Nature)।

আলকেমির ওপর জাবিরের লেখা বইগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বইগুলো ইউরোপীয় আলকেমিস্টদের কাছে মানসম্মত বই হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১১44 সালের ১১ ফেব্রুয়ারি চেস্টারের রবার্ট 'বুক অব দ্য কম্পোজিশন অব আলকেমি' শিরোনামে জাবিরের 'কিতাব আল-কিমিয়া' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। জাবিরের এ বইটি

www.pathagar.com

অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আলকেমির যাত্রা শুরু হয়। উমাইয়া যুবরাজ খালিদ ইবনে ইয়াজিদ এবং একজন সন্ন্যাসির মধ্যকার সংলাপ হলো 'কিতাব আল-কিমিয়া'র বিষয়বস্তু। 'বুক অব দ্য কম্পোজিশন অব আলকেমি'র ভূমিকায় রবার্ট লিখেছেন, *'বইটি অনুবাদ করার সময় ল্যাটিন ইউরোপ ছিল আলকেমি সম্পর্কে অজ্ঞ।'* ১১৮৭ সালে ক্রিমোনার গেরার্ড 'লাইবার সেপটুয়াজিনতা' শিরোনামে জাবিরের 'কিতাব আল-সাবিন' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। মঁসিয়ে বার্থেলট 'বুক অব দ্য কিংডোম', ' লিটল বুক অব দ্য ব্যালেন্সেস', 'বুক অব মারকিউরি এন্ড কনসেন্ট্রেশন' এবং 'বুক অব দি ইস্টার্ন মারকিউরি' প্রভৃতি শিরোনামে তার কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। জাবিরের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো:

(১) কিতাবু উসতু কাসিল উসিল আউয়াল ইলাম বারামিকা
(২) কিতাবু উসতু কাসিল আসিস ছানি ইলাইহিম
(৩) কিতাবুল কামালে হুয়াহু সালেছ ইলাইহিম
(৪) কিতাবুল ওয়াহিদুল কাবির
(৫) কিতাবুল ওয়াহিদিস সাগির
(৬) কিতাবুর রুকোনে
(৭) কিতাবুল বাইয়ান
(৮) কিতাবুত তারতীব
(৯) কিতাবুল নূর
(১০) কিতাবুস সিবগিল আহমার
(১১) কিতাবুল খামাইরিস কাবির
(১২) কিতাবুল তাদাবিরুর রাইয়া
(১৩) কিতাব ইউরাফু বিস ছালিস
(১৪) কিতাবুর রুহ
(১৫) কিতাবুয যিবাক

মৃত্যু

বিশ্ববিখ্যাত এ মনীষীর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো সূত্রে বলা হয়, তিনি ৮০৩ সালে কুফায় গৃহবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। হাজী খলিফার মতে, তিনি ৭৭৬ সালে ইন্তেকাল করেছেন। হাজী খলিফা প্রদত্ত তার মৃত্যুর তারিখ তার জন্ম তারিখের মতোই ভুল। সব বিষয় বিবেচনা করে অধ্যাপক হোমইয়ার্ড এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, জাবির খুব সম্ভব ৭৩০-৩৫ সালের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন এবং ৮১৫ সালে ৮০ বছর বয়সে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বালিশের নিচে 'কিতাব আল-রহমাহ'র একটি কপি পাওয়া গিয়েছিল।

www.pathagar.com

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ আল-বেরুনি

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ আবু আল-রায়হান মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনি ৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের একটু আগে খাওয়ারিজমে আফ্রিগিদস রাজবংশের রাজধানী কাথের বাইরের জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ফারসি ভাষায় 'বেরুন' শব্দের মানে হলো 'বাইরের জেলা'। কাথ জেলার বাইরে জন্ম নেয়ায় তিনি 'বেরুনি' নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। তার সম্মানে কাথের নামকরণ করা হয়েছে 'বেরুন'। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আল-বারুনিয়াস' এবং ইংরেজি ভাষায় 'আল-বিরুনি' (Al-Biruni) নামে পরিচিত। তিনি নিজে শুধু 'আবু রায়হান' নাম ব্যবহার করতেন।

আল-বেরুনি ছিলেন একজন শিয়া মুসলমান। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম পণ্ডিত হিসাবে গণ্য করা হয়। বীজগণিতে 'লগারিদম' পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন তিনি। আল-বেরুনিই প্রথম এ সত্য আবিষ্কার করেন যে, শব্দের চেয়ে আলোর গতি অনেক বেশি। অবিশ্বাস্য নির্ভুলতায় তিনি পৃথিবী পরিমাপ করেছিলেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া তিনি নিজেকে একজন ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষী ও ভাষাবিদ হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল-বেরুনি উত্তর ও দক্ষিণ মেরু খুঁজে বের করার ৭টি ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এ কথা প্রমাণ এবং প্রচার করেছিলেন যে, পৃথিবী নিজের অক্ষরেখার ওপর ঘুরে। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী সবকিছুকে তার কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ করে। তিনি চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। আল-বেরুনি নির্ভুলভাবে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার 'আল-আছার আল-বাকিয়া'য় এসব পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব ও প্রমাণ পেশ করেন। মহাবিশ্বের অন্যতম ছায়াপথ মিল্কিওয়ের সংজ্ঞা ও তার বিস্তারিত বিবরণ তিনিই দিয়ে গেছেন। আল-বেরুনি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম, ভাষা ও আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে 'আল-উসতাদাহ' বা শিক্ষক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। ফ্রান্সিস রবিনসনের মতে, একাদশ শতাব্দীর ভারতের নিখুঁত বর্ণনা দেয়ার জন্য তিনি 'ফাউন্ডার অব ইন্ডোলজি' (Founder of Indology) এবং প্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদ (Archaeologist) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের প্রথম ২৫ বছর তিনি খোরাসানে কাটিয়েছেন। এখানে তিনি ফিকাহ, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

www.pathagar.com

আবু রায়হান আল-বেরুনি

www.pathagar.com

খাওয়ারিজমে আল-বেরুনি

২০ বছরের তরুণ আল-বেরুনি খাওয়ারিজম ত্যাগ করে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে গোরগাঁয়ে গিয়ে পৌছান। গোরগাঁয়ের শাসক আবু কাবুস আল-মোয়ালির মনোযোগ আকর্ষণে তার সময় লাগেনি। আল-বেরুনি তার দরবারে অন্যতম সভাসদ হিসাবে দু'বছর অবস্থান করেন। আমির আবু কাবুস সাময়িকভাবে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ৯৯৮ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলে আল- বেরুনি তার সঙ্গে গোরগাঁয়ে ফিরে যান। কাবুস তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে অর্ধেক রাজত্ব উপহার দেয়ার প্রস্তাব করেন। আল-বেরুনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় তিনি 'আছারুল বাকিয়া' শিরোনামে তার প্রথম বই লিখেন। তার বইটি 'দ্য ক্রনোলজি অব এনশিয়েন্ট ন্যাশন্স' শিরোনামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। বইটিতে আনুমানিক এক হাজার বছরের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিবরণ স্থান পায়। পরবর্তীতে আল-বেরুনি বইটির কিছু অংশ সংশোধন করেন। কাবুসের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হলেও তিনি 'আছারুল বাকিয়া' এবং 'তাজরীদুশ শুয়াত' গ্রন্থ দু'টি তার নামে উৎসর্গ করেন। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে গোরগাঁয়ে অবস্থান করলেও তিনি তার জন্মস্থানের স্মৃতি ভুলতে পারেননি। ১০০৯ সালে তিনি খাওয়ারিজমে ফিরে যান। খাওয়ারিজমে তিনি আমির শামসুল মোয়ালি আবুল হাসান ইবনে ওয়াশমাগিরের অধীনে উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। ১০১৭ সালে বিদ্রোহী প্রজারা আমির শামসুল মোয়ালিকে হত্যা করলে সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখল করেন। আল-বেরুনি সুলতান মাহমুদের হাতে তার আশ্রয়দাতার মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। খাওয়ারিজমের রাজদরবারের জীবিত সদস্যদের গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমির শামসুল মোয়ালির রাজদরবারে আল-বেরুনি ছাড়া আরো ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আবু আলী ইবনে সিনা, দার্শনিক আবু সহল মসীহ, গণিতজ্ঞ আবু নসর ইরাকি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল খায়ের খাম্মার প্রমুখ। এখানে অবস্থানকালে ইবনে সিনার সঙ্গে তার পত্রালাপ হতো। এই দুই পণ্ডিতের মধ্যে চিঠিতে যেসব বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছিল সেগুলো এখনো সংরক্ষিত। সুলতান মাহমুদের হুমকি টের পেয়ে কয়েক বছর আগে ইবনে সিনা খাওয়ারিজম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আবু নসর ইরাকি ছিলেন আল-বেরুনির শিক্ষক এবং আফ্রিগিদস রাজবংশের সন্তান। এ বংশ পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত খাওয়ারিজম শাসন করে। তারা নিজেদেরকে 'বনি ইরাক' বা 'ইরাকের পুত্র' হিসাবে পরিচয় দিতো। কাথ ছিল আফ্রিগিদস বংশের শাসনাধীন কারাকালপাক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। আবু নসর ইরাকি ছিলেন গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি নির্মাণে দক্ষ। তিনি তার ছাত্র আল-বেরুনিকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেন।

গজনীতে আল-বেরুনি

সুলতান মাহমুদের দরবারে আল-বেরুনিকে জ্যোতিষী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। গজনীতে তার জীবনের গতি পাল্টে যায়। রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে তিনি

www.pathagar.com

জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গজনীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আলাপে তিনি দোভাষী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ভারত সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। গজনী পৌঁছার কিছুদিন পরই তিনি ভারতে যান। ভারতে সুলতান মাহমুদের কয়েকটি অভিযানে তিনি তার সঙ্গী হয়েছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন তার কাছে বন্দি। সুলতান মাহমুদকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা তার ছিল না। ১০২২ সাল থেকে সুলতান মাহমুদের বাহিনী উত্তর ভারতে অভিযান শুরু করে এবং ১০২৬ সালে তার বাহিনী ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে পৌঁছে যায়। ১০১৯ থেকে ১০২৯ সাল পর্যন্ত আল-বেরুনি ভারতে অবস্থান করেন। গজনীতে ফিরে এসে তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোযোগ দেন। এ সময় সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হলে গজনীতে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সুলতান মাহমুদের দুই ছেলে মোহাম্মদ ও মাসউদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর সময় মাসউদ ইরাকে অবস্থান করতে থাকায় মোহাম্মদ নিজেকে গজনীর সুলতান হিসাবে দাবি করেন। দু'ভাইয়ের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সৈন্যরা বিদ্রোহ করে মোহাম্মদকে অন্ধ করে দেয় এবং মাসউদের হাতে সিংহাসন অর্পণ করে। ১০৩১ সালে মাসউদ সিংহাসনে বসেন। গোলযোগের সময় আল-বেরুনি তার 'কিতাবুল হিন্দ' রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। গজনীতে সুলতান মাহমুদের জীবদ্দশায় তিনি লিখেছিলেন 'দ্য বুক অব ইন্সট্রাক্টশন ইন দি এলিমেন্টস অব দি আর্ট অব এস্ট্রোলজি'। বইটি ভারত ও ভারতীয় বিজ্ঞান নিয়ে লিখা হয়।

ভূগোল

আল-বেরুনি হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ। তার সময়ে ইসলামী ভূগোল বিজ্ঞান উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহন করে। তিনি তার 'তাহদিদ নিহায়েতুল আমাকিন' (The Determination of the Co-ordinates) গ্রন্থের মধ্য দিয়ে গাণিতিক ভূগোলের জন্ম দেন। স্থানের অবস্থান, দূরত্ব এবং শহর ও নগরের আয়তনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বহু বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে ১৬ টির সন্ধান পাওয়া গেছে। তার 'কিতাবুল হিন্দ' (The book of India), 'আল-আছারুল বাকিয়া আনালকরুনিল খালিয়া' (The Chronology of Ancient Nations) এবং 'কানুন-ই-মাসউদী' (Masud's Canon) হলো উল্লেখযোগ্য ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ। সি. এডওয়ার্ড সাচু আল-বেরুনির 'আল-আছারুল বাকিয়া' ও 'কিতাবুল হিন্দ' ইংরেজি অনুবাদ করলেও ল্যাটিনে কেউ অনুবাদ করেননি। আল-বেরুনি তার সময় পর্যন্ত ভূগোল বিষয়ক সব জ্ঞানের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন। তিনি মুসলিম ভূগোলবিদদের পাশাপাশি গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক ভূগোলবিদদের অবদানের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তার মতে, ভূগোলে গ্রীকরা ছিল ভারতীয়দের চেয়ে অধিক অগ্রসর। তিনি শহরগুলোর সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করেন এবং তার সঙ্গে এক ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন। তার মাধ্যমে আল-বেরুনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিতিক (Geodetic) জরিপের একটির সমাধান করেন। তিনি প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলে তাৎপর্যপূর্ণ তাত্ত্বিক উন্নতি ঘটান। আল-বেরুনি

www.pathagar.com

পৃথিবীর আকার এবং বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্ধারণে ট্রাইঅ্যাংগলেশন' কৌশল চালু করেন। ট্রাইঅ্যাংগলেশন' কৌশল হলো সরাসরি বিন্দুর দূরত্ব পরিমাপের পরিবর্তে কোনো স্থির তলের উভয় প্রান্তের জ্ঞাত বিন্দু থেকে কোণগুলো পরিমাপ করে কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি। কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু এবং দু'টি কোণ জ্ঞাত হলে বিন্দু খুঁজে বের করা সম্ভব।

ইসলামী ভূগোলে আল-বেরুনির অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে ইরানি ঐতিহাসিক সৈয়দ হোসেন নাসির তার 'ইসলামিক সায়েন্স'-এর ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*The height of Islamic geographical studies of the early period is to be found in the writings of peerless Abu Rayhan al-Biruni, at once master of mathematical, descriptive and cultural geography.*' অর্থাৎ '*এক সময়ের গাণিতিক, বর্ণনামূলক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের পণ্ডিত অদ্বিতীয় আবু রায়হান আল-বেরুনির লেখায় প্রাথমিক যুগে ইসলামী ভূগোল বিজ্ঞান অধ্যয়নের চূড়ান্ত উন্নতি খুঁজে পাওয়া যায়।*'

বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন

আল-বেরুনি মক্কাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কল্পনা করে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ডেভিড এ. কিং তার 'ওয়ার্ল্ড ম্যাপস ফর ফাইন্ডিং দ্য ডিরেকশন এন্ড ডিসটেন্স টু মেক্কা'র ৩৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Al-Biruni is known to have completed several other treatises on mathematical geography and on the determination of the qibla which have not survived; we know only their titles and the number of folios, which he lists in his bibliography. Most of these gave no impression of dealing with any kind of map, but there is one that is particularly interesting. The title is Tahdid al-ma'mura wa-tashhihuhu fil'l-sura. The determination of the inhabited world and its correct representation on a map. The length of the treatise is not stated. How al-Biruni imagined his map we can not tell; it may well have been one of the Ptolemic or Ma'muniac tradition.But possibly he also considered the problem of a grid that would preserve direction and distance to the central point and even produced a Mecca-centred map satisfying these criteria. We also note in passing that al-Biruni is the first person known to have used $21:20^0$ for Øm in a set of geographical tables.*'

অর্থাৎ '*আল-বেরুনি গাণিতিক ভূগোল এবং কিবলা নির্ধারণে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায়। তবে গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব নেই। আমরা কেবল গ্রন্থগুলোর শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা জানি। গ্রন্থ তালিকায় তিনি বইগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। এসব গ্রন্থে কোনো ধরনের মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তবে একটি বিশেষ বই আকর্ষণীয়। বইটির শিরোনাম হলো তাহদিদ আল-মা'মুরা ওয়া-তাশহিহুহু ফি'ল-সুরা। এ গ্রন্থটির মানচিত্রে বাসযোগ্য পৃথিবীর নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। গ্রন্থটির আকার বর্ণনা করা হয়নি। আল-বেরুনি কিভাবে পৃথিবীর মানচিত্র কল্পনা করেছেন আমরা তা বলতে পারি না। সম্ভবত তা ছিল টলেমি অথবা মামুনীয়*

www.pathagar.com

মডেলের। তবে তিনি সম্ভবত একটি গ্রিডের সমস্যাও বিবেচনা করেছিলেন যা মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিকনির্দেশনা ও দূরত্ব নির্দেশ করতো এবং এসব মানদণ্ড পূর্ণ করে মক্কাকেন্দ্রিক একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। আল-বেরুনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি ভৌগোলিক সারণীতে Øm-এর জন্য ২১:২০° ব্যবহার করেছেন।'

আল-বেরুনির ভারতীয় জ্ঞানের গভীরতা

৬৩০ সালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ২৬ বছর বয়সে ভারত সফরে এসেছিলেন। ভারত সফর শেষ করে তিনি দেশে ফিরে যান। যাবার সময় ২০টি ঘোড়া বোঝাই করে ভারত থেকে মূল্যবান বই পুস্তক সঙ্গে করে নিয়ে যান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেন। অন্যদিকে আল-বেরুনি মাত্র একটি উট বোঝাই করে ভারতীয় বই পুস্তক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সংগৃহীত বই পুস্তকের পরিমাণ কম হলেও ভারতের ওপর তার লেখা ইতিহাসের মান ছিল হিউয়েন সাংয়ের চেয়ে বহু গুণে সমৃদ্ধ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বাগ্মিতা অর্জনে হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং প্রচুর বই পুস্তক সংগ্রহ করেন। পাতঞ্জলীর যুগসূত্র আরবীতে 'কিতাব পাতঞ্জলী' শিরোনামে অনুবাদ করেন। আল-বেরুনি মোট ১১৪টি বই রচনা করেছেন। বইগুলোর মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো 'কিতাবুল হিন্দ' (দ্য বুক অব ইন্ডিয়া)। বইটি রচনায় তিনি যেসব সংস্কৃত বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করেছেন সেগুলো হলো হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক চারটি বেদ, কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলী, গীতা ও ভগবদগীতার কোনো একটি সংস্করণ। পৌরাণিক বিষয়ে তিনি ১৮টি পুরাণের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো (১) আদিপুরাণ (২) মৎস্য পুরাণ (৩) কর্ম পুরাণ (৪) বরাহ পুরাণ (৫) নরসিংহ পুরাণ (৬) বামন পুরাণ (৭) বায়ু পুরাণ (৮) নান্দ পুরাণ (৯) স্কন্দ পুরাণ (১০) আদিত্য পুরাণ (১১) সোম পুরাণ (১২) শম্ব পুরাণ (১৩) ব্রহ্মান্ড পুরাণ (১৪) মার্তন্ডেয় পুরাণ (১৫) তার্কশ্য (গরূড়) পুরাণ (১৬) বিষ্ণু পুরাণ (১৭) ব্রহ্ম পুরাণ (১৮) ভবিষ্য পুরাণ।

ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে আল-বেরুনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি এখানকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং তার আহরিত জ্ঞান আরবী ভাষায় প্রচার করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনিত কুমার চ্যাটার্জী 'আল-বেরুনি এন্ড স্যান্সক্রিট' নামে বইয়ে তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্ডোলজিস্ট বা ভারতীয় ইতিহাসবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ভূগোলে আল-বেরুনির অবদানের প্রশংসা করতে গিয়ে অধ্যাপক জি. সার্টন 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এ লিখেছেন, *'Al-Biruni may be counted one of the greatest geographers of all times, but he was alone. His services to geography were manifold and immense. To begin with, he developed the mathematical side of it, carrying on geodetic measurement and determining with remarkable precision the coordinate of a number of places. He introduced a simplified method of*

www.pathagar.com

stereographic projection. His description of India is a geographical monument of fundamental importance. He explained the occurrence of natural springs and of artificial well by the laws of hydrostatics. He remarked that the Indus valley was probably an ancient sea-basin which had gradually filled up with alluvions'

অর্থাৎ *'আল-বেরুনিকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে তিনি ছিলেন একা। ভূগোলে তার অবদান অগণিত ও অপরিমেয়। কাজের শুরুতে তিনি ভূগোলের গাণিতিক শাখাকে উন্নত করেছেন, পৃথিবীর আকার পরিমাপ করেছেন এবং নির্ভুলভাবে বেশ কয়েকটি জায়গার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেছেন। তিনি অতি সহজ একটি গতানুগতিক পদ্ধতি চালু করেছেন। ভারত সম্পর্কে তার বর্ণনা ভৌগোলিক গুরুত্বের একটি মৌলিক স্তম্ভ। তিনি প্রকৃতির আইন দিয়ে প্রাকৃতিক ঝরণা এবং কৃত্রিম কূপগুলোর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকা ছিল একটি প্রাচীন সাগর অববাহিকা। পলিমাটিতে এ অববাহিকা পূর্ণ হয়ে সিন্ধু উপত্যকায় রূপ নিয়েছে।'* অধ্যাপক হামারনে আল-বেরুনির ভারত সফর এবং এ সফরের ভিত্তিতে তার বই 'কিতাবুল হিন্দ'-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন, *'As a result of his profound and intimate knowledge of the country and its people, the author left us in his writing the wealth of information of undying interest on civilization in the sub-continent during the first half of the eleventh century.'*

অর্থাৎ *'এ দেশ (ভারত) এবং দেশটির অধিবাসীদের সম্পর্কে তার (আল-বেরুনি) গভীর ও ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের আলোকে গ্রন্থকার তার পুস্তকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ উপমহাদেশের সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ পূরণে অমর তথ্য ভাণ্ডার রেখে গেছেন।'*

সোমনাথ মন্দির ধ্বংসে আল-বেরুনির নীরবতা

আল-বেরুনি 'কিতাবুল হিন্দ' রচনা করেছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদের নির্দেশে। তিনি সম্ভবত ভারতের পাঞ্জাবে তার সঙ্গে কয়েক বছর অবস্থান করেন। সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। ১০২৪ সালে তিনি বর্তমান গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ ও মথুরার মন্দির লুট করেছিলেন। সোমনাথ মন্দিরে রক্ষিত মূর্তির উপরের অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়। মূর্তিটির নিচের অংশ গজনীতে সুলতান মাহমুদের প্রাসাদে স্থানান্তর করা হয়। থানেশ্বরে চক্রস্বামীর রৌপ্য মূর্তির একটি অংশ অলংকারসহ আর্বজনার স্তূপে নিক্ষেপ করা হয় এবং আরেকটি অংশ গজনীতে একটি মসজিদের দরজায় রাখা হয়। মুছল্লিরা মসজিদে ঢোকার আগে মূর্তির এই ভগ্নাংশের ওপর পায়ের ধূলি ময়লা ঝাড়তো। আল-বেরুনি স্বীকার করেন যে, তার প্রভু সুলতান মাহমুদ সমৃদ্ধ ভারত ধ্বংস করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কিতাবুল হিন্দে লিখেছেন, *'মাহমুদ দেশটিকে একেবারে উচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। তার অভিযানে হিন্দুরা ধূলিকণার*

www.pathagar.com

মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের কথা পুরা কাহিনীর মতো মনে হয়।' আল-বেরুনি সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের সমালোচনা করলেও তার মন্দির লুটের নিন্দা করেননি। সুলতান মাহমুদকে তিনি গজনীর সিংহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সুলতান মাহমুদ ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কিংবা হিন্দু ধর্ম ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সোমনাথ মন্দির লুট করেননি। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুদের এ মন্দির তছনছ করেন। সোমনাথ মন্দিরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল বেশি। এখানে হিন্দু রাজারা তাদের বিপুল সম্পদ মজুদ রাখতেন। মন্দিরের মাঝখানে একটি ঝুলন্ত মূর্তি দেখে সাধারণ হিন্দুরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতো। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে তারা মন্দিরের বেদিতে সোনা দানা ও মূল্যবান মনি মুক্তা উৎসর্গ করতো। তাই সুলতান মাহমুদ সাধারণ হিন্দুদের ধোঁকা দেয়া বন্ধে সোমনাথ মন্দিরে অভিযান চালান।

হিন্দু জাতির সঙ্গে মুসলমানদের তুলনা

আল-বেরুনি মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা পোষণ করার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম পুরোপুরি একে অন্য থেকে পৃথক। একাদশ শতাব্দীর হিন্দুরা শুধু মুসলমান নয়, সব বিদেশীকে অপবিত্র জ্ঞান করতো এবং তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে চাইতো না। ভারতে মুসলমানদের আগমনের আগে মঙ্গোলিয়ার সাক ও চীনের হুনরা এ দেশে লুণ্ঠন চালিয়েছিল। আল- বেরুনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এ দু'টি জাতি একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

আল-বেরুনি তার বিশ্ববিখ্যাত বই কিতাবুল হিন্দে মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সঙ্গে বর্ণবাদী হিন্দু সমাজে প্রচলিত অসাম্য ও ভেদনীতির পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি ভারতের ধর্মকে উন্নত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। তিনি 'কিতাবুল হিন্দ' লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন, *'I shall not produce the arguments of our antagonists in order to refute such of them as I believe to be in the wrong. My boook is nothing but a simple historic record of facts I shall place before the reader the theories of the Hindus exactly as they are.'*

অর্থাৎ *'আমি আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য তাদের কোনো যুক্তি পেশ করবো না। কেননা আমি মনে করি তা ভুল হবে। আমার বইটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা ছাড়া আর কিছু নয়। যথার্থ অর্থে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস যা আমি আমার পাঠকদের কাছে ঠিক সেভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করবো।'*

বইটিতে তিনি লিখেছেন, *'হিন্দু জাতি সব বিষয়ে মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমত: তাদের ভাষার কথাই ধরা যাক। এক জাতির ভাষার সঙ্গে অন্য জাতির ভাষার মিল নেই। সংস্কৃত ভাষা আরবী ভাষার মতোই কুণ্ডুলী পাকানো অজগর। ভারতীয়রা তাদের ভাষার এ কুণ্ডুলিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করে। ভাষার আবার*

www.pathagar.com

দু'টি স্তর দেখা যায়। একটি স্তর উপেক্ষিত এবং দ্বিতীয়টি উচ্চ শ্রেণীর। উচ্চ শ্রেণীর লোকজন দ্বিতীয় স্তরের ভাষা ব্যবহার করে। ভারতীয় সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলো কাব্যে লিখিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ধারণা এতে প্রক্ষেপ বা বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না এবং তাদের বিজ্ঞান বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত। কিন্তু তারা একটি কথা ভুলে গেছেন যে, কাব্যে ছন্দের খাতিরে কতগুলো দুর্বোধ্য ও সংকুচিত ভাব ঢুকিয়ে দিতে হয়। এছাড়া অনেক সময় অযথা বেশি কথারও আমদানি করতে হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো ধর্ম। হিন্দু জাতি ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা বা বিবাদ বিসম্বাদ না করলেও বিদেশীদের প্রতি তাদের যত গোঁড়ামি ও আক্রোশ। তারা বিদেশীদের ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র বলে মনে করে এবং তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব করা দূরের কথা, তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া দাওয়া বা পান পর্যন্ত করে না। আমাদের সঙ্গে তাদের পোশাক আশাকে এত পার্থক্য যে, তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের পোশাক দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। এগুলো ছাড়া আর একটি মস্তবড় কারণ হলো তাদের দাম্ভিকতা। রহস্যের মতো শোনালেও দাম্ভিকতা তাদের জাতীয় জীবনে দৃঢ় শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই তা পরিস্ফুটিত। আমরা শুধু বলতে পারি, এ নির্বুদ্ধিতার কোনো ওষুধ নেই। হিন্দুরা মনে করে, তাদের দেশের মতো কোনো দেশ নেই। তাদের মতো কোনো লোক নেই। তাদের রাজার মতো কোনো রাজা নেই। তাদের বিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞান নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জন্য পরজন্মে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে, অন্যদের জন্য নয়। এই জনপদ ৯ ভাগে বিভক্ত। প্রতি দু'খণ্ডের মধ্যে একটি করে সাগর আছে যা পাড়ি দিয়ে অন্য খণ্ডে যেতে হয়। হিন্দুদের মতে, তাদের দেশটাই পৃথিবী এবং তারাই একমাত্র মানবজাতি। তাদের দেশে এমন কোনো সমুদ্র নেই যা এক খণ্ড থেকে আরেক খণ্ডে যেতে হলে পার হতে হয়। তারা এসব খণ্ডকে দ্বীপ বলে মনে করে না। হিন্দুরা উদ্ধত, দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। তারা স্বভাবতই নিজেদের জ্ঞাত বিষয় নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে নারাজ। এমনকি নিজেদের মধ্যেও এক সমাজ অন্য সমাজকে নিজেদের বিষয় জানতে দিতে অনিচ্ছুক। বিদেশী বিজাতি হলে তো কথাই নেই। তাদের ধারণা সৃষ্ট জীবের মধ্যে তারা ছাড়া আর কেউ বিজ্ঞান জানে না। আপনি যদি তাদেরকে খোরাসান ও পারস্যের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার অথবা এসব অঞ্চলের সুধীবর্গের কথা বলতে চান, তাহলে তারা আপনাকে জলজ্যান্ত মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। যদি তাদের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার অথবা অন্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যাস থাকতো তাহলে তারা এমন সংকীর্ণমনা হতো না বরং তারা হতো তাদের পূর্ব পুরুষদের মতো উদার।'

আল-বেরুনির মতে, শিক্ষিত হিন্দুরা প্রধানত একেশ্বরাবাদী। তারা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করে। অন্যদিকে অশিক্ষিত হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে। এই একেশ্বরাবাদের অর্থ সবই ঈশ্বর থেকে এসেছে। যেমন- গীতায় বলা হয়েছে, বিষ্ণু নিজেকে মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন হিসাবে অধিষ্ঠিত করেছেন। আল-বেরুনি গীতার সঙ্গে এপোলনিয়াসের 'দ্য কাউসিস রিরাম'-এর তুলনা করেছেন। তিনি হিন্দুদের রীতিনীতি

www.pathagar.com

সম্পর্কে লিখেছেন, 'হিন্দুরা একা একা একজন একজন করে খায়। তারা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ খায় না। যে থালায় তারা খাওয়া দাওয়া করে তা মাটির তৈরি হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কোনো কিছু ভক্ষণ করার আগে তারা মদ পান করে। পান করে তারা খাবার গ্রহণ করে। তারা গরুর দুধ পান করে। তবে মাংস খায় না। যে কোনো কাজে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তারা মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করে। তারা কারো গৃহে প্রবেশ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে না। তবে অন্যের গৃহত্যাগ করার সময় অনুমতি চায়। বৈঠককালে তারা পায়ের ওপর পা তুলে বসে। আরবরা কোনো কিছু বলার সময় কম বিশেষণ ব্যবহার করে। অন্যদিকে ভারতীয়রা অতিরিক্ত বিশেষণ ব্যবহার করে। তারা হাঁচিকে একটি অশুভ লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করে। তারা বই লেখার শেষে শিরোনাম দেয়, শুরুতে নয়।'

আল-বেরুনি হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যবাহী বর্ণ ভেদ প্রথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতে তখন চারটি বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। অন্তজ (Antyaja) নামে বর্ণবাদী শ্রেণীর বাইরে আরেকটি শ্রেণী ছিল। চারটি বর্ণবাদী শ্রেণী একই শহর বা গ্রামে বসবাস করতো। একই গৃহে একত্রিত হতো। অন্তজ শ্রেণীর মধ্যে ছিল আটটি ভাগ। মুটে, মুচি ও তাঁতী ছাড়া পেশা অনুযায়ী তারা একে অন্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। অন্তজ শ্রেণী বর্ণবাদী শ্রেণী অধ্যুষিত শহর বা গ্রামের কাছাকাছি বসবাস করলেও তারা থাকতো আলাদা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

তরুণ বয়সে আল-বেরুনি গ্রীক বিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলোতে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখে রাখতেন। 'তাহাদিদ আল-আমাকিন' হলো তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এমনি একটি বই। বইটিতে তিনি ৯৯৭ সালের একটি চন্দ্র গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। খাওয়ারিজম থেকে আল-বেরুনি এ চন্দ্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। খাওয়ারিজম ও বাগদাদের দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য খুঁজে বের করা ছিল তার চন্দ্র গ্রহণ প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্য। আল-বেরুনি রচিত 'দ্য ক্রনলজি অব এনশিয়েন্ট ন্যাশন্স' হলো পার্সী, সোগদিয়ানীয়, খাওয়ারিজমীয়, ইহুদী, সিরীয় হারারীয়, আরব ও গ্রীকদের ব্যবহৃত পঞ্জিকার তথ্যের একটি খনি। বইটি এখনো প্রাচীন ও মধ্যযুগের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সূত্র। আল-বেরুনি এস্ট্রোল্যাবের ওপর কয়েকটি বই লিখেছেন। তিনি আলোর গতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং আলোর গতিকে শব্দের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আলো তীব্র গতিতে চলাচল করে। ইবনে সিনার সঙ্গে তাপ ও আলোর প্রকৃতি নিয়ে তার পত্র বিনিময় হতো। ইবনে সিনা আল-বেরুনির প্রশ্নের জবাব দিয়ে তার কাছে ১৮টি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েও তাদের মধ্যে চিঠি বিনিময় হতো। আল-বেরুনি ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করে তাকে

www.pathagar.com

অগণিত তারকার একটি সমষ্টি হিসাবে আখ্যা দেন। তিনি টলেমির পর্যবেক্ষণে একটি ভুল খুঁজে পান। টলেমি ধারণা করেছিলেন যে, সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা বা এপোজী স্থির। কিন্তু আল-বেরুনি দেখতে পান যে, সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা স্থির নয়। ধীরে ধীরে তা ঘুরছে।

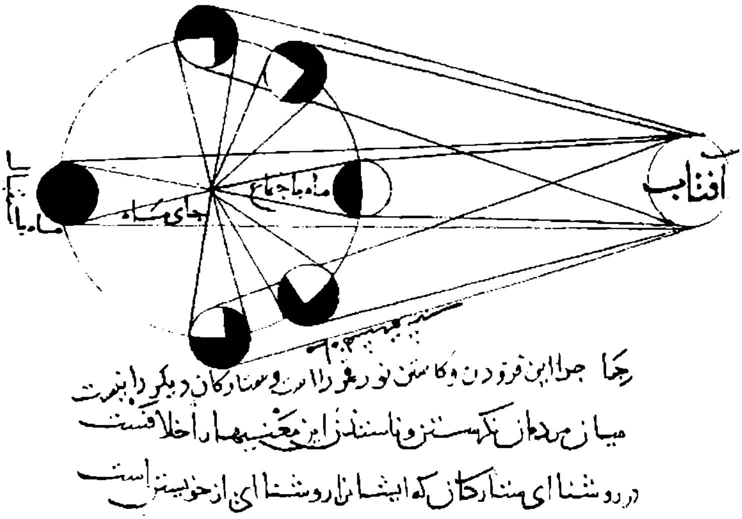

আল-বেরুনির পরিলক্ষিত চন্দ্রগ্রহণ

হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আল-বেরুনি

১০৩০ সালে আল-বেরুনি তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'তারিখ আল হিন্দ' (Indica)-এ আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহিরের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ তিন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডলের ধারণায় বিশ্বাস করতেন। আল-বেরুনি লিখেছেন, আর্যভট্টের অনুসারীরা সূর্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলে মনে করে। তিনি তার বইয়ে এ ধারণা ঘন ঘন উল্লেখ করে বলেছেন, এ তত্ত্ব কোনো গাণিতিক সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

আল-বেরুনি ব্রহ্মগুপ্তের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, *'কয়েকটি ঘটনা আমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে গোলাকার হিসাবে কল্পনা করতে বাধ্য করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, তারকাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উদিত ও অস্তমিত হয়। যামাকোতিতে কোনো লোক একটি অভিন্ন তারকাকে পশ্চিম দিগন্তে উদিত হতে দেখতে পেলে একই সময় রুমায় অন্য একজন লোক সেই তারকাকে পূর্ব দিগন্তে উদিত হতে দেখতে পায়। আকাশ ও পৃথিবীর গোলাকার সম্পর্কে পরবর্তী যুক্তি হচ্ছে,*

www.pathagar.com

মিরুর একজন লোক রাক্ষসের দেশ শ্রীলংকার মধ্য দিগন্তে একটি তারকা দেখতে পেলে একই সময় লংকায় আরেকজন লোক তা মাথার ওপর দেখতে পায়। আকাশ ও পৃথিবীকে গোলাকার হিসাবে কল্পনা না করলে আমাদের জ্যোতির্মণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণ নির্ভুল হতে পারে না। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে, আকাশ গোলাকার এবং বাস্তবিকভাবে আকাশ গোলাকার না হলে পৃথিবীর এসব বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণ সঠিক হতে পারে না। এতে এখন প্রতীয়মান হচ্ছে, পৃথিবী সম্পর্কে অন্যান্য তত্ত্বগুলো ভুল।' বরাহমিহিরের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-বেরুনি আরো লিখেছেন, 'পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, গাছ-পালা, শহর-বন্দর, মানুষ ও দেবতা সবই পৃথিবীর গোলকের চারদিকে। যামাকোতি ও রুমা একে অন্যের বিপরীত দিকে হলে কেউ বলতে পারে না যে, একটি অন্যটির নিচে। কেননা নিচে অবস্থান করলে কোনোটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের কথা বলে। কেউ বলে, আমি ওপরে এবং অন্যরা নিচে। একটি কদম গাছের শাখা প্রশাখায় প্রস্ফুটিত বসন্ত ফুলের মতো তাদের সবাই গোলকের চারদিকে। তারা সবদিক থেকে পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। প্রতিটি ফুলের অবস্থান অন্যটির মতো। কোনোটি নিচের দিকে ঝুলছে না কিংবা অন্যগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না। পৃথিবী তার মধ্যকার সবকিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। কেননা সব দিক থেকে পৃথিবী হলো নিচে এবং আকাশ হলো সব দিক থেকে ওপরে।'

ভারতীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ধ্যান ধারণার উল্লেখ করতে গিয়ে আল-বেরুনি আরো লিখেছেন, 'ভারতীয়দের বিশ্বাস লঙ্কা রাক্ষসদের পুরী। পৃথিবীর সমতল ভাগ থেকে লঙ্কার উচ্চতা ৩০ যোজন অর্থাৎ ৮০ ফারসাখ। লঙ্কার পূর্ব ও পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ১০০ যোজন এবং উত্তর থেকে দক্ষিণের বিস্তৃতি তার উচ্চতার সমান অর্থাৎ ৩০ যোজন। এই লঙ্কা বা বাড়বামুখ দ্বীপের জন্যই হিন্দুরা দক্ষিণ দিককে অশুভ বলে মনে করে। দক্ষিণ মুখ করে তারা কোনো কর্ম করে না এবং দক্ষিণমুখী হয়ে তারা যাত্রা আরম্ভ করে না। কেবল দুষ্কর্ম প্রসঙ্গেই দক্ষিণ দিকের উল্লেখ করতে দেখা যায়।'

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা

আল-বেরুনি বিভিন্ন শহর ও বন্দরের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে ভারতের উপকূল রেখার নির্ভুল অবস্থান চিহ্নিত করেন। তিনি সাগর নিয়ে গবেষণা করেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, দক্ষিণাঞ্চলীয় সাগরগুলোর মধ্যে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করে দেখতে পান, একসময় একটি প্রাচীন সাগর শুকিয়ে গিয়ে সিন্ধু উপত্যকার জন্ম হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে আল-বেরুনি লিখেছেন, *'ভারতের মধ্যস্থান হলো কনৌজ। তারা একে মধ্যদেশ বা দেশের মধ্যস্থান বলে। পূর্বকালে কনৌজ ছিল তাদের রাজা ও বীর পুরুষদের বাসস্থান। কনৌজ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি বেশ বড় শহর। তবে এখন এ শহর প্রায় পরিত্যক্ত। এখান থেকে রাজধানী বারীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বারী*

www.pathagar.com

গঙ্গার পূর্ব তীরে। দু'টি শহরের মধ্যে ৪ দিনের রাস্তার ব্যবধান। কনৌজ যেমন পাণ্ডব পুত্রদের জন্য বিখ্যাত তেমনি মহুরা (মথুরা) বাসুদেবের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে। মহুরা জৌন (যমুনা) নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। মথুরা থেকে কনৌজ ২৮ ফারসাখ দূরে। কনৌজের পূর্বদিকে বারী ১০ ফারসাখ, দুগুম ৪৫ ফারসাখ, শিলাহাট রাজ্য ১০ ফারসাখ, বিহাট শহর ১২ ফারসাখ দূরে। তারপর ডানদিকে গেলে যে জায়গা পাওয়া যাবে তার নাম তিলাওয়াত। এলাকার অধিবাসীদের নাম তরু। ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ তুর্কিদের মতো তাদের নাক চ্যাপ্টা। এখান থেকে কামরু পাহাড়ে যাওয়া যায়। এ পাহাড়টি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তিলাওয়াতের উল্টোদিকে বামে নাইপাল (নেপাল) রাজ্য। ভোটেশ্বর তিব্বতের প্রথম সীমানা। এখান থেকে ভাষা, রীতিনীতি, লোকের পোশাক পরিচ্ছদ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখান থেকে সর্বোচ্চ শিখর হলো ২০ ফারসাখ দূরে। পর্বতের এ শিখর থেকে ভারতবর্ষকে কুয়াশার নিচে কালো দেখা যায়। এ শিখর থেকে অন্য পবর্তগুলোকে ছোট ছোট পাহাড়ের মতো দেখায় এবং তিব্বত ও চীনকে দেখায় লাল। কনৌজ থেকে গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণ পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে ৩০ ফারসাখ দূরে পাওয়া যাবে জাজাহুতি। এ রাজ্যের রাজধানী কাজুরাহা। কনৌজ ও জাজাহুতির মধ্যে দু'টি বিখ্যাত দুর্গ। একটি দুর্গের নাম গোয়ালিয়র এবং আরেকটির নাম কালিঞ্জর। দাহালা রাজ্যের রাজধানী তিওয়ারি। এ রাজ্যের রাজা গাঙ্গেয়। এখান থেকে কান্নাকাররা (কন্যাকুমারী) ২০ ফারসাখ দূরে। তারপর সমুদ্রতীরে আপসুর ও বানাভাস। কনৌজ থেকে ১৮ ফারসাখ দূরে আসি, ১৭ ফারসাখ দূরে সাহানা, ১৮ ফারসাখ দূরে জানদ্রা, ১৫ ফারসাখ দূরে রাজাউরি, গুজরাটের রাজধানী বাজানা ২০ ফারসাখ দূরে। মহুরা থেকে উজ্জায়ন যেতে যেসব গ্রাম পাওয়া যায় সেগুলোর দূরত্ব ৫ ফারসাখ। ৫ ফারসাখ দূরে ভাইলসান। হিন্দুদের কাছে জায়গাটি অত্যন্ত বিখ্যাত। এ জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে এখানকার বিগ্রহ মূর্তির নামানুসারে। এখান থেকে আরদিন ৯ ফারসাখ দূরে। এলাকার বিগ্রহের নাম মহাকাল। বাজানা থেকে ২৫ ফারসাখ দূরে মাইওয়ার। এ রাজ্যের রাজধানী জাত্তারাউর। জাত্তারাউর থেকে ২০ ফারসাখ দূরে মালব। মালবের রাজধানী ধারের দূরত্ব ২০ ফারসাখ। ধারের ৭ ফারসাখ দূরে উজ্জায়ন শহর। ধার থেকে দক্ষিণে গেলে পাওয়া যাবে ভূমিহারা, কান্দ, নর্মদা নদীর তীরে নামাবুর, আলিসপুর, গোদাবর নদীর তীরে মান্দাপিছু। ধার থেকে দক্ষিণে নামিয়া-উপত্যকা। মাহরাট্টা (বর্তমান মহারাষ্ট্র) দেশ ১৮ ফারসাখ দূরে। সমুদ্র তীরে কঙ্কন প্রদেশ ও তার রাজধানী তানা ২৫ ফারসাখ দূরে।

ভারতবর্ষে অনেক গণ্ডার আছে। ব্রাহ্মণরাই গণ্ডারের মাংস খাওয়ার অধিকারী। নীল নদের মতো এখানকার নদীতেও কুমীর আছে। বাজানা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ৮০ ফারসাখ দূরে আনহিলভারা। তারপর সমুদ্র তীরে সোমনাথ। আনহিলভারা থেকে দক্ষিণে গেলে পাওয়া যাবে লারদেশ। বাজানা থেকে পশ্চিমে পাওয়া যাবে মুলতান। ভাটি থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পাওয়া যাবে আরোরা। সিন্ধু নদের দু'শাখার মধ্যে এ শহরটি অবস্থিত। তারপর বামহানওয়া আলমনসুরা। সিন্ধু নদের মোহনায় লোহারানী ৩০ ফারসাখ দূরে। কনৌজ থেকে উত্তর পশ্চিমে ৫০ ফারসাখ গেলে পাওয়া যাবে শিরশারাহা। তারপর

www.pathagar.com

পাহাড়ের ওপর পিনজাপুর। বিপরীত দিকে সমতলভূমিতে থানেশ্বর শহর। পাহাড়ের পাদদেশে ১৮ ফারসাখ দূরে জলন্ধরের রাজধানী দাহমালা। বাল্লাওয়ার ১০ ফারসাখ দূরে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে লাড্ডা ১৩ ফারসাখ। রাজাগিরি দূর্গ ১৮ ফারসাখ দূরে। এখান থেকে উত্তর দিকে কাশ্মীর ২৫ ফারসাখ। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের দেশগুলো হিন্দুদের অধিকৃত। কাশ্মীরের অধিবাসীরা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে। আরোহন করার মতো হাতি বা ঘোড়া না থাকায় এখানকার অভিজাতরা মানুষের কাঁধ বাহিত কাট নামে এক প্রকার পাল্কীতে চলাফেরা করে। এখানকার অধিবাসীরা তাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এজন্য তারা তাদের দেশের প্রবেশ পথগুলো নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখতে খুবই যত্নবান। কাশ্মীরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা কঠিন। আগে তারা দু'একজন বিদেশী বিশেষ করে ইহুদীদের ঢুকতে দিতো। কিন্তু এখন তারা অপরিচিত কোনো হিন্দুকেও ঢুকতে দেয় না। অন্যদের ঢুকতে দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

কনৌজ থেকে পশ্চিমে ১০ ফারসাখ দূরে দিয়ামাউ, ১০ ফারসাখ দূরে কুটি, ১০ ফারসাখ দূরে আনার, ১০ ফারসাখ দূরে মিরাট, ১০ ফারসাখ দূরে পানিপথ। মিরাট ও পানিপথের মধ্য দিয়ে জৌন নদী প্রবাহিত। কাবিতাল ১০ ফারসাখ এবং সুন্নাম ১০ ফারসাখ দূরে। এখান থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে গেলে আদিত্য হাওড় ৯ ফারসাখ, জাজজানির দূরত্ব ৬ ফারসাখ, লোহাউরের রাজধানী (ইরাবতী নদীর পূর্বদিকে) মান্দাহুকুর ৯ ফারসাখ, চন্দ্রাহা নদী ১২ ফারসাখ, বিয়াত্তা নদীর পশ্চিমে জাইলাম নদীর দূরত্ব ৮ ফারসাখ, সিন্ধু নদের পশ্চিমে কান্দাহারের রাজধানী ভাইহিন্দের দূরত্ব ২০ ফারসাখ, পুরশাওয়ারের দূরত্ব ১৪ ফারসাখ, দুনপুর ১৫ ফারসাখ, কাবুল ১২ ফারসাখ ও গাজনা ১৭ ফারসাখ।'

নাগর সমবৃত্তে প্রবাহিত নদ নদীর বিবরণ:

যেসব বিখ্যাত পর্বতকে মেরু পর্বতের গ্রন্থি বা বাঁক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বায়ু পুরাণে সে সব বাঁক থেকে উৎসারিত নদ নদীর একটি তালিকা স্থান পেয়েছে। আল-বেরুনি বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী ভারতের নদ নদীগুলোর একটি বিবরণী প্রকাশ করেছেন। নিচের ছকে তার বিবরণী দেয়া হলো:

বাঁক	নাগর সমবৃত্তে প্রবাহিত নদ নদীর নাম
মহেন্দ্র	ত্রিসাগা, ঋষিকূল্য, ইকসুল, ত্রিপাবা, অয়ন, লাঙ্গুলিনী, বংশবারা।
মলয়	কৃতমালা, তাম্রবর্ণ, পুষ্পজাতি, উৎপলাবতী।
সহ্য	গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণ, বৈন্য, সবঞ্জল, তুঙ্গাভদ্রা, সুপ্রয়োগ, পয়, কাবেরী।
শুক্তি	রিশিকা, বালুকা, কুমারী, মন্দবাহিনী, কৃপ, পলাসিনী।

www.pathagar.com

ঋক্ষ	সোন, মহানদ, নর্মদা, সুরস, কিরবা, মন্দাকিনী, দর্শান, চিত্রকুট, তমসা, পিপ্পল, শ্রোণী, করমোদ, পিসাবিক, চিত্রপল, মহাবেগ, বঞ্জুল, বালুবাহিনী, শুক্তিমর্ত্তী, শক্রুন, ত্রিদিব।
বিন্ধ্যা	তাপি, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধা, সিরব, নিষাধ, বেন্ব, বৈতরণী, সিনি, হাহু, কুমুদবতি, তোবা, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশীলা।
পরিযাত্রা	বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নি, পূর্ণাশা, নন্দনা, সন্দনা, রামাদি, পারা, চর্মন্বতি, লুপা, বিদিশা।

আরব সাগর বা রামের বাঁধে পতিত নদ নদীর বর্ণনাঃ

সিন্ধু	বিয়াত্তা	চন্দ্রভাগা	বিয়াহা	ইরাবতী	শতদ্রু বা
ভাইহিন্দ	বা জাইলাম	বা চন্দ্রাহা	বা শতদল		
সারসত	জৌন	গঙ্গা	সরযু	দেবিকা	কুহু
গোমতী	ধূতাপাপা	বিশাল	বাহুদশা	কৌশিকী	নিশ্চিরা
গাণ্ডকি	লোহিত	দৃশদ্বতী	তাম্র, অরুণা		
বিদাসিনী	চন্দনা	কাওন	পারা		
ভানুমতি	শিপ্রা	করতোয়া	শমাহিনা		

হিন্দুদের বিশ্বাস পুরাকালে গঙ্গার প্রবাহ ছিল স্বর্গে। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, পৃথিবী স্পর্শ করার পর গঙ্গা ৭টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে মূল ধারাটি গঙ্গা নামে প্রবাহিত। তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। এগুলো হলো নলিনী, হ্রাদিনী ও পাবনি। পশ্চিম দিকে প্রবাহিত তিনটি ধারা হলো সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু। সীতা নদী হিমাবন্ত থেকে উৎসারিত হয়ে সলিল, করষ্ণুব, বাহা, চীন, বার্বার, যবাশা, পুষ্কর, কুলত, মঙ্গল, কবর ও সঙ্গবন্ত দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে।

সীতার দক্ষিণে আছে চাকসু নদী। এই নদী চীন, মারু, কালিকা, ধূলিকা, তুখারা, বারবারা, কচ্ছ, পহ্লাব, ও বারওয়ানচত দেশগুলোতে পানি সরবরাহ করে। সিন্ধু, দরদ, যিন্দতুন্দ, গান্ধার, রুরস, ক্রুর, শিবপুর, ইন্দ্র মারু, সাবাতি, সৈন্ধব, কুবত, ভীমরর্বর (ভ্রমরাভির), মর, মরুণ ও সুকর্দ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। প্রধান শাখা গঙ্গা নামে গন্ধর্ব ঠিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রাম, কিম্বপুরুষ খাস, পার্বত্যজীব কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পাঞ্চাল, কৌশক, মাৎস্য, মগধ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্তের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। এসব সৎ ও দুষ্ট জীবনের আবাসভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা বিন্ধ্যা গিরিমালায় যেখানে হস্তীদের বিচরণ ভূমি সেখানে প্রবেশ করে এবং অবশেষে দক্ষিণ সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। গঙ্গার পূর্ব শাখাগুলোর মধ্যে হ্রাদিনী নিশাব,

www.pathagar.com

উপকান, ধীবর, প্রিশক, নীলমুখ, কিংকর, উষ্ট্রকর্ণ, কিরাত, কালিদর, বিবর্ণ, কুশীকনা জাতি ও স্বর্গভূমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে।

পাবনি নদী (রাজা ইন্দ্রের সরোবর) রূপথখ, বিত্র ও সঙ্কুপাথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উদ্যান মরু প্রান্তর দিয়ে কুশপ্রবরণ দেশ ও ইন্দ্রদ্বীপ হয়ে লবণ সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। নলিনী নদী তামর হংসমার্গ, সমূহক ও পূর্ণ অতিক্রম করে প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর পর্বতের মধ্য দিয়ে কর্ণ প্রবরণ ও অশ্বমুখদের দেশ হয়ে পবর্তমরু ও রূমীমণ্ডল অতিক্রম করে নলিনী নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

জনপদের বর্ণনা

বায়ু পুরাণ অনুযায়ী আল-বেরুনি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জনপদগুলোর বর্ণনা দেন। জনপদগুলো হলোঃ কুরু, পাঞ্চাল, শল্য, জঙ্গাল, সুরসেন, ভদ্রকাল, বোধা, পথেশ্বর, মচ্চি, কুসত, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, অর্থয়াশ্ব, ফুলিঙ্গ, মশক ও বৃক। পূর্বদিকের জাতিগুলো হলোঃ অন্ধ্র, বাকা, মুদ্রাকারক, প্রাত্রগির, বহির্গির, প্রথঙ্গ, বঙ্গেয়, মালব, মালবার্তিক, প্রাগজ্যোতিষ, মুণ্ড, অবিক, তাম্রলিপ্তিক, মাল, মগধ ও গোবিন্দ। দক্ষিণের জাতিগুলো হলোঃ পাণ্ডা, কেরল, চৌল, সেতুক, মুশিক, রুমন, বনবাসিক, মহারাষ্ট্র, মাহিষ, কলিঙ্গ, আভীর, ইষক, অটব্য, সবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যামুলি, বিদর্ভ, দণ্ডক, মুলিক, অম্মক, নৈতিক, ভোগবর্ধন, উড্ডীর, নলক, অলিক, দাক্ষিণাত্য, বৈদেশ, সুরপরাক, কোলাবর্ণ, দুর্গ, তিল্লিত, পুলেয়, ক্রাল, রূপক, তামস, তরুপন, করস্‌কর, নাসিক, উত্তর নর্মদা, ভারকচ্ছ, মাহি, সারস্বত, কচ্ছ, সুরাষ্ট্র, অনর্ত ও হুদবুদ। পশ্চিমের জাতিগুলো হলোঃ করুষ, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, বসান, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্য, ত্রৈপুর, থর্পুর, তম্বুর, সত্তমান, পধা, কর্ণ প্রবরণ, হুন, দর্ব, হুহক, ত্রিগর্ত, কিরাত ও তামার। উত্তরের জাতিগুলো হলো; বাহলীক, বাঢ়, বাণ, কালতোয়ক, অবরান্ত, পাহলব, চর্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সোবীর, মদ্র, সক্ক, দ্রিহাল, লিত্ব, মল্ল, কোদর, আত্রেয়, ভারদ্ব, দশেরক, লম্পগ, তালকুন, সুলিক ও জাগুর।

হিন্দু গণিত

আল-বেরুনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, গণিতে হিন্দুরা সংখ্যা প্রতীকের জন্য তাদের বর্ণমালা ব্যবহার করে না। অন্যদিকে মুসলমানরা হিব্রু বর্ণমালার অনুকরণে সংখ্যা প্রতীকে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করতো। আল-বেরুনি আরবদের এ রীতিকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মেনে নিতে পারেননি। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবদের ভারতীয় সংখ্যা প্রতীক গ্রহণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি লিখেছেন, *'আমাদের সংখ্যা লিখন প্রতীক এসেছে হিন্দুদের সুন্দরতম প্রতীক থেকে।'* আল-বেরুনি বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে গিয়ে তাদের সংখ্যার ক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তাতে তিনি দেখতে পান যে, কোনো ভাষা এমনকি আরবী ভাষা পর্যন্ত এক হাজার অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র ভারতীয়রা ছিল ব্যতিক্রম। তাদের সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যা ছিল অষ্টাদশ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

হিন্দু রসায়ন সম্পর্কে আল-বেরুনি

আল-বেরুনির ভারত সফরকালে এখানে রসায়ন বা সোনা তৈরির নামে বীভৎস কর্মকাণ্ড চলতো। তিনি এসব কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করে পারেননি। হিন্দু জাতির আচার আচরণ দেখে তাদের রসায়ন কতদূর অধঃপতিত হতে পারে তিনি তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তার মতে, হিন্দুরা তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী এবং এসবের প্রতি তাদের আগ্রহ খুব বেশি। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নরবলীর মতো নৃশংস কাজ করতে তারা দ্বিধা করে না। আল-বেরুনি হাইড্রোস্ট্যাটিক সূত্র দিয়ে প্রাকৃতিক ঝর্ণাগুলোর সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং ১৮টি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর ওজন নির্ভুলভাবে পরিমাপ করেন।

কানুন-ই-মাসউদী

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুরাগী হওয়ায় সুলতান মাসউদের কাছে আল-বেরুনির কদর বৃদ্ধি পায়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'কানুন-ই-মাসউদী' সুলতান মাসউদের নামে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটির জন্য সুলতান মাসউদ আল-বেরুনিকে এক উট বোঝাই রৌপ্য উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আল-বেরুনি এ উপহার সুলতানের কোষাগারে ফেরত পাঠান। 'কানুন-ই-মাসউদী' (The Canon of Masud on astronomy and the stars) হলো আল-বেরুনির বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বইটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ত্রিকোণমিতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। 'কানুন-ই-মাসউদী'তে বর্ণিত একটি তত্ত্বে আল-বেরুনি স্বীকার করেন যে, পৃথিবী নিজ অক্ষরেখার ওপর ঘুরছে। কোয়ার্টারলি রিভিউ'তে বিখ্যাত পণ্ডিত নিকোলাস দ্য খান নেকওফের একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে আল-বেরুনির বইটির প্রতি পাশ্চাত্যের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। নিকোলাস তার প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে, এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিজ্ঞান চর্চাকারী দেশ হিসাবে পূর্ব পারস্যের দাবি অগ্রগণ্য। কানুন-ই-মাসউদী বিজ্ঞান বিশেষ করে ত্রিকোণমিতির জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। টলেমি ও ইয়াকুব উভয়ে বৃত্তের পরিধির অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বহুভুজের মধ্যমান গণনা করেছিলেন। উভয়ের ফল ছিল নির্ভুল। তবে তাদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। এ পদ্ধতিগত দুর্বলতা আল-বেরুনির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তিনি টলেমির গণনায় সন্তুষ্ট হতে না পারলেও তার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত হিসাবে মেনে নেন। কিন্তু ইয়াকুব $\frac{১৫}{১৬}$ ডিগ্রির চাপ (arc) গণনা করে π এর মূল্য বের করতে তার সঙ্গে এর $\frac{১০}{১৬}$ অংশ যোগ করে অন্য একটি কোণের চাপ বের করার চেষ্টা করতে থাকলে আল-বেরুনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। এ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

'কানুন-ই-মাসউদী' ১১ টি খণ্ডে বিভক্ত। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল স্কট ভাষ্যসহ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ করেন। ১৯৫০ সালে প্রথম ৪ খণ্ডের আরবী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। 'কানুন-ই-মাসউদী'তে আল-বেরুনি তার আগের বহু বিজ্ঞানী বিশেষ

www.pathagar.com

করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও তাদের প্রণীত জিজের বর্ণনা দিয়েছেন। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে জিজের ধারাবাহিক আলোচনা। এ আলোচনায় হিজরী, সেলুসিড, ইয়াজদিজিরদ, ইহুদী, মিসরীয়, জুলিয়ান ও জরোস্ত্রিয়ান পঞ্জিকার পূর্ণ তালিকা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ত্রিকোণমিতির আলোচনায় দু'টি তালিকা দেয়া হয়েছে। একটি হলো প্রতি ১৫ মিনিটের ব্যবধানে কোণে সাইনের পরিমাণ। এ তালিকায় দু'টি কলাম ব্যবহার করা হয়। একটি কলামে এক মিনিটের পরিবর্তনে এবং অন্যটিতে সিকি ডিগ্রির পরিবর্তনে যে বৃদ্ধি দেখা যায় তা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় তালিকাটি হলো কোণে টানের পরিমাণ। এতে দশমিকের পঞ্চম স্থান পর্যন্ত মূল্যমান দেয়া হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বৃত্তাকার জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৃত্তাকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকাগুলোতে প্রত্যেক ৫ ডিগ্রির দশমিকের চতুর্থ স্থান পর্যন্ত মূল্যমান দেয়া হয়েছে। তার প্রথম পরিচ্ছেদে কন্সট্যান্ট৮ (Constant8) এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আল-বেরুনির মতে, তার মূল্যমান হলো ২৩ঃ ৩৫$^\circ$ ডিগ্রি । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্রান্তিবৃত্তের বিন্দুর ওপর বিষুবলম্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর o_1 এবং o_2এর তালিকা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিষুবীয় স্থানাঙ্ক (Right Ascensions) বের করে A_0 (X) এর তালিকা দেয়া হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিষুব রেখা থেকে ক্রান্তিবৃত্তে পরিবর্তন এবং উল্টোভাবে ক্রান্তিবৃত্ত থেকে নিরক্ষ রেখায় পরির্বতন করার উপায় দেখানো হয়েছে। সপ্তম থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সূর্যঘড়ির কাঁটা (Gnomon) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দশম পরিচ্ছেদে গজনীর অক্ষরেখার (দ্রাঘিমাংশ $^\circ$=33ঃ 35^0) তালিকা দেয়া হয়েছে এবং সমান ঘণ্টার দিনের আলোর স্থিতিকাল, অসমান ঘণ্টার দৈর্ঘ্য, সূর্যের মধ্যোন্নতি (Meridian Altitude) দেয়া হয়েছে। একাদশ পরিচ্ছেদে টান ম্যাক্স এইচএস (Tan max $h_{s)}$ এবং টুভেলভ টান ম্যাক্স এইচএস (12 Tan max $h_{s)}$ এর তালিকা এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গজনীর Ax (X) এর তালিকা দেয়া হয়েছে। ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদে সময় নিরূপণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম কানুন, জ্যোতিষ কেন্দ্র নিরূপণ, ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনে সময় ও এসেনশনের (Ascension) পরিবর্তন এবং পৃথিবীর ছাদ (Cupola of the Earth) নিরূপণ পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে ভূমিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা। পর পর গ্রহণ দেখে কিভাবে কোনো জায়গার দ্রাঘিমা বের করতে হয় প্রথম পরিচ্ছেদে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে স্থানের স্থানাঙ্ক জানা আছে তা থেকে অন্যস্থানের দূরত্ব দিয়ে কিভাবে দ্বিতীয় স্থানের দ্রাঘিমা বের করতে হয় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে দুই জায়গার স্থানাঙ্ক জানা আছে তাদের ভৌগোলিক দূরত্ব বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কোনো এক স্থান থেকে দু'টি নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব জেনে নিয়ে সেই স্থানের স্থানাঙ্ক বের করার পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কোনো জায়গার দিগাংশ বিশেষ করে মক্কার বেলায় কেবলার দিগাংশ বের করার পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে

www.pathagar.com

পৃথিবীর পরিধি বের করার পদ্ধতি এবং অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে দ্রাঘিমার সমান্তরাল স্থানের জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দশম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের তালিকা দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে মূলত সূর্যের গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে দু'টি ভিন্ন দ্রাঘিমায় অবস্থিত জায়গার সময় এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলেকজান্দ্রিয়া ও গজনীর মধ্যকার দ্রাঘিমার পার্থক্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম খণ্ডে চাঁদের গতি এবং অষ্টম খণ্ডে চাঁদের দৃশ্যমানতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম খণ্ডে গ্রহ ও নক্ষত্র এবং দশম খণ্ডে টলেমির অনুসরণে আলোচনা করা হয়েছে। একাদশ খণ্ডে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

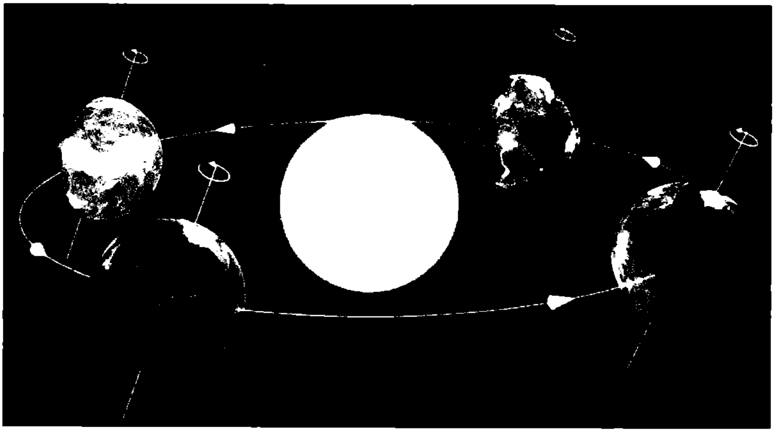

সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর আবর্তন

'কানুন-ই-মাসউদী'তে আল-বেরুনি প্রথম পৃথিবীর গতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটিতে তিনি লিখেছেন, *'আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদকে চিনি যিনি এই মতবাদে বিশ্বাসী।'* আল-বেরুনি এ জ্যোতির্বিদের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ জ্যোতির্বিদ হলেন তিনি নিজে। তার মতে, যখন কোনো জিনিস উঁচু জায়গা থেকে নিচে পড়ে তখন তা তার পতনের ধারা অনুযায়ী লম্ব রেখা ধরে পড়ে না বরং একটু বেঁকে যায় এবং বিভিন্ন কোণ করে পতিত হয়। তিনি বলেন, *'যখন পৃথিবী থেকে তার কোনো একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন এই ছিন্ন অংশটি* দু'প্রকার গতি লাভ করে। এক হলো বৃত্তাকার গতি (Circular Motion)। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলেই এ গতির উদ্ভব ঘটে। আরেকটি হলো সরল গতি (Straight *Motion)।*

www.pathagar.com

পৃথিবীর কেন্দ্রে সরাসরিভাবে পতিত হওয়ার জন্য এ গতির সঞ্চার হয়। বৃত্তিক গতির জন্য জিনিসটির গতি পরিবর্তন হয়। সরল গতি জিনিসটির অবস্থান ঠিক রাখে। যদি জিনিসটির সরল গতি থাকতো তাহলে তা লম্ব রেখার পশ্চিমে পতিত হতো। একই সঙ্গে দু'প্রকার গতি কার্যকর হওয়ায় জিনিসটি পশ্চিম দিকেও পড়ে না কিংবা ঠিক লম্বভাবেও পড়ে না। বরং একটু পূর্বদিকে বেঁকে পড়ে।'

ত্রিকোণমিতিতে অবদান

ত্রিকোণমিতিতে আল-বেরুনি তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। প্রতিটি গণনাকে তিনি শুদ্ধ ও অভ্রান্ত করার জন্য প্রাণপন সাধনা করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলে সন্তুষ্ট হওয়া নাগাদ তিনি তাকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করেননি। তিনি প্রত্যেক ডিগ্রির এক-চতুর্থাংশ অনুসারে গণনা করে তালিকা তৈরি করেন। এ গণনায় তিনি দু'টি নিয়ম অনুসরণ করেন। একটি নিয়ম ছিল সাধারণভাবে গণনা এবং অন্যটি ছিল সূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ গণনা। সাধারণ গণনার জন্য তিনি আনুপাতিক অংশের নিয়ম ব্যবহার করেন। সূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ গণনায় আল-বেরুনির অনুসৃত নিয়ম তার যুগ এবং পরবর্তীকালে বিস্ময়কর বলে প্রমাণিত হলেও কৃতিত্ব থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। তার আবিস্কৃত ফর্মুলাটির নাম 'দ্য ফর্মুলা অব ইন্টারপোলেশন'। কিন্তু আইজাক নিউটনকে এ ফর্মুলার আবিষ্কারক হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। নিউটনের জন্মের বহু আগে আল-বেরুনি শুধু এ প্রণালী আবিষ্কার নয়, তাকে ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইনের তালিকাও তৈরি করেন। তবে তিনি দশমিকের সপ্তম স্থানের পর আর তাকে এগিয়ে নিয়ে যাননি। আল-বেরুনি এত সূক্ষ্মভাবে সাইন তালিকা তৈরি করেন যে, তাতে ভুলের মাত্রা ছিল $১/১০^{৭}$ এর চেয়েও কম। নির্দিষ্ট অঙ্কের কোণের সাইন নির্ধারণ করেই তিনি থেমে যাননি, তার বিপরীত উপায় অর্থাৎ সাইন জানা থাকলেও অতি নিপুনভাবে তার কোণ নির্ধারণ করার পন্থা বের করেছেন। তিনি তার ত্রিকোণমিতির প্রমাণ ও স্বতঃসিদ্ধগুলো জ্যামিতিক অঙ্কন ও প্রমাণের সাহায্যে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে দাঁড় করিয়েছেন। সাইন তালিকা তৈরি করেই আল-বেরুনি টানজেন্ট তালিকার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বৃত্তের ব্যাসার্ধের পরিমাণকে এক ইউনিট ধরে নিয়ে ত্রিকোণমিতির সম্পর্কগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং খুব সহজে এগুলোর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

আল-বেরুনি তার 'কানুন-ই-মাসউদী'তে বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির আলোচনায় প্রথমে শূন্য ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি সাইনের মূল্য নির্ধারণ করে সাইনের একটি তালিকা তৈরি করেন। তিনি শুধু প্রত্যেক ডিগ্রির সাইন নির্ধারণ করেই তার কর্তব্য শেষ করেননি, প্রতি ডিগ্রির অংশের সাইনও নির্ধারণ করেছেন। প্রতি ১৫ মিনিট করে অংশ বৃদ্ধির জন্য সাইনের পরিমাণে যে তারতম্য হয় তার মূল্য দশমিকের সপ্তম স্থান পর্যন্ত নির্ধারণ করেন। এই তালিকা তৈরি করতে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে তিনি সুষম বহুভুজের বাহুগুলো ঠিক করে

www.pathagar.com

নিয়ে তা থেকে ৬০ ডিগ্রি, ৩০ ডিগ্রি, ৪৫ ডিগ্রি এবং ১৮ ডিগ্রির সাইনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তারপর ত্রিকোণমিত্রিক ও জ্যামিতিক উভয় পদ্ধতিতে সাইনের (A+B) ফর্মুলা নির্ণয় করেন। পরে B=A ধরে নিয়ে তা থেকে সাইন 2A এর পরিমাণ নির্ধারণ করার উপায় বের করেন। তৃতীয় পন্থাটি জটিল গাণিতিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিচ্ছে। ১৫ ডিগ্রির সাইন নির্ধারণে প্রয়োজন হয় ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধান। জ্যামিতিক ভাষায় তাকে বলা যেতে পেরে চাপের এক-তৃতীয়াংশের জন্য জ্যা নির্ধারণ করা। স্তরে স্তরে গণনা করে এ ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধানে আল-বেরুনি তার গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। চতুর্থ দফায় সাইনের (A+B) ফর্মুলা পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করে তালিকাটি সম্পূর্ণ করেছেন। টানজেন্ট তালিকা তৈরি করতে গিয়ে তিনি একটি ফর্মুলা বের করেন। ফর্মুলাটি এরকম:

XCY এবং ECW কোনো বৃত্তের দু'টি ব্যাস। যদি SCY সূর্যের উন্নতি (altitude) হয় তাহলে SM হবে সেই উন্নতির সাইন এবং CM কোসাইন। X বিন্দুতে একটি টানজেন্ট আঁকা যাক। SC বর্ধিত করলে এই টানজেন্টকে তা P বিন্দুতে ছেদ করবে। তাহলে PX হবে উন্নতির টানজেন্ট। এমনি বৃত্তের W বিন্দুতে একটি টানজেন্ট অঙ্কন করলে সেই টানজেন্ট যদি CP-কে Q বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে WQ হবে উন্নতির কোটানজেন্ট, CP হবে সিকান্ট এবং CQ কোসিকান্ট।

আল-বেরুনি কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হন। তাত্ত্বিক সমাধান অসম্ভব বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি ১২টি যান্ত্রিক উপায় নির্ধারণ করেন। এ যান্ত্রিক উপায়ের মধ্যে তার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উপায়ে তিনি ১° ডিগ্রি চাপের যে পরিমাণ নির্ধারণ করেন তা দশমিকের দশম স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। তার নির্ধারিত পরিমাণগুলো হলো $1g\ 2^{I}\text{-}49^{II}\text{-}5^{IIII}\text{-}48^{IV}$। আবুল ওয়াফার নির্ধারিত পরিমাণ হলো $1g2^{I}\text{-}40^{II}\text{-}51^{III}\text{-}58^{Iv}\text{-}0v^{I}$। বর্তমানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হিসাবে স্থিরীকৃত পরিমাণ হলো $1g2^{I}\text{-}49^{II}\text{-}5^{IIII}\text{-}48^{Iv}\text{-}O^{v}\text{-}25^{vI}\text{-}27^{vII}$। এমনিভাবে আল-বেরুনি π এর প্রকৃত মান বের করেন। তার স্থিরীকৃত পরিমান হলো $3^{0}\text{-}80^{II}\text{-}17^{III}\text{-}36^{vI}\text{-}46^{vI}\text{-}30^{vI}$। আল-বেরুনি তার 'কিতাবুল হিন্দ'-এ π-এর পরিমাণ নির্ধারণে হিন্দু মনীষীদের ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা ক:েছেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে মৎস্য পুরাণে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, পরিধি ব্যাসের তিনগুণ। একইভাবে আদিত্য পুরাণে দ্বীপগুলোর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, পরিধি ব্যাসের তিনগুণ। বায়ু পুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরে হিন্দুরা তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পারে। ব্রহ্মগুপ্ত প্রথম প্রকাশ করেন যে, পরিধি ব্যাসের ৩$\frac{১}{৭}$ গুণ। কিন্তু তার পরিধি নির্ধারণের পদ্ধতিটি ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তার মতে, ১০ এর বর্গমূল যেমন ৩$\frac{১}{৭}$ এর প্রায় সমান, ব্যাস এবং পরিধির অনুপাতও তেমনি ১ থেকে ১০ এর বর্গমূলের অনুপাতের সমান। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা একে

www.pathagar.com

৩ $\frac{১৭৭}{৯৫০}$ বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। হিন্দু মনীষীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরাও তাদের একই ফল ব্যবহার করেন। গণিতজ্ঞ ইয়াকুব ইবনে তারিক তার 'কোম্পোজিটো স্ফোয়েরয়্যারাম' নামে বইয়ে একই অনুপাত ব্যবহার করেছেন। তার মতে, জোডিয়াক-এর পরিধি হলো ১২৫,৬৬০,০০০ যোজন এবং তার ব্যাস হলো ৫০০,০০০,০০০ যোজন।

আবিষ্কার

বহু আবিষ্কারের সঙ্গে আবু রায়হান আল-বেরুনির নাম জড়িত। তিনি ল্যাবরেটরি ফ্লাক্স ও পাইকনোমিটার, আবিষ্কার করেন। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি বাতাসে কোনো উপাদানের ওজন এবং স্থানচ্যুত পানির মধ্যকার অনুপাত খুঁজে বের করতে কণিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি রত্নপাথর ও ধাতুর নির্দিষ্ট ওজন সঠিকভাবে পরিমাপ করেন। তার পরিমাপ আধুনিক পরিমাপের অত্যন্ত কাছাকাছি।

কিতাবুল তাফহিম

আল-বেরুনির 'কিতাবুল তাফহিম' হলো একটি শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র। বইটি 'কানুন-ই-মাসউদী'র মতো উচ্চাঙ্গের নয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। আল-বেরুনি বইটি খাওয়ারিজমের আমির আবুল হাসানের কন্যা যুবরাজ্ঞী রায়হানকে উৎসর্গ করেন। অনুবাদক র‍্যামসে রাইটের মতে, বইটি যদিও জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত উপদেশাবলী সম্বলিত তবু তাকে একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রথম পুস্ত ক হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তাতে জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত এস্ট্রোল্যাব এবং সমসাময়িক ভূগোল ও তারিখ গণনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বইটিকে বিশ্ব গঠন তত্ত্বের বই বলা যেতে পারে। 'কিতাবুল তাফহিম'কে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক বই হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়েছে। পুরো বইটি ৫০৩ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। জ্যামিতির অংশে সাধারণত জ্যামিতিতে ব্যবহৃত চিত্রসহ সব অঙ্কনাদির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক সংজ্ঞা থেকে শুরু করে কণিক, বৃত্তচাপ প্রভৃতি জটিল জ্যামিতিক বিষয়গুলো বইটিতে স্থান পেয়েছে।

পাণ্ডিত্যের প্রমাণ

আল-বেরুনির অধিকাংশ বই আরবী ভাষায় রচিত হলেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে তিনি তার বিখ্যাত বই 'কিতাব আল-তাফহিম' আরবী ও ফারসি উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। বৈজ্ঞানিক লেখালেখিতে তিনি ফারসি ভাষার চেয়ে আরবী ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতেন। আল-বেরুনির 'কানুন-ই-মাসউদী' হলো তার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

রচনা। বইটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ত্রিকোণমিতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী

একদিন সুলতান মাহমুদ গজনীতে তার হাজার বৃক্ষের বাগানে গ্রীষ্মাবাসের ছাদে বসা ছিলেন। এ সময় তিনি আল-বেরুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, *'এই বাড়ির চারটি দরজার কোনটি দিয়ে আমি বের হবো তা গণনা করে একটি কাগজে লিখে আমার কম্বলের নিচে রেখে দেবেন।'* আল-বেরুনি এস্ট্রোল্যাব যন্ত্র আনিয়ে জায়গার উচ্চতা দেখে নেন। তারপর অঙ্ক কষে তিনি সুলতান মাহমুদের বের হয়ে যাবার জায়গা চিহ্নিত করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি তার অভিমত লিখে কম্বলের নিচে রেখে আসেন। সুলতান মাহমুদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, *'আপনি কি গণনা শেষ করেছেন?'* আল-বেরুনি হ্যাঁসূচক জবাব দেন। সুলতান একদিকের দেয়াল ভেঙ্গে একটি দরজা তৈরির আদেশ দেন। লোকজন শাবল গাইতি এনে পূর্বদিকের দেয়াল ভেঙ্গে একটি দরজা বানিয়ে ফেলে। সুলতান মাহমুদ সে দরজা দিয়ে বের হয়ে যান। তারপর তিনি আল-বেরুনির লিখিত কাগজ নিয়ে আসতে বলেন। কাগজ খণ্ড এনে সুলতান মাহমুদ দেখতে পান, তাতে লেখা রয়েছে, তিনি চারটি দরজার কোনোটা দিয়েই বের হবেন না। লোকজন পূর্বদিকের দেয়াল ভেঙ্গে আরেকটি দরজা বানিয়ে দেবে এবং তিনি সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবেন। আল-বেরুনির সঠিক গণনা পাঠ করে সুলতান মাহমুদ ক্ষেপে যান। তাকে প্রাসাদের ছাদ থেকে ফেলে দেয়ার হুকুম দেন। তার হুকুম তামিল করা হয়। মশা মাছি তাড়ানোর জন্য নিচে একটি জাল পেতে রাখা হয়েছিল। আল-বেরুনি দেয়াল থেকে ছিঁটকে সেই জালে গিয়ে পড়েন। জাল ছিঁড়ে তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে পড়েন। তাতে তিনি কোনো আঘাত পাননি। সুলতান মাহমুদ আল-বেরুনিকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তাকে নিয়ে আসা হয়। সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, *'আবু রায়হান আপনি কি তা জানতেন?'* জবাবে আল-বেরুনি বললেন, *'হ্যাঁ হুজুর। আমি জানতাম।'* তারপর সুলতান মাহমুদ চাকরের কাছ থেকে পঞ্জিকা নিয়ে তা থেকে আল-বেরুনির নিজের সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণীর পৃষ্ঠা বের করেন। পঞ্জিকার পাতায় তিনি দেখতে পান তাতে লেখা রয়েছে, *'আজ আমাকে কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। তবে আমি নিরাপদে মাটিতে পড়বো এবং আমার শরীরে কোনো আঘাত লাগবে না।'*

সম্মান

ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) ১৯৭০ সালে আল-বেরুনিকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বছর চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ

www.pathagar.com

করা হয় তার নামে। ১৭ দশমিক ৯ দ্রাঘিমাংশ এবং ৯২ দশমিক ৫ অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৭৫ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

রচনাবলী

আল-বেরুনি ভারত সফরের ওপরই অন্তত ২০টি বই লিখেছিলেন। তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বই টিকে আছে। তার উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো:

(১) আলাল কি জিজে খাওয়ারিজমি

(২) এবতালোল বোহতানে বেইরাদেল বোরহানে আলা ইলালেল খাওয়ারিজমি

(৩) আবু হাসান আহওয়াযীর খাওয়ারিজম

(৪) তাকমিলে মিজে হাবশ বিল ইলাল ও তাহজীবে আমালিহি মিন জালাল

(৫) জাওয়ামেউল মওজুদে লে খাওয়াতিরিল হুনুদ ফি হিসাবেত তানজীম জিজে আরকন্দ

(৬) কিতাবু মাকালিদে এলমেল হায়য়াতে মা ইয়াহদেছু ফি বাসিতেল কুররা

(৭) খেয়ালোল কসুফাইনে এন্দাল হিন্দ

(৮) আমরোল মোমতাহানে

(৯) এখতেলাফোল আকাবীল লে এসতেবরাজিল তাহাবিল

(১০) মাকালাতুন ফিত্তাহলীল ওয়াততাকতিরে লিততাদিল

(১১) মেফতাহু এলমেল হায়ায়াত

(১২) তাহজীবে ফসুলেলু ফরগানি

(১৩) এফরাদোল কাল ফি আমরেল আযলাল

(১৪) এসতেমালে দাওয়ায়েরেস সামাওয়াতে লে এসতেখরাজে মারাকেজেল বুয়ুত

(১৫) মাকালাতে ফি তালেয়ে কোব্বাতেল আরদে

(১৬) তাহদীদ নেহায়াতেল আমাকেন লেতাসহীহে মাসফাতেল মাসাকেন

(১৭) তাহজীবল আকওয়াল ফি তসহীহেল ওরুদে ওয়াল আত ওয়াল

(১৮) তাসহীফোল মানকুলে মিনাল ওরুদে ওয়াল তাওলে

(১৯) মাকালাতো ফি তসহীহেত্ তাওলে ওশাল ওরুদে লেমাসাকেনেল মা'মুরে মিনাল আরদে

(২০) রসুমুল হিন্দ

(২১) আল-আছার আল-বাকিয়া

(২২) কিতাব আল-জামাহির ফি মারিফাত আল-জাওয়াহির

মৃত্যু

রূপকথার গল্পের মতো প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টির অমোঘ বিধান তাকেও মেনে নিতে হয়েছে। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তার জ্ঞান পিপাসা দূর হয়নি। অন্তিম সময়ে ফকিহ আবুল হুসেন তার অবস্থা দেখার

www.pathagar.com

জন্য হাজির হলে তিনি তাকে বললেন, *'আপনি একদিন কৃত্রিম মাতামহীর হিসাবটা যেন কিভাবে বলেছিলেন?'* আবুল হুসেন সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, *'আপনার এ অবস্থায় আমাকে সেই হিসাবটা বলতে হবে?'* তিনি বললেন, *'হ্যাঁ এখনি বলুন। বিষয়টি না জেনে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে জেনে ছেড়ে যাওয়া উত্তম।'* আবুল হুসেন তাকে হিসাবটি বুঝিয়ে বলেন। আল-বেরুনি শান্তভাবে শুনে পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর আবুল হুসেন বের হয়ে আসেন। বাইরে এসে তিনি কান্নাকাটি শুনতে পান। ১০৪৮ সালে মুসলিম ইতিহাসের এ অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানী গজনীতে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালে বিশ্বের কতটুকু ক্ষতি হয়েছিল অধ্যাপক সাকায়ের একটি মন্তব্য থেকে তা আঁচ করা যায়। তিনি বলেছিলেন, *'Al-Biruni was the greatest intelect that ever lived on this earth.'* অর্থাৎ *'আল-বেরুনি হলেন বিশ্বের এ যাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।'*

www.pathagar.com

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনার আসল নাম আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি সাধারণত ইবনে সিনা, বু-আলী সিনা এবং আবু আলী সিনা নামে পরিচিত। ল্যাটিন ভাষায় তার পরিচয় 'আভিসিনা' (Avicenna) নামে। তাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজির জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। দার্শনিক আল-ফারাবি ছিলেন তার গুরু। যোগ্যতায় তিনি তার গুরুকে অতিক্রম করে যান। ৯৮০ সালে তুর্কিস্তানের বিখ্যাত শহর বুখারার নিকটবর্তী আফসানা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম সিতারা বিবি। পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন খোরাসানের শাসনকর্তা। জন্মের কিছুকাল পরই তিনি ইবনে সিনাকে বুখারায় নিয়ে আসেন এবং তার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআনের ৩০ পারা মুখস্থ করে ফেলেন। তার ৩ জন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাদের মধ্যে ইসমাইল সুফি তাকে শিক্ষা দিতেন ধর্মতত্ত্ব, ফিকাহ শাস্ত্র ও তাফসীর। মাহমুদ মাসসাহ শিক্ষা দিতেন গণিতশাস্ত্র এবং বিখ্যাত দার্শনিক আল-নূতেলী শিক্ষা দিতেন দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি, টলেমির 'আলমাগেস্ট', 'জওয়াহেরে মান্তেক' প্রভৃতি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সব জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। বিখ্যাত দার্শনিক আল-নূতেলীর নিকট এমন কোনো জ্ঞান আর অবশিষ্ট ছিল না যা তিনি ইবনে সিনাকে শিক্ষা দিতে পারতেন। তারপর তিনি তাকে নিজের ইচ্ছেমতো গবেষণা করার সুযোগ দেন।

ইবনে সিনার 'কিতাব আল-শিফা' (The Book of Healing) হলো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর লেখা একটি বিশ্বকোষ। তার 'আল-কানুন ফি আল-তিব্ব' (The canon of Medicine) মধ্যযুগের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ১৬৫০-এর দশকে বইটি ফ্রান্সের মাউন্টপিলার ও বেলজিয়ামের লাউভেইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। ইবনে সিনার ক্যানন অব মেডিসিনে গালেন ও হিপোক্রেটসের নীতিমালার ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ইবনে সিনা ইসলামের স্বর্ণযুগে ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। তাকে এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় অনুবাদগুলো নিয়ে গবেষণা করা হতো। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। ইবনে সিনা ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ফিকাহ

www.pathagar.com

ও ধর্মের গবেষণাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। আল-রাজি ও আল-ফারাবি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করায় ইবনে সিনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। বলখ, খাওয়ারিজম, গোরগাঁও, শহর-ই-রাই, ইস্পাহান ও হামাদানের লাইব্রেরিগুলোতে তার অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি তার সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। খাওয়ারিজম ত্যাগ করার আগে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল-বেরুনি, খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ আবু নসর ইরাকি, দার্শনিক আবু সহল মাসীহ্ এবং প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল খাম্মারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বিহ্বল মুহূর্তে তিনি অজু করতেন এবং মসজিদে গিয়ে নফল নামাজ আদায় করতেন। সেজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে বলতেন, *'হে আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞানের দরজা খুলে দাও। জ্ঞান লাভ ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কোনো কামনা নেই।'* তারপর ঘরে এসে আবার গবেষণা শুরু করতেন। ক্লান্তিতে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো স্বপ্নের ন্যায় তার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হতো এবং তার জ্ঞানের দরজা যেন খুলে যেতো। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেই সমস্যাগুলোর সমাধান পেয়ে যেতেন। এক পর্যায়ে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কিত বই সংগ্রহ করে গবেষণা করতে শুরু করেন। কিশোর বয়সে তিনি এরিস্টোটলের 'মেটাফিজিক্স' (Metaphysics)-এ গভীরভাবে প্রভাবিত হন। দেড় বছর তিনি দর্শনের বইটি অধ্যয়ন করেন। এরিস্টোটলের দর্শন অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি জটিলতার মুখোমুখি হন। 'মেটাফিজিক্স' তিনি ৪০ বার পাঠ করেন। এতবার পাঠ করায় বইটির অক্ষরগুলো তার স্মৃতিতে গেঁথে যায়। কিন্তু তিনি অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। আল-ফারাবির ভাষ্য পাঠ করে তিনি অর্থ বুঝতে সক্ষম হন। একটি বুক স্টল থেকে তিন দিরহাম দিয়ে আল-ফারাবির ভাষ্য সংগ্রহ করেন। এরিস্টোটলের মেটাফিজিক্সের ওপর আল-ফারাবির ভাষ্য পাঠ করে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তৎক্ষণাৎ মসজিদে ছুটে গিয়ে নামাজ আদায় করেন এবং দীন দুঃখীদের দান খয়রাত করেন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে ইবনে সিনা চিকিৎসা বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শুধু চিকিৎসা বিষয়ক তত্ত্বগুলো শিখতেন তাই নয়, বিনা মূল্যে অসহায় রোগীদের চিকিৎসাও করতেন। দ্রুত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি চিকিৎসায় নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসকের মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সিনা বুঝতে পারেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান গণিত অথবা অধিবিদ্যার মতো এত কঠিন নয়। তিনি এনাটমিতে বিশ্বাস করতেন না এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি রোগ নিরাময়ে ওষুধের ওপর গুরুত্ব দিতেন বেশি।

যৌবনকাল

ইবনে সিনা যৌবনে খাওয়ারিজমের তাবারিস্তানের মামুনীয় আমির শামসুল মোয়ালি আবুল হাসান ইবনে ওয়াশমাগিরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

www.pathagar.com

৯৯৭ সালে তিনি ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। আমির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার জন্য রাজদরবারের লাইব্রেরি উন্মুক্ত করে দেন। মাত্র অল্প কয়েকদিনে তিনি অসীম ধৈর্য ও একাগ্রতার সঙ্গে লাইব্রেরির সব বই মুখস্থ করে ফেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডে লাইব্রেরি ভস্মীভূত হয়। লাইব্রেরিতে অগ্নিকাণ্ডের জন্য তার শত্রুরা তাকে অভিযুক্ত করে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, খোদাতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসীম জ্ঞানের অধিকারী হন। ২১ বছর বয়সে 'আল-মজমুয়া' নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এ বিশ্বকোষে গণিতশাস্ত্র ছাড়া প্রায় সব বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১০০১ সালে পিতা আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ২২ বছর। সামানীয় রাজবংশের পতন ঘটলে তার ওপর রাজনৈতিক দুর্যোগ নেমে আসে। নিরাপত্তা লাভে তিনি আধুনিক উজবেকিস্তানের উরগাঞ্চের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পরিচিত উজবেকিস্তানের উজির ইবনে সিনাকে মাসে বৃত্তি প্রদান করতেন। এই বৃত্তি এত সামান্য ছিল যে, তিনি জীবিকার্জনে খোরাসান সীমান্তের নিশাপুর ও মার্ভ জেলার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। দাইলাম ও মধ্য পারস্যের শাসক কাবুস ছিলেন একজন পণ্ডিত ও কবি। ইবনে সিনা তার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আশা করছিলেন। কিন্তু তিনি এমন এক সময় তার কাছে আশ্রয় কামনা করছিলেন যখন তার নিজের অবস্থা ছিল টলটলায়মান। বিদ্রোহী সৈন্যরা তাকে অনাহারে রেখে হত্যা করে। এসময় ইবনে সিনা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে কাস্পিয়ান সাগরের কাছে গোরগাঁয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার নিজের বাড়ির কাছে ইবনে সিনাকে একটি বাড়ি কিনে দেন। এই বাড়িতে তিনি যুক্তিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভাষণ দিতেন। বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে সিনা কয়েকটি বই লিখতে সক্ষম হন। হায়ারসানিয়ায় অবস্থানকালে তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত বই 'আল-কানুন ফি আল-তিব্ব' লিখতে শুরু করেন।

একসময় ইবনে সিনা আধুনিক ইরানের রাজধানী তেহরানের উপকণ্ঠে রাইয়ে বসবাস করতে থাকেন। শেষ বুয়েদীয় আমিরের ছেলে মজিদ আদদৌলা ছিলেন রাইয়ের নামমাত্র শাসক। তিনি তার মা সৈয়দা খাতুনের প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করতেন। রাইয়ে ইবনে সিনা অন্তত ৩০টি সংক্ষিপ্ত বই লেখা সম্পন্ন করেন। মজিদ আদদৌলা ও তার দ্বিতীয় পুত্র শামসুদৌলার মধ্যে সার্বক্ষণিক বিরোধ চলতে থাকায় ইবনে সিনা রাই ছাড়তে বাধ্য হন। কাজবিনে সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর তিনি দক্ষিণে হামাদান পৌঁছান। বুয়েদীয় আমির শামসুদৌলা নিজেকে হামাদানের শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে সিনা প্রথমে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার চিকিৎসক হিসাবে নিয়োজিত হন। তার আগমনের কথা শুনতে পেয়ে আমির তার চিকিৎসক হিসাবে তাকে তলব করেন। তাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠান। ইবনে সিনাকে উজিরের পদে আসীন করা হয়। সুস্থ হয়ে আমির তাকে রাজ্য ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। এসময়

www.pathagar.com

ইবনে সিনা শেখ আহমদ ফাদেলের বাড়িতে ৪০দিন আত্মগোপন করে থাকেন। আমির পুনরায় অসুস্থ হলে তাকে ডেকে পাঠান এবং তার পদ ফিরিয়ে দেন। জীবনের উত্থান পতনের দিনগুলোতে ইবনে সিনা তার জ্ঞান সাধনা চালিয়ে যান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি ছাত্রদের কাছে 'কানুন' ও 'সানাসিও'র অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা করতেন। আমিরের মৃত্যু হলে ইবনে সিনা তার মন্ত্রী পদ হারান এবং এক ছাত্রের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। সেখানে চরম দুঃসময়ে তিনি তার কাজ চালিয়ে যান। চাকরিতে নিয়োগ লাভের প্রস্তাব দিয়ে তিনি ইস্পাহানের শাসক আবু ইয়াফার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আবু ইয়াফার কাছে চিঠি পাঠানোর কথা জানতে পেরে হামাদানের আমির তাকে একটি দুর্গে বন্দি করেন। এ নিয়ে হামাদান ও ইস্পাহানের শাসকদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ১০২৪ সালে ইস্পাহানের শাসক হামাদান দখল করেন এবং ভাড়াটিয়া তাজিক সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। দুর্যোগ থেমে গেলে ইবনে সিনা হামাদানের আমিরের সঙ্গে ফিরে আসেন এবং তার লাইব্রেরি ওয়ার্ক চালিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্তীতে সুফির বেশ ধারণ করে তার ভাই ও প্রিয় ছাত্র এবং দু'জন ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হামাদান থেকে পালিয়ে যান। দীর্ঘ বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে তারা ইস্পাহানে পৌছলে তাদেরকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়।

১০০৪ সালে ইবনে সিনা খাওয়ারিজমে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। খাওয়ারিজমের বাদশাহ মামুন বিন মাহমুদ ছিলেন ব্যক্তি জীবনে একজন কবি। ১০০৪-১০১০ সাল পর্যন্ত ইবনে সিনা খাওয়ারিজমে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করলেও তার এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে গজনীর সুলতান মাহমুদ তাকে আমন্ত্রণ জানান। মাহমুদ জ্ঞানী ব্যক্তিদের খুব ভালোবাসতেন। তাদেরকে দেশ বিদেশ থেকে ডেকে এনে তার শাহী দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করতেন এবং তাদেরকে মনি মুক্তা উপহার দিতেন। ইবনে সিনাকে খুঁজে বের করতে সুলতান মাহমুদ তার প্রধান শিল্পী আবু নাসেরের মাধ্যমে তার ৪০টি প্রতিকৃতি তৈরি করে সমগ্র পারস্য ও এশিয়া মাইনরের রাজন্যবর্গের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি দেশে বিদেশে লোক পাঠান। এছাড়া তিনি খাওয়ারিজমের বাদশাহ মামুন বিন মাহমুদকে পরোক্ষভাবে এ নির্দেশ দিয়ে একটি পত্র পাঠান যে, তিনি যেন তার দরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের তার দরবারে পাঠিয়ে দেন। আসলে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে ইবনে সিনাকে পাওয়াই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

ইবনে সিনার ধর্মীয় মাযহাব নিয়ে বিতর্ক

মহান দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা ইসলামের কোন মাযহাবভুক্ত ছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক জহিরউদ্দিন আল-বায়হাকীর মতে, তিনি ছিলেন একটি গুপ্ত দার্শনিক সংস্থার সদস্য। অন্যদিকে শিয়া ফকিহ নূরুল্লাহ শুশতারি ও ঐতিহাসিক সৈয়দ হোসেন নাসির উভয়ে দাবি করেছেন, ইবনে সিনা শিয়াদের দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীতে দিমিত্রি গুস্তাস উভয়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছেন, ইবনে সিনা সুন্নি হানাফি মাযহাবভুক্ত মুসলমান

www.pathagar.com

ছিলেন। ধর্মীয় তাত্ত্বিক হেনরি করবিন আরেকটি তত্ত্বে দাবি করেছেন, ইবনে সিনা তার পিতার মতো ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। ইবনে সিনার পারিবারিক পটভূমি নিয়েও অনুরূপ বিতর্ক বিদ্যমান। একটি পক্ষ দাবি করছে, ইবনে সিনার পরিবার ছিল সুন্নি সম্প্রদায়ের। আরেকটি পক্ষ দাবি করছে, তার পরিবার ছিল শিয়া।

ক্যানন অব মেডিসিন

ইবনে সিনার 'আল-কানুন ফি আল-তিব্ব' (Canon of Medicine)-এর একটি ল্যাটিন কপি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আই. নিক্সন মেডিকেল হিস্টরিক্যাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। ইবনে সিনা প্রায় এক হাজার বই পুস্তক লিখে রেখে গেছেন।

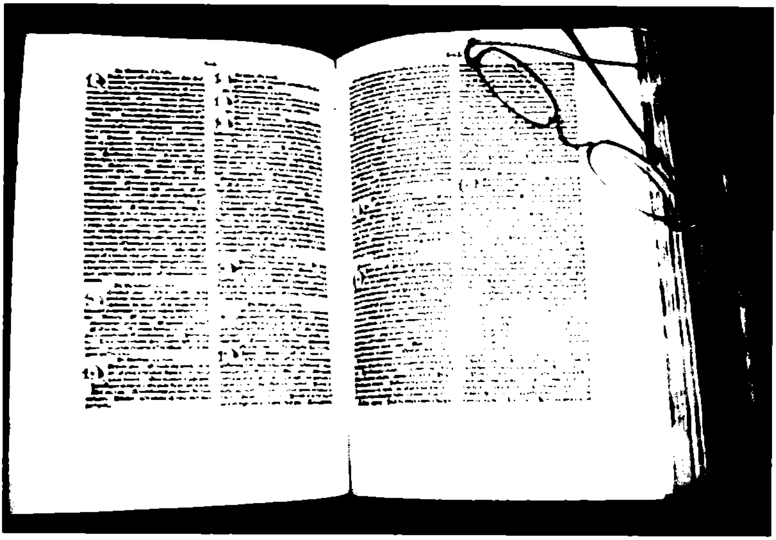

ইবনে সিনার বিশ্বকোষ দ্য ক্যানন অব মেডিসিন

তার কোনো কোনো বই মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার। অন্যগুলো কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। তবে ১৪ খণ্ডের 'ক্যানন অব মেডিসিন' তাকে ইতিহাসে জীবিত রেখেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ বইটি মুসলিম ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ানো হতো। ছোঁয়াচে এবং যৌনক্রিয়া বাহিত রোগ উদ্ভাবন, সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধে কোয়ারান্টাইন চালু, পরীক্ষামূলক ওষুধ ব্যবহার, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, স্নায়ু রোগের চিকিৎসা, ঝুঁকির উপাদান বিশ্লেষণ, লক্ষণ দেখে নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয় এবং মাইক্রোআর্গানিজমের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণার জন্য বইটি সুপরিচিত। ইবনে সিনা তার

www.pathagar.com

বইটিতে এ তত্ত্ব প্রচার করেন যে, বায়ু দূষণ হলো মহামারির কারণ। বইটিতে বিভিন্ন রোগের শ্রেণীবিন্যাস ও বিবরণ এবং রোগের সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সহজ ও জটিল ওষুধ এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে সিনাই প্রথম নির্ভুলভাবে চোখের গঠন এবং ছানির মতো চোখের বিভিন্ন অসুখের কথা উল্লেখ করেছেন। ক্যানন অব মেডিসিনে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়, যক্ষা হলো একটি সংক্রামক ব্যাধি। ইউরোপীয়রা যক্ষাকে সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে মেনে নিতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু পরে ইবনে সিনার তত্ত্ব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। বইটিতে বহুমূত্র রোগের লক্ষণ ও জটিলতাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। মুখমণ্ডলের উভয় প্রকার প্যারালাইসিস নিয়েও গভীর আলোচনা করা হয়েছে।

মনস্তত্ত্ব

ইবনে সিনা স্নায়ু চিকিৎসার অগ্রপথিক ছিলেন। তিনিই প্রথম স্মৃতিভ্রষ্টতা, অনিদ্রা, মানসিক বিকার, দুঃস্বপ্ন, অবসাদ, চিত্তভ্রংশ, মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত, স্ট্রোক ও ঘূর্ণিরোগসহ অসংখ্য স্নায়ুবিক দুর্বলতার বর্ণনা দেন। তিনি আবেগ সংশ্লিষ্ট অসুস্থতার জন্য মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা প্রদান করতেন এবং অভ্যন্তরীণ অনুভূতিসহ নাড়ির স্পন্দন পরিবর্তনের একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। ইবনে সিনা নাড়ি পরীক্ষা এবং প্রদেশ, জেলা, শহর, রাজপথ ও লোকজনের নাম চিৎকার করে উচ্চারণ করে একজন গুরুতর মানসিক রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন। বিশেষ নামগুলো উচ্চারণ করার সময় তিনি রোগীর নাড়ির স্পন্দনের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। ইবনে সিনা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে রোগীর প্রেম ছিল। ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি মেয়েটির বাড়ি খুঁজে পান। ইবনে সিনা মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য রোগীকে পরামর্শ দেন। মেয়েটিকে বিয়ে করার পর রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

ইউনানী চিকিৎসা

দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত গালেনের সময় থেকে ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যা চালু হয়। তবে এ চিকিৎসা পদ্ধতির মৌলিক জ্ঞান উদ্ভাবন করেছিলেন হেকিম ইবনে সিনা। তিনি তার ক্যানন অব মেডিসিনে ইউনানী চিকিৎসার বর্ণনা দিয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মেডিকেল কলেজগুলোর পাঠ্যসূচিতে বইটি অন্তর্ভুক্ত। হেকিম ইবনে সিনার ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ক বই নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে ভারতীয় হেকিম সৈয়দ জিল্লুর রহমান নিজেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ইবনে সিনার ওপর তার লেখা বইগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

(১) রিসালাহ জুদিয়া অব ইবনে সিনা
(২) আল-আদভিয়া আল-কালবিয়া অব ইবনে সিনা
(৩) ইলমুল আমরাজ অব ইবনে সিনা
(৪) কানুন ইবনে সিনা আউর উসকে শারিহীন ওয়া মুত্রারাজমীন

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা

আল-ফারাবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইবনে সিনা বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি নির্যাস (মাহিয়াত) ও অস্তিত্বের (উজুদ) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, বিদ্যমান বস্তুর নির্যাস থেকে কোনো কিছু অস্তিত্ব লাভ

www.pathagar.com

করতে এবং বস্তুগুলো নিজেরা পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে না। এছাড়া বস্তুগুলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতিশীলতায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কোনো কার্যকারণ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করেছে। হামাদানের কাছে ফারদাজান দুর্গে অন্তরীণ থাকার সময় ইবনে সিনা মানুষের আত্মসচেতনতা এবং আত্মার অবিনশ্বরতা প্রদর্শনে তার বিখ্যাত বই 'ফ্লোটিং ম্যান' লিখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার ফ্লোটিং ম্যান চিন্তাধারার মাধ্যমে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা একটি সত্তা।

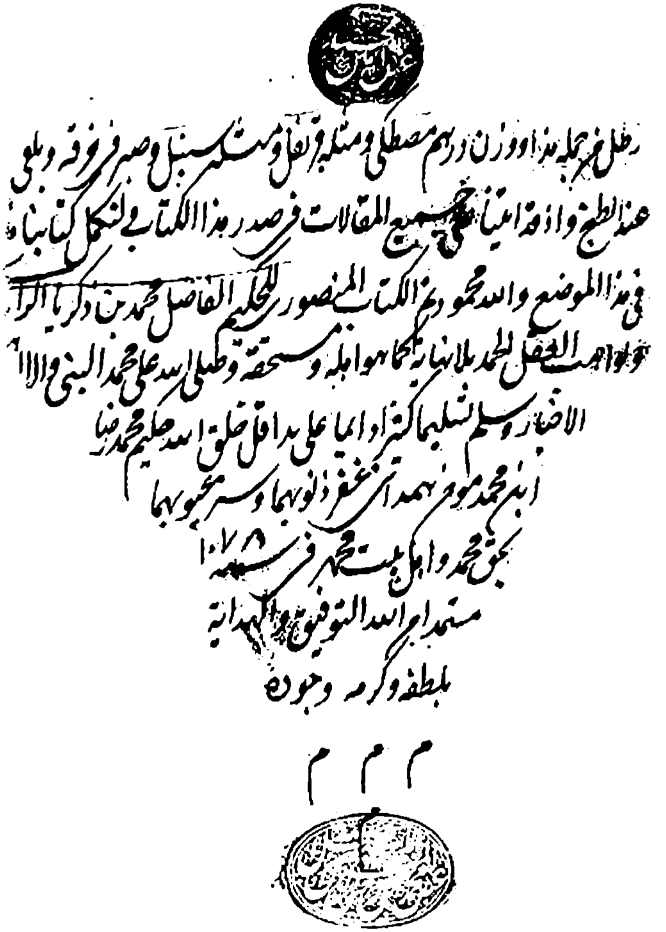

এরিস্টোটলের ডি এনিমার ওপর লেখা ইবনে সিনার ভাষ্য

www.pathagar.com

দর্শন

ইবনে সিনা ইসলামী দর্শনে বিশ্বাস করতেন। তিনি ইসলামী দর্শন বিশেষ করে যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যার ওপর ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। এসব বিষয়ের ওপর লিখিত তার একটি বইয়ের ইংরেজি নাম হলো 'লজিক' এবং আরেকটি বইয়ের নাম 'মেটাফিজিক্স'। আরবী ভাষায় তিনি অধিকাংশ বই লিখেছেন। তার সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ছিল বৈজ্ঞানিক ভাষা। ইবনে সিনা ফারসি ভাষায়ও কয়েকটি বই লিখেছেন। ফারসি ভাষায় তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম হলো 'দানিশনামা-ই-আলা' বা আলাউদদৌলার দর্শন। এরিস্টোটলের ওপর ইবনে সিনার ভাষ্য বিজ্ঞানীদের ভুল সংশোধনে সহায়ক হয়। বিজ্ঞানীরা ইজতিহাদের চেতনায় প্রাণবন্ত বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এরিস্টোটলের মতবাদ এবং নব্য প্লেটোবাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সফল হওয়ায় ইবনে সিনা দ্বাদশ শতাব্দীতে নেতৃস্থানীয় ইসলামী দার্শনিক হিসাবে আবির্ভূত হন। মধ্যযুগের ইউরোপে তার মতবাদ বিশেষ করে আত্মার প্রকৃতি এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মতবাদ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। ফরাসি ধর্মযাজক উইলিয়াম ও জার্মান দার্শনিক এলবার্টাস ম্যাগনাস প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ১২১০ সালে ফ্রান্সে ইবনে সিনার মতবাদ নিষিদ্ধ করা হয়। তার অধিবিদ্যা ইতালীয় ধর্মযাজক টমাস একুইনাসের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র

ইবনে সিনা দু'টি কারণে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের বিরোধিতা করতেন। প্রথম কারণ ছিল জ্যোতিষীদের অনুসৃত পদ্ধতি। জ্যোতিষীরা অনুমান আন্দাজে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। ভবিষ্যদ্বাণীর সপক্ষে তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারতেন না। দ্বিতীয় কারণ ছিল জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরোধিতায় তার যুক্তির পক্ষে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি এরিস্টোটলের মতবাদের বিরোধিতা করতেন। এরিস্টোটল বলেছিলেন, তারকাগুলো সূর্যের আলোয় আলোকিত। ইবনে সিনা দাবি করছিলেন, নক্ষত্রগুলো নিজের আলোয় আলোকিত। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, গ্রহগুলোও নিজের আলোয় আলোকিত। ইবনে সিনা উল্লেখ করেছিলেন, তিনি ১০৩২ সালের ২৪ মে সূর্যের চারদিকে শুক্রকে প্রদক্ষিণ করতে দেখতে পেয়েছেন। তবে আধুনিক পণ্ডিতরা তার এ দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলছেন। তারা বলছেন, ইবনে সিনা যেখান থেকে শুক্র গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে দেখতে পেয়েছেন তা ঐ সময় ঐ স্থান থেকে দেখা সম্ভব নয়। ইবনে সিনা 'দ্য কম্পেনডিয়াম অব আলমাগেস্ট' শিরোনামে টলেমির আলমাগেস্ট-এর একটি ভাষ্য লিখার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, শুক্র গ্রহ সূর্য থেকে পৃথিবীর অনেক বেশি কাছে। ১০৭০ সালে ইবনে সিনার ছাত্র আবু ওবায়েদ আল-জুজযানি দাবি করেন, তার শিক্ষক ক্লডিয়াস টলেমির একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছেন।

www.pathagar.com

রসায়ন

রসায়নশাস্ত্রে ইবনে সিনা প্রথম বাষ্পীয় পাতনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন। এ পদ্ধতি এলকোহল ও ঘন হাইড্রোলিক তরল পদার্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। অ্যারোমেটিক থেরাপি তৈরিতে এলকোহলের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। তিনি রেফ্রিজারেটেড কয়েল (গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার্য যন্ত্র) আবিষ্কার করেন। তার এ আবিষ্কার ছিল পাতন প্রযুক্তিতে একটি বিরাট অগ্রগতি। তিনি বাষ্পীয় পাতন প্রক্রিয়ায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। ঘন হাইড্রোলিক তরল পদার্থ উৎপাদনে রেফ্রিজারেটেড টিউবের (Refrigerated tube) প্রয়োজন হতো। একজন রসায়নবিদ হিসাবে ইবনে সিনা প্রথম আলকেমি সংক্রান্ত তত্ত্ব খণ্ডন করে চারটি বই লিখেন। তার বইগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ইবনে সিনা তার গ্রন্থ 'দ্য বুক অব মিনার‍্যালস'-এ পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে পরশমনি তৈরির (Transmulation of Substance) তত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মতামত দেন যে, অন্য কোনো ধাতুর রূপান্তর ঘটিয়ে সোনা কিংবা রূপা তৈরি করা সম্ভব নয়। তখনকার দিনে আলকেমিস্টরা ধাতুর রূপান্তরে বিশ্বাস করতেন। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল এরিস্টোটলের একটি তত্ত্ব। এরিস্টোটল তার তত্ত্বে দাবি করেছিলেন, মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন- এ চারটি উপাদান নিয়ে বস্তু গঠিত। স্বর্ণ হচ্ছে সব ধাতুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং রূপা হচ্ছে দ্বিতীয়। এসব উপাদানের সংমিশ্রণে একটি ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তর করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় পঞ্চম ধাতু বা 'এলিক্সার' তৈরি করা যাবে। এলিক্সার তৈরি করা সম্ভব হলে মানুষ চির যৌবন লাভ করবে। কিন্তু ইবনে সিনা এরিস্টোটলেরর এ তত্ত্ব বিশ্বাস করতে পারেননি। আলকেমির প্রতি অবিশ্বাস থেকে তিনি যেসব বই রচনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল 'লাইবার এবোয়ালি এবিনসাইন দ্য এনিমা ইন আর্টি আলকিমিয়া'। ভিনসেন্ট অব বিউভাইসের মতো মধ্যযুগের রসায়নবিদ ও আলকেমিস্টদের ওপর বইটির প্রভাব ছিল অসামান্য। 'দ্য কংলেশনি ইট কংলিউটিনেশনি লাপিডিয়াম' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত অন্য আরেকটি বইয়ে ইবনে সিনা চার খণ্ডে বিভক্ত একটি অজৈব পদার্থ শ্রেণীকরণের প্রস্তাব করেন। তার এ প্রস্তাব ছিল এরিস্টোটলের দু'টি খণ্ড (অরিকটা ও ধাতু) এবং গালেনের তিন খণ্ডে (টারে, লাপিডেস ও ধাতু) বিভক্ত শ্রেণীকরণের তুলনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। ইবনে সিনার শ্রেণীকরণের চারটি অংশ ছিল লাপিডেস, ক্ষার, লবণ ও ধাতু।

প্রকৌশল

ইবনে সিনা তার বিশ্বকোষ 'মায়ার আল-আকল'-এর (The measure of Mind) মেকানিক্স ও প্রকৌশল বিষয়ক অধ্যায়গুলোতে সরল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং সরল যন্ত্র ও তাদের সমন্বয়গুলো শ্রেণীকরণে একটি সফল প্রচেষ্টা চালান। তিনি প্রথমেই কপিকল, ভারোত্তোলক, স্ক্রু, গোঁজ ও চরকি- এ পাঁচটি সরল

www.pathagar.com

যন্ত্রের উপকরণের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেন। পরে তিনি এসব সরল যন্ত্রপাতির বিশ্লেষণ হাজির করেন। তিনিই প্রথম এমন একটি কৌশল বর্ণনা করেন যা ছিল গোঁজ ছাড়া অন্য সরল যন্ত্রগুলোর একটি সমন্বয়।

বিজ্ঞানের দর্শন

'দ্য বুক অব হীলিং'-এর আল-বুরহান অধ্যায়ে ইবনে সিনা বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এরিস্টোটলের 'পোস্টারিয়র অ্যানালিটিক্স' নিয়ে আলোচনার কয়েক জায়গায় তার দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। ইবনে সিনা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে একটি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, *'একজন লোক কিভাবে বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতিমালা শিখতে পারবে?' তিনি আরো জানতে চেয়েছেন, 'কয়েকটি মৌলিক জিজ্ঞাসা ছাড়া একজন বিজ্ঞানী কিভাবে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অথবা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় পৌঁছাতে পারবেন?'* তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যদি কেউ আশ্রয় বাক্যগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারেন তাহলে তিনি নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌঁছাতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রথম আশ্রয় বাক্যে বলা হয়, *'মানুষ মরণশীল'* এবং দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়, *'সক্রেটিস একজন মানুষ'* তাহলে তৃতীয় বাক্যটি হবে *'সক্রেটিস মরণশীল'*। তারপর ইবনে সিনা প্রথম নীতিতে পৌঁছানোর জন্য আরো দু'টি পদ্ধতি যুক্ত করেন। প্রথম পদ্ধতিটি হচ্ছে এরিস্টোটলের আরোহ বা ইশতিকরা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা বা তাজরিবা পদ্ধতি। ইবনে সিনা এরিস্টোটলের আরোহ পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, এ পদ্ধতিতে চূড়ান্ত ও সর্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না এবং কোনো কোনো আশ্রয় বাক্য ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়। এরিস্টোটলের আরোহ পদ্ধতির স্থলে তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপায় হিসাবে একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞানে ইবনে সিনাকে গতি তত্ত্বের ধারণার জনক হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। মেকানিক্সে তিনি তার দ্য বুক অব হীলিংয়ে একটি বিস্তারিত গতি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। তাতে তিনি গতির প্রবণতা এবং উৎক্ষিপ্ত বস্তুর শক্তির মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গতি হলো নিক্ষিপ্ত বস্তুতে নিক্ষেপকারীর স্থানান্তরিত আনতি বা 'মায়াল'। তিনি গতির প্রবণতাকে একটি স্থায়ী শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বায়ুর বাধার মতো বাইরের কয়েকটি শক্তি এ স্থায়ী শক্তির ক্ষয় সাধন করে। ইবনে সিনা বুঝাতে চেয়েছেন, ধাবমান শক্তি সমান হলে বস্তুগুলো তাদের আনুপাতিক ওজন অনুযায়ী অগ্রসর হবে। তিনি জন ফিলিপোনসের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন, গতিশীল বস্তুর পথে কোনো বাধা না এলে প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি অনন্তকাল চলতে থাকবে। ইবনে সিনার এ গতি তত্ত্ব বর্তমানে নিউটনের প্রথম গতি সূত্র হিসাবে পরিচিত জড়

www.pathagar.com

তত্ত্বের একটি স্মারক। তার মায়াল তত্ত্বে একটি সচল দেহের গতি এবং ওজনের মধ্যকার সংখ্যাগত সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ফরাসি ধর্মযাজক জ্যাঁ বুরিদান তার 'থিওরি অব ইম্পেটাস'-এ ইবনে সিনার গতি তত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

আবিষ্কার

ইবনে সিনা শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন আবিষ্কারক। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে তিনি অতি প্রয়োজনীয় একটি তৈল আবিষ্কার করেছিলেন। তার আবিষ্কৃত তৈল এরোমেথেরাপি, পানীয় ও প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার করা হতো। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় তিনি প্রথম একটি এয়ার থার্মোমিটার ব্যবহার করেছিলেন।

লেগ্যাসি

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডিভাইন কমেডি'তে (Divine Comedy) কল্পনার অনন্ত লোকে বিশ্ববরেণ্য কবি দান্তে আলিগেরির সঙ্গে রোমান কবি ভার্জিল, মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ, অন্ধ গ্রীক মহাকবি হোমার, রোমান কবি হোরেস, রোমান কবি ওভিড, রোমান কবি লিউকান, দার্শনিক সক্রেটিস, দার্শনিক প্লেটো ও সুলতান সালাহউদ্দিনের মতো ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। দান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে ইবনে সিনাকে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'র গ্রন্থকার বেলজীয় রসায়নবিদ জর্জ সারটন তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়ক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাকে ইসলামের সবচেয়ে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং সকল জাতি, সকল দেশ ও সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকার করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

ইবনে সিনা প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী হিপোক্রিটাস ও গালেন এবং প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞ সুশ্রুতা ও প্রাচীন ভারতীয় আয়ুবেদীয় চিকিৎসক চরাকার দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আল-রাজি, আবু আল-কাসিম, ইবনুল নাফিস ও আল-ইবাদির পাশাপাশি ইবনে সিনাকেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁয় অমূল্য অবদান রাখায় তাকে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়। ইবনে সিনাকে পদার্থবিজ্ঞানে গতিবিদ্যার মৌলিক ধারণার জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। ইরানে তাকে একজন জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়া হয় এবং প্রায়ই তাকে পারস্যের শ্রেষ্ঠতম সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমান ইরানে তার বহু প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বিদ্যমান। উজবেকিস্তানের রাজধানী বুখারায় জাদুঘরের বাইরে চিকিৎসকদের চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত এ মহান ব্যক্তির জীবনী ও কর্ম সম্বলিত একটি সুদৃশ্য প্রতিকৃতি টানানো রয়েছে। একইভাবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আভিসিনা মেডিকেল ফ্যাকাল্টির হলে তার একটি প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। বিজ্ঞানে বহুমুখী প্রতিভা ইবনে সিনার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে

www.pathagar.com

১৯৭০ সালে তার নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে। ৩৯ দশমিক শূন্য ৭এস এবং ৯৭ দশমিক শূন্য ২ ডব্লিউ অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৭৪ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। হামাদানের বু আলী সিনা বিশ্ববিদ্যালয়, তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবের ইবনে সিনা তাজিক স্টেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় ইবনে সিনা একাডেমি অব মেডিয়ীভাল মেডিসিন এন্ড সায়েন্সেস, করাচিতে ইবনে সিনা মেডিকেল স্কুল, লাহোরে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, তার জন্মভূমি বলখে ইবনে সিনা বলখ মেডিকেল স্কুল, তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে সিনা ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন এবং ফিলিপাইনের মারাভি সিটিতে ইবনে সিনা ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল স্কুল এবং ঢাকায় ইবনে সিনা মেডিকেল সেন্টার তার স্মৃতি বহন করছে। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন স্মারক ডাক টিকিট ইস্যু এবং তার একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইবনে সিনার সহস্র জন্মবার্ষিকী পালন করে। বুখারা থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে তার জন্মস্থান আফসানার কিষলাকে তার নামে একটি প্রশিক্ষণ কলেজের নামকরণ করা হয়। মেডিকেল স্টাফের এ কলেজের মাঠে নির্মিত একটি জাদুঘর তার জীবন, যুগ ও কর্মের প্রতি উৎসর্গ করা হয়। ২০০৮ সালের মার্চে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা কর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নয়া ডাইরেক্টরিতে ইবনে সিনার নাম ব্যবহার করা হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনার গুরুত্ব

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের জনক অধ্যাপক জি. সারটনের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করাই যথেষ্ট। অধ্যাপক সারটন 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এ লিখেছেন, '*One of the most famous exponents of Muslim universalism and an eminant figure in Islamic learning was Ibn Sina, known in the West as Avicenna. For a thousand years he has retained his original renown as one of the greatest thinkers and medical scholars in history. His most important medical works are the Qanun (Canon) and a treatise on Cardiac drugs. The `Qanun Fi-al-Tibb' is an immense encyclopedia of medicine. It contains some of the most illuminating thoughts pertaining to distinction of mediastinitis from pleurisy; contagious nature of phthisis; distribution of diseases by water and soil; careful description of skin troubles, of sexual diseases and perversions; of nervous ailments.* '

অর্থাৎ '*পাশ্চাত্যে আভিসিনা হিসাবে পরিচিত ইবনে সিনা হলেন মুসলিম বিশ্বজনীনতার সবচেয়ে সুপরিচিত পথপ্রদর্শক এবং ইসলামী জ্ঞান জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। একজন শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ এবং ইতিহাসে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি হাজার বছর তার মৌলিক খ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কানুন (ক্যানন) এবং হৃদযন্ত্রের ওষুধের ওপর একটি গ্রন্থ হলো তার চিকিৎসা বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। কানুন ফি আল-তিব্ব চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ। তাতে রয়েছে ঝিল্লির প্রদাহ থেকে সংক্রামক ব্যাধিকে পৃথক করার কয়েকটি উজ্জ্বল চিন্তা, ফুসফুসের যক্ষার ছোঁয়াচে প্রকৃতি, পানি ও মাটির*

ভিত্তিতে রোগের শ্রেণীকরণ, চর্মরোগের সতর্ক বিবরণ, যৌন রোগ ও যৌন বিকৃতি এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা।'

রচনাবলী

ইবনে সিনার রচনাবলী পরবর্তীকালে ধর্ম, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও সঙ্গীতসহ বহু ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করেছে। ব্যাপক বিষয়ের ওপর তার বইয়ের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। এসব বইয়ের মধ্যে ২৪০টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। তার যেসব বই পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে ১৫০টি হচ্ছে দর্শনের ওপর লিখিত এবং ৪০টি হচ্ছে চিকিৎসা বিষয়ক। তার বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত 'দ্য বুক অব হীলিং' এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন'। ইবনে সিনা আলকেমির ওপর অন্তত একটি বই লিখলেও তার নামে আরো কয়েকটি বই দেখা যায়। মাইকেল স্কট পশুপাখির ওপর তার একটি বই অনুবাদ করেছেন। দলজিক', 'মেটাফিজিক্স', 'ফিজিক্স' ও 'দ্য কাইলো'তে এরিস্টোটলের মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে তিনি 'মেটাফিজিক্স'-এ নিউপ্লেটোবাদ নামে পরিচিত এরিস্টোটলের মতবাদ থেকে পুরোপুরি পিছু হটেন। আরব দার্শনিকরা আভাস দিয়েছেন যে, ইবনে সিনা এরিস্টোটলের মতবাদকে মুসলিম দর্শনের সঙ্গে মানানসই করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৪৯৩, ১৪৯৫ ও ১৫৪৬ সালে ভেনিসে ইবনে সিনার 'লজিক' ও 'মেটাফিজিক্স' ব্যাপকভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ক তার কয়েকটি প্রবন্ধকে কাব্যিক রূপ দেয়া হয়েছে। বোডলিয়ন লাইব্রেরিতে তার 'কিতাব আল-শিফা'র একটি বড় অংশ সংরক্ষিত। ১৪৯০ সালে পাভিয়ায় বইটির অংশবিশেষ দি আমিনা'য় 'লাইবার সেক্সটাস ন্যাচারালিয়াম' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ শাহরাস্তানি ইবনে সিনার দর্শনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটি দীর্ঘ বই লিখেছেন। বিশ্লেষণাত্মক বইটি কয়েক জায়গায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়। 'হিকমত আল-মাশরিক্কিয়া' ল্যাটিন ভাষায় 'ফিলসোফিয়া ওরিয়েন্টালস' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রজার ব্যাকন বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। বইটির বেশির ভাগ হারিয়ে গেছে।

অন্যান্য বই

(১) সিরাত আল-শায়েখ আল-রইস (দ্য লাইফ অব ইবনে সিনা)
(২) আল-ইশারাত ওয়াল-তানবিহাত (রিমার্কস এন্ড এডমোনিশন্স)
(৩) রিসালাহ ফি সার আল-কাদার (অ্যাসে অন দ্য সিক্রেট অব ডেস্টিনি)
(৪) দানিশনামা-ই-আলা-ই (দ্য বুক অব সায়েন্টিফিক নলেজ)
(৫) কিতাব আল-নাজাত (দ্য বুক অব স্যালভেশন)
(৬) হায় ইবনে ইয়াকধান (এ পার্সিয়ান মিথ)
(৭) দ্য মিনারালিবাস

www.pathagar.com

মৃত্যু

ইবনে সিনা জীবনের শেষ ১০/১২টি বছর আবু জাফর আলাউদ্দিনের সেবায় কাটান। তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক, গণপাঠাগার ও বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তার অনেক অভিযানে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। এ সময় তিনি সাহিত্য কর্ম ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। হামাদানের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানকালে তিনি কঠিন শূল বেদনায় আক্রান্ত হন। ওষুধ সেবন করায় তিনি রক্ষা পান। তবে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, কদাচিৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন। অনুরূপ অভিযানে তিনি আবার একই রোগে আক্রান্ত হন। অতি কষ্টে তিনি হামাদানে ফিরে আসেন। রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তিনি পথ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন। বন্ধু বান্ধবরা তাকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি সবার পরামর্শ উপেক্ষা করে বললেন, *'আমি সংকীর্ণ দীর্ঘ জীবনের চেয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনকে পছন্দ করি বেশি।'* মৃত্যুশয্যায় অনুশোচনা তাকে গ্রাস করে। ইবনে সিনা দরিদ্রদের মাঝে তার ধন সম্পত্তি বিলিয়ে দেন। ক্রীতদাসদের মুক্তি দেন। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে প্রতি তিনদিনে তিনি একবার করে কোরআন পাঠ শেষ করতেন। ১০৩৭ সালে রমজান মাসে ইরানের হামাদানে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে এ ক্ষণজন্মা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইন্তেকাল করেন। হামাদানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পর আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইম তার যাবতীয় গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন।

www.pathagar.com

হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল আবিষ্কারক ইবনুল নাফিস

হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল আবিষ্কারক ইবনুল নাফিসের পূর্ণ নাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবিল হাজম ইবনুল নাফিস আল-কোরায়েশী আল-মিসরী আশশাফী। সংক্ষেপে তিনি 'ইবনুল নাফিস' নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার নামের সঙ্গে 'আল-মিসরী' যুক্ত থাকায় মনে হয় তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরেক বর্ণনায় বলা হয়, তিনি ১২০৮ সালে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরে নূরুদ্দিন আল-জঙ্গি প্রতিষ্ঠিত বামারিস্তান আল-নূরী নামে একটি মেডিকেল কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আল-নূরী হাসপাতাল তখন আল-মানসুরিয়া হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও ইবনুল নাফিস সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েও পড়াশোনা করেন। লিখতে বসলে তার সামনে অনেকগুলো কলম ঠিক করে রাখা হতো। তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে কোনো বই না দেখে লিখতে শুরু করতেন। লিখতেন স্রোতের মতো। একটি কলম ভোঁতা হয়ে গেলে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি নতুন কলম হাতে তুলে নিতেন। তিনি তার প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন দামেস্কে এবং মুহাজজবি উদ্দিন আদ দাখওয়ারের কাছ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। একজন সুপরিচিত চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি তিনি শায়েফী মাযহাবের একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। তৎকালীন সময়ে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তথ্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

খলিল আস-সাকিদি তার 'ওয়াদি বিল ওয়াকায়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, *'ইবনুল নাফিস ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন ইমাম এবং অতি উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞ হাকিম।'* চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভের পর ১২৬৩ সালে ইবনুল নাফিস মিসরে স্থানান্তরিত হন এবং আল-নাসারি হাসপাতালে কাজ শুরু করেন। তিনি এ হাসপাতাল এবং মিসরের মামলুক সুলতান আল-জহির বায়বারসের প্রধান চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ পান।

৮০ খণ্ডের অসমাপ্ত বিশ্বকোষ

নাফিসের সবচেয়ে বৃহৎ কর্ম হচ্ছে 'কিতাবুল শামিল ফিল সিনায়াত তিব্ব' (কম্প্রিহেনসিভ বুক অব দ্য আর্ট অব মেডিসিন)। বইটিতে তার সব আবিষ্কার, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ও খাদ্য গ্রহণের বিভিন্ন দিক স্থান পেয়েছে। তিনি বইটিকে ৩শ' ভলিউমের একটি বিশ্বকোষে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সুযোগ দেয়নি। ৮০টি খণ্ড লেখার পরই তার মৃত্যু হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল লাইব্রেরি এবং দামেস্কের জাহিরিয়া লাইব্রেরিতে বইটির

www.pathagar.com

৩৩তম, ৪২তম এবং ৪৩তম পাণ্ডুলিপি এখনো সংরক্ষিত। এ তিন খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো যথাক্রমে ৯৪, ৯৬ ও ৯৭। এসব খণ্ড নাফিসের নিজের হাতে লেখা। অক্ষরগুলো জড়ানো। পোকক ও বোডলিয়ন লাইব্রেরিতে বইটির আরো দু'টি খণ্ড সংরক্ষিত। এ দু'টি খণ্ড কার লেখা তা জানা যায়নি। চার খণ্ডে বিভক্ত 'মুয়াজ আল-কানুন' (আইনের সারসংক্ষেপ) হলো তার সবচেয়ে সুপরিচিত বই। এ বইটিও পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে নাফিস চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ এবং চিকিৎসা বিষয়ক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে মিশ্রিত ও অমিশ্রিত ওষুধ এবং খাবার দাবার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোগ এবং চতুর্থ খণ্ডে রোগের কারণ, লক্ষণ ও তার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ২০ খণ্ডে ইবনে সিনার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন'-এর ভাষ্য রচনা করেন। এ ভাষ্যই তাকে ইতিহাসে অমরত্বের আসন দিয়েছে। এতে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটস, রোমান চিকিৎসক ক্লডিয়াস গালেন, আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানী হুনায়ন ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সিনার গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রের ওপরও কয়েকটি ভাষ্য লিখেছেন।

হৃদযন্ত্রে রক্তপ্রবাহ আবিষ্কার

হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কার। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী পালমনারি সঞ্চালন মানে হলো হৃদযন্ত্রের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে শিরার মধ্য দিয়ে ফুসফুসে রক্ত চলাচল করা এবং ফুসফুসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করার পর শিরার মধ্য দিয়ে হৃদযন্ত্রের বাম প্রকোষ্ঠে পুনরায় রক্ত ফিরে যাওয়া। হৃদযন্ত্রে রক্তপ্রবাহের এ আবিষ্কার হচ্ছে ইবনুল নাফিসের অমর কীর্তি।

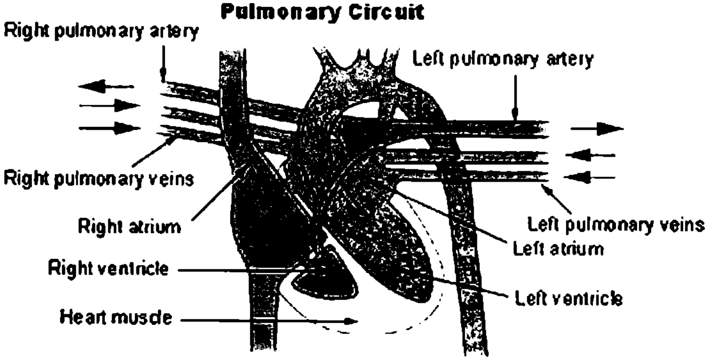

ইবনুল নাফিসের আবিষ্কৃত হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

১৯২৪ সালে মিসরীয় চিকিৎসক ডা. মহিউদ্দিন আলতাবি জার্মানির আলবার্ট লুগউইগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবদের ইতিহাস নিয়ে থিসিস করছিলেন। এসময় তিনি বার্লিনে প্রুশীয় স্টেট লাইব্রেরিতে 'শারহে তাশরিহ কিতাব আল-কানুন ফিল তিব্বি ইবনে সিনা' (কমেন্টারি অন দি এনাটমি অব ক্যানন অব আবিসিনা) শিরোনামে ৬২২৪৩ নম্বর একটি স্ক্রিপ্ট উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিটি ছিল ইবনুল নাফিসের লেখা। ডা. মহিউদ্দিনের থিসিস বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় অথবা তিনি নিজে কোনো বই প্রকাশ না করায় ইবনুল নাফিসের আবিষ্কার সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানতে পারেনি। তবে তিনি তার সন্দর্ভে মন্তব্য করেন যে, ইবনুল নাফিসই হলেন হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের প্রকৃত আবিষ্কারক। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে ডাক্তার আবদুল করিম শিহাদি প্যারিসে আরেকটি সন্দর্ভে অভিন্ন মতামত প্রদান করেন। ডা. মহিউদ্দিন ও ডা. শিহাদির মতো পল গালিউনজি এবং সালমান কাতায়া ইবনুল নাফিসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তারাও একই মত দেন। কিন্তু তাদের মতামতে কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়নি।

নাফিসের আবিষ্কার সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত

আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট পণ্ডিত ম্যাক্স মায়ারহফ মিসরীয় ডা.মহিউদ্দিনের থিসিস পাঠ করে তার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখেন। মায়ারহফের সঙ্গে অধ্যাপক সারটনের পত্রালাপ হতো। এ পত্রালাপের সূত্র ধরে ১৯৩১ সালে অধ্যাপক সারটনের 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি সন্দিগ্ধ মনে নাফিসের আবিষ্কার উল্লেখ করেন। তিনি নিঃসন্দেহ হতে না পারায় ১৯৩৩ সালে ম্যাক্স মায়ারহফ নাফিসের বই অনুবাদ করে সকলের সন্দেহ নিরসন করে লিখেন, 'We *have seen that Ibn al-Nafis, three centuries before Colombo, had already noticed visible passages between the two types of pulmonary* vessels.' *অর্থাৎ 'আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কলম্বোর তিন শত বছর আগে ইবনুল নাফিস হৃদযন্ত্রের দু'টি প্রকোষ্ঠের মধ্যে দৃশ্যমান নির্গমন পথ দেখতে পেয়েছিলেন।'*

তিনি আরো লিখেছেন,'*This commentary on the anatomy of Ibn al-Nafis exists in numerous manuscripts. In this work Ibn al-Nafis sets out the theory of the Lesser or Pulmonary circulation of the blood through heart and lungs, against the erroneous theory of Galen and Avicena, three hundred years before it was reformulated in Europe by Micheal Servetus who most probably knew of the Arab physician in translation.*'

অর্থাৎ *'ইবনুল নাফিসের এনাটমির এ ভাষ্য অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। ইউরোপে মাইকেল সার্ভিটাস পুনরায় এ তত্ত্ব হাজির করার ৩ শত বছর আগে ইবনুল নাফিস গালেন ও ইবনে সিনার ভুল তত্ত্বের বিপরীতে হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের মধ্য দিয়ে মহাধমনীতে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। বোধ হয় মাইকেল সার্ভিটাস ল্যাটিন অনুবাদ পাঠে এ আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানী সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।'*

www.pathagar.com

ম্যাক্স মায়ারহফের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক মার্টিন প্লেসনার বলেছেন, '*It now seems likely that Micheal Servetus was familiar with this last theory (Ibn al-Nafis).*' অর্থাৎ '*এখন মনে হচ্ছে যে, মাইকেল সার্ভিটাস সর্বশেষ তত্ত্বের (ইবনুল নাফিসের তত্ত্ব) সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।*'

হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল আবিষ্কার সম্পর্কে উইলিয়াম অসলার মেডাল অ্যাসে'তে এডওয়ার্ড কপোলা লিখেছেন, '*The theory of pulmonary circulation propounded by Ibn Nafis in the 13th century was not forgotten and that centuries after his death it may fave influenced the direction of the anatomical investigation of Colombo and Valverde, who finally announced it to the Western world as a physiological fact susceptible to experimental proof.*'

অর্থাৎ '*ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইবনুল নাফিসের প্রচারিত হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচলের তত্ত্ব কেউ বিস্মৃত হয়নি এবং তার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর এ তত্ত্ব কলম্বো ও ভালভার্ডের এনাটমিক্যাল গবেষণার দিকনির্দেশনাকে প্রভাবিত করে থাকবে। অবশেষে কলম্বো ও ভালভার্ডে গবেষণামূলক প্রমাণ সাপেক্ষে পাশ্চাত্যের কাছে শারীরবৃত্তীয় একটি ঘটনা হিসাবে তা প্রকাশ করেছেন।*'

নাফিসের বর্ণনা

নাফিস তার পাণ্ডুলিপিতে শব ব্যবচ্ছেদ, রোগ নির্ণয় বিদ্যা এবং শারীরবৃত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতে তিনি হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের বিবরণও দিয়েছেন। সত্য উদ্ঘাটনের পরও বিশ্ব বিশ্বাস করছে যে, উইলিয়াম হার্ভে হলেন হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের আবিষ্কারক এবং এ আবিষ্কারের অংশীদারিত্ব দেয়া হচ্ছে মাইকেল সার্ভিটাস, আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াস ও রিয়ালডো কলম্বোকে।

নাফিসের পাণ্ডুলিপিকে একটি শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। নাফিসের আগে দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানী গালেন হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের একটি তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। তিনি তার তত্ত্বে দাবি করেছিলেন, শিরার রক্ত অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডানদিক থেকে বামদিকের হৃদপ্রকোষ্ঠে চলাচল করে। সেখানে বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রাণশক্তি গঠন করে এবং পরে পর্যায়ক্রমে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। গালেনের মতে, অদৃশ্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ না ঘটা পর্যন্ত শিরা ও ফুসফুস মহাধমনী থেকে পুরোপুরি পৃথক থাকে। গালেনের এ মতবাদ অভ্রান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। খ্রিস্টানদের ভয়ে কেউ তার মতবাদের বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। ইবনুস নাফিস ইবনে সিনার কানুনের এনাটমি অংশের ভাষ্য 'শারহে তসরিহ ইবনে সিনা'য় সেই দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামের উদারতাই তাকে সাহসী হতে উৎসাহিত করেছিল। তিনি প্রচলিত ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে এনাটমি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে, শিরার রক্ত বরাবরই মহাধমনীর ভেতর দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে রক্ত বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শিরার ধমনীর মধ্য দিয়ে হৃদযন্ত্রের বামদিকের প্রকোষ্ঠে চলাচল করে। এভাবে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়।

www.pathagar.com

হৃদযন্ত্রের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে রক্ত অবশ্যই বাম প্রকোষ্ঠে চলাচল করে। তাদের মধ্যে সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। একটি রক্তে পরিপূর্ণ এবং তার অবস্থান ডানদিকে। আর অন্যটিতে থাকে শক্তি। তার অবস্থান বামদিকে। এ দু'টির মধ্যে চলাচলের কোনো পথ নেই। শিরায় কোনো ছিদ্র নেই এবং গালেনসহ অন্যদের ধারণা অনুযায়ী দৃশ্যমান কোনো ছিদ্র নেই। তিনি আরো বলেছেন, দু'টি হৃদপ্রকোষ্ঠের মধ্যকার সেপটাম অন্য জায়গার চেয়ে বেশি পুরু জিনিসে ভর্তি থাকে যার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করতে পারে না। কেননা তাতে অনেক ক্ষতি হতে পারে। যারা মনে করেন সেখানে ছিদ্র রয়েছে তারা মারাত্মক ভুল করছেন।

হৃদযন্ত্রের এনাটমি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নাফিস যুক্তি দেন যে, ডানদিকের হৃদপ্রকোষ্ঠের কোনো কার্যকরী চলৎ শক্তি নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, পালমনারি শিরাতে কঠিন পদার্থের দু'টি স্তর রয়েছে। এ দু'টি স্তরের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী রক্ত অধিক পরিমাণে পরিশোধিত হয়। পালমনারি ধমনীর অন্যদিকে রয়েছে পাতলা পদার্থ। এ পাতলা পদার্থের মধ্য দিয়ে রক্ত সহজে চলাচল করতে পারে। পালমনারি শিরা এবং শিরার মধ্যে বোধগম্য চলাচলের পথও রয়েছে। পালমনারি ও মহাধমনীর মধ্যে তুলনা করে তিনি বলেছেন, পালমনারি ধমনী মহাধমনীর তুলনায় ছোট। কেননা শিরাতে থাকে অল্প পরিমাণ রক্ত। আর মহাধমনীতে সেই পরিমাণ রক্ত বিদ্যমান যা বাতাসের সংমিশ্রণে দেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার করে।

নাফিসই প্রথম সঠিকভাবে ফুসফুস গঠনের বর্ণনা দেন এবং শ্বাসনালী, শরীরের শিরা উপশিরায় বায়ু ও রক্ত প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেন। বাতাস ও রক্ত গ্রহণের প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার বিবরণ দেন। তিনি হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী হিসাবে মস্তিষ্কের শিরার কার্যক্রমও ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, ফুসফুসের মধ্য দিয়ে হৃদযন্ত্রের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাম প্রকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

নাফিসের আবিষ্কারের তিন শতাব্দী পর ফের হৃদযন্ত্রে রক্তপ্রবাহ আবিষ্কার করা হয়। দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বাস করা হতো যে, মাইকেল সার্ভিটাস, আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াস, রিয়ালডো কলম্বো এবং ষোড়শ শতাব্দীতে চূড়ান্তভাবে উইলিয়াম হার্ভে ইউরোপে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, সার্ভিটাস, ভেসালিয়াস, কলম্বো কিংবা হার্ভের ৩ শত বছর আগে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনুল নাফিস হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কার করেছেন। তিনি হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ সত্যের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তার মতবাদ পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক সত্য বলে সবাই মেনে নিয়েছেন। মাইকেল সার্ভিটাস অথবা অন্য কোনো ইউরোপীয় হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল তত্ত্বের আবিষ্কারক নন। আরব বিজ্ঞানী ইবনুল নাফিসই হলেন প্রথম আবিষ্কারক। তার আবিষ্কারের কথা ইউরোপীয়রা ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

দালিলিক স্বীকৃতি

প্রথমেই এনসাইক্লোপিডিয়ার একটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো। ২০০৩ সালে এনসাইক্লোপিডিয়ায় বলা হয়, *'Ibn al-Nafis is best known for his writings on physiology and medicine. His book `Tashrih al-Qanun' described pulmonary circulation centuries before noted English physician William Harvey described the circulation of blood.'* অর্থাৎ *'ইবনুল নাফিস শারীরবৃত্তীয় ও মেডিসিনের ওপর লেখালেখির জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচলের বর্ণনা দেয়ার কয়েক শত বছর আগে নাফিস তার 'তাশরিহ আল-কানুন'-এ হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচলের বর্ণনা দিয়েছিলেন।'*

ঐতিহাসিক হেলেন সেলিন-ও নাফিসকে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের উদগাতা হিসাবে স্বীকার করছেন। তিনি তার 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড মেডিসিন'-এর ৪১০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Ibn al-Nafis' discovery of pulmonary circulation antedates the accounts mentioned by Micheal Servetus, Realdo Colombo and Andrea Cesalpino. Another important work is Sharh Tashrih Kitab al-Qanun fi'l- Tibb-e-Ibn Sina. In it gives the earliest known account of pulmonary circulation '*

অর্থাৎ' *হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনে ইবনুল নাফিসের আবিষ্কার মাইকেল সার্ভিটাস, রিয়ালডো কলম্বো এবং আঁন্দ্রে কেসালপিনোর উল্লেখিত বর্ণনার পূর্ববর্তী। 'শারহে তাশরিহ কিতাব আল-কানুন ফিল তিব্ব-ই-ইবনে সিনা' হলো তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। এতে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনে জ্ঞাত প্রাথমিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে।'*

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনুল নাফিসের মৌলিক অবদানের কথা 'ট্রাডিশনাল মেডিসিন এমাং গালফ অ্যারাব'-এ আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'গালফ অ্যারাব'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, *`In 1242, the Arabian physician, Ibn al-Nafis became the first person to accurately described the process of pulmonary circulation for which he is sometimes considered the father of circulatory physiology. He stated this in his Commentary on Anatomy in Avicinna's Canon.'*

অর্থাৎ' আরব চিকিৎসাবিদ ইবনুল নাফিস হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ১২৪২ সালে নির্ভুলভাবে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেন। এজন্য কখনো কখনো তাকে শারীরবৃত্তীয় রক্ত সঞ্চালনের জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইবনে সিনার কাননের এনাটমির ভাষ্যে তিনি হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন।'

যতই দিন যাচ্ছে ততই নাফিসকে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবি জোরদার হচ্ছে। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মীলি স্টীল নাফিসকে এ বিস্ময়কর আবিষ্কারের কৃতিত্ব দানের দাবি জানিয়ে লিখেছেন, *'We believe that henceforth it is fair to attribute the discovery of the pulmonary circulation to Ibn al-Nafis who was a distant precursor of the physicians of the sixteenth century Italian School and of*

www.pathagar.com

William Harvey, who four centuries later described the whole of the pulmonary circulation in an accurate, clear and definitive manner.' অর্থাৎ 'আমরা বিশ্বাস করি যে, এখন থেকে ইবনুল নাফিসকে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন *আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়ে দেয়া ন্যায়সঙ্গত। তিনি হলেন ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় মতবাদের চিকিৎসাবিদ এবং উইলিয়াম হার্ভের দূরবর্তী পূর্বসূরি। ইবনুল নাফিসের চার শত বছর পর উইলিয়াম হার্ভে নির্ভুল, স্পষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের বর্ণনা দিয়েছেন।'*

ইউরোপীয়দের অজ্ঞতা

ইবনুল নাফিসের ইন্তেকালের ৩ শত বছর পরও হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে ইউরোপীয়দের কোনো ধারণা ছিল না। ১৫৪৭ সালে বেলুনোর আন্দ্রিয়া আলপাগো নাফিসের কয়েকটি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করলে ইউরোপীয়রা তা জানতে পারে। পরে স্পেনের পাদ্রী চিকিৎসক মাইকেল সার্ভিটাস তার বই 'ক্রিশ্চিয়ানিজম রেসটিটিউশন'-এ হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে ইবনুল নাফিসের মতবাদ সমর্থন করেন। অবশ্য তিনি তার বইয়ে নাফিসের নাম উল্লেখ করেননি। ভয়ে ভয়ে ১৫৫৩ সালে বাইবেলের দোহাই দিয়ে তিনি লিখেন, *'ধমনীর মধ্য দিয়ে ফুসফুস থেকে বাতাস মিশ্রিত রক্ত হৃদযন্ত্রে পাঠানো হয়। ফুসফুসে বাতাসের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। ফুসফুস রক্তকে বিশুদ্ধ করে; হৃদযন্ত্র নয়। গালেন ফুসফুস গঠনের ভুল বর্ণনা দিয়েছেন।'*

সার্ভিটাস এ মতবাদ প্রচার করায় খ্রিস্টানরা ক্ষেপে যায়। তারা তাকে বাইবেল বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য অভিযুক্ত করে। ইউরোপে তখন ইনকুয়িজিশনের যুগ। বিচারকদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৫৫৩ সালের অক্টোবরে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। একই সঙ্গে তার বইও পুড়িয়ে ফেলা হয়। আন্দ্রিয়াস ভাসালিয়াস অবিকল ইবনুল নাফিসের মতো তার বই 'দ্য ফাব্রিকা'য় রক্ত সঞ্চালনের বর্ণনা দেন। তবে ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত ভাসালিয়াস তার বইয়ের প্রথম সংস্করণে গালেনের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিলেন, শিরার রক্ত অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডানদিক থেকে বামদিকের হৃদপ্রকোষ্ঠে চলাচল করে। ১৫৫৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি উল্লেখিত মতবাদ উহ্য রেখে লিখেছেন,*'অতি সামান্য পরিমাণ হলেও শিরার রক্ত অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডানদিক থেকে বামদিকের হৃদপ্রকোষ্ঠে কিভাবে চলাচল করে আমি তা এখনো বুঝতে পারছি না।'*

১৫৫৯ সালে ইতালীয় রিয়ালডো কলম্বো তার 'দ্য রি এনাটমিকা'য় রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তারপর ১৬১৮ সালে উইলিয়াম হার্ভে গবেষণাগারে পশুর শরীরে সরাসরি পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান, ফুসফুসের ডানপ্রকোষ্ঠ থেকে রক্ত চলাচল শুরু হয় এবং প্রধান ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত হৃদযন্ত্রের বামপ্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। অতি ভয়ে এক বক্তৃতায় তিনি তার মতবাদ প্রকাশ করে

www.pathagar.com

বলেছিলেন, *'আমি বক্তৃতায় যা বলতে যাচ্ছি তা এতই অভিনব ও অভূতপূর্ব যে, এজন্য আমি যে কেবল ঈর্ষান্বিত লোকদের ঈর্ষার রোষানলে পড়বো তাই নয়, হয়তো গোটা মানব জাতি আমার শত্রুতে পরিণত হবে। সে কথা ভেবে আমি ভয়ে শিউরে উঠছি।'*

হার্ভে বক্তৃতায় তার মতবাদ প্রকাশ করে লিখিতভাবে তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর তিনি 'এক্সারসিট্যাশিও এনাটমিকা ডি মটু করডিসেট স্যাংগুইনিজ এনিমালিবাস' (Exercitatio Anatomica de Motu Cordiset Sanguinis Animalibus) নামে গ্রন্থে লিখেছেন, *'আমি বুঝতে পারলাম, একটি বৃত্তাকারে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। পরে আমি এ সত্য দেখতে পাই যে, বাম প্রকোষ্ঠের স্পন্দন থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে সারা শরীরের শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। শিরার মধ্য দিয়ে পুনরায় বাম প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। পরে আবার ডান প্রকোষ্ঠে সঞ্চালিত হয়।'* হার্ভে আরো উল্লেখ করেন, তিনি শিরায় কোনো ছিদ্র দেখতে পাননি। মাইকেল সার্ভিটাসের পরিণতি উইলিয়াম হার্ভেকে বরাবরই তাড়া করে ফিরতো। তবে তার ভাগ্য ছিল ভালো। ইংল্যান্ডে প্রোটেস্টান্টরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় তিনি নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পান। তবে আর্থিক ও সামাজিকভাবে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তার সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। লোকজন তাকে পাগল বলে মনে করতো।

হার্ভে রক্ত সঞ্চালনের ফিজিওলজি অনুধাবন করতে পারেননি। রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্থলাভিষিক্ত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিজ্ঞানী লেভয়াশিয়ে তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেন।

এডওয়ার্ড কোপলা লিখেছেন, *'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইবনুল নাফিসের রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব কেউ ভুলে যায়নি এবং তার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর এ তত্ত্ব কলম্বো ও ভালভারডের এনাটমিকেল গবেষণায় দিকনির্দেশনা দিয়েছে।'*

হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় অবদান রেখে গেলেও এ কাজের জন্য হতভাগ্য আরব বিজ্ঞানী ইবনুস নাফিস কিছুই পাননি। কিন্তু ইবনে সিনার কানুনের ভাষ্য 'শারহে তাশরিহ কিতাব আল-কানুন ফিল তিব্ব-ই-ইবনে সিনা' তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। ম্যাক্স মায়ারহোফের ভাষায়, *'Among the works of Ibn al-Nafis it has met with the greatest success in the Oriental medical world.'* অর্থাৎ *'ইবনুল নাফিসের রচনাবলীর মধ্যে এটি প্রাচ্যের চিকিৎসা জগতে অসামান্য সফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।'*

নাফিসের শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক

ইবনুল নাফিস কিভাবে হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিস্কার করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। শব ব্যবচ্ছেদ করা ছাড়া হৃদযন্ত্র গঠনের সঠিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করার সত্যতা স্বীকার করেননি। তবে তিনি পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। পশুর দেহ কাটা ছেঁড়া করে যা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি তার এনাটমি বিষয়ক বইগুলোতে তার বর্ণনাই দিয়েছেন। ইবনে সিনা রোমে একটি হাতির

www.pathagar.com

হৃদপিণ্ড ব্যবচ্ছেদ করার বিবরণ শুনে মন্তব্য করেছিলেন, মানুষের হৃদযন্ত্রে হাড় রয়েছে। নাফিস ইবনে সিনার এ ধারণা বাতিল করে দিয়ে বলেন, *'তার বক্তব্য সঠিক নয়। মানুষের বুকের পাঁজরের মাঝে ডানদিকে হৃদযন্ত্রের অবস্থান। সেখানে অবশ্যই কোনো হাড় নেই। বুকের বহির্ভাগে হাড় খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে যেখানে হৃদযন্ত্র আছে সেখানে নয়।'* নাফিসের এ বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে, তিনি মানুষের শরীর কাটা ছেঁড়া করেছিলেন। নাফিসের পক্ষে কেন শব ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না অথবা করে থাকলেও কেন তিনি তা স্বীকার করেননি সে ব্যাপারে জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মায়ারহোফ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, *'In the earlier days of Islamic Shariah, the study of virtually all sciences was permissible. But since the appearance of the renowned Islamic theologician and philosopher Al-Ghazzali, a religious clamp down was imposed on such studies as they allegedly might lead to scepticism in the basic tenents about the origin of the world and the existence of the Creator.'* অর্থাৎ *'ইসলামী শরিয়াহর প্রাথমিক দিনগুলোতে দৃশ্যত সকল বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ছিল অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু বিখ্যাত ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক আল-গাজ্জালির আবির্ভাব ঘটার পর থেকে এ ধরনের গবেষণার (শব ব্যবচ্ছেদ) ওপর একটি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা* আরোপ *করা হয়। কেননা এ ধরনের গবেষণায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হতে পারতো।'*

কৈশিক নালির রক্ত সঞ্চালনে মৌলিক ধারণা

ইবনুল নাফিসের বহু মৌলিক অবদানের মধ্যে কৈশিক নালিতে রক্ত সঞ্চালন অন্যতম। তিনিই প্রথম কৈশিক নালিতে রক্ত সঞ্চালনের ধারণা ব্যক্ত করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নাফিসের এ অবদান সম্পর্কে জন বি. ওয়েস্টের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো। জন ওয়েস্ট 'ইবনুল নাফিস, দ্য পালমনারি সার্কুলেশন এন্ড দি ইসলামিক গোল্ডেন এজ'-এ লিখেছেন, *'In addition, Ibn al-Nafis had an insight into what would become the larger theory of the capillary circulation. He stated that `there must be small communication or porses (manafidh in Arabic) between the pulmonary artery and vein; a prediction that preceeded the discovery of the capillary system by more than 400 years.'* অর্থাৎ *'অধিকন্তু, ইবনুল নাফিসের এমন একটি পরিজ্ঞান ছিল যা কৈশিক নালিতে রক্ত সঞ্চালনের বৃহত্তর তত্ত্বে পরিণত হয়। তিনি বর্ণনা দেন যে, মহাধমনী ও রক্ত নালির (আরবীতে মানাফিধ) মধ্যে অবশ্যই স্বল্প যোগাযোগ বা ছিদ্র থাকতে হবে। কৈশিক নালিতে রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কারের চার শ' বছর আগে তিনি এ পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।'*

ফুসফুসের গঠন আবিষ্কার

ফুসফুসের গঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কয়েকটি অঙ্গ নিয়ে ফুসফুস গঠিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে শ্বাসনালী, দ্বিতীয়টি ধমনীতন্ত্রের শাখা এবং তৃতীয়টি শিরার শাখা। শিথিল ছিদ্রযুক্ত মাংসের মাধ্যমে সংযুক্ত। ইবনুল নাফিস কানুনের ভাষ্যে ৫ জায়গায় হৃদযন্ত্রে প্রকোষ্ঠের সংখ্যা এবং ফুসফুসের ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল সম্পর্কে

www.pathagar.com

ইবনে সিনার মতামত ভ্রান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সিনা এরিস্টোটলের সঙ্গে একমত হয়ে দাবি করেছিলেন, হৃদপিণ্ডে প্রকোষ্ঠের সংখ্যা ৩টি। এরিস্টোটল মনে করতেন, দেহের পরিমাপ অনুযায়ী হৃদপ্রকোষ্ঠের সংখ্যা কম বা বেশি হয়ে থাকে।

নাড়ির স্পন্দন

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনুল নাফিস হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং ফুসফুসের গঠন বর্ণনা করেই তার কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি নাড়ির স্পন্দনের সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নাড়ির কলাকৌশল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞানী গ্যালেন বিশ্বাস করতেন, ধমনী থেকে প্রাকৃতিকভাবে নাড়ির স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং একযোগে শিরা উপশিরায় স্পন্দন এবং হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল করে। অন্যদিকে নাফিস বিশ্বাস করতেন, শরীরে চলাচলকারী রক্ত থেকে নাড়ির স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং হৃদযন্ত্র থেকে রক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ার পর ধমনীতে স্পন্দন অনুভূত হয় এবং হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল এবং ধমনীতে স্পন্দন একযোগে ঘটে না।

অস্ত্রোপচারের সাফল্য সম্পর্কে পরামর্শ

ইবনুল নাফিস বিশ্বাস করতেন, তিনটি পর্যায়ে মনোযোগ দেয়ার ওপর যে কোনো অস্ত্রোপচারের সাফল্য নির্ভর করে। প্রথম পর্যায়কে তিনি টাইম অব প্রেসেনটেশন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ পর্যায়ে একজন শৈল্য চিকিৎসককে রোগীর আক্রান্ত স্থান চিহ্নিত করতে হবে। রোগীর করণীয় নির্ধারণে তার দেহকে শৈল্য চিকিৎসকের কাছে সঁপে দেয়ায় এ পর্যায়কে টাইম অব প্রেজেনটেশন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়কে তিনি টাইম অব অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ পর্যায়ে শৈল্য চিকিৎসক রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়াতালি দেবেন। তৃতীয় পর্যায়কে নাফিস টাইম অব প্রিজার্ভেশন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ পর্যায় হচ্ছে সার্জিকেল অপারেশন উত্তর রোগীকে সেবা দান। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর উচিত নিজের প্রতি যত্ন নেয়া। এ পর্যায়ে নার্স ও কর্মচারিদের উচিত রোগীর প্রতি নজর রাখা। যতক্ষণ রোগী সুস্থ না হয় ততক্ষণ তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ইবনুল নাফিস এ তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটি পর্যায়ে শৈল্য চিকিৎসক, নার্স ও রোগীর নিজ নিজ ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের একটি বিবরণও দিয়েছেন। কিভাবে যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তার নির্দেশনা দিয়েছেন। ইবনুল নাফিসের ওপর ইবনে সিনার কিছুটা প্রভাব ছিল। 'কম্প্রিহেনসিভ বুক অন দ্য আর্ট অব মেডিসিন'-এ বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পদ্ধতি থেকে একথা বুঝা যায়।

অদ্ভুত খেয়াল

ইবনুল নাফিস একদিন কায়রোর এক হাম্মামখানায় গোসল করছিলেন। গোসল করতে করতে হঠাৎ পোশাক ঘরে গিয়ে দোয়াত কলম চান। এ অবস্থায় তিনি নাড়ি সম্পর্কে আস্ত একটি বই লিখে ফেলেন। পরে গোসলখানায় ফিরে গিয়ে গোসল শেষ করেন।

www.pathagar.com

বিরল প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় লোকজন তাকে 'দ্বিতীয় ইবনে সিনা' বলে ডাকতো। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার গ্রন্থ ১০ হাজার বছর টিকে থাকবে। তার এ বিশ্বাস খুব একটা ভুল হয়নি।

রচনাবলী

ইবনুল নাফিসের সব বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিচে তার প্রাপ্ত বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া হলো:

(১) কিতাবু মুযিজুল কানুন
(২) কিতাবুশ শামিল ফিল সিনায়াত তিব্বিয়া
(৩) আল-মুখতার মিনাল আগজিয়া
(৪) রিসালাতু ফি মানাফিয়ের আদাল ইনসানিয়া
(৫) শারহোল ফুসুলে লে আবকিরাত
(৬) শারদে তাকদিমাতেল মারিফাতে লেআবকিরাত
(৭) শারহে ওবায়ে আম লে আবকিরাত
(৮) শারহে রিসালায়ে ইবদিমিয়া লে আবকিরাত ওয়া তাফসিরুল মারাজাল কাওয়ায়েদ

মৃত্যু

ইবনুল নাফিস ১২৮৮ সালে কায়রোতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে সুস্থ করে তোলার প্রায় সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে মৃত্যু শয্যায় মিসর ও কায়রোর চিকিৎসক বন্ধুরা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে তাকে মদপান করার অনুরোধ করেন। মদপান করলেই তার রোগ সেরে যাবে বলে তারা তাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এক ফোঁটা মদপান করতেও রাজি হননি। তিনি বন্ধুদেরকে বললেন, '*আমি আল্লাহপাকের দরবারে চলে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি চিরদিন এ নশ্বর পৃথিবীতে থাকতে আসিনি। আল্লাহ আমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতা দিয়ে আমি মানুষের কল্যাণে কিছু করার করেছি। বিদায়ের এ লগ্নে শরীরে মদ নিয়ে আল্লাহপাকের দরবারে উপস্থিত হতে চাই না।*' তারপর ১২৮৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার সকালে এ মহামনীষী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বাড়ি, লাইব্রেরি ও ক্লিনিক আল-মানসুরিয়া হাসপাতালে দান করে যান।

www.pathagar.com

বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারিজমি

মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারিজমি হলেন বীজগণিতের জনক। তার পূর্ণ নাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি। তার মূল নাম 'মোহাম্মদ'; ছেলের নাম 'আবদুল্লাহ' এবং পিতার নাম 'মুসা'। তিনি প্রাচীন খোরাসানের খাওয়ারিজমে ৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক উজবেকিস্তানের খাওয়ারিজমের বাসিন্দা হওয়ায় তিনি ইতিহাসে সংক্ষেপে 'খাওয়ারিজমি' হিসাবে পরিচিত। খাওয়ারিজম নামে এখন কোনো দেশ নেই। এ ভূখণ্ডের বর্তমান নাম খিভা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল-খাওয়ারিজমিকে 'মুসলিম নিউটন' হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। তিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ সালের মধ্যে তার অধিকাংশ কর্ম সম্পন্ন করেন। এক সময় বাগদাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। তাই অনেকের মতো খাওয়ারিজমিও বাগদাদ সফরে যান। বাগদাদে এসে তিনি বায়তুল হিকমাহর সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিছু প্রশ্ন করার পর তাকে সদস্য হিসাবে নিযুক্তি দেয়া হয়। একসময় তাকে বায়তুল হিকমাহর পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপির অনুবাদসহ বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে গবেষণা করেন। খাওয়ারিজমি চারজন খলিফার অধীনে কাজ করেছেন। তারা হলেন: আল-মামুন, আল-মুতাসিম, আল-ওয়াসিত ও আল-মুতাওয়াক্কিল। ৮৩০ সালে তিনি খলিফা আল-মামুনের জন্য জ্ঞাত পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কনে ৭০ জন ভূগোলবিদ তার নেতৃত্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি মামুনের জন্য পৃথিবীর মানচিত্রের একটি এটলাস তৈরি করেন।

গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মানচিত্র বিজ্ঞানে আল-খাওয়ারিজমির অবদান বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি উদ্ভাবনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমান্তরাল ও সাধারণ দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণ সমাধানে তার ধারাবাহিক গবেষণার পথ বেয়ে বীজগণিত আবিষ্কৃত হয়েছে। খাওয়ারিজমির যুগে বীজগণিত ও গণিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। গণিতের অনেক বিষয় বীজগণিতের মধ্যে আলোচনা করা হতো। একইভাবে বীজগণিতের বিষয় গণিতে আলোচনা করা হতো। খাওয়ারিজমি এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তার 'আল-ইলম উল জাবর ওয়াল মুকাবালা'র শিরোনাম থেকে 'এলজাব্রা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আনুমানিক ৮২৫ সালে 'কিতাব আল-জামা ওয়াল তাফরিক বি হিসাব আল-হিন্দ' নামে তার লেখা আরেকটি বই মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ভারতীয় সংখ্যা

www.pathagar.com

আল খাওয়ারিজম

www.pathagar.com

লিখন প্রণালী ছড়িয়ে দিতে অবদান রেখেছে। খলিফা আল-মামুনের অনুরোধে খাওয়ারিজমি 'ইলম উল হিসাব' শিরোনামে গণিত বিষয়ক অন্য একটি বই রচনা করেন। খাওয়ারিজমি পারস্য ও বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যা, ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী এবং গ্রীক গণিতের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় তার বই অনূদিত হয়ে ইউরোপে পৌঁছে যায়। এসব বই ইউরোপে গণিতের অগ্রগতিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

কোনো কোনো ঐতিহাসিক শুধু ধর্মীয় পরিচয় নয়, খাওয়ারিজমির অস্তিত্ব নিয়েও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। কেউ দাবি করছেন, খাওয়ারিজমি নামে কোনো ব্যক্তি কখনো ছিল না। আবার কেউ বলছেন, খাওয়ারিজমি হলেন বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের অন্যতম। তার নাম মোহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির। ঐতিহাসিক আল-তাবারি দাবি করছেন, তার নাম মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি আল-মাজুসি আল-কাতারবালি। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে জোরোস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী হিসাবেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তার নাম মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি আল-মাজুসি আল-কাতারবালি নয়। এখানে মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির নামের সঙ্গে জোরোস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী আল-মাজুসি আল-কাতারবালির নাম গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আরবী ওয়া অক্ষর বাদ দেয়ায় দু'জনের নাম একাকার হয়ে গেছে। ওয়া'র মানে হলো 'এবং'। শুদ্ধ বাক্যটি ছিল মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি এবং আল-মাজুসি আল-কাতারবালি। খাওয়ারিজমির নামের এ বিভ্রাট সংশোধন করে জি. জে. টুমার লিখেছেন,

' Another epithet given to him by al-Tabari, `al-Majushi' would seem to indicate that he (Khwarizmi) was an adherent of the old Zoroastrian religion. This would still have been possible at that time for a man of Iranian origin, but the pious preface to al-Khwarizmi's Algebra shows that he was an orthodox Muslim, so al-Tabari's epithet could mean no more than his forebears, and perhaps he in his youth, had been Zoroastrians.'

অর্থাৎ 'আল-তাবারি তাকে 'আল-মাজুসি' বিশেষণে ভূষিত করায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি (খাওয়ারিজমি) ছিলেন প্রাচীন জোরোস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী। ঐ সময় ইরানী বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তির পক্ষে জোরোস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। তবে খাওয়ারিজমির এলজাব্রা বইয়ের অকপট ভূমিকা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান। অতএব আল-তাবারি আরোপিত বিশেষণের অর্থ এই হতে পারে যে, খাওয়ারিজমির পূর্বপুরুষ এবং সম্ভবত তিনি তার যৌবনে ছিলেন জোরোস্ত্রীয়।'

ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী নিয়ে বিতর্ক

ভারত ভ্রমণ শেষ করে আল-খাওয়ারিজমি ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি প্রচলন করার চেষ্টা করেছেন। বিশদভাবে তার উপযোগিতার বর্ণনা দিয়ে তিনি 'কিতাব আল-জামা ওয়াল তাফরিক বি হিসাব আল-হিন্দ' শিরোনামে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি লিখেন।

www.pathagar.com

গণিতের ওপর তার লেখা এ বইটির মধ্য দিয়ে আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালী পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করে। ১১৩৮ সালে সিসিলির রাজা রজার খাওয়ারিজমির প্রবর্তিত আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালী অনুসরণ করে নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বইটি সংরক্ষিত। ল্যাটিন ভাষায় তার বইটি দু'বার দু'টি ভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাথের এডিলার্ডের অনূদিত বইয়ের শিরোনাম ছিল 'দীক্ষিত এলগোরিজমি' (আল-খাওয়ারিজমি যা বলেছেন) এবং ১৮৫৭ সালে ইতালীয় গণিতজ্ঞ বালডাসারে বোনকোম্পাগনি অনূদিত বইয়ের শিরোনাম ছিল 'এলগোরিদমি দ্য নুমেরো ইন্ডোরাম' (আল-খাওয়ারিজমি অন দি আর্ট অব হিন্দু রিকনিং)। ১৮৩১ সালে ফ্রেডারিক রোজেন 'এলজাব্রা অব মোহাম্মদ বিন মুসা' (Algebra of Muhammad ben Musa) শিরোনামে লন্ডন এবং ১৯৬৯ সালে নিউইয়র্ক থেকে ইংরেজিতে বইটি প্রকাশ করেন। গণিতের ওপর লেখা খাওয়ারিজমির এ বইটির ল্যাটিন অনুবাদ টিকে রয়েছে। তবে মূল আরবী পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে।

ল্যাটিন অনুবাদে খাওয়ারিজমির মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বহু বিচ্যুতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বইটিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ০ ভিত্তিক হিন্দু সংখ্যা লিখন প্রণালীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। খাওয়ারিজমির মূল আরবী পাণ্ডুলিপিতে প্রথম শূন্য ব্যবহার, গাণিতিক গণনা এবং বর্গমূল বের করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। খাওয়ারিজমির এ বইটিতে প্রথম ভারতীয় দশমিক পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ল্যাটিন সংস্করণে এগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। আল-খাওয়ারিজমি প্রথম অজ্ঞাত বর্গে পরিবর্তনশীল 'মাল' বা পাওয়ার ব্যবহারের ধারণা চালু করেন। তিনি দু'টি ঘন সমীকরণের হিন্দু জ্যামিতিক সমাধান দেন।

প্রাথমিক যুগ থেকেই আরবদের বিজ্ঞান আলোচনায় সংখ্যা লিখন প্রণালীতে আরবীয় সংখ্যা প্রতীক প্রচলিত ছিল। আল-খাওয়ারিজমি তার গ্রন্থে এ প্রণালীকে 'হিন্দি' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষকে 'হিন্দ' নামে আখ্যায়িত করায় মনে হয় আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সংখ্যা লিখন প্রণালী শিখেছিল। তবে খাওয়ারিজমির বইয়ে উল্লেখিত 'হিন্দি' শব্দটি ভারতবর্ষের পরিচিতিমূলক 'হিন্দ' শব্দ কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, আরবীতে 'হিন্দাসী' শব্দটি লেখার গোলমাল থেকে এরকম হয়ে থাকতে পারে। হিন্দাসীর 'সীন' অক্ষরকে আরবীতে অনেকেই 'ইয়া' হিসাবে উচ্চারণ করেন। এভাবে আরবী 'হিন্দাসী' শব্দটি 'হিন্দ'-এ পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষেই সংখ্যা লিখন প্রণালীর উদ্ভব ঘটেছিল। বিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ও বিজ্ঞানী আল-বেরুনির মতে, আরবরা ভারতের হিন্দুদের কাছ থেকেই সংখ্যা লিখন প্রণালী শিখেছিল। পরবর্তীতে আরবদের হাতে এ সংখ্যা লিখন প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত রূপ লাভ করে। তবে গণিতের ঐতিহাসিক এফ. কাজোরি এ অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছেন। 'অ্যা হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন্স'-এর প্রথম ভলিউমের ৪৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, '*With all the painstaking study which has been given to the history of our numerals we are at the present time obliged to admit that we have not even*

www.pathagar.com

settled the time and place of their origin. At the beginning of the present century the Hindu origin of our numerals was supposed to have been established beyond doubt. But at present time several earnest students of this perplexing question have expressed grave doubts on this point. These investigators- G.R. Kėye in India, Carra de Vaux in France and Nicol Bubnov in Russia- working independently of one another have denied the Hindu origin.'

অর্থাৎ *'আমাদের সংখ্যা লিখন পদ্ধতির ইতিহাস নিয়ে পরিচালিত কষ্টকর সকল গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা বর্তমানে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, কখন ও কোথায় সংখ্যাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে আমরা এখনো তা মীমাংসা করতে পারিনি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমাদের সংখ্যা লিখন পদ্ধতির হিন্দু উৎপত্তি নিঃসন্দেহে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে কয়েকজন আগ্রহী গবেষক এ জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেন। এসব গবেষকের মধ্যে আছেন ভারতের জি. আর. কায়ি, ফ্রান্সের কারা দ্য ভাউক্স এবং রাশিয়ার নিকোল বাবনোভ। এসব গবেষক একে অন্য থেকে পৃথকভাবে গবেষণা করে সংখ্যা লিখন পদ্ধতির হিন্দু উৎপত্তি অস্বীকার করেছেন।'*

গণিতের ঐতিহাসিক আর্চিবল্ড শূন্যের ভারতীয় উৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ সালে গ্রীক গণিতজ্ঞ হিপসিকলস শূন্য ব্যবহার করেছিলেন।

আরবদের হাতে প্রথম শূন্যের ব্যবহার

স্বর্ণযুগে আরবরা সংখ্য লিখন পদ্ধতি চালু করলেও তখনো অঙ্কে শূন্য সংখ্যাটি ছিল না। নিঃসন্দেহে শূন্য ব্যবহারের কৃতিত্ব আরবদের বিশেষ করে আল-খাওয়ারিজমির। কিন্তু খাওয়ারিজমির দুর্ভাগ্য যে, তার মূল আরবী পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় শূন্য ব্যবহারের কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে আরেক খাওয়ারিজমিকে। এ খাওয়ারিজমি-ও ছিলেন মুসলমান। তিনি ছিলেন পার্সী। দ্বিতীয় খাওয়ারিজমির নাম পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইউসুফ আল-কাতিব আল-খাওয়ারিজমি। তার জন্ম বলখে। নিশাপুরে তিনি বসবাস করতেন। তিনি সংক্ষেপে আল-বলখি নামে পরিচিত ছিলেন। আল-বলখি সামানীয় রাজদরবারে কিছুদিন কেরানি হিসাবে চাকরি করেছিলেন। ৯৭৬ সালে তিনি 'মাফাতিহ আল-উলুম' শিরোনামে গণিতের ওপর একটি বই লিখেছিলেন। সামানীয় সুলতান দ্বিতীয় নূহের উজির আবুল হাসান উতবির অনুরোধে তিনি বইটি লিখেছিলেন। আরবীতে লিখিত বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন আবুল হাসান উতবিকে। বইটি ইংরেজিতে 'কিস অব দ্য সায়েন্সেস' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিকদের অনেকেই ভুল করে শূন্য ব্যবহারের সূত্র হিসাবে এ বইটি এবং এ বইয়ের লেখক মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খাওয়ারিজমির কথা উল্লেখ করছেন। কিন্তু তাদের ভাষ্য মোটেও সঠিক নয়। উইলি ডুরান্ট সেই ভুলের সূত্র ধরে 'দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশন: ভলিউম ফোর'-এ লিখেছেন, *'In 976 AD the*

www.pathagar.com

Persian encyclopaedist Muhammad Ibn Ahmad Al-Khwarizmi in his `Keys of the Sciences', remarked that if, in a calculation, no number appears in the place of tens, then a little circle should be used `to keep the rows'. This circle the Arabs called sifr, empty. That was the earliest mention of the name sifr that evntually became zero.'

অর্থাৎ '৯৭৬ সালে পার্সী বিশ্বকোষ প্রণেতা মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খাওয়ারিজমি তার 'কিস অব দ্য সায়েন্সেস'-এ মন্তব্য করেছেন যে, কোনো গণনায় দশকের জায়গায় কোনো সংখ্যা পাওয়া না গেলে সারি ঠিক রাখার জন্য একটি ছোট্ট বৃত্ত ব্যবহার করা উচিত। এই বৃত্তকে আরবরা সিফর বা শূন্য হিসাবে আখ্যায়িত করতো। এটাই ছিল সিফর নামটি উল্লেখের প্রথম বিবরণ। পর্যায়ক্রমে সিফর শব্দটি শূন্যে রূপান্তরিত হয়।'

'হিন্দু এরাবিক নিউমার‍্যালস' শিরোনামে বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার স্মিথ ও কারপিনস্কি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে তারিখে একটু হেরফের করে লিখেছেন, *'The earliest Muslim zero known as the dot (The Arabic zero has remained a dot to this day) in manuscript dated 973. The earliest Hindu example of a zero is an inscription of 976 at Gwalior.'* অর্থাৎ *'বিন্দু হিসাবে পরিচিত (এখনো আরবীতে বিন্দু হিসাবে বহাল রয়েছে) শূন্যের ব্যবহার শুরু হয় ৯৭৩ সালে প্রাথমিক যুগের মুসলিম পাণ্ডুলিপিতে। ভারতে প্রথম বিন্দুর ব্যবহার করা হয় ৯৭৬ সালে গোয়ালিয়রে।'*

ইসলামী রিসার্চের এক গবেষণামূলক নিবন্ধেও অনুরূপ ভুলের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়, *'Arabic numerals including zero were the greatest contributions made by the Arabs to the mathematical science. The outstanding quality of Arabic numerals lies in the fact that they possess an absolute value. Huroful Jhubar was a novel form of numerals adopted in Spain by 950 A.D. The most significant numeral invented by the Arabs was zero which according to Carra De Vaux `was used by the Arabs at least 250 years before it became known in the west. Before the introduction of zero it was necessary to arrange figures in columns to differentiate between tens, hundreds, thousands etc. The earliest use of zero is given as 973 A.D.'*

অর্থাৎ 'শূন্যসহ আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালী ছিল গাণিতিক বিজ্ঞানে আরবদের শ্রেষ্ঠতম অবদান। আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালী প্রণয়নে আরবদের অসাধারণ গুণের মূলে ছিল চূড়ান্ত মূল্য সম্পর্কে তাদের ধারণা। ৯৫০ সালে স্পেনে হুরফুল ঝুবার একটি অভিনব সংখ্যা লিখন প্রণালী হিসাবে গৃহীত হয়। আরবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল শূন্য। ক্যারা দ্য ভাউক্সের মতে, পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত হওয়ার ২৫০ বছর আগে আরবরা শূন্য ব্যবহার করতো। শূন্যের প্রচলন হওয়ার আগে দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ে কলামে কলামে সংখ্যাগুলোর বিন্যাস ঘটানোর প্রয়োজন হতো। ৯৭৩ সালে প্রথম শূন্য ব্যবহার করা হয়।'

ওপরের উদ্ধৃতিগুলোতে আসল খাওয়ারিজমির নাম উল্লেখে ভুল থাকলেও স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরবরাই হলো শূন্যের প্রথম ব্যবহারকারী এবং আরবী 'সিফর' থেকে ইংরেজি 'সাইফার' শব্দটি এসেছে।

www.pathagar.com

শূন্য ব্যবহারে আল-খাওয়ারিজমি সম্পর্কে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনে ঐতিহাসিক আর. রাশেদের একটি উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অব এরাবিক ম্যাথমেটিক্স: বিটুয়িন এরিথমেটিক এন্ড এলজাব্রা' শিরোনামে গ্রন্থে শূন্য ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে খাওয়ারিজমির একটি বিবৃতি উল্লেখ করেছেন। খাওয়ারিজমি তার বিবৃতিতে বলেছেন, '*When I consider what people generally want in calculation,I found that it was always a number. I also observed that every number is composed of units and that any number may be divided into units. Moreover, I found that every number which may be expressed from one to ten, surpasses the preceeding by one unit; afterwards the ten is doubled or tripled just as before the units were: thus arise twenty, thirty etc. until a hundred: then the hundred is doubled and tripled in the same manner as the units and the tens upto the thousand; so forth to the utmost limit of numberation.*'

অর্থাৎ '*লোকজন গণনায় সাধারণত কী চায় তা বিবেচনা করার সময় আমি দেখতে পেয়েছি যে, তা হলো বরাবরই একটি সংখ্যা। আমি আরো দেখতে পেয়েছি যে, প্রতিটি সংখ্যা কয়েকটি একক নিয়ে গঠিত এবং যে কোনো সংখ্যাকে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করা যেতে পারে। আমি আরো দেখতে পেয়েছি, এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যার চেয়ে এক একক করে বৃদ্ধি পায়। এককগুলোর মতো দশ দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ হয়। এভাবে বিশ, ত্রিশ করে একশো পর্যন্ত গড়ায়। পরে একই পদ্ধতিতে ইউনিট হিসাবে একশো হয় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ এবং দশকগুলো হাজার পর্যন্ত এবং এভাবে সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে।*'

খাওয়ারিজমির এ বৃবতি থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি গণিতে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করেছেন। সংখ্যা হিসাবে দশ বলতে তিনি নিশ্চয়ই শূন্য বুঝিয়েছেন।

শূন্য আবিষ্কারের আগে দশক, শতক, সহস্র বা তদুর্ধ্ব কোনো সংখ্যা লিখার জন্য 'এবাকাস' পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। এ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত জটিল। রোমান যুগ থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপে বিরাট অঙ্কের সংখ্যা গণনায় এবাকাস পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। রোমান সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পর ইউরোপ এ প্রণালীর কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। দশম শতাব্দীতে বিজ্ঞানী গারবার্ট পুনরায় এবাকাস প্রণালী চালু করেন। তবে তিনি শূন্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছিলেন একেবারে অজ্ঞ।

আধুনিক সংখ্যা লিখন প্রণালী চালু হওয়ার প্রাক্কালে রোমানদের উদ্ভাবিত রোমান পদ্ধতি অতি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হতো। আজকাল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে রোমান সংখ্যা লিখন প্রণালী ব্যবহার করা হয়। লম্বালম্বি রেখা টেনে রোমান সংখ্যাগুলো লিখা যায়। যেমন- I, II, III, IIII, IIIII ইত্যাদি। তবে চার, পাঁচ কিংবা ততোধিক সংখ্যা গণনা কঠিন হওয়ায় রোমানরা অতিরিক্ত কয়েকটি প্রতীক উদ্ভাবন করে। যেমন- পাঁচের জন্য V, দশের জন্য X, পঞ্চাশের জন্য L, একশোর জন্য C এবং এক হাজারের জন্য M। উদাহরণস্বরূপ, রোমান পদ্ধতিতে ১,২৭৮ সংখ্যাটি

www.pathagar.com

লিখতে গেলে লিখতে হবে MCCLXXVIII। চিহ্ন দিয়ে প্রতীকগুলো লিখলে দাঁড়াবে M+C+C+L+X+X+V+I+I+I। আধুনিক সংখ্যা প্রণালী অনুযায়ী লিখলে তা হবে ১০০০+১০০+১০০+৫০+১০+১০+৫+১+১+১। রোমান পদ্ধতির এ জটিলতা থেকে ছোট্ট একটি বিন্দু 'শূন্য' মানব সভ্যতাকে মুক্তি দিয়েছে।

আরবদের কাছ থেকে ইউরোপে 'শূন্য' স্থানান্তর

লিওনার্দো ফিবোনাসি প্রথম ইউরোপে শূন্যের ব্যবহার চালু করেন। এছাড়া তিনি ইউরোপে বীজগণিতের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। তার লেখা 'লাইবার আবাসি'র মধ্য দিয়ে ইউরোপ শূন্যের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়। ফিবোনাসির পিতা গিলিইমো বোনাসি ছিলেন পিসার একজন বণিক। ১১৯২ সালের দিকে তিনি উত্তর আফ্রিকায় কূটনীতিক হিসাবে নিয়োগ পান। তার কর্মস্থল ছিল বুগিয়া। বর্তমানে জায়গাটির নাম বেজাজিয়া। উত্তর-পূবার্ঞ্চলীয় বারবেরির ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর নগরী হলো বুগিয়া। বর্তমান আলজেরিয়াকে তখন বলা হতো বারবেরি। ফিবোনাসি তার পিতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে বারবেরি সফর করেন। পরে তাকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সিরিয়া, মিসর, গ্রীস, সিসিলি ও প্রোভেন্সে পাঠানো হয়। বারবেরিতে তিনি প্রচুর গাণিতিক জ্ঞান অর্জন করেন। এখানে তিনি আরব বণিকদের সংখ্যা লিখতে এবং অঙ্ক কষতে একটি চমৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখতে পান। ১২০০ সালে ভ্রমণ শেষে ফিবোনাসি পিসায় ফিরে এসে গণিতের ওপর ল্যাটিন ভাষায় বেশ কয়েকটি বই লিখেন। তার লেখা গণিত বিষয়ক বইগুলোর বেশিরভাগ হারিয়ে গেছে। 'লাইবার আবাসি' হলো তার প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত বই। বইটি টিকে রয়েছে। 'লাইবার আবাসি'তে ফিবোনাসি হিন্দু-আরব সংখ্যা এবং সংখ্যাগুলোর স্থানগত মানের বর্ণনা দেন। তিনি সংখ্যার সাহায্যে কিভাবে গণনা করতে হয় তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। ফিবোনাসি যে পদ্ধতি চালু করেন তা 'এলগোরিজম' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠে। তিনি নিজে সংখ্যাগুলোকে 'হিন্দু' হিসাবে উল্লেখ করতেন। পরবর্তীকালের লেখকগণ ফিবোনাসির প্রবর্তিত সংখ্যাগুলোকে 'হিন্দু-আরব' কিংবা শুধুমাত্র 'আরব' হিসাবে উল্লেখ করতেন।

'লাইবার আবাসি' একটি বিশাল বই। ইংরেজিতে অনূদিত ৬৭২ পৃষ্ঠার বই 'দ্য বুক অব ক্যালকুলেশন' (The Book of Calculation)-এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়, '*These are the nine figures of the Indians: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. With these nine figures and* with this sign 0 which in Arabic is called zephirum, any number can be written, as will be demonstrated'.

অর্থাৎ '*এ নয়টি হলো ভারতীয় সংখ্যা: ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১। এ নয়টি সংখ্যা এবং ০ প্রতীক আরবরা যাকে জেফিরাম হিসাবে আখ্যায়িত করে তার সহায়তায় যে কোনো সংখ্যা লেখা যেতে পারে এবং তা প্রমাণ করা যাবে।*'

আরবীতে 'শূন্য'কে বলা হয় 'সিফর'। খাওয়ারিজমি-ও 'সিফর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ অড্রিয়ান মেটিয়ার্স, হেরিসন, ক্যাভেলাইরি ও ইউলারের মতো গণিতজ্ঞগণ শূন্য প্রকাশে 'সিফর' শব্দটি ব্যবহার করতেন। কিন্তু

www.pathagar.com

ফিবোনাসির বইয়ের ইংরেজি অনুবাদে শব্দটিকে ল্যাটিন 'জেফিরাম' (Zephirum) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ল্যাটিন 'জেফিরাম' ছাড়াও শূন্যকে 'জিফার'(Zeffer), 'জোনেরো' (Zonero), 'কেনেরো' (Cenero) ইত্যাদি বলা হতো। ইতালীয় ভাষায় 'জেফিরাম' হয়ে যায় 'জেফিরো' (Zefiro) এবং ভেনিসীয় ভাষায় 'জেফিরো' হয়ে যায় 'জিরো' (Zero)। ইংরেজিতে ভেনিসীয় বানান রীতি 'জিরো' গ্রহণ করা হয়। আরবী 'সিফর' থেকে শুধু 'জিরো' নয়, 'এনসাইফার' ও 'ডিসাইফার' শব্দেরও উৎপত্তি হয়েছে।

লিওনার্দো ফিবোনাসির ১৫ পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'লাইবার আবাসি'র শেষ পরিচ্ছেদে বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় তিনি হুবহু আল-খাওয়ারিজমিকে অনুসরণ করেছেন। খাওয়ারিজমির মতো তিনিও দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করে নেন। তাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বীজগণিতে খাওয়ারিজমির আদর্শকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে জ্ঞান করতেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শূন্যের ব্যবহার

মুসলিম সভ্যতায় শূন্য ব্যবহারের আড়াই শত বছর পর ইউরোপে শূন্যের ব্যবহার শুরু হয়। স্পেনের মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয়রা শূন্য বা জিরো (Zero) সংখ্যাটি ব্যবহার করতে শুরু করে। শূন্যসহ সংখ্যা লিখন পদ্ধতিকে বলা হতো 'এলগোরিদম'। দশম শতাব্দীতে ইউসূফ প্রণীত 'মাফাতিফুল উলুম' পাঠ থেকে বুঝা যায়, আল-খাওয়ারিজমির সময় থেকেই শূন্যের ব্যবহার শুরু হয়। ইউসূফ তার গ্রন্থে বলেছেন, *'যদি কোনো গুণিতক শক্তি সংখ্যার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হয় তাহলে 'সিফর' বা শূন্যের সাহায্যে তা পূর্ণ করা হয়। এভাবে সংখ্যাটি পূর্ণভাবে লেখা যায়।'*

খাওয়ারিজমির বীজগণিত

গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র ডায়োফেন্টাসই বীজগণিতের ওপর 'এরিথমেটিকা' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তারপর আর কেউ এ বিষয়ে মনোযোগ দেননি। খাওয়ারিজমি 'আল-মুখতাছার জাবর ওয়াল মুকাবালা' নামে গণিতের ওপর তার প্রথম বই লিখেন। তারপর ৮৩০ সালে তিনি গণিতের ওপর তার বিশ্ববিখ্যাত বই 'আল-ইলম উল জাবর ওয়াল মুকাবালা' রচনা করেন। এ বইটি সংক্ষেপে 'হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা' এবং 'কিতাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা' নামেও পরিচিত। ইংরেজি অনুবাদে বইটির নাম দেয়া হয়েছে 'দ্য কম্পেন্ডিয়াস বুক অন ক্যালকিউলেশন বাই কম্প্লিশন এন্ড ব্যালেন্সিং' (The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing)। আল-খাওয়ারিজমির 'মুকাবালা' বীজগণিতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। সমস্যা সমাধানে তিনি তার বইয়ে প্রতীক ব্যবহার করেননি। প্রতীকগুলো তিনি প্রকাশ করেছেন কথায়। ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে খাওয়ারিজমি বীজগণিতের সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তার এ পদ্ধতি লিওনার্দো ফিবোনাসি ইউরোপে চালু করেন। তিনি ল্যাটিসেরও উন্নয়ন ঘটান।

www.pathagar.com

মুকাবালা'য় বিষয়গুলোর পর পর বিন্যাসের মধ্যে খাওয়ারিজমির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ফুটে উঠেছে। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের অনুপ্রেরণায় বইটি লেখা হয়। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য, জরিপ এবং উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপক সমস্যায় প্রয়োগযোগ্য অসংখ্য সমাধান ও হিসাব স্থান পেয়েছে। ১১৪৫ সালে চেস্টারের রবার্ট 'লাইবার এলজাব্রি ইট আল-মুকাবালা' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় বইটি অনুবাদ করেন। ক্রিমোনার গেরার্ডও বইটি অনুবাদ করেন। ১৯১৫ সালে 'দ্য হিন্দু অ্যারাব নিউমার‍্যালস' নামে বইয়ের লেখক এল. পি. কারপিনস্কি পুনরায় নিউইয়র্ক থেকে বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। খাওয়ারিজমির লেখা গণিত বিষয়ক বই 'আজজাম ওয়াত তাফরিক' কে অনুবাদ করেছেন তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তবে অনেকের ধারণা, রবার্টই বইটির প্রকৃত অনুবাদক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মুকাবালা'র একটি দুর্লভ আরবী কপি সংরক্ষিত ছিল এবং ১৮৩১ সালে এফ. রোজেন তা অনুবাদ করেন। লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুকাবালা'র আরেকটি ল্যাটিন অনুবাদ সংরক্ষিত।

আরবরা জ্যামিতি ছাড়া বীজগণিত সমাধানের কথা ভাবতেও পারতো না। তারা জ্যামিতিকে যেমন বীজগণিতের সমস্যা সমাধানে টেনে আনতো তেমনি বীজগণিত এমনকি শুদ্ধ গণিতকেও জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতো। এদিক থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞানীদের ছাড়িয়ে যান। জ্যামিতি, বীজগণিত ও বিশুদ্ধ গণিত বা পাটিগণিত একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটিকে ছাড়া অন্যটি অগ্রসর হতে পারে না। প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীগণ এ বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চাননি। অঙ্কশাস্ত্রকে তারা পৃথক পৃথকভাবে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে অঙ্কশাস্ত্র মুক্তি পায়। আরব বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারিজমি জ্যামিতির সাহায্য নিয়ে দ্বিপদ সমীকরণের সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। তার দ্বিপদ সমীকরণ সমাধানের একটি উদাহরণ দেয়া হলো: $x^2+10x=39$।

আল খাওয়ারিজমির মতে, বৃত্তের পরিধির অর্ধেককে ব্যাসের অর্ধেক দিয়ে গুণ করলে বৃত্তের আয়তন পাওয়া যাবে। তিনি চতুর্ভুজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে তাদের আয়তন বের করার উপায় নির্ধারণ করেছেন। পাঁচটি ভাগ হলো যথাক্রমে (১) বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং কোণগুলো প্রত্যেকটি এক সমকোণ। (২) কোণগুলো সমকোণ তবে বাহু অসমান (৩) বাহুগুলো সমান কিন্তু কোণগুলো অসমান (৪) বিপরীত বাহুগুলো সমান তবে কোণগুলো অসমান। (৫) কোণ ও বাহু সবই অসমান। ত্রিভুজকে তিনি সূক্ষ্মকোণী, স্থূলকোণী এবং সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন, সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের বর্গ অন্য দু'বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ছাড়া তিনি 'পিরামিড' নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি ত্রিভুজের তিনটি বাহু থেকে তার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে বীজগণিতের মতো একটি অজ্ঞাত সংখ্যা আমদানি করে একটি সমীকরণের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং তার সমাধানও করেছেন।

গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য শাখায় অমূল্য অবদান রাখলেও বীজগণিত বা এলজাব্রায় খাওয়ারিজমির অবদান তাকে পৃথিবীতে অমর করে রেখেছে। এলজাব্রায় তার অবদান

www.pathagar.com

কতটুকু তা উপলব্ধি করার জন্য জে. জে. ওসিকোনার এবং ই. এফ. রবার্টসনের একটি উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ দুই গণিতজ্ঞ 'ম্যাকটিউটর হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্স আর্কাইভ'-এ লিখেছেন, *'Perhaps one of the most significant advances made by Arabic mathematics began at this time with the work of al-Khwarizmi, namely the beginnings of algebra. It is important to understand just how significant this new idea was. It was a revolutionary move away from the Greek concept of mathematics which was essentially geometry. Algebra was a unifying theory which allowed rational numbers, irrational numbers, geometrical magnitudes etc. to all be treated as `algebraic objects'.It gave mathematics a whole new development path so much broader in concept to that which had not existed before, and provided a vehicle for future development of the subject. Another important aspect of the introduction of algebraic ideas was that it allowed mathematics to be applied to itself in a way which had not happened before.'*

অর্থাৎ *'ঐ সময় আল-খাওয়ারিজমির কর্ম বিশেষ করে এলজাব্রার সূচনার মধ্য দিয়ে আরবী গণিতে সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। এ নয়া ধারণা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ। এলজাব্রার সূচনা ছিল গণিতের গ্রীক দর্শন থেকে মুক্ত একটি বৈপ্লবিক উদ্যোগ। গণিতে গ্রীক দর্শন ছিল মূলত জ্যামিতিক। এলজাব্রা ছিল একটি ঐক্য প্রয়াসী তত্ত্ব যা মূলদ সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা, জ্যামিতি ইত্যাদি সবগুলোকে বীজগণিতের বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বীজগণিত গণিতকে উন্নতির সম্পূর্ণ নতুন একটি পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ নতুন পথ ছিল ধারণার দিক থেকে এতটাই প্রশস্ততর যে, তার অস্তিত্ব আগে ছিল না এবং বিষয়টিকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি বাহন প্রদান করে। বীজগণিতের ধারণা প্রবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, তা গণিতকে নিজের জন্য প্রযোজ্য একটি পথের সন্ধান দেয় যা আগে ঘটেনি।'*

বীজগণিত সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি সত্যি যথার্থ। খাওয়ারিজমির বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থ মুকাবালা ছিল বেবিলনীয় পদ্ধতি এবং আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাসের 'এরিথমেটিকা' থেকে ভিন্নতর।

'দ্য ডেভেলপমেন্ট অব অ্যারাবিক ম্যাথমেটিক্স'-এর ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় বইটি সম্পর্কে আর. রাশেদ ও এঞ্জেলা আর্মস্ট্রংয়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ দু'জন লিখেছেন, *'Al-Khwarizmi's text can be seen to be distinct not only from the Babylonian tablets, but also from Diophantus' Arithmetica. It no longer concerns a series of problems to be solved, but an exposition which starts with primitive terms in which the combinations must give all possible prototypes for equations, which henceforward explicitly constitute the true object of study. On the other hand, the idea of an equation for its own sake appears from the beginning and, one could say, in a generic manner, insofar as it does not simply emerge in the course of solving a problem, but is specifically called on to define an infinite class of problems.'*

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'আল-খাওয়ারিজমির গ্রন্থকে শুধু বেবিলনীয় তালিকা থেকে পৃথক করে দেখলে চলবে না, তাকে ডায়োফেন্টাসের এরিথমেটিকা থেকেও আলাদা করে দেখতে হবে। গ্রন্থটি শুধু কয়েকটি সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। গ্রন্থটি হচ্ছে একটি ব্যাখ্যা যা প্রাচীন শব্দাবলী নিয়ে শুরু হয়েছে যেখানে সমন্বয়গুলোকে অবশ্যই সমীকরণ সমাধানে সম্ভাব্য সব নমুনা প্রদান করতে হবে। গ্রন্থটিতে সুস্পষ্টরূপে গবেষণার সত্যিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে শুরু থেকে সমীকরণ সমাধানের একটি ধারণা ফুটে উঠেছে এবং যে কেউ যথার্থভাবে বলতে পারেন যে, গ্রন্থটি কেবলমাত্র কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের একটি দিকনির্দেশনা হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। বরং তাতে সুনির্দিষ্টভাবে সীমাহীন সমস্যার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।'

খাওয়ারিজমির 'মুকাবালা' ইউরোপীয়দের কল্যাণে এলজাব্রা'য় (Algebra) রূপান্তরিত হয়। বইটি ল্যাটিন ভাষায় 'লিউডাস অ্যালজাব্রাক অ্যালমুক্রাবালাক', 'গাবিবা মুতাবিলা' ইত্যাদি শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজি অনুবাদে 'এলজাব্রা' ও 'আলমাকাবেল' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। ১৮৩১ সালে এফ. রোজেন মুকাবালা'কে 'এলজাব্রা অব মোহাম্মদ বিন মুসা' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। স্মিথ বইটিকে 'দ্য সায়েন্স অব রিডাকশন এন্ড ক্যানসেলেশন' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তার অনুবাদ কর্মটি শাব্দিক হওয়ায় এফ. কাজোরি 'রেস্টোরেশন এন্ড রিডাকশন' নাম দিয়ে আরেকটি পৃথক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার মতে, রেস্টোরেশনের মানে হলো নেতিবাচক সংখ্যাগুলোকে সমীকরণের অন্য পাশে নিয়ে যাওয়া এবং রিডাকশনের মানে হলো একই ধরনের সংখ্যাগুলোকে একত্রিত করা। উদাহরণস্বরূপ তিনি $x^2=2x+5x+6$ সমীকরণটি উল্লেখ করেছেন। তার মতে, ওয়াল জাবর বা রেস্টোরেশনে সমীকরণটি হবে $x^2=2x+5x+6$ এবং আল-মুকাবালা বা রিডাকশনে হবে $x^2=7x+6$ *এর* বর্গ সম মূল ($ax^2=bx$)।

বীজগণিতে জনকের ভূমিকায় খাওয়ারিজমি

এলজাব্রা বা বীজগণিত হলো আধুনিক গণিতের প্রাণ। কেউ কেউ গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাসকে বীজগণিতের জনক বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মুসলিম গণিতজ্ঞ আল-খাওয়ারিজমি হলেন বীজগণিতের জনক। তার বইয়ের শিরোনাম 'আল-জাবর' থেকে 'এলজাব্রা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আরবী 'আল-জাবর'-এর বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায় সাধারণ যোগের কাজ। প্রকৃতপক্ষে 'আল-জাবর' শব্দের অর্থ হলো কোনো সংখ্যার সঙ্গে অন্য কোনো সংখ্যা যোগ করে বা কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করে অন্য কোনো সংখ্যার সমান করা। অক্সফোর্ড ডিকশনারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী এলজাব্রা হলো সাধারণ নমুনার সাহায্যে সংখ্যার গুণ ও পরিমাণের অনুসন্ধান। অন্য কথায় আল-জাবর শব্দের মানে ভগ্নাংশগুলো পুনরায় একত্রিত করা।

খাওয়ারিজমি তার গ্রন্থে জ্যামিতিক প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। তিনি $x=0$ মূলকে স্বীকার করেননি। কেবলমাত্র ইতিবাচক মূল নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্যামিতির

www.pathagar.com

স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে সমান সমান রাশির সঙ্গে সমান সমান রাশি যোগ করলে যোগফলগুলো সমান হয়। জ্যামিতির এ স্বতঃসিদ্ধ বীজগণিতের প্রথম সূত্র হলেও তাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গণ্য করেননি। কেন তিনি তাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেননি নিচে তার ব্যাখ্যা দেয়া হলোঃ

জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে 'ক' যদি 'খ' এর সমান হয় তাহলে 'ক' এর সঙ্গে 'গ' যোগ করে যে ফল পাওয়া যাবে, 'খ'-এর সঙ্গে 'গ' যোগ করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। বীজগণিতের নিয়মানুযায়ী লিখতে হবে যদি ক= খ হয় তাহলে ক+গ= খ+গ। এককথায় সমান সমান সংখ্যার সঙ্গে অন্য কোনো সংখ্যা যোগ করলে বা এসব সংখ্যাকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যোগফল বা গুণফল সমান হবে। এটাই বীজগণিতের প্রথম সূত্র। এ সূত্রকে সংক্ষেপে 'আল-জাবর' বলা হয়েছে।

'আল-জাবর' বা মুকাবালা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রমাণ না দিয়ে দ্বিপদ সমীকরণ সমাধানের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিপদ সমীকরণকে খাওয়ারিজমি ৬ ভাগে বিভক্ত করেছেন। বইটিতে তিনি সংখ্যাগুলো প্রতীকের পরিবর্তে কথায় লিখেছেন। যেমন-আধুনিক বীজগণিতে x^2 বলতে যা বুঝায় তিনি সেখানে লিখেছেন স্কোয়ার বা বর্গ। আধুনিক বীজগণিতের পরিভাষায় x বলতে যা বুঝায় তিনি সেখানে লিখেছেন রুট বা মূল। একইভাবে ৪২ বলতে যা বুঝায় তিনি সেখানে লিখেছেন সংখ্যা বা নাম্বার। আধুনিক বীজগণিতের পরিভাষা অনুযায়ী খাওয়ারিজমির ৬টি দ্বিপদ ও সমান্তরাল সমীকরণ লিখতে গেলে তা হবে:

(১) বর্গ সমান মূল ($ax^2=bx$), (২) বর্গ সমান সংখ্যা ($ax^2=c$), (৩) মূল সমান সংখ্যা ($bx=c$), (৪) বর্গ ও মূল সমান সংখ্যা ($ax^2+ bx = c$), (৫) বর্গ ও সংখ্যা সমান মূল ($ax^2+ c =bx$) এবং (৬) মূল ও সংখ্যা সমান বর্গ ($bx+c=ax^2$)। খাওয়ারিজমি এসব সমীকরণের দু'টি সমাধান প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। গ্রীক বিজ্ঞানী ডায়োফেন্টাস একটি সমাধানের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় ভাগে খাওয়ারিজমি সমীকরণগুলোর জ্যামিতিক সমাধান দিয়েছেন। তৃতীয় ভাগে তিনি ($x \pm a$) এবং ($x \pm b$) এর গুণফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ ভাগে তিনি অজ্ঞাত সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ও বর্গমূল বের করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তা থেকে তিনি $a \sqrt{}b=a2b$ এবং $\sqrt{}a\ b= \sqrt{}ab$ এর ফর্মুলা বের করেছেন। পঞ্চম বা শেষ ভাগে তিনি কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেছেন। যেমন- একটি হলো এমন দু'টি সংখ্যা বের করতে হবে যার সমষ্টি হবে ১০ এবং বর্গের বিয়োগ ফল হবে ৪০।

ওপরে উল্লেখিত ৬টি সমীকরণের মধ্যে (৩) (৪) ও (৬) হলো দ্বিপদ সমীকরণ। এই দ্বিপদ সমীকরণের সমাধান প্রণালী হিসাবে দু'টি ফর্মুলা প্রচলিত দেখা যায়। তার মধ্যে একটির ব্যবহার সর্বত্র। অন্যটির ব্যবহার দেখা যায় কদাচিৎ। এই স্বল্প ব্যবহৃত সমাধানটির আবিষ্কারক হলেন একাদশ শতাব্দীর ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীধর আচার্য। দ্বিতীয় সহজতম ফর্মুলার আবিষ্কারক হলেন আল-খাওয়ারিজমি। সমীকরণে তার ফর্মুলাটি ছিল এরকম: $x^2+px=q$।

www.pathagar.com

আল-খাওয়ারিজমির মতে, অনির্দিষ্ট সংখ্যাটির প্রথম শক্তির গুণিতকের অর্ধেককে বর্গ করে দু'দিকে যোগ করতে হবে। তাহলে একদিকে একটি পূর্ণ বর্গ পাওয়া যাবে। এবার দু'দিকের বর্গমূল বের করলে সহজেই অনির্দিষ্ট সংখ্যাটি বের হয়ে পড়বে। এখানে অনির্দিষ্ট সংখ্যার প্রথম শক্তির গুণিতকের অর্ধেক ½ p কে বর্গ করে দু'দিকে যোগ করে দেয়া হলে তা হবে:

$$x^2+px+ \frac{1}{4}p^2=q+ p^2$$

অর্থাৎ $(x+ p)^2=q+\frac{1}{4} p^2$

দু'দিকে বর্গমূল বের করলে হবে $x+ \frac{1}{2}p= \sqrt{q}+\frac{1}{4} p^2$

অতএব $x= \sqrt{q}+ \frac{1}{4}p^2- \frac{1}{2}p$

এ নিয়মটি $\neq$ চিহ্নসহ সাধারণত প্রচলিত।

'আল-জাবর' শব্দের মতো 'আল-মুকাবালা' শব্দটিরও সঠিক অনুবাদ করা হয়নি। মুকাবালা'র সাধারণ অর্থ হলো সাক্ষাৎ। বীজগণিতের চিহ্নগুলোর প্রতি তাকালেই 'মুকাবালা' শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। সমান সমান চিহ্নের সংখ্যাগুলোকে একপাশ থেকে অন্যপাশে একত্রিত করার নিয়ম বীজগণিতে দ্বিতীয় সূত্র হিসাবে পরিচিত। সমীকরণে কোনো সংখ্যাকে একপাশ থেকে অন্য পাশে নিয়ে গেলে চিহ্ন পাল্টে যায়। উভয়পক্ষের যোগফল হয় শূন্য। অর্থাৎ সাক্ষাৎ হলেই দু'টি পক্ষ একাত্ম হয়ে মিলে যায়। মুকাবালার নিয়ম অনুযায়ী যদি ক= খ হয় তাহলে পাশ পরিবর্তন করলে তা হবে ক-খ=০।

সমীকরণে হ্রাসকৃত সংখ্যাগুলোকে একপাশ থেকে অন্য পাশে স্থানান্তর করার নিয়ম ছিল আল-খাওয়ারিজমির একান্ত মৌলিক। তিনি ভারতীয় অথবা গ্রীক কারো কাছে ঋণী নন। এ ব্যাপারে 'অ্যা হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন্স'-এর লেখক এফ. কাজোরি বলেছেন, *'বিভিন্ন কারণে এ নিয়ম ভারতীয় সূত্র থেকে আসতে পারে না। প্রথমত. ভারতীয়রা রেস্টোরেশন অথবা রিডাকশনের মতো কোনো নিয়ম জানতো না। তারা রেস্টোরেশনের নিয়ম অনুযায়ী সমীকরণের সব অঙ্ক পজেটিভ করতো না। গ্রীক বিজ্ঞানী ডায়োফেন্টাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল-খাওয়ারিজমির মতো তার বীজগণিতেও সমীকরণের দু'টি নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আরব বিজ্ঞানী খাওয়ারিজমি যে তাকে অনুসরণ করেননি তা সহজেই বুঝা যায়। গ্রীক বিজ্ঞানী ডায়োফেন্টাস দ্বিপদ সমীকরণে মাত্র একটি সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে খাওয়ারিজমি দু'টি সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ডায়োফেন্টাস বরাবরই অমূলদ সমীকরণ বাদ দিয়েছেন। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, আল-খাওয়ারিজমির ওপর ভারতীয় বা গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ কারো কোনো প্রভাব ছিল না।'*

ফরাসি গণিতজ্ঞ বোসো-ও কাজোরির মতামত সমর্থন করেছেন। তার মতে, ডায়োফেন্টাস বীজগণিত নিয়ে যে সামান্য আলোচনা শুরু করেছিলেন, আরবরা তাকে পরিপূর্ণ ও পরিস্ফূটিত করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কারডান-ও একই মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আরবরাই বীজগণিতের উদ্ভাবক। প্রখ্যাত বিশ্লেষক

www.pathagar.com

ওয়ালিস এই মত সমর্থন করেছেন। ডায়োফেন্টাসের সঙ্গে আরবদের পার্থক্য বুঝানোর জন্য তিনি বলেছেন, গ্রীক পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাত্রাকে যথাক্রমে স্কোয়ার, কিউব, কোয়াড্রাটো, কোয়াড্রাটাম, কোয়াড্রাটো কিউবাস, কিউবো-কিউবাস নাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাত্রার নামকরণ করা হয়েছে ঐ দু'টি অধঃস্তন মাত্রার সাহায্যে যাদের নিয়ে মাত্রাটি গঠিত। অন্যদিকে আরবদের মাত্রার নামগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করলে সেগুলো দাঁড়াবে স্কোয়ার, কিউব, কোয়াড্রাটো-কোয়াড্রাটাম, সারসলিড, কোয়াড্রাটো-কিউবাস, সেকেন্ড সারসলিড প্রভৃতি হিসাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পিসার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিওনার্দো ফিবোনাসির মতে, আরব বিজ্ঞানীদের বীজগণিত ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞানীদের বীজগণিত অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুশৃঙ্খল ও বিশদভাবে আলোচিত। তিনি মিসর, সিসিলি, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ সফর করে আরবদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। লিওনার্দো ফিবোনাসির মতো সিনান বিন ফতেহ, আবু আবদুল্লাহ বিন আল-সৈয়দানি, আবুল ওয়াফা ও আবু কামিল সুজা বিন আসলামের মতো পণ্ডিতগণ তাদের গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে খাওয়ারিজমির বীজগণিতের কথা উল্লেখ করেছেন। আবু কামিল, আল-কারখি ও ওমর খৈয়াম তাদের বীজগণিতে খাওয়ারিজমির ব্যবহৃত $x^2+10x=39$ সমীকরণটি ব্যবহার করেছেন। আল-খাওয়ারিজমির গ্রন্থের মাধ্যমেই ইতালীয় বিজ্ঞানীগণ এলজাব্রা সম্পর্কে জানতে পারেন। গণিতের দশমিক প্রণালী সম্পর্কেও তারা জ্ঞান লাভ করে। এ গণিতকে বলা হতো 'এলগোরিজম' বা 'দি আর্ট অব আলখাওয়ারিজমি' (the art of Alkhwarizmi)। `এলগোরিজম' নাম দিয়েই এ গণিতকে গ্রীক গণিতজ্ঞ ও ভাস্কর বোয়েথাসের (Boethus) গণিত থেকে আলাদা করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এলজাব্রা 'এলগোরিজম' নামেই পরিচিত ছিল।

বীজগণিতের জনক হিসাবে ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসাবে খাওয়ারিজমিকে স্বীকৃতি দিয়ে 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪৫ পৃষ্ঠায় গণিতজ্ঞ জি. সারটন লিখেছেন, '*The greatest Mathematician of the time, and if one takes all circumstances into account, one of the greatest of all time was Al-Khwarizmi.*' অর্থাৎ '*আল-খাওয়ারিজমি হলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং সব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেয়া হলে তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ।*'

এস. গান্ডেজ খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার 'দ্য সোর্সেচ অব আল-খাওয়ারিজমি'স এলজাব্রা'র ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Al-Khwarizmi's algebra is regarded as the foundation and corner stone of the science. In a sense, al-Khwarizmi is more entitled to be called the father of algebra than Diophantus because al-Khwarizmi is the first to teach algebra in an elementary form and for its own sake, Diophantus is primarily concerned with the theory of numbers.*' অর্থাৎ '*আল-খাওয়ারিজমির বীজগণিতকে*

www.pathagar.com

এ বিজ্ঞানের বুনিয়াদ ও ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। এক অর্থে, ডায়োফেন্টাসের চেয়ে আল-খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, খাওয়ারিজমিই প্রথম প্রাথমিক পদ্ধতিতে বীজগণিত শিক্ষা দিয়েছেন। আর ডায়োফেন্টাস মূলত বীজগণিতের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।'

রবার্ট চেস্টার তার গ্রন্থ 'আল-খাওয়ারিজমি এন্ড দ্য ট্রীটিজ অব এলজাব্রা'র ১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন, *'Recognition of the fame of Al-Khwarizmi is to be found in the explicit statement by Ibn Khaldun in his encyclopaedic work. The first who wrote upon this branch (algebra) was Abu Abdallah Al-Khwarizmi after whom came Abu Kamil Shuja Ibn Aslam.'*

অর্থাৎ 'ইবনে খালদুনের রচিত বিশ্বকোষের একটি স্পষ্ট বিবৃতিতে আল-খাওয়ারিজমির প্রাপ্য সম্মানের প্রতি স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। যিনি জ্ঞানের এ শাখার (বীজগণিত) ওপর প্রথম বই লিখেছেন তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ আল-খাওয়ারিজমি। তার পরে যার নাম আসে তিনি হলেন আবু কামিল শুজা ইবনে আসলাম।'

ওপরে উল্লেখিত উক্তিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ভাষ্যগুলোতে খাওয়ারিজমিকে দ্বিধান্বিতভাবে বীজগণিতের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন মুসলিম ঐতিহাসিক আলী আবদুল্লাহ আল-দাফা। ড. দাফা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় খাওয়ারিজমকে বীজগণিতের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে 'দ্য মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, *'During the nineth century Al-Khwarizmi, the founder of algebra, transformed the concept of a number from its earlier arithmetic character as a fixed quantity into that of a variable element in an equation.'*

অর্থাৎ 'নবম শতাব্দীতে বীজগণিতের প্রতিষ্ঠাতা আল-খাওয়ারিজমি সংখ্যার ধারণাকে ইতিপূর্বের গাণিতিক ধারণা থেকে স্থায়ী পরিমাণ হিসাবে একটি সমীকরণে পরিবর্তনশীল উপাদানে রূপান্তরিত করেছেন।'

তবে আল-খাওয়ারিজমি বীজগণিতের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দানে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন করোনা ব্রিজাইনা। ব্রিজাইনা খাওয়ারিজমিকে নিয়ে আস্ত একটি বই লিখেছেন। তার বইয়ের শিরোনাম হলো 'আল-খাওয়ারিজমি: দি ইনভেন্টার অব এলজাব্রা' বা আল-খাওয়ারিজমি: বীজগণিতের আবিষ্কারক।

এলগোরিজমের উৎপত্তি

'এলগোরিদম' (Algorithm) শব্দটি এসেছে 'এলগোরিজম' (Algorism) শব্দ থেকে। 'এলগোরিজম' ছিল আল-খাওয়ারিজমি উদ্ভাবিত আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালীতে গণিত সমাধানের একটি কৌশল। 'এলগোরিজম' এবং 'এলগোরিদম' উভয় শব্দ এসেছে আল-খাওয়ারিজমির ল্যাটিন নাম থেকে। ল্যাটিন ভাষায় তাকে 'এলগোরিজম' ও 'এলগোরিদম' নামে আখ্যায়িত করা হতো। স্পেনীয় ভাষায় খাওয়ারিজমির নাম দেয়া হয়েছিল 'গারিসমো'

www.pathagar.com

এবং পর্তুগীজ ভাষায় ‘আলগারিসমো’। গারিসমো ও আলগারিসমো শব্দ দু’টির অর্থ হলো ‘সংখ্যা’। খাওয়ারিজমির নাম থেকেই বীজগণিতের অন্যতম অংশ ‘লগারিদম’ (Logarithm) শব্দটির উৎপন্ন হয়েছে।

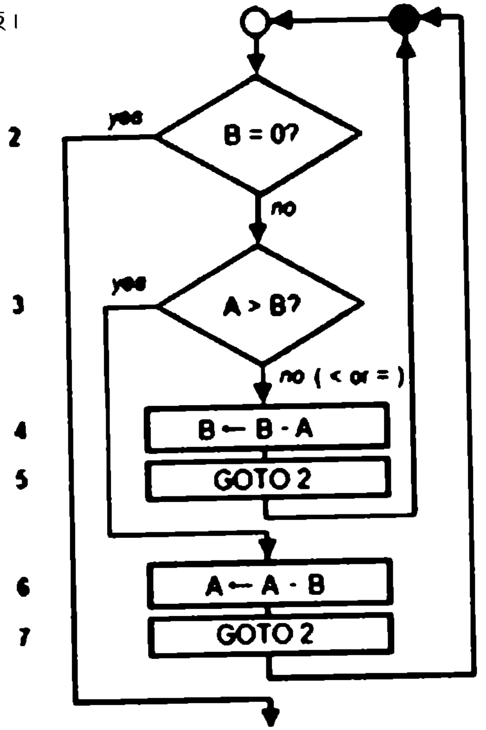

আল-খাওয়ারিজমির এলগোরিদম

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জীবনের শুরুতে খাওয়ারিজমি আফগানিস্তানে যান এবং পরে যান ভারতে। ভারতে তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাগদাদে ফিরে এসে হিন্দু গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রচার করতে থাকেন। এসময় তিনি আরবীতে ‘জিজ আল-সিন্দহিন্দ’ নামে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি তালিকা তৈরি করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিজের এবং সহকর্মী অন্যান্য বিজ্ঞানীর মৌলিক গবেষণার ফল নিয়ে খাওয়ারিজমি এ তালিকা তৈরি করেছিলেন। এ তালিকার আরেক নাম ছিল ‘ফিজিজ’। এতে শুধু জিজ বা তালিকা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চমৎকার আলোচনাও স্থান পেয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকা নির্মাতা হওয়ায় সমসাময়িককালে আল-খাওয়ারিজমিকে ‘সাহেব আল-জিজ’ নামে আখ্যায়িত করা হতো। ৩৭টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত জিজ আল-সিন্দহিন্দে পঞ্জিকা ও জ্যোতির্মণ্ডলের হিসাব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক উপাত্ত, সাইনের মানসহ ১১৬টি তালিকা ছিল।

‘সিন্দহিন্দ’ ছিল ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে লেখা প্রথম আরবী কর্ম। সিন্দহিন্দের ভিত্তিতে রচিত খাওয়ারিজমির বইটিতে ছিল ঐ সময়ের পরিচিত পাঁচটি গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্যের পরিভ্রমণের কয়েকটি চিত্র । আল-খাওয়ারিজমির এ বই ইসলামী

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে বিবেচিত। তারপর থেকে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং গ্রীক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলো অনুবাদ করেন। ৮২০ সালে আল-খাওয়ারিজমির নিজ হাতে লেখা মূল বইটি হারিয়ে গেলেও একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত স্প্যানিশ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাসলামাহ ইবনে আহমদ আল-মাজরিতি বইটি নিজে সম্পাদনা করে পুনরায় প্রকাশ করেন। তার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে বইটি টিকে রয়েছে। মাসলামাহর প্রকাশিত সংস্করণটি ১১২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি বাথের এডিলার্ড ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। কোনো শিরোনাম ছাড়াই খাওয়ারিজমির বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ল্যাটিন অনুবাদে ত্রিকোণমিতির তালিকা দেয়া হয়। ল্যাটিন অনুবাদের বহু জায়গায় সাইনের আরবী প্রতিশব্দ 'জাইব' উল্লেখ করা হয়। তাতে মনে হয়, ল্যাটিন অনুবাদে ত্রিকোণমিতির তালিকা মাজরিতিই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বইটির চারটি পাণ্ডুলিপি চারট্রিসের বিবলিওথিক পাবলিক, প্যারিসের দ্য বিবলিওথিক মাজারিন, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের বিবলিওথিক ন্যাশনাল এবং অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। আল-খাওয়ারিজমি এস্ট্রোল্যাব ও সৌরঘড়ির মতো কয়েকটি যান্ত্রিক ডিভাইসের ওপরও বই লিখেছেন। সূর্যঘড়ি তৈরিতে তিনি অবদান রেখেছেন। এস্ট্রোল্যাব নিয়ে লেখা তার প্রথম বইয়ের নাম 'কিতাবুল আমল আল-আস্তারলাব' এবং দ্বিতীয় বইয়ের নাম 'কিতাবুল আমল বিল আস্তারলাব'। ল্যাটিন ভাষায় এ দু'টি বইয়ের অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণে একটি প্রকল্পে সহায়তা করেন এবং ৭০ জন ভূগোলবিদকে নিয়ে বাগদাদের খলিফা আল-মামুনের জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করেন।

ত্রিকোণমিতি

খাওয়ারিজমির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই 'জিজ আল-সিন্দহিন্দ'-এ ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত সাইন ও কোসাইনের কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বইটি এখনো মিসরে ব্যবহার করা হয়। তাতে বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির ওপর কয়েকটি প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। খাওয়ারিজমি নির্ভুলভাবে সাইন ও কোসাইন এবং টানজেন্টের সারণী প্রস্তুত করেন। তিনি ছিলেন বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির অগ্রদূত। ত্রিকোণমিতিতে খাওয়ারিজমির অনবদ্য অবদান স্বীকার করতে গিয়ে 'এ জেনারেল হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্স'-এর ১৫৮ পৃষ্ঠায় জন বুসাট লিখেছেন, *'বর্তমানে পরিদৃষ্ট সহজ ও জটিল আকারের ত্রিকোণমিত্রিক সমাধান দেয়ায় ব্যবহারিক ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আরবদের কাছে ঋণী। আরবরা সাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত দ্বিগুণ আয়তনের জ্যায়ের পরিবর্তে ঋজু ও বৃত্তাকার উভয় ধরনের ত্রিভুজ অঙ্কনের তত্ত্ব সহজ প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত করেছে। যেসব ত্রিভুজের সমাধানে অসীম সংখ্যার প্রয়োজন হতো তারা তা সংক্ষিপ্ত করেছে। জ্যামিতিজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে মুসার 'প্লেইন এন্ড স্ফেরিক্যাল ফিগার্স' শিরোনামে প্রাপ্ত একটি বইয়ে এসব সমাধান দেয়া হয়েছে।'*

www.pathagar.com

ভূগোল

আল-খাওয়ারিজমির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো 'কিতাবুস সুরাত আল-আরদ' (বুক অন দি এপিয়ারেন্স অব দি আর্থ অথবা দি ইমেজ অব দি আর্থ)। এ বইয়ের ভিত্তিতে এইচ. মাজিক প্রাচীন আফ্রিকার মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। ৮৩৩ সালে বইটি লেখা শেষ হয়। 'কিতাবুস সুরাত আল-আরদ' হলো টলেমির 'জিওগ্রাফিয়া'র একটি সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। এতে ২০৪২ টি শহর ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় করা হয়। এছাড়া এতে ভূমধ্যসাগর, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নততর ভৌগোলিক বিবরণ দেয়া হয়। ১৯২৬ সালে লিপজিগ থেকে বইটির একটি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বইটির একটি কপি সংরক্ষিত। মাদ্রিদের বিবলিওথিক ন্যাশনাল দ্য ইস্পানায় ল্যাটিন অনুবাদ সংরক্ষিত। বইটির প্রথমেই আবহাওয়া অঞ্চল অনুসারে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মূল আরবী অথবা ল্যাটিন অনুবাদের কোনো কপিতেই পৃথিবীর মানচিত্র ছিল না। তবে হুবার্ট ডাউনচিট্‌ শহরগুলোর তালিকা দেখে নিখোঁজ মানচিত্র পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত উপকূলীয় পয়েন্টগুলোর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ পাঠ করেন। ডাউনচিট পয়েন্টগুলো গ্রাফ পেপারে স্থানান্তর করেন এবং লম্বালম্বি রেখা টেনে সেগুলো সংযুক্ত করেন। এভাবে তিনি পাণ্ডুলিপিতে প্রদর্শিত মূল মানচিত্রের আনুমানিক উপকূলগুলো খুঁজে বের করেন। একইভাবে তিনি শহর ও নদীগুলো চিহ্নিত করেন। টলেমি ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হিসাব করেছিলেন। তার মানচিত্রে ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছিল ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ৬৩ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে। আল-খাওয়ারিজমি তার ভুল সংশোধন করেন। তিনি ভূমধ্যসাগরকে ৫০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে দেখান। আল-খাওয়ারিজমি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের অবস্থান নির্ণয় করেন। তিনি এ দু'টি মহাসাগরকে উন্মুক্ত জলরাশি হিসাবে দেখতে পান। অন্যদিকে টলেমি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরকে স্থলবেষ্টিত মহাসাগর হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তারপর আল-খাওয়ারিজমি আলেক্সান্দ্রিয়ার ১০-১৩ ডিগ্রি পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলকে প্রাচীন পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশ রেখা হিসাবে নির্ধারণ করেন। তার আগে টলেমি বাগদাদের ৭০ ডিগ্রি পশ্চিমে দ্রাঘিমাংশ রেখা নির্ধারণ করেছিলেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ মুসলিম ভূগোলবিদ খাওয়ারিজমির দ্রাঘিমাংশ রেখা ব্যবহার অব্যাহত রেখেছিলেন।

ইহুদী পঞ্জিকা

আল-খাওয়ারিজমি 'রিসালা ফি ইসতিখারাজ তারিখ আল-ইয়াহুদ'-এ ইহুদী পঞ্জিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার বইয়ে সপ্তাহ বা মাসের প্রথম দিন 'তিশরি' নির্ধারণে ১৯ বছর দীর্ঘ একটি প্রাচীন চক্র রীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে ইহুদী যুগ এবং সেলিউসিড যুগের মধ্যবর্তী বিরতি হিসাব করে বের করা হয়। খাওয়ারিজমি

www.pathagar.com

ইহুদী পঞ্জিকা ব্যবহার করে চন্দ্র ও সূর্যের দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণের রীতি উদ্ভাবন করেন। আল-বেরুনি ও ইহুদী পণ্ডিত মুসা ইবনে ময়মনের কর্মেও অনুরূপ উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় খাওয়ারিজমির প্রভাব

খাওয়ারিজমির কাছে আজকের সভ্যতা বিশেষ করে ইউরোপ তাদের ঋণ অস্বীকার করতে পারে না। ইউরোপীয় রেনেসাঁ তার কাছে কতটুকু ঋণী সে ব্যাপারে 'ইসলামিক অন লাইন'-এর একটি নিবন্ধে বলা হয়, '*While teaching at Dar-ul-Hikma, Al-Khwarizmi published his most popular book Al-Kitab Al-Jabr Wa'al Muqabala which was written in Arabic in 830. This book made him famous in the east and west. The influence of this book lasted for centuries. If we consider that Al-Kitab Al-Jabr Wa'al Muqabala was translated and published in London in 1831 and in New York in 1945, we can say that Al-Khwarizmi's work strongly influenced the west for a long time. His work became a base of the study of algebra in Renaissance. It is safe to say that big mathematicians such as Leonardo Fibonacci, Albert and Roger Bacon used Al-Khwarizmi's algorithms and solutions in their studies. This influnce clearly appears in Practica Geometria written by Leonardo Fibonacci.*'

অর্থাৎ 'দারুল হিকমাহয় শিক্ষকতা করার সময় ৮৩০ সালে আল-খাওয়ারিজমি আরবীতে তার অত্যন্ত জনপ্রিয় বই আল-কিতাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা রচনা করেন। বইটি তাকে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলে। বইটির প্রভাব কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়। আমরা যদি ধরে নিই যে, ১৮৩১ সালে লন্ডন এবং ১৯৪৫ সালে নিউইয়র্কে আল-কিতাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা অনুবাদ ও প্রকাশিত হয়েছিল তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আল-খাওয়ারিজমির কর্ম দীর্ঘসময় পাশ্চাত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রেনেসাঁ যুগে বীজগণিত গবেষণায় বইটি একটি ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়। একথা বলা নিরাপদ যে, লিওনার্দো ফিবোনাসি, আলবার্ট ও রজার ব্যাকনের মতো বড় বড় গণিতজ্ঞগণ তাদের গবেষণায় আল-খাওয়ারিজমির এলগোরিদম ব্যবহার করেছিলেন। লিওনার্দো ফিবোনাসির প্র্যাকটিকা জিওমেট্রিয়ায় এ প্রভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।'

গণিতজ্ঞ জি.সারটন খাওয়ারিজমির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, '*He was one of the greatest scientists of his race and the greatest of his time.*' অর্থাৎ '*তিনি ছিলেন তার জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং তার সময়ের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী।*'

সম্মান

ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) ১৯৭০ সালে এ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের অংশ হিসাবে

www.pathagar.com

চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। ৭ দশমিক ১ দ্রাঘিমাংশ এবং ১০৬ দশমিক ৪ অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৬৫ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। ইরানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা প্রতি বছর গবেষণা, উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের 'খাওয়ারিজম ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড' প্রদান করে থাকে।

অন্য রচনাবলী

বার্লিন, ইস্তাম্বুল, তাসখন্দ, কায়রো ও প্যারিসের লাইব্রেরিগুলোতে খাওয়ারিজমির কয়েকটি আরবী পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। সূর্যঘড়ির ওপর লেখা একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল লাইব্রেরির হেফাজতে। ঐতিহাসিক ইবনে আল-নাদিমের 'কিতাব আল-ফিরিস্তি'তে এ পাণ্ডুলিপির উল্লেখ রয়েছে। মক্কা শরীফের দিকনির্দেশনা সম্বলিত তার একটি কর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ বইটি হচ্ছে স্ফেরিক্যাল এস্ট্রোনমির ওপর খাওয়ারিজমির লেখা কয়েকটি বইয়ের একটি। 'মারিফাত সা'ত মাশরিক ফি কুল বালাদ' এবং 'মারিফাত আল-সামি মিন কিবাল আল-ইরতিফা' নামে আরো দু'টি বই পাওয়া গেছে। মারিফাত সা'ত মাশরিক ফি কুল বালাদ-এ সকালের দৈর্ঘ্য এবং মারিফাত আল-সামি মিন কিবাল আল-ইরতিফা'য় একটি উঁচু জায়গা থেকে দিগবলয় নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খাওয়ারিজমি এস্ট্রোল্যাব নির্মাণ ও ব্যবহারের ওপর অন্য দু'টি বই লিখেছিলেন। ফিরিস্তি'তে বই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো 'কিতাব আর রুখমাত' এবং আরেকটি হলো 'কিতাব আল-তারিখ'।

www.pathagar.com

পদার্থ বিজ্ঞানে শূন্যের অবস্থান নির্ণয়কারী আল-ফারাবি

পদার্থ বিজ্ঞানে শূন্যের অবস্থান নির্ণয়কারী আল-ফারাবি জাতিতে ছিলেন তুর্কি। ৮৭০ সালে তুর্কিস্তানের ফারাব শহরের কাছাকাছি আল-ওয়াসিজ গ্রামে তার জন্ম। বর্তমানে ফারাব শহরের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন। এ শহর আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকের জন্মস্থান। তৈমুর লং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এ শহরেই। ফারাব শহরের নামানুসারে আবু নাসির মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তারখান ইবনে আউজালাগ 'ফারাবি' নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আলফারাবিয়াস' (Alpharabius) নামে পরিচিত। ফারাবি ছিলেন তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। এছাড়া তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, সৃষ্টিতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ ও সমাজ বিজ্ঞানী। আল-ফারাবির পিতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও রাজনৈতিক কারণে তার পূর্বপুরুষ পারস্য ত্যাগ করে তুর্কিস্তানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুফির মতো তিনি জীবন যাপন করেছেন। ফারাবি আরবদের কাছে 'আল-মুয়াল্লিম আস-সানি' বা 'দ্বিতীয় এরিস্টোটল' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাকে ইসলামে নয়া প্লেটো মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সিরিয়া ও বাগদাদের নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের যেসব বই আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন ফারাবির ওপর সে সব বইয়ের প্রভাব পড়েছিল। দর্শনে তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল, প্লেটো, পরফাইরি ও ক্লডিয়াস টলেমিকে অনুসরণ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সময় বিজ্ঞান উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছিল এবং তার শিষ্য প্লেটো ও এরিস্টোটল বিজ্ঞানকে নতুন মাত্রায় বিকশিত করে তুলেছেন। তিনি ছিলেন ফারাবি মতবাদের জনক। তার মতবাদে ইবনে সিনা, ইয়াহিয়া ইবনে আলী, আবু সোলায়মান সিজিস্তানি, সোহরাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, ইবনে ইয়াহিয়া ও সদরুদ্দিন মোহাম্মদ শিরাজি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

জীবন ও শিক্ষা

আল-ফারাবি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। অজানাকে জানার এবং অজেয়কে জয় করার প্রবল আকাঙ্খা ছিল তার। তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন সারাটা জীবন। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ছুটে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে।

www.pathagar.com

তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় ফারাবে। এ সময় তিনি জীবিকার্জনের জন্য চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তিনি তার শিষ্য ইবনে সিনার মতো চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে বেছে নেননি। এক পর্যায়ে তিনি দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ফারাবে কয়েক বছর শিক্ষা লাভের পর চলে যান বুখারায়। বুখারায় তাকে কাজী পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান পিপাসা মেটাতে তিনি কাজী পদে ইস্তাফা দিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। এখানে তিনি খ্রিস্টান দার্শনিক আবু বিশর মাত্তা ইবনে ইউনূসের কাছে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। বাগদাদে আসার আগে ফারাবি আরবী জানতেন না। তবে তিনি তার মাতৃভাষা তুর্কিসহ ৮৯ টি ভাষা জানতেন। পরে আরবী ভাষা শিখে নেন। আরবী ভাষা শেখার পর তিনি গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করেন। বাগদাদে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। এসময় বাগদাদে একের পর এক ৬ জন খলিফার পরিবর্তন ঘটে। এখানে তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজক ইউহান্না বি. হাইলানের তত্ত্বাবধানে এরিস্টোটলের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বাগদাদে তিনি দর্শনের ওপর ৭০ খণ্ডের সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তারপর তিনি বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ আবু বকর ইবনে শিরাজের অধীনে আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। আরবী ব্যাকরণ শেখার পর ফারাবি কয়েকজন পণ্ডিতের দিকনির্দেশনায় গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

৯৩২ সালে খলিফা আল-মুকতাদিরের আমলে ইউহান্না পরলোকগমন করলেও ফারাবি একই বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ সেখানে বসবাস করেন। বাগদাদ ত্যাগ করে তিনি স্বল্পকাল তুর্কিস্তানে অবস্থান করছিলেন। এসময় তিনি স্থানীয় আমীর আলী সামানের নির্দেশে তার বিখ্যাত বই 'তালিম আস-সানি' রচনা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসাবে তার সুখ্যাতি আস্তে আস্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ফারাবির পদচারণা ছিল। কিন্তু তারপরও জ্ঞানের পিপাসা তার মেটেনি। জ্ঞানের অন্বেষণে ছুটে যান দামেস্ক। এখানে এসে তিনি বাগানে মালির কাজ নিয়েছিলেন। মক্কায় হজব্রত পালন করতে গিয়ে আলেপ্পোর (আধুনিক সিরিয়া) হামাদানী শাসক সাইফুদৌলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কিছুদিন তিনি দামেস্কে অবস্থান করেন। দামেস্কে অবস্থানকালে তিনি শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি যান মিসরে। এ ভ্রমণের সময় ফারাবি 'আসসিয়ামাতুল মাদানিয়া' (এডমিনিস্ট্রেশন অব দ্য সিটি) নামে একটি বই রচনা করেন। মিসরে অবস্থানকালে তিনি 'মাবাদে'র ৬টি খণ্ড শেষ করেন। আবার মিসর থেকে ফিরে আসেন সিরিয়ায়। ইরান, মিসর ও সিরিয়ায় দীর্ঘদিন অবস্থান করলেও তিনি তার তুর্কি পোশাক ও তুর্কি ডাক নাম পরিত্যাগ করেননি। তার তুর্কি ডাক নাম ছিল 'ফারাবি আত তুর্কি'।

www.pathagar.com

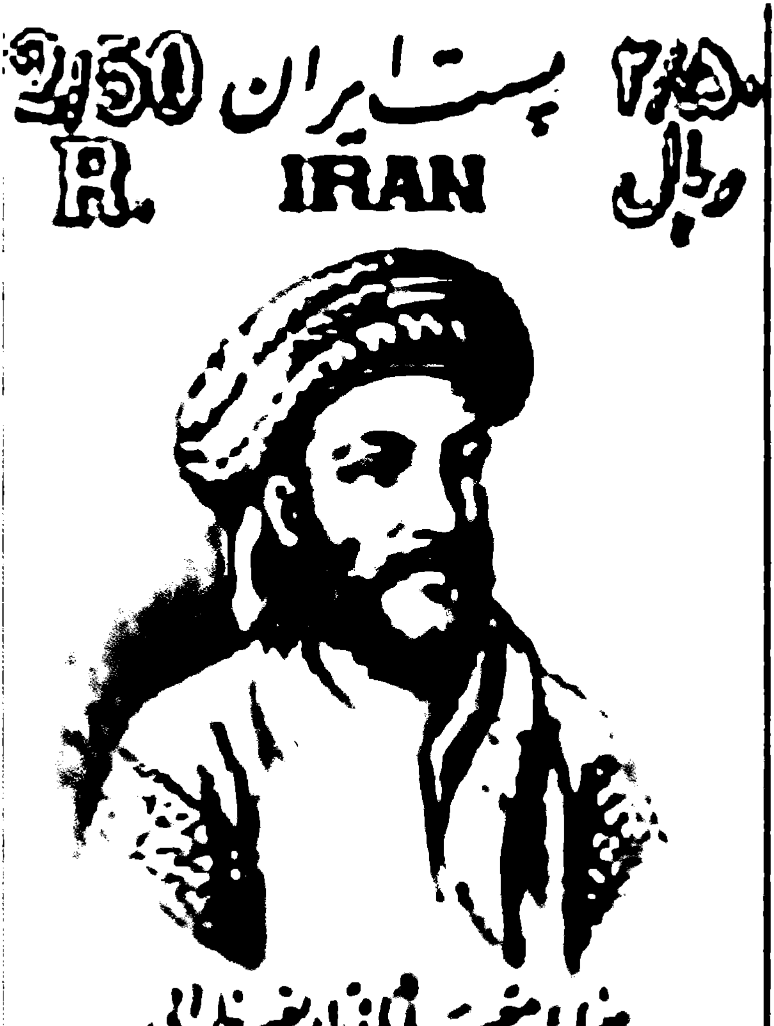

আল ফারাবি

www.pathagar.com

ফারাবি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে গবেষণা করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ছিল তার অসামান্য অবদান। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনে তার অবদান ছিল সর্বাধিক। দর্শনে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনিই শূন্যের অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। দার্শনিক হিসাবে ছিলেন নয়া প্লেটোবাদীদের পর্যায়ে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসাবে তিনি আরোহণ করেছিলেন জ্ঞানের শীর্ষে। ফারাবি এরিস্টোটলের অধিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা চালান এবং এ বিষয়ের ওপর নিজে একটি বই লিখেন। তিনি এরিস্টোটলের 'পোস্টারিয়র এনালিটিক্স', 'ক্যাটাগরিস' ও 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন' এবং গ্রীক দার্শনিক পরফাইরির 'আইসাগোগ' অধ্যয়ন করেন।

ফারাবি সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বহু বই লিখেছেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। এসব অমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর কয়েকটি হলো 'আল-মদিনা আল ফাদিলা' (দ্য আইডিয়াল সিটি), 'রিসালা ফিল আকল' (এপিসল অব ইন্টিলেক্ট), 'কিতাব আল-হুরফ' (দ্য বুক অব লেটার্স), 'কিতাব আল-ইহসা আল-উলুম' (দ্য বুক অব ইন্যুমারেশন অব দ্য সায়েন্সেস), 'কিতাব আল-মুসিকা আল-কবির' (দ্য গ্রেট বুক অব মিউজিক), 'মাবাদে', 'তানবিহ' ইত্যাদি। নয়া প্লেটোবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ ফারাবির 'আল-মদিনা আল ফাদিলা'কে প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। বইটি লিখতে গিয়ে তিনি প্লেটোর 'রিপাবলিক' ও 'দ্য লজ' থেকে প্রচুর তথ্য গ্রহণ করেন। ফারাবি প্রাথমিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা নিয়েও কয়েকটি বই লিখেছেন।

যুক্তিবিদ্যা

ফারাবি এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যার অনুসারী হলেও তার বেশ কয়েকটি বইয়ে এরিস্টোটলের দর্শন বিরোধী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ভবিষ্যতের ধারণা, সংখ্যা এবং মানদণ্ডের সম্পর্ক, যুক্তিবিদ্যা ও ব্যাকরণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নন-এরিস্টোটলীয় সিদ্ধান্তের ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফারাবি যুক্তিবিদ্যাকে দু'টি গ্রুপে বিভক্ত করেন। প্রথমটি ছিল ধারণা এবং দ্বিতীয়টি ছিল প্রমাণ। আল-ফারাবি শর্তসাপেক্ষ উপসংহার (কন্ডিশনাল সিলোগিজম) এবং আনুমানিক সিদ্ধান্তের (এনালজিক্যাল ইনফারেন্স) তত্ত্ব নিয়েও গবেষণা চালান। এরিস্টোটলের 'পোয়েটিক্স'-এর একটি ভাষ্যে তিনি পোয়েটিক সিলোগিজমের ধারণা চালু করেন।

সঙ্গীত ও সমাজ বিজ্ঞান

সিরিয়ার হামাদানী শাসক সাইফুদৌলা ফারাবিকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। একবার মুসাফিরের বেশে তিনি তার শাহী দরবারে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে বাদশাহ ফারাবির নাম শুনেছিলেন। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাননি। ফারাবিকে কাছে পেয়ে বাদশাহ খুব খুশি হন এবং তার সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় তার জ্ঞান ও

www.pathagar.com

গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে খুব সম্মান দেখান। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাকে রাজদরবারে উঁচু মর্যাদায় নিয়োগ দান করেন। এত বড় পদমর্যাদায় নিযুক্তি পেয়েও ফারাবি তার কাছে মাসে মাত্র চার দিরহাম এবং একটি নির্জন কক্ষ দাবি করেন। বাদশাহ তার জন্য একটি নিভৃত কক্ষ মঞ্জুর করেন। ফারাবি এ নির্জন কক্ষে জ্ঞান সাধনা করতেন।

তিনি বাদশাহর সঙ্গী হিসাবে এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। সঙ্গীতে ফারাবির প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটার একটি মজার ঘটনা আছে। বাদশাহ সাইফুদৌলা আলী ইবনে হামাদান তার গুণে মোহিত হয়ে তাকে সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন। ফারাবি নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে অচিরে বাদশাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। বাদশাহ সাইফুদৌলা একদিন তাকে ডেকে পাঠান। তিনি নিজের তুর্কি পোশাকে বাদশাহর দরবারে হাজির হন। বাদশাহ তাকে বসতে বললে তিনি জানতে চান, *'আমি কোথায় বসবো, আপনি যেখানে আছেন সেখানে নাকি আমি যেখানে আছি সেখানে।'* জবাবে বাদশাহ বললেন, *'আপনি যেখানে।'* ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি অনুযায়ী ফারাবি ধরে নিলেন বাদশাহ যেখানে বসে আছেন সেখানেই তাকে বসতে হবে। তিনি সামনে উপবিষ্ট লোকদের মাড়িয়ে বাদশাহর কাছে গিয়ে বসেন। বাদশাহ তার অভদ্র আচরণে চরম অসন্তুষ্ট হন। বাদশাহর একটি নিয়ম ছিল। অন্য কেউ যাতে তার কথা বুঝতে না পারে সেজন্য তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে অজ্ঞাত ভাষায় গোপনীয় কথাবার্তা বলতেন। তিনি মামলুক সভাসদদের বললেন, *'এই লোকটি আদব কায়দা জানে না। আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো। জবাব দিতে না পারলে তোমরা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে।'* বাদশাহর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফারাবি সেই অজ্ঞাত ভাষায় বললেন,*'আমীর সাহেব, মনে রাখবেন, সব সময় কাজ অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়।'* বাদশাহ বিস্মিত হয়ে বললেন, *'কি রকম? আপনি কি এ ভাষা জানেন?'* জবাবে ফারাবি বললেন, *'নিশ্চয়ই। আমি প্রায় ৮৯টি ভাষা জানি।'* সভা শেষে বাদশাহ তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। পান ভোজন করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি গান শুনতে রাজি কিনা জানতে চান বাদশাহ। ফরাবি তৎক্ষণাৎ সায় দেন। বাদশাহ সঙ্গীতজ্ঞদের ডেকে ফারাবিকে গান শোনাতে বলেন। ফারাবি গান শুনতে শুনতে সব গায়কের ভুল ত্রুটি ধরতে থাকেন। বিস্মিত হয়ে বাদশাহ জানতে চান, *'আপনি গান জানেন নাকি?'* ফারাবি উত্তর দেন, *'নিশ্চয়ই।'* জবাব দিয়ে তিনি তার কোমরবন্দ থেকে একটি বাদ্যযন্ত্র বের করে গান আরম্ভ করেন। তার গানের মূর্ছনায় প্রথমে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে। পরবর্তী গানে তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। শেষ গানে তারা সবাই ঘুমিয়ে যায়। এ ফাঁকে ফারাবি দরবার ত্যাগ করেন।

সঙ্গীতের ওপর ফারাবির প্রভাব ছিল এমনি। সঙ্গীতে তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'কিতাব আল-মুসিকা' (The Book of Music)। ঐতিহাসিক সৈয়দ হোসেন নাসির ও মেহেদী আমিন রিজভীর মতে, *'আরবী বই হিসাবে পাশ্চাত্যে পরিচিত হলেও কিতাব আল-মুসিকা মূলত ফারাবির সময়কার পারস্য সঙ্গীতের একটি তাত্ত্বিক*

www.pathagar.com

গবেষণা।' এছাড়া তিনি 'ফিল ইকা' (Melody), 'আল-নুকলাব ইলাল-ইকা' (Transition to Melody) এবং 'কালাম ফিল ইকা-মুখতাছার' (A Short discourse on Melody) শিরোনামে আরো কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তবে বইগুলো হারিয়ে গেছে। ফারাবি 'কানুন' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতের দার্শনিক নীতি, তার মহাজাগতিক আবেদন এবং প্রভাব উপস্থাপন করেছেন। তার 'মিনিংস অব দি ইন্টিলেক্ট'-এ সঙ্গীত থেরাপি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে আত্মার ওপর সঙ্গীতের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব স্থান পেয়েছে। 'অন দ্য কজ অব ড্রীমস' হলো তার স্বপ্ন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি তার জনপ্রিয় গ্রন্থ 'আল-মদিনা আল ফাদিলা' বা 'দি আইডিয়াল সিটি'র ২৪তম অধ্যায়। এ প্রবন্ধে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি এবং স্বপ্নের কারণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

দর্শন

আল-ফারাবি এরিস্টোটলের 'রিটরিক' (Rhetoric) ২ শ' বার এবং 'ফিজিক্স' (Physics) ৪০ বার পাঠ করে নিজস্ব মতবাদ প্রচারে অগ্রসর হন। তিনি তার দর্শন প্রচারে এরিস্টোটলবাদীদের ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং বিশ্ব সৃষ্টি, আত্মার অবিনশ্বরতা, পারলৌকিক জীবনে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের মতো বিষয়গুলোতে এরিস্টোটল ও প্লেটোর মধ্যে মৌলিক ঐক্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। দার্শনিক হিসাবে ফারাবি ছিলেন ফারাবিবাদ বা আল-ফারাবিবাদ হিসাবে পরিচিত প্রাথমিক ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে ইবনে সিনার প্রভাবে তার দর্শন ম্লান হয়ে যায়। আল-ফারাবি প্লেটো ও এরিস্টোটলের প্রভাবমুক্ত দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিবিদ্যার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তার এ উদ্যোগ আধুনিক দর্শনের পথ সুগম করে। দর্শনে তিনি তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনকে সম্পৃক্ত করেন। রাজনৈতিক দর্শনে তিনি তত্ত্ব থেকে অনুশীলনকে মুক্ত করেন। তার নিউপ্লেটোনিক তত্ত্ব ছিল অধিবিদ্যার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। ফার্স্ট কজ বা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করেন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান ও দর্শনে আল-ফারাবির প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। জ্ঞানে তার মর্যাদা এরিস্টোটলের কাছাকাছি হওয়ায় তার সময়ে তাকে 'দ্বিতীয় শিক্ষক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। দর্শনের সঙ্গে সুফিবাদের সংমিশ্রণ ঘটানোর লক্ষ্যে তার চিন্তাধারা ইবনে সিনার গবেষণার পথ প্রশস্ত করে। ফারাবি এরিস্টোটলের লেখা বইয়ের একটি ভাষ্য লিখেছেন। 'আল-মদিনা আল-ফাদিলা' হলো তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে যে ধরনের আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ফারাবি আল-মদিনা আল ফাদিলা'য় অনুরূপ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন। তিনি ধর্মকে সত্যের একটি বিমূর্ত প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং প্লেটোর মতো বিশ্বাস করতেন, দার্শনিকদের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রকে দিকনির্দেশনা দেয়া। প্লেটো দার্শনিক রাজার শাসনে বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে ফারাবি নবী অথবা ইমামদের আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে কল্পনা করেছেন। আল-ফারাবি মদিনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

প্রতীক হিসাবে গণ্য করতেন। মদিনাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)। তিনিই ছিলেন এ শিশু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বনবীর (সা.) সরাসরি যোগাযোগ ছিল এবং তার কাছে আল্লাহর বাণী বা অহী আসতো।

আল-ফারাবির দার্শনিক মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড আর. টার্নার তার 'সায়েন্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম' শিরোনামে গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Known as the `second teacher' (after Aristotle), Abu Nasr al-Farabi, a Turk who died in the tenth century, was particularly interested in reconciling Aristotelian and Platonic idea. He found areas of accord between classical Hellenistic philosophy and prophecy. Accepting the validity of both Qur'an and the philosophy of Plato and Aristotle, he reasoned that both must agree and he worked to clarify reconciliation. His work Al-Madina al-Fadila (The good city) set forth ways of gaining happiness through politics and showed the relation between Plato's ideal community and Islam's divine law.'*

অর্থাৎ *'দ্বিতীয় শিক্ষক (এরিস্টোটলের পরে) হিসাবে পরিচিত তুর্কি আবু নাসের আল-ফারাবি যিনি দশম শতাব্দীতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি এরিস্টোটল ও প্লেটোর দর্শনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রাচীন হেলেনীয় দর্শন ও নবুয়তের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। কোরআন এবং প্লেটো ও এরিস্টোটলের দর্শন উভয়ের যথার্থতা মেনে নিয়ে তিনি যুক্তি দেন যে, উভয়কে অবশ্যই ঐক্য স্থাপনে সম্মত হবে এবং তিনি উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাখ্যা দানে কাজ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থ আল-মদিনা আল-ফাদিলা'য় (আদর্শ নগর রাষ্ট্র) রাজনীতির মধ্য দিয়ে চিরন্তন সুখ অর্জনের উপায়গুলো নির্দেশ করেছেন এবং প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ও ইসলামের ঐশী আইনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।'*

ফারাবি তার রাষ্ট্রকে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও ধর্মের একটি সমাহার মনে করতেন। তিনি তার এ ধরনের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা সরকারকে ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দেন। ফারাবি মনে করতেন, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো ব্যক্তি পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। তিনি লিখেছেন, একে অন্যের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা অথবা তার কাজে অন্য আরেকজনের এগিয়ে আসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। উপসংহারে তিনি বলেছেন, পূর্ণতা অর্জনে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন অন্যদের কাছাকাছি অবস্থান করা এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা। ফারাবি এরিস্টোটলের পদার্থ বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার ওপর কয়েকটি ভাষ্য লিখেছিলেন। 'কিতাব আল-ইহসা আল-উলুম'-এ তিনি তার সময়ের দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি ও রাজনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বিশ্বের সব দার্শনিকের ওপর বইটি গভীর প্রভাব ফেলে। 'কিতাব আল-ইহসা আল-উলুম' হলো ফারাবির সবচেয়ে বিখ্যাত বই। তার আরেকটি বই 'ফুসুজ আল-হিকমা' ইউরোপে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পাঠ্যবই হিসাবে চালু ছিল।

কেউ কেউ ফারাবিকে জ্যাঁ জ্যাক রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট'-এর উদগাতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কেউ বা জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের ভাবগুরু হিসাবে তাকে

www.pathagar.com

গণ্য করেন। একবিংশ শতাব্দী থেকে এক হাজার বছর আগে তিনিই প্রথম একটি সরকারের অধীনে সারা পৃথিবী শাসনের ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। ফারাবি আজীবন সত্যের অন্বেষণ করতেন এবং তিনি তার উন্নত দর্শন ও সূফিবাদের মধ্য দিয়ে তা খুঁজে পেয়েছিলেন। তার দর্শনের ভিত্তিতে 'ইখওয়ানুস-সাফা' নামে পরিচিত দার্শনিক্দের একটি গ্রুপ এবং ইবনে সিনা, নাসিরুদ্দিন তুসি, আস-সুলামি ও ইমাম আল-গাজ্জালির মতো পণ্ডিতগণ ইসলামে তাসাউফ বা সুফিবাদের উত্থান ঘটান।

ইসলামের আলোকে দর্শন চর্চা করতে গিয়ে ফারাবি অহী, তাসবীহ, রিসালাত, বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসি, তাকদির, তাকলিদ প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। এজন্য তাকে ইসলামী দর্শনের জনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তার মতে, নবুয়ত হলো সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সাফল্য। তবে নবুয়ত কোনো জন্মগত অধিকার নয়। অতএব দর্শনের স্থান নবুয়তের ওপরে। নবুয়ত সম্পর্কে বিতর্কিত মতামত দেয়ায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তামিয়াসহ অসংখ্য আলেম তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইমাম তামিয়া দর্শন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করে একটি ফতোয়া জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞান

একসময় ধারণা করা হতো আকাশ বা ভূমণ্ডলে শূন্যতা বা শূন্যস্থান রয়েছে। ফারাবি পদার্থ বিজ্ঞানে এ শূন্যতার অস্তিত্বের প্রকৃতি নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা চালান। থার্মোডায়ানামিক্সে তিনি শূন্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এ ক্ষেত্রে তিনি পানিতে হস্তচালিত পাম্প ব্যবহার করেন। ফারাবি প্রমাণ করেন, প্রচুর বায়ু প্রাপ্ত শূন্যস্থান পূরণে প্রসারিত হয় এবং পরিপূর্ণ শূন্যতার ধারণা অবাস্তব। তবে আধুনিককালে বাল্বের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুজগতে শূন্যতা বা শূন্যস্থান থাকতে পারে। ফারাবি তার 'কিতাব আল-ইহসা আল-উলুম'-এ মেকানিক্সের মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ওজন বিজ্ঞান ও মেকানিক্স বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরে বলেন, এ দু'টি হলো গাণিতিক বিজ্ঞানের দু'টি শাখা। বইটি ক্রিমোনার গেরার্ড 'সায়েন্সশিয়া দ্য পোন্দারিবাস' (Scientia de Ponderibus) শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। 'কিতাব ফিল-কারাসতান' হলো ফারাবির পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক আরেকটি বই। এ বইটির চারটি কপি সংরক্ষিত। তিনটি কপি পূর্ণাঙ্গ। দু'টি কপি সংরক্ষিত লন্ডন ও বৈরুতে। তৃতীয় কপিটি সংরক্ষিত ছিল বার্লিনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কপিটি নিখোঁজ হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে পোল্যান্ডের ক্রাকোউতে এ কপি পাওয়া যায়। ইতালীর ফ্লোরেন্সের লরেন্টিয়ানা লাইব্রেরিতে 'কারাসতান'-এর চতুর্থ কপি সংরক্ষিত। বইটি ক্রিমোনার গেরার্ড 'লাইবার কারাসতনিস' (Liber Karastonis) শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ডোমিনিকাস গান্ডিসলিকাস অনুবাদ করেছিলেন 'দ্য সায়েনটিস' (De Scientiis) শিরোনামে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বইটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.pathagar.com

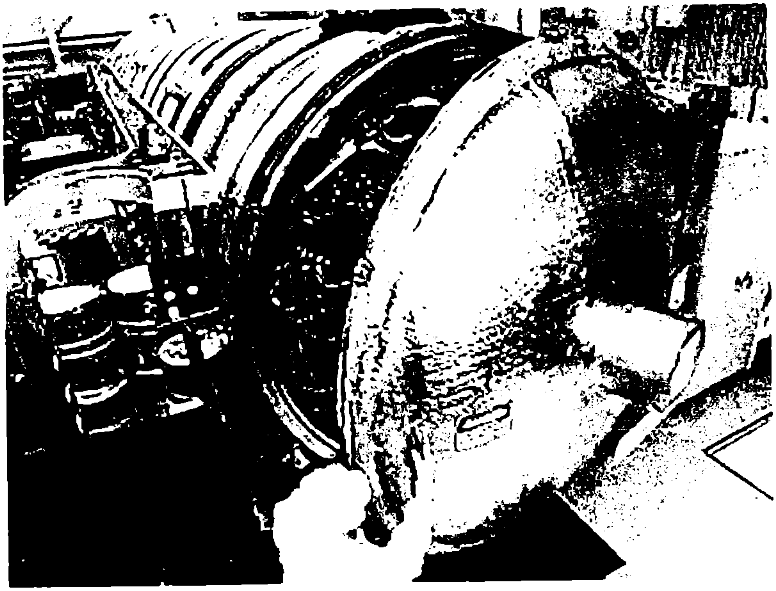

আল-ফারাবি আবিষ্কৃত ভ্যাকুয়াম চেম্বার

রসায়ন

আল-ফারাবি 'দ্য নেসেসিটি অব দি আর্ট অব দি এলিক্সার'-এ তার রসায়নিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। বইটিতে তিনি ওয়াইন বা এলকোহলের পাতনের সঙ্গে সালফার মিশ্রণের বর্ণনা দিয়েছেন।

দার্শনিক মতবাদ

আলেক্সান্দ্রিয়ার নয়া এরিস্টোটলীয় মতবাদ আল-ফারাবির দর্শনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মুসলিম সমাজে 'পেরিপাটেটিক্স'র (গ্রীক দার্শনিক মতবাদ) এবং যুক্তিবাদের একজন সমর্থক হিসাবে স্বীকৃত। তবে তিনি 'দ্য গ্যাথারিং অব দি আইডিয়াস অব দ্য টু ফিলসোফার্স'-এ প্লেটো ও এরিস্টোটলের আদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক রবার্ট এডামসনের মতে, আলেক্সান্দ্রীয়

www.pathagar.com

দার্শনিক মতবাদের পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফারাবির প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। তার খ্রিস্টান শিক্ষক ইউহান্না বিন হাইলান ছিলেন আলেক্সান্দ্রীয় দর্শনের অনুসারী। এডামসন আরো বলেছেন, ফারাবি কখনো আল-কিন্দি অথবা তার সমসাময়িক আবু বকর আল-রাজির কোনো কথা উল্লেখ করেননি। তাতে মনে হয়, তিনি তাদের দর্শনকে নির্ভুল অথবা স্থায়ী হিসাবে বিবেচনা করতে পারেননি।

অধিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

ফারাবি মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের একটি মৌলিক পার্থক্য টানার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু মেটাফিজিক্সের কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। বাস্তবতা বিশেষ করে অস্তিত্ববাদ হচ্ছে এ শাস্ত্রের আলোচনার ক্ষেত্র। তবে মেটাফিজিক্স ঐসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে যেগুলো বস্তু থেকে পৃথক। ফারাবি দু'টি ভাবগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথম অবস্তুগত সত্তা হলো আল্লাহ ও মানুষের মন। দ্বিতীয় অবস্তুগত সত্তা হলো দুর্ঘটনা, কার্যকারণ, গুণ ও সন্তুষ্টি। তিনি বলেছেন, সত্তার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। দৃশ্যমান সবকিছুই কোনো না কোনো কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনর্থক কোনো কিছু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। ফারাবি তার দর্শনকে গতি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন। গতি থেকে রূপান্তর ঘটে। আল-কিন্দি অধিবিদ্যাকে আল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে বিবেচনা করলেও ফারাবি এ শাস্ত্রকে আত্মজিজ্ঞাসা বা নিজের পরিচয় জানার এবং নিজেকে একটি সৃষ্টি হিসাবে মেনে নেয়ার একটি বিষয় বলে মনে করতেন। তার মতে, অধিবিদ্যার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে তা শুধু তাকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া পর্যন্ত।

তৎকালীন সময়ে গ্রীক দর্শন সম্পর্কে আল-কিন্দির দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে ভুল ধারণার জন্ম দেয়। এজন্য ইবনে সিনা মন্তব্য করেছিলেন, আল-ফারাবির একটি প্রবন্ধ পাঠ করা নাগাদ তিনি এরিস্টোটলের অধিবিদ্যা যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি। ফারাবির দর্শন তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো (১) কার্যকারণ সম্পর্কে এরিস্টোটলীয় অধিবিদ্যা (২) অতি উচ্চমার্গের প্লোটোনিয়ান এমান্যাশনাল কসমোলজি এবং (৩) টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান। ফারাবির দার্শনিক মডেলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একগুচ্ছ এককেন্দ্রিক সার্কেল, উর্ধ্বমণ্ডল বা ফার্স্ট হেভেন, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র ও বুধের মতো স্থির গ্রহ এবং সবশেষে চাঁদের একটি সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব এককেন্দ্রিক সার্কেলের কেন্দ্রে রয়েছে সাব লিউনার মণ্ডল। এ মণ্ডল বস্তুগত পৃথিবী নিয়ে গঠিত। এসব সার্কেলের প্রতিটি তাদের নিজ নিজ দ্বিতীয় ইন্টেলিজেন্সের মণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি স্রষ্টা বা আল্লাহকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। আল্লাহকে তিনি ফার্স্ট কজ (First cause) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সার্কেলগুলো ফার্স্ট কজ বা আল্লাহ ও ভূমণ্ডলে কার্যকারণ মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করে। আল্লাহর হুকুমে এসব সার্কেল সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন

www.pathagar.com

তাদের আনুষ্ঠানিক ও কার্যকর কারণ। ফারাবির এই মতবাদ এরিস্টোটলের মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরিস্টোটল দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। ফারাবি তার ধারণাকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে রূপান্তরিত করেন। তিনি তার দার্শনিক মডেলকে ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে আরো সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলেন। 'ফার্স্ট কজ' বা প্রথম কার্যকারণ থেকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফার্স্ট কজের কর্মকাণ্ড হচ্ছে স্বপ্রণোদিত। এই সচেতন সত্তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে নিজের ভূমিকা নির্ধারণ করেছে। ফার্স্ট কজের ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটে এবং তা থেকে 'সেকেন্ড বিইং' (Second Being) বা 'ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট' (প্রথম আকল) অস্তিত্ব লাভ করে। ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং এ প্রক্রিয়ায় 'থার্ড বিইং' (Third Being) বা 'সেকেন্ড ইন্টিলেক্টে'-এর (Second Intellect) জন্ম হয়। ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং তার পরিণামে 'আল-সামা আল-উলা' বা ফার্স্ট হেভেন বা প্রথম আকাশের জন্ম হয়। একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী আকাশগুলোর জন্ম হয়। টেন্থ ইন্টিলেক্টে (আশায়ার-ই-মুদাব্বির) পৌঁছানো নাগাদ এ ধারা অব্যাহত থাকে। এই টেন্থ ইন্টিলেক্টের নিচে অবস্থান করছে পৃথিবী। ফার্স্ট কজ থেকে মোট ১০টি ইন্টিলেক্ট অস্তিত্ব লাভ করেছে।

অনুসন্ধিৎসা ও শেষবিচার

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আল-ফারাবির চিন্তাধারায় মানুষের স্থান ছিল বিচিত্র। কেননা মানুষের সত্তা দু'টি স্তরে বিভক্ত। একটি হচ্ছে উচ্চমার্গের অপার্থিব স্তর এবং আরেকটি হচ্ছে ভোগ বিলাসিতায় পূর্ণ পার্থিব স্তর। মানুষের জৈবিক চাহিদা থাকায় সে স্বাভাবিকভাবে ভোগ বিলাসিতায় পূর্ণ পার্থিব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। তারপরও তাদের মধ্যে যুক্তিবোধ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ যুক্তিবোধ মানুষকে উচ্চমার্গের সন্ধান দেয়। পূর্ণতা লাভের প্রতি ধাবিত করে। ফারাবির মতে, মানুষের দু'টি স্তরই পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে। তিনি মানুষের আক্কেল বা সচেতনতাবোধকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো পটেনশিয়াল, একচুয়াল, একয়ার্ড ও এজেন্ট। ফারাবির মহাবিশ্বের প্রথম তিনটি স্তর হচ্ছে মানুষের সচেতনতা বা বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন অবস্থা এবং চতুর্থটি হচ্ছে টেন্থ ইন্টিলেক্ট বা আলোকিত সত্তা। পটেনশিয়াল ইন্টিলেক্ট হলো মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত এবং একচুয়াল ইন্টিলেক্ট মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। ফারাবির মতে, মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ভালো অথবা মন্দ দু'ধরনের কাজ করতে পারে। আল-ফারাবি বুঝাতে চেয়েছেন, চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়ায় মানুষ নিজের জন্য ভালো অথবা মন্দ এ দু'টির যে কোনো একটি বেছে নিতে পারে। সূর্য যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে তেমনি এজেন্ট ইন্টিলেক্ট বা পরম জ্ঞান আমাদের চিন্তা জগৎকে আলোকিত করে।

বিষয়টি যান্ত্রিক মনে হলেও কর্ম নির্ধারণে মানুষের নিজের স্বাধীনতা রয়েছে। রাইসম্যান বলেছেন, আল-ফারাবি মানুষের কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ নিজেকে সৎ পথে নাকি অসৎ পথে পরিচালিত করবে সে সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

গ্রহণের স্বাধীনতা তার রয়েছে। এভাবে সে শান্তি অথবা অশান্তির পথে নিজেকে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী কোনো মানুষ পরিচালিত হলে পূর্ণতা অর্জন করবে এবং সে মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। পরকালে সে অনন্ত জীবন লাভ করবে। ফারাবির মতে, পরলোক সাধারণত ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিগত ধারণার মতো নয়। শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জাগতিক সত্তার অবসান ঘটে। কেবলমাত্র মানুষের নৈতিক গুণাবলী অবশিষ্ট থাকে। প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী স্টাডিজের অধ্যাপক হেনরি করবিন পরলোক সম্পর্কে আল-ফারাবির দর্শনকে ইসমাঈলীয় নিউপ্লেটোনিস্টদের বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সাইকোলজি, আত্মা ও আধ্যাত্ম জ্ঞান

মানুষের আত্মা সম্পর্কে আল ফারাবি এরিস্টোটলীয় ধারণাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, চারটি গুণের সমন্বয়ে আত্মা গঠিত। সেগুলো হলো ক্ষুধা (যে কোনো কিছু লাভ করার আগ্রহ অথবা যে কোনো বস্তুর প্রতি অনাগ্রহ), স্পর্শকাতরতা (দৈহিক সত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা), কল্পনাশক্তি (এমন একটি গুণ যা দৃশ্যমান বস্তুর চিত্র ধারণ করতে পারে) এবং যুক্তিবোধ (এটি হচ্ছে ইন্টিলেকশনের একটি ফ্যাকাল্টি)। যুক্তিবোধ হচ্ছে মানব জাতির একটি অসাধারণ ও সর্বোচ্চ গুণ। এই যুক্তিবোধই মানুষকে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পৃথক করছে। শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার একমাত্র এ অংশই জীবিত থাকে।

অবমূল্যায়ন

আল-ফারাবিকে ইসলামের পাঁচ অথবা ছয় জন মহান দার্শনিকের অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হলেও বিজ্ঞান ও দর্শনে তার অবদানের পরিধি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তার লেখালেখি শুধু মুসলমান নয়, মধ্যযুগে ইহুদী চিন্তাধারায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিকরা মানব জাতির কল্যাণে ফারাবির অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই ইতিহাস তার কাছে অপরাধী। অধ্যাপক জর্জ সারটন তার 'ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এর ৬২৯ পৃষ্ঠায় ফারাবির প্রতি ইতিহাসের এ অবিচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, *'A study of Al-Farabi from our special point of view is much needed. I was unable to state more specifically his contribution to science, to the philosophy of mathematics for example, because of the lack of preparatory investigaton.'*

অর্থাৎ 'আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আল-ফারাবিকে নিয়ে একটি গবেষণা চালানো অত্যন্ত জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, প্রস্তুতিমূলক অনুসন্ধানের ঘাটতি থাকায় আমি বিজ্ঞান ও গাণিতিক দর্শনে তার অবদান বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারিনি।'

www.pathagar.com

রচনাবলী

আল-ফারাবিকে আরবীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসাবে আখায়িত করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর তার ৫টি মৌলিক বই এখনো বিদ্যমান। সেগুলো হলো:

(১) সিয়াসাতুল মাদানিয়া

(২) আরাওয়াল আহলিল

(৩) মাদিনাতুল ফাদিলা

(৪) জাওয়ামি আস-সিয়াসাতা

(৫) ইজতিমা মাদানিয়া

মৃত্যু

৯৫০ সালে বাদশাহ সাইফুদৌলা দামেস্ক অভিযাত্রা করেন। ফারাবিকে তিনি অভিযানে সঙ্গী হিসাবে নেন। ৮০ বছরের বৃদ্ধ ফারাবি দীর্ঘ পথযাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। দামেস্কে পৌছার পরই ১২ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাদশাহ সাইফুদৌলা তার নামাজে জানাযায় শরীক হন। দামেস্কের উপকণ্ঠে বাব আস-সগীরে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্ব নবীর (সা.) সাহাবী হযরত আমির মুয়াবিয়ার (রা:) পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। প্রতিদিন সর্বস্তরের মানুষ তার মাজার জিয়ারত করতে ছুটে আসে। ফারাবি হাজার বছর আগে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তার বাণী আজো অমর হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছেন, *'ফল যেমন একটি গাছের সফলতার প্রমাণ বহন করে তেমনি প্রকৃত শান্তি অন্বেষণ করার মধ্যে নৈতিক সাফল্য নিহিত এবং পরিপূর্ণ ও খাঁটি শান্তি হলো মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।'*

www.pathagar.com

আলোক বিজ্ঞানের জনক ইবনে আল-হাইছাম

আলোক বিজ্ঞানের জনক আবু আলী আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-হাইছাম হলেন একজন পার্সী মুসলিম বিজ্ঞানী। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আলহাচেন' (Alhacen) নামে পরিচিত। আল-হাইছাম আলোক বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, এনাটমি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, গণিত, চিকিৎসা, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও চক্ষু বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বীজগণিতকে জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেন এবং এনালিটিক্যাল জ্যামিতি হিসাবে পরিচিত গণিতের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাকে কখনো কখনো 'আল-বাসরি' নামে সম্বোধন করা হয়। তার ডাক নাম ছিল 'দ্বিতীয় টলেমি' (Second Ptolemy)। মধ্যযুগে সংক্ষেপে তাকে 'পদার্থ বিজ্ঞানী' হিসাবেও ডাকা হতো। আল-হাইছাম প্রথমে ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতেন। শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসনে ব্যর্থ হয়ে তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল, আর্কিমিডিস, গণিতবিদ ইউক্লিড ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমির গবেষণার ওপর মূল্যবান ভাষ্য রচনা করেছেন। হাইছাম ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' (Elements) এবং টলেমির 'আলমাগেস্ট' (Almagest)-এর আরবী অনুবাদ করেন। তিনি প্রতিটি ধারণাকে পদার্থ বিজ্ঞান অথবা গাণিতিক প্রমাণ দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করতেন।

আল-হাইছাম আনুমানিক ৯৬৫ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। বসরা ছিল তখন বুয়েদীয় পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ। সে সময় বসরা ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। তিনি বসরা ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। বুয়েদীয় ইরানে অবস্থান করার সময় তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেন এবং বহু ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক বই পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

আল-হাইছাম মিসরের রাজধানী কায়রোতেও বসবাস করতেন। ৭৬.বছর বয়সে ইসলামের স্বর্ণযুগে তিনি কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ ফেরান এবং পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন। তিনি গাণিতিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের ব্যাপারে অতিরিক্ত আশাবাদী ছিলেন। ইবনে হাইছাম বিশ্বাস করতেন, তিনি নীল নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবেন। তিনি নীল নদের পানি নিয়ন্ত্রণে আসোয়ানের কাছে তিন স্তরবিশিষ্ট একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনা তিনি মিসরের ষষ্ঠ ফাতেমীয় শাসক আল-হাকিম বি. আমরের কাছে পাঠান। আল-হাকিম বসরায় একজন দূত পাঠিয়ে তাকে কায়রো তলব করেন। আল-হাইছাম

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ রাজকীয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কয়েকদিন কায়রো অবস্থান শেষে তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে নীল নদের পরিস্থিতি দেখার জন্য পাঠানো হয়। তিনি কায়রো থেকে ৪০০ মাইল দক্ষিণে আসোয়ানে যান। সাইট পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন যে, এ কাজ তার পক্ষে অসম্ভব। আল-হাইছাম পিরামিডের প্রাচীন প্রকৌশল ও জ্যামিতিক দক্ষতায় বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন, *'প্রাচীন মিসরীয়দের উচিত ছিল পিরামিড তৈরি করার আগে নীল নদে বাঁধ দেয়া।'* কায়রো ফিরে এসে তিনি বাঁধ নির্মাণে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। আল-হাকিম তাকে রাজস্ব আদায়ের একটি চাকরি দেন। কিন্তু তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অবসর গ্রহণ করেন। প্রাণনাশের আশংকা দেখা দেয়ায় তিনি উন্মাদের ভান করেন। তাকে গৃহবন্দি করা হয়। গৃহবন্দি অবস্থায় আমৃত্যু তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১০১১ থেকে ১০২১ সাল পর্যন্ত আল-হাকিমের মৃত্যু নাগাদ তিনি গৃহবন্দি ছিলেন। এসময় তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'বুক অব অপটিক্স' রচনা করেন। কোনো কোনো সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, আল-হাইছাম সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে তিনি বাগদাদে যান। আরো দাবি করা হচ্ছে, তিনি উন্মাদের ভান করা অবস্থায় বসরায় ছিলেন। তবে একথা নিশ্চিত যে, তিনি সর্বশেষ ১০৩৮ সাল নাগাদ মিসরে অবস্থান করছিলেন। কায়রোতে অবস্থানকালে তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং দার উল ইলম নামে পরিচিত এ নগরীর একটি লাইব্রেরিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। গৃহবন্দিত্ব শেষ হলে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও গণিতের ওপর বেশ কয়েকটি বই রচনা করেন। কোনো একসময় তিনি মুসলিম স্পেনও ভ্রমণ করেন। এসময় তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রচুর সময় পান। তার ছাত্রদের মধ্যে দু'জন হলেন বিখ্যাত। একজন হলেন সোহরাব এবং আরেকজন হলেন আবু আল-ওয়াফা মুবাশ্বির ইবনে ফাতেক। মিসরীয় মুবাশ্বির তার কাছে গণিত শিক্ষা লাভ করেন। সোহরাব ছিলেন সিরিয়ার একজন অভিজাত ব্যক্তি। সোহরাব তার কাছে শিক্ষা লাভ করতে চাইলে তিনি সম্মত হন। তবে তিনি ১০০ দিনার মাসিক বেতন দাবি করেন। বেতনের পরিমাণ বেশি হলেও সোহরাব রাজি হন। তিন বছরের অধিক সময় ইবনে হাইছামের কাছে অধ্যয়ন শেষে সোহরাব তার কাছে বিদায় চান। হাইছাম তাকে সামান্য অপেক্ষা করতে বলেন। বিদায় জানানোর আগে তার হাতে ৩৬০০ দিনার ফেরত দিয়ে বললেন, *'এ অর্থ তোমার। আমি তোমার আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য মাসিক বেতন দাবি করেছিলাম।'*

আলোক বিজ্ঞানের ওপর ইবনে হাইছামের কর্ম এ ক্ষেত্রে গবেষণায় নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। সাধারণভাবে পদার্থ বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে আলোক বিজ্ঞানে তার অবদানকে বিরাট সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং তত্ত্বগত ও বাস্তবে আলোক বিজ্ঞানে তার গবেষণা একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। আল-হাইছাম আলোক বিজ্ঞানের গবেষণায় কাঁচ ব্যবহার করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'এঙ্গেল অব ইনসিডেন্স' এবং প্রতিসরণ স্থির থাকে না। একটি লেন্সের ম্যাগনিফাইং ক্ষমতাও তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। কাঁচের ওপর প্রতিফলিত আলো ও ছায়া নিয়ে গবেষণায়

www.pathagar.com

তিনি সমস্যার মুখোমুখি হন। তার সমস্যা 'আল-হাজেন্স প্রবলেম' হিসাবে পরিচিত। আল-হাইছামের গবেষণা আলোক বিজ্ঞানে ইবনে রুশদের কর্মকে প্রভাবিত করেছে। পার্সী বিজ্ঞানী কামাল আল-দীন আল-ফারসি 'কিতাব তানকিয়া আল-মানাজির'-এ আল হাইছামের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে আল-হাইছামের বুক অব অপটিক্সের ওপর ভিত্তি করে আল-ফারসি এবং জার্মানির ফ্রাইবার্গের থিওডরিক রং ধনুর সঠিক ব্যাখ্যা দেন। ১৫৭৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের বহুমুখী প্রতিভা তাকি আল-দীন তার 'বুক অব দ্য লাইট অব দ্য পিউপিল অব ভিশন এন্ড দ্য লাইট অব দ্য ট্রুথ অব দ্য সাইট'-এ ইবনে আল-হাইছাম এবং আল-ফারসির গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

বুক অব অপটিক্স

১২৭০ সালে পোলিশ পদার্থ বিজ্ঞানী উইটেলো ল্যাটিন ভাষায় হাইছামের 'বুক অব অপটিক্স' অনুবাদ করেন। বইটিতে সাতটি খণ্ড। ল্যাটিন ভাষায় তার মূল কর্ম 'কিতাব আল-মানাজির' (বুক অব অপটিক্স) পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ দার্শনিক রজার ব্যাকন এবং জার্মান গণিতজ্ঞ জোহানেস কেপলারের ওপর তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। রজার ব্যাকন 'পারস্পেকটিভ' শিরোনামে কিতাব আল-মানাজিরের একটি সারসংক্ষেপ রচনা করেন। বইটিতে তিনি আল-হাইছামের নাম উল্লেখ করেছেন। বুক অব অপটিক্সের সারসংক্ষেপ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কিতাব আল-মানাজির গবেষণামূলক পদ্ধতিতে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বুক অব অপটিক্স আধুনিক আলোক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যা এবং প্রায়োগিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। পদার্থবিদ্যায় বইটি আইজাক নিউটনের 'ফিলোসফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিশিয়া'র সমকক্ষ। পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ইবনে আল-হাইছামের বই রবার্ট গ্রোসটেস্ট, রজার ব্যাকন, জন পেকহ্যাম, উইটেলো, ওকহামের উইলিয়াম, ইতালীয় চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ফ্রাঁসোয়া ব্যাকন, রেনি ডেসকার্টেস, জোহানেস কেপলার, গ্যালিলিও এবং আইজাক নিউটনের মতো ইউরোপের বহু বিজ্ঞানীর কর্ম প্রভাবিত করেছে। বুক অব অপটিক্স চশমা, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রোস্কোপি, রেটিনার অস্ত্রোপচার এবং রোবটিক দৃষ্টিশক্তির মতো পশ্চিমা প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছে। বইটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্যান্য দিকও প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের অগ্রদূত জন ওয়াইক্লিফ 'দ্য এসপেকটিবাস'-এ বিশ্লেষিত সাত প্রকার আয়নায় সাতটি ভয়াবহ বিকৃতি নিয়ে আলোচনাকালে ইবনে হাইছামের নাম উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যে গিলাউম দ্য লরিসের 'রোমান দ্য লা রোজ'-এ ইবনে আল-হাইছামের বুক অব অপটিক্সের প্রশংসা করা হয়। শিল্পে বুক অব অপটিক্স রৈখিক চিত্রাঙ্কন কৌশল এবং রেনেসাঁ আর্টে চশমা ব্যবহারের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমুদ্র অভিযানের যুগে ইউরোপের ভৌগোলিক মানচিত্রে রৈখিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। নয়া বিশ্ব আবিষ্কারে বের হওয়ার সময় ক্রিস্টোফার কলম্বাস এরকম একটি মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৭২ সালে জার্মান গণিতজ্ঞ ফ্রেডারিক রাইসনার

www.pathagar.com

বাসিলে 'অপটিকা দ্যসাউরাস: আলহাজেন আরাবিস লাইব্রি সেপটেম, নানক্রিপাম ইডিটি: আইসডেম লাইবার দ্য ক্রেপাসকিউলিস ইট নুবিয়াম এসেনসিয়নিবাস' শিরোনামে বইটি মুদ্রণ করেন। তিনি মুদ্রিত কপিতে আল-হাইছামের নাম দেন 'আলহাজেন'। তার আগে আল-হাইছাম পাশ্চাত্যে 'আলহাচেন' নামে পরিচিত ছিলেন। আলহাচেন হলো ল্যটিন ভাষায় আল-হাইছাম নামের সঠিক অনুবাদ। ১৮৩৪ সালে ই. এ. সেডিলট প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জ্যামিতির ওপর আল-হাইছামের পাণ্ডুলিপিগুলো উদ্ধার করেন। অন্য পাণ্ডুলিপিগুলো অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরি এবং লাইডেনের আরেকটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

দৃষ্টিশক্তি তত্ত্ব

প্রাচীনকালে দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে দু'টি প্রধান তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। প্রথম তত্ত্ব 'ইমিশন থিওরি' নামে পরিচিত। ইউক্লিড ও টলেমির মতো বিজ্ঞানীগণ প্রথম তত্ত্ব সমর্থন করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, চোখ থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি কাজ করে। দ্বিতীয় তত্ত 'ইনট্রমিশন থিওরি' নামে পরিচিত। এরিস্টোটল ও তার অনুসারীরা এ থিওরি সমর্থন করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি চোখে প্রবেশ করে। ইবনে আল-হাইছাম যুক্তি দেন যে, চোখ কিংবা বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। কারান্ত রালে অবস্থান করার সময় তিনি এ সত্য আবিষ্কার করেন। একাদশ শতাব্দীতে মিসরীয়রা এরিস্টোটলের থিওরি সত্য বলে মনে করতো। হাইছাম অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শুয়ে শুয়ে এরিস্টোটলের থিওরির সত্যতা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, এরিস্টোটলের কথা সত্যি হলে প্রকোষ্ঠের জিনিসগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না কেন? তিনি নিজের কাছে আরো জানতে চান, এরিস্টোটলের মতো বিজ্ঞানী কি ভুল করতে পারেন? এ জিজ্ঞাসা থেকে তিনি মোমবাতি ও কপার নিয়ে শুরু করেন গবেষণা। কারা প্রকোষ্ঠে এ গবেষণা তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তিনি এরিস্টোটলের থিওরি ভুল বলে প্রমাণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, চোখ থেকে কোনো আলোক রশ্মি বের হতে পারে না। আমরা চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমাদের দৃষ্টিশক্তি দূরবর্তী তারকায় পৌঁছে যায়। তিনি আরো বলেছেন, অতি উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে আমাদের চোখ ঝলসে যেতে পারে কিংবা চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। আল-হাইছাম দর্শনের ব্যাখ্যা দানে একটি সফল থিওরি আবিষ্কার করেন যাতে বলা হয়, কোনো বস্তুর সব পিঠ থেকে আমাদের চোখে আলোক রশ্মি ছুটে আসে। তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে তার থিওরি প্রমাণ করেন। তার ফিলোসফিক্যাল ফিজিক্সের সঙ্গে জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ আধুনিক ফিজিক্যাল অপটিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আল-হাইছাম তার বুক অব অপটিক্সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন, আলোক রশ্মি সরলরেখায় গমন করে। তিনি লেন্স, কাঁচ, প্রতিসরণ ও প্রতিফলন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনিই প্রথম লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি বস্তুতে প্রতিসরিত ও প্রতিফলিত আলোক রশ্মি সংকোচনে সক্ষম হন। জ্যামিতিক

www.pathagar.com

অপটিক্সে তার এ সাফল্য ছিল একটি মৌলিক অবদান। তিনি প্রতিসরিত আলোর একটি যথার্থ মডেল তৈরির চেষ্টা করেন। তার এ মডেলের ফলাফল ল' অব রিফ্র্যাকশন'-এর অনুরূপ মডেলের ফলাফল ছাড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তিনি এ ফলাফল লাভে তার মডেলের যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে পারেননি।

বাতাসের সঙ্গে আলো ও রংয়ের সংমিশ্রণ ঘটে না, এ ধারণা প্রমাণে ইবনে হাইছাম ক্যামেরা অবসকিউরা (একদিকে ছিদ্রবিশিষ্ট বাক্স আকৃতির ক্যামেরা) উদ্ভাবন করেন। তিনি পিনহোল ক্যামেরার (লেন্সবিহীন ক্যামেরা) স্পষ্ট ও সঠিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে তার আগে এরিস্টোটল, গ্রীক পণ্ডিত থিওয়েন অব আলেক্সান্দ্রিয়া, আল-কিন্দি ও চীনা দার্শনিক মোজি পিনহোলের মধ্য দিয়ে আলো কণা গমনের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই একথা প্রমাণ করতে পারেননি যে, পর্দায় প্রতিফলিত আলো ছিদ্রের বিপরীত দিকের একটি ছবি। ইবনে আল-হাইছাম প্রথম বাতি দিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেখান যে, ছিদ্র দিয়ে বিভিন্ন উৎসের আলো প্রবেশ করে একটি বিরাট জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই প্রথম ক্যামেরা অবসকিউরার সাহায্যে ভেতরের একটি পর্দায় বাইরে থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ ছবি প্রদর্শনে সফল হন।

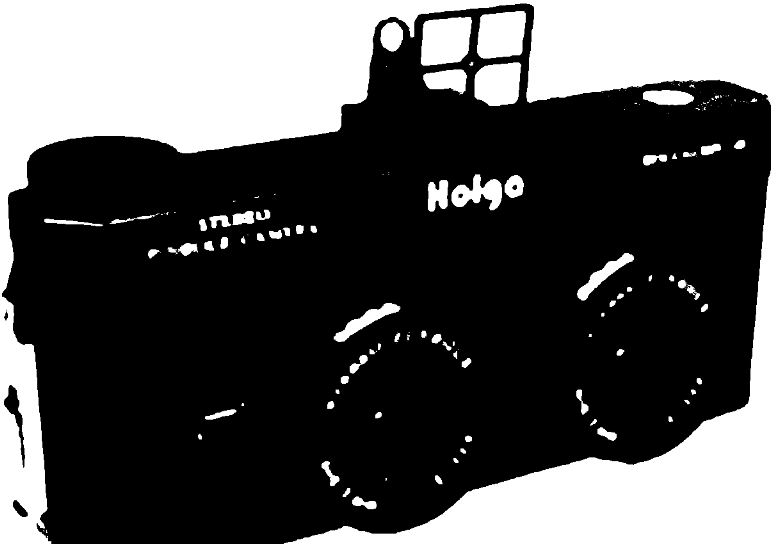

ইবনে আল-হাইছামের আবিষ্কৃত ক্যামেরা

www.pathagar.com

ফিজিক্যাল অপটিক্স ছাড়াও 'দ্য বুক অব অপটিক্স' ফিজিওলজিক্যাল অপটিক্সে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে। ইবনে হাইছাম চিকিৎসা, অপথালমোলজি, এনাটমি ও ফিজিওলজির বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। তিনি দর্শন প্রক্রিয়া, চোখের গঠন, চোখে ছবির প্রতিফলন এবং ভিউচুয়াল সিস্টেমের বর্ণনা দেন। তিনি হেরিংয়ের ল' অব ইকুয়েল ইনারভেশন, লম্বালম্বি বাইনোক্যুলার ভিশন ও বাইনোক্যুলার ডেসপারিটি'র বর্ণনাও দিয়েছেন এবং বাইনোক্যুলার ভিশন, মোশন পারশেপশন ও বাইনোক্যুলার ভিশন-এর উন্নতি করেন। একটি অপটিক্যাল সিস্টেম অথবা অপটিক্যাল যন্ত্র হিসাবে চোখের ফাঙ্কশনাল এনাটমির বর্ণনা হলো তার সবচেয়ে মৌলিক এনাটমিক্যাল অবদান। চোখ ও অবসকিউরা ক্যামেরার মধ্যে তিনি যে পার্থক্য নির্ণয় করেন তা তাকে এনাটমি ও অপটিক্সের সংশ্লেষণ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সংশ্লেষণ হলো ফিজিওলজিক্যাল অপটিক্সের ভিত্তি। পিনহোল ক্যামেরার সহায়তায় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আলোক প্রক্ষেপণে অপরিহার্য নীতিমালা আঁচ করতে পারায় হাইছাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, চোখের ভেতর ছবি উল্টো হয়ে প্রতিফলিত হয়। হাইছাম চোখের তারার সঙ্গে একটি ছিদ্রের সাদৃশ্য খুঁজে পান। ছবি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি ভুলক্রমে ইবনে সিনার সঙ্গে একমত হয়ে ধারণা করছিলেন, লেন্স হলো ছবি ধারণকারী একটি অঙ্গ। তবে এ প্রক্রিয়ায় তিনি রেটিনার সংশ্লিষ্টতার সঠিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ক্যামেরা অবসকিউরা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিন্দুর মধ্য দিয়ে আলো প্রক্ষেপণে পূর্ববর্তী তত্ত্বের উন্নয়নে হাইছাম পর্যাপ্ত তথ্য ও যুক্তি লাভ করেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আল-হাইছাম হলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অগ্রদূত। তিনি তাত্ত্বিক ধারণাগুলো প্রমাণে নিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কঠোর গবেষণামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং অনুমানসিদ্ধ ধারণাগুলো প্রমাণ করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-হাইছামের যথার্থ অবস্থান স্বীকার করতে গিয়ে রোসান্না গোরিনি তার 'আল-হাইছাম দ্য ম্যান অব এক্সপেরিয়েন্স: ফার্স্ট স্টেপস ইন দ্য সায়েন্স অব ভিশন'-এ লিখেছেন, '*According to the majority of the historians, al-Haytham was the pioneer of the modern scientific method. With his book he changed the meaning of the term optics and established experiments as the norm of proof in this field. His investigations are not on abstract theories, but on experimental evidences and his experiments were systematic and repeatable.*'

অর্থাৎ '*অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আল-হাইছাম ছিলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অগ্রদূত। তিনি তার গ্রন্থের মাধ্যমে আলোক বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ বদলে দিয়েছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষাকে এ ক্ষেত্রে প্রমাণের আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিমূর্ত তত্ত্বের ওপর তিনি গবেষণা চালাননি। তিনি গবেষণা চালিয়েছেন পরীক্ষামূলক প্রমাণের ভিত্তিতে এবং তার পরীক্ষাগুলো ধারাবাহিক ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগযোগ্য।*'

www.pathagar.com

তবে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ আল-হাইছামের গবেষণাকে টলেমির মতো গতানুগতিক বলে গণ্য করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাগুলোকে তাকে আধুনিক হিসাবে প্রমাণ করার একটি প্রবণতা হিসাবে বিচার করছেন। কামাল আল-দীন আল-ফারসি তার 'কিতাব তানকিয়া আল-মানাজির'-এ হাইছামের আলোক বিজ্ঞানের ধারণাগুলো সংশোধন করে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

আলহাজেনের সমস্যা

বুক অব অপটিক্সের পঞ্চম খণ্ডে তিনি 'ক্যাটোপরিক্স' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার এ আলোচনা এখন আলহাজেনের সমস্যা হিসাবে পরিচিত। ১৫০ সালে টলেমি প্রথম 'ক্যাটোপরিক্স' তৈরি করেন। একটি বৃত্তের সমতল ভূমিতে দু'টি রেখা টানা হলে পরিধির একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঐ দু'টি বিন্দু মিলিত হবে এবং এ বিন্দুতে উৎপন্ন সমকোণকে ক্যাটোপরিক্স বলা হয়। ক্যাটোপরিক্স হচ্ছে একটি বৃত্তাকার বিলিয়ার্ড টেবিলের প্রান্তে বিন্দু খুঁজে পাওয়ার মতো একটি ব্যাপার। অতএব অপটিক্সে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আলোর একটি নির্দিষ্ট উৎস এবং গোলাকার একটি আয়না। একজন পর্যবেক্ষকের চোখে কোথা থেকে আলো প্রতিফলিত হবে, আয়নায় সেই বিন্দু খুঁজে বের করা। এ পরীক্ষা একটি ইকুয়েশন অব ফোর্থ ডিগ্রি'র দিকে ঠেলে দেয়। ইকুয়েশন অব ফোর্থ ডিগ্রি পর্যায়ক্রমে ফোর্থ পাওয়ার্স'র অঙ্কের জন্য সহজতর ফর্মুলা খুঁজে পেতে ইবনে আল-হাইছামকে উৎসাহিত করে। গাণিতিক আরোহ প্রণালীর মাধ্যমে তিনি এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যাকে যে কোনো অখণ্ড সংখ্যার জন্য ফর্মুলা খুঁজে বের করতে তৎক্ষণাৎ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি অখণ্ড সংখ্যার মাধ্যমে অধিবৃত্তের একটি ভলিউম খুঁজে বের করতে অখণ্ড সংখ্যার ওপর তার ফলাফল প্রয়োগ করেন। তিনি চতুর্থ ডিগ্রি পর্যন্ত বীজগণিতের বহুপদের জন্য অখণ্ড সংখ্যা খুঁজে বের করতে সক্ষম হন এবং যে কোনো বীজগণিতের বহুপদের অখণ্ড সংখ্যার জন্য একটি সাধারণ ফর্মুলা খুঁজে বের করার কাছাকাছি পৌছে যান। এটি ছিল তার অতি ক্ষুদ্র রাশি এবং অখণ্ড ক্যালকুলাস উন্নয়নে একটি মৌলিক অবদান। পর্যায়ক্রমে ইবনে আল-হাইছাম কণিক সেকশন এবং জ্যামিতিক প্রমাণ ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করেন। হাইছামের পরে বহু বিজ্ঞানী এ সমস্যার বীজগাণিতিক সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে ১৯৯৭ সালে অক্সফোর্ডের গণিতজ্ঞ পিটার এম. নিউম্যান তাতে সফল হন।

অন্যান্য অবদান

ইবনে আল-হাইছাম আলোক বিজ্ঞান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মেকানিক্সে বহু গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ এবং মেকানিক্যাল সিদ্ধান্তে পৌছান। আলোক বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে তিনি কিভাবে মেকানিক্যাল ব্যাখ্যার ফলাফল কাজে লাগিয়েছেন দ্য বুক অব অপটিক্সে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তিনি উৎক্ষেপক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে এ

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে পৌছান যে, উৎক্ষেপণ হলো ভূ-পৃষ্ঠের ওপর সম্পূর্ণ খাড়া উৎক্ষেপক নিক্ষেপের ফলাফল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আলোর প্রতিসরণ বুঝানোর জন্য পেছন থেকে একটি ঘন মাধ্যমে ধাতব শীটের প্রশস্ত গর্ত আচ্ছাদনকারী সরু স্লেটের ওপর লোহার বল নিক্ষেপের মেকানিক্যাল সিদ্ধান্ত কাজে লাগান। একটি সম্পূর্ণ খাড়া বস্তু নিক্ষেপ করা হলে স্লেট ভেঙ্গে গিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, একই শক্তিতে সমান দূরত্ব থেকে খাড়া নয় এমন বস্তু নিক্ষেপ করা হলে স্লেট ভাঙ্গবে না। সরাসরি তীব্র আলো চোখের কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে, এ ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি তাও বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

বুক অব অপটিক্সের ১৫ থেকে ১৬ নম্বর অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে আল-হাইছাম প্রথম প্রমাণ করেছেন, মহাকাশ কঠিন পদার্থে গঠিত নয়। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন, মহাকাশ বাতাসের চেয়ে কম ঘন। পরবর্তীকালে পোলিশ পদার্থ বিজ্ঞানী উইটেলো তার এ মতবাদের পুনরাবৃত্তি করেন। ইবনে হাইছামের গবেষণা কোপার্নিকাস এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে সৌরজগতের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সুদানি মনস্তত্ত্ববিদ ওমর খলিফা দৃষ্টি এবং অপটিক্যাল ভ্রম মনস্তত্ত্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ইবনে আল-হাইছামকে গবেষণামূলক মনস্তত্ত্ব এবং সাইকোফিজিক্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। সাইকোফিজিক্স হলো সাবডিসিপ্লিন এবং আধুনিক মনস্তত্ত্বের অগ্রদূত। ইবনে আল-হাইছাম দৃষ্টিশক্তির ওপর অন্তর্মুখী প্রবন্ধ লিখলেও এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে, তিনি সাইকোফিজিক্যাল কলাকৌশল ব্যবহার করেছিলেন।

বুক অব অপটিক্সে ইবনে হাইছাম উল্লেখ করেছেন, দৃষ্টির জন্ম হয় মস্তিষ্কে, চোখে নয়। তিনি আরো বলেছেন, মানুষ যা দেখে এবং যেভাবে দেখে তার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি চাঁদের লুকোচুরি খেলার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তার এ গবেষণা মধ্যযুগে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দূর আকাশে থাকার সময় চাঁদকে যতখানি বড় দেখায়, দিগন্তের কাছাকাছি অবস্থান করলে কেন তাকে তার চেয়ে বড় মনে হয়, হাইছামের গবেষণা ছিল সে ব্যাখ্যা দানের একটি প্রচেষ্টা। আজো এ বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়নি। টলেমির প্রতিসরণ তত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি এ সমস্যাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি বলেন, কোনো বস্তু ছোট নাকি বড় দেখাবে তা নির্ভর করছে পর্যবেক্ষক ও বস্তুর মধ্যে দূরত্বের ওপর। ইবনে হাইছামের এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রজার ব্যাকন, ইংরেজ বিশপ জন পিচাম ও উইটেলো গবেষণা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে টলেমির তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং চাঁদকে বড় বা ছোট হিসাবে দৃশ্যমান হওয়ার ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে একটি মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কেউ কেউ দাবি করছেন, ব্যথা ও অনুভূতি সম্পর্কে ইবনে হাইছামের অভিমতের ওপর গৌতম বুদ্ধের দর্শনের প্রভাব ছিল। হাইছাম লিখেছেন, প্রতিটি অনুভূতি হচ্ছে এক ধরনের দুর্দশা এবং লোকে যাকে ব্যথা বলে আসলে তা হলো কেবলমাত্র তীব্রতর অনুভূতি।

www.pathagar.com

আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক বই

'বুক অব অপটিক্স' ছাড়াও ইবনে আল-হাইছাম আলোক বিজ্ঞানের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তার 'রিসালা ফিল দাও' হচ্ছে কিতাব আল-মানাজির-এর একটি সম্পূরক বই। রিসালা ফিল দাও-এ লিউমিনিসেন্স এবং বিভিন্ন স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয় নিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা স্থান পেয়েছে। তিনি চোখের এনাটমি এবং দৃষ্টি ভ্রম নিয়ে আরো পরীক্ষা চালিয়েছেন। আল-হাইছাম প্রথম ক্যামেরা অবসকিউরা এবং পিনহোল ক্যামেরা তৈরি করেন এবং রং ধনুর আবহবিদ্য এবং বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। গ্রহণ, গোধূলি ও চাঁদের আলোসহ বিভিন্ন মহাজাগতিক বিষয়ও পরীক্ষা করে দেখেছেন। এছাড়া তিনি প্রতিসরণ, ক্যাটোপরিক্স, ডায়োপট্রিক্স, গোলাকার আয়না ও ম্যাগনিফাইং লেন্স নিয়ে গবেষণা চালান। তিনি তার বই 'মিজান আল হিকমা'য় বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাকে উচ্চতার সঙ্গে তুলনা করেন। বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান, দিগন্তের সূর্য ১৯ ডিগ্রি নিচে অবস্থান করলে গোধূলি শুরু কিংবা মিলিয়ে যায়। তিনি তার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাপের চেষ্টা করেন। আলোক বিজ্ঞানে প্রতিসরণের সমস্যা সমাধানে ইবনে আল-হাইছামের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে হেলেন সেলিন 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড মেডিসিন' শিরোনামে বইয়ের ৮২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Optics, which would today be considered a branch of physics, was studied in close conjuction with both geometry and medicine, since various problems regarding vision unresolved in Greek scientific literature. The contribution of Ibn al-Haythem to the problem of refraction are particularly noteworthy.*'

অর্থাৎ '*গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলোতে দৃষ্টিশক্তির সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থাকায় জ্যামিতি ও চিকিৎসা উভয় বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিল রেখে আধুনিককালে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে পরিগণিত অপটিক্স নিয়ে গবেষণা চালানো হতো। প্রতিসরণের সমস্যা সমাধানে ইবনে আল-হাইছামের অবদান উল্লেখযোগ্য।*'

চোখের গঠনে অবদান

ইবনে আল-হাইছাম চোখের এনাটমি পর্যবেক্ষণ করে সালোবিয়া, কর্নিয়া, মাশিমিয়া, আনিয়া প্রভৃতির পার্থক্য নির্ধারণ করেন। তিনি চোখের শাবকাতুল আইন বা রেটিনা এবং চোখের জলীয় রসের কাজ নিয়েও আলোচনা করেন। ইংরেজি 'লেন্স' (lens) শব্দটি এসেছে ইবনুল হাইছামের চোখের পরকলার জন্য ব্যবহৃত আরবী 'আদাসা' শব্দ থেকে। আরবী আদাসা'র আভিধানিক অর্থ হলো মসুরের ডাল। ল্যাটিন অনুবাদকরা আরবী আদাসা শব্দকে 'লেন্টিকুলাম' (lenticulum) বলে অনুবাদ করেন। লেন্টিকুলাম শব্দটি শেষ পর্যন্ত লেন্সে পরিবর্তিত হয়। চোখের পরকলাই লেন্স নামে পরিচিত।

এস্ট্রোফিজিক্স

এস্ট্রোফিজিক্স হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা। গ্রীক ভাষায় 'এস্ট্রো' শব্দের মানে হলো 'তারকা' এবং 'ফিজিজ' শব্দের মানে হলো 'প্রকৃতি'। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গঠন নিয়ে

www.pathagar.com

আলোচনা করাই এস্ট্রোফিজিক্সের লক্ষ্য। মুসলিম বিজ্ঞানী বিশেষ করে ইবনে আল-হাইছামের হাতে এ বিজ্ঞান পরিপুষ্টি লাভ করে। তিনি এস্ট্রোফিজিক্স এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মহাজাগতিক কলাকৌশলে তার 'এপিটোম অব এস্ট্রোনমি' প্রয়োগ করেন। তিনি প্রমাণ করেন, ল'স অব ফিজিক্সের জন্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দায়ী। তার মিজান আল-হিকমা'য় পরিসংখ্যান, এস্ট্রোফিজিক্স ও মহাজাগতিক কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাইছাম বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মনে হচ্ছে তিনি দু'টি বস্তুর আকর্ষণের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র নিয়ে 'মাকালা ফিল-কারাসতান' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। এ বইয়ে ইবনে আল-হাইছাম একটি তত্ত্বে দেখান যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব পরিবর্তন করে। বিশ্ববিখ্যাত বুক অব অপটিক্স রচনা করার কিছু সময় আগে তিনি 'মাকালা ফি দাউ আল-কামার' (অব দ্য লাইট অব দ্য মুন) শিরোনামে আরেকটি বই রচনা করেন। এ বইয়ে তিনি গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও এস্ট্রোফিজিক্সে গবেষণামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। সে সময় বিশ্বাস করা হতো, একটি কাঁচের মতো চাঁদ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তিনি এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেন এবং সঠিকভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, চন্দ্র পৃষ্ঠের যে অংশে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় কেবলমাত্র সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। চাঁদের আলোকিত পৃষ্ঠের সব অংশ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়, একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি সাধারণ গবেষণামূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। ১০২১ সালে রচিত 'মাকালা ফি দাউ আল-কামার'-এ (On the light of the Moon) তিনি এ তত্ত্ব হাজির করেন। ইবনে আল-হাইছাম একটি আদর্শ গাণিতিক মডেল এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বস্তুর মধ্যে সম্পর্কের একটি স্পষ্ট ধারণা দেন। তিনিই প্রথম পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল উপায়ে গবেষণামূলক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ধারাবাহিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি গবেষণা করে দেখান যে, একটি পর্দার ওপর দু'টি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো প্রক্ষেপণ করা হলে যে অংশ আলোকিত হবে পর্যায়ক্রমে একটি ছিদ্র বন্ধ করে দিলে আলোকিত অংশের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাবে।

মেকানিক্স

ইবনে আল-হাইছাম 'রিসালা ফিল-মাকান'-এ (ট্রিটিজ অন প্লেস) অবয়বের গতিশীলতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাহ্যিক শক্তি বাধা না দিলে অথবা শরীর তার গতি পরিবর্তন না করলে দেহ সর্বক্ষণ সচল থাকে। তার এ তত্ত্ব ছিল ইনারশিয়া (জড়) ধারণার অনুরূপ। তবে তার ধারণা ছিল অনুমানসিদ্ধ। গবেষণা করে তিনি তা প্রমাণ করেননি। কয়েক শতাব্দী পর গ্যালিলিও গালিলি ফ্রিকশনাল ফোর্স প্রয়োগ করে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেন এবং আরো পরে এ তত্ত্ব নিউটনের ফার্স্ট ল' অব মোশন নামে পরিচিত হয়। রিসালা ফিল মাকান-এ ইবনে আল-হাইছাম এরিস্টোটলের অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত

www.pathagar.com

পোষণ করেন। এরিস্টোটল অভিমত দিয়েছিলেন, প্রকৃতি শূন্যতাকে এড়িয়ে চলে। তার মতে, কোনো স্থান বলতে বুঝায় নিয়ন্ত্রিত অবয়বের দ্বিমাত্রিক সীমানা এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোর সঙ্গে তার যোগাযোগ। হাইছাম জ্যামিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখান যে, আল-মাকান বা স্থান হলো একটি নিয়ন্ত্রিত অবয়বের বাইরের মধ্যকার কাল্পনিক ত্রিমাত্রিক শূন্যতা। তিনি গাণিতিক যুক্তি দিয়ে আরো দেখান যে, স্থান হলো শূন্যতার সমতুল্য। ইবনে আল-হাইছাম মোমেন্টাম-এর ধারণাও উদ্ভাবন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী

১০২৫ থেকে ১০২৮ সালের মধ্যে 'আল-শুকুক আলা বাতালামযুস' শিরোনামে (ডাউটস কনসারনিং টলেমি) ইবনে আল-হাইছাম একটি বই লিখেন। বইটিতে তিনি 'আলমাগেস্ট', 'প্ল্যানেটারি হাইপোথিসিসেস' এবং 'অপটিক্স'সহ টলেমির বেশ কয়েকটি বইয়ের সমালোচনা করেছেন। টলেমির এসব বইয়ে তিনি প্রচুর পরস্পরবিরোধিতা খুঁজে পান এবং সেগুলো উল্লেখ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমি যেসব গাণিতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন সেসব যন্ত্রপাতি একই ধরনের বৃত্তাকার গতির বাহ্যিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে হাইছাম মনে করতেন। তিনি টলেমির এস্ট্রোনমিক্যাল সিস্টেমের বাস্তব প্রয়োজনের কঠোর সমালোচনা করেন এবং অনুমানসিদ্ধ গাণিতিক বিন্দু, রেখা ও বৃত্তের সঙ্গে প্রকৃত ফিজিক্যাল গতির তুলনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। ইবনে হাইছাম টলেমির অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক যুক্তিরও সমালোচনা করেন। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানীর মতো টলেমির মডেলকে এরিস্টোটলের প্রাকৃতিক দর্শনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে আখ্যায়িত না করলেও তিনি তার গ্রন্থাবলীর পরস্পরবিরোধিতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। 'এপোরিয়াস এগেইনস্ট টলেমি'তে হাইছাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে জটিলতার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, *'তিনি (টলেমি) সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তবে সত্য অনুসন্ধানের পথে রয়েছে অনিশ্চয়তা। তার মতো ব্যক্তিও ভুল থেকে মুক্ত নন।'*

এ ব্যাপারে 'ডাউটস কনসারনিং টলেমি'তে তিনি আরো লিখেছেন,' *সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান। তবে সত্য খুঁজে বের করা কঠিন এবং সে পথ মসৃণ নয়। সত্য অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিজ্ঞানীদের ভুল করা থেকে রক্ষা করেননি এবং বিজ্ঞানকে ঘাটতি ও ত্রুটিমুক্ত রাখেননি। যদি তাই হতো তাহলে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন না।'*

পৃথিবীর গঠন

'অন দ্য কনফিগারেশন অব দি ওয়ার্ল্ড'-এ টলেমির সমালোচনা করলেও হাইছাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে প্রাচীন ভুল ধারণা মেনে নিয়েছেন। তিনি তার এ বইয়ে মহাকাশের বৈজ্ঞানিক গঠনের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার মতে, মোটের

www.pathagar.com

ওপর পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে পৃথিবী স্থির। টলেমির গাণিতিক মডেলের বাস্তবতা খুঁজে বের করতে গিয়ে তিনি সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহের আকারের জন্য একটি একক 'ওরব' (ফালাক)-এর ধারণা উদ্ভাবন করেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তার বইটি ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বইটি মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ যুগে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ ভন পিউয়ারবাচের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

সাতটি গ্রহের প্রতিটির গতির মডেল

১০৩৮ সালে ইবনে হাইছাম 'দ্য মডেল অব দ্য মোশন্স অব ইচ অব দ্য সেভেন প্ল্যানেটস' রচনা করেন। বইটি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক। একবিংশ শতাব্দীতে বইটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হলেও অনেকাংশ হারিয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ হওয়ায় বইটি প্রকাশিত হয়নি। দ্য মডেল অব দ্য মোশন্স-এ হাইছাম প্রথম টলেমি বহির্ভূত মডেলের ধারণা ব্যক্ত করেন। কসমোলজির প্রতি জোর না দিলেও তিনি মহাজাগতিক গতিবিদ্যার একটি ধারাবাহিক গবেষণা উদ্ভাবন করেন। মহাজাগতিক গতিবিদ্যা ছিল পুরোপুরি জ্যামিতিক। তার এ উদ্ভাবন অতি সূক্ষ্ম জ্যামিতি উদ্ভাবনের পথ সুগম করেছে। তার উদ্ভাবিত মডেল গাণিতিক ও জ্যামিতিক ধারণা বাতিল করে দিয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সাধারণ দর্শনকে পৃথক করেছে, কসমোলজি থেকে মহাজাগতিক গতিবিদ্যাকে মুক্ত করেছে এবং বাস্তব অস্তিত্বকে জ্যামিতিক অস্তিত্বে পরিণত করেছে। এ মডেল নিজের অক্ষের ওপর পৃথিবীর আবর্তনের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, গতির কেন্দ্র হলো জ্যামিতিক বিন্দু। বইটিতে ইবনে হাইছাম ওকাম'স রেজার'-এর প্রাথমিক সংস্করণের বর্ণনা দিয়েছেন। ওকাম'স রেজারে তিনি জ্যোতির্মণ্ডলের গতি নির্ধারণে ন্যূনতম অনুমানের ওপর নির্ভর করেছেন।

অন্যান্য জ্যোতির্মণ্ডলীয় রচনাবলী

ইবনে আল-হাইছাম জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রকে আলাদা করেছেন এবং জ্যোতিষীদের অনুসৃত পদ্ধতি অনুমানসিদ্ধ এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তিনি এ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে হাইছাম 'অন দ্য মিল্কিওয়ে' শিরোনামে বইয়ে মহাবিশ্বের অন্যতম ছায়াপথ মিল্কিওয়ে ও লম্বনের সমস্যার সমাধান করেন। প্রাচীনকালে এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন, বৃহৎ তারকাগুলো একত্রিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে ঘর্ষণে সৃষ্ট বাষ্পীয় প্রজ্বলন থেকে মিল্কিওয়ে তৈরি হয় এবং বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে এ প্রজ্বলন ঘটে। ইবনে হাইছাম এরিস্টোটলের ধারণা ভুল বলে বাতিল করে দেন এবং নিশ্চিত হন যে, মিল্কিওয়েতে কোনো লম্বন নেই। মিল্কিওয়ে পৃথিবী থেকে শত কোটি মাইল দূরে এবং তার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি লিখেছেন, *'মিল্কিওয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি হলে যে কেউ তুলনামূলকভাবে স্থির তারকারাজির অবস্থানে পার্থক্য খুঁজে পেতো।'* তিনি মিল্কিওয়ের

www.pathagar.com

লম্বন নির্ধারণে দু'টি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে বলেন, *'যে কেউ পৃথিবীর একই জায়গা থেকে দু'টি পৃথক সময়ে অথবা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দু'টি পৃথক স্থান থেকে একযোগে মিল্কিওয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।'* তিনি প্রথম পদ্ধতিকে মিল্কিওয়ের লম্বন পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য বেছে নেন। হাইছাম নিশ্চিত করেন যে, মিল্কিওয়ের কোনো লম্বন না থাকায় তা বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি থাকতে পারে না। ১৮৫৮ সালে মোহাম্মদ ওয়ালি ইবনে মোহাম্মদ জাফর তার 'শিগারফ-নামা'য় দাবি করেছেন, ইবনে আল-হাইছাম 'মারাতিব আল-সামা' শিরোনামে বইয়ে সৌরজগতের অনুরূপ টাইকণিক সিস্টেম কল্পনা করেছেন। টাইকণিক সিস্টেমে গ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

গাণিতিক রচনাবলী

ইবনে হাইছাম ইউক্লিড ও ছাবেত ইবনে কোরার গাণিতিক রচনাবলীর ভিত্তিতে কাজ করেছেন। তিনি কোণ ছেদনকারী বক্ররেখা এবং সংখ্যা তত্ত্ব সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এনালিটিক্যাল জ্যামিতির ওপর কয়েকটি প্রাথমিক গবেষণা চালান। গণিতে তার গবেষণা রেনি ডেসকার্টেসের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ এবং আইজাক নিউটনের ক্যালকুলাসের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে।

জ্যামিতি

ইবনে আল-হাইছাম এনালিটিক্যাল জ্যামিতির উন্নয়ন ঘটিয়েছেন এবং জ্যামিতি ও এলজাব্রার মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রথম স্বাভাবিক ১০০ সংখ্যা যোগ করার একটি ফর্মুলা উদ্ভাবন করেন। হাইছাম তার ফর্মুলা প্রমাণে জ্যামিতিক প্রমাণ ব্যবহার করেন। তিনি ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস'-এ উল্লেখিত পঞ্চম সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণে তিনি জ্যামিতিতে গতি ও রূপান্তরের ধারণা চালু করেন। তিনি ল্যাম্বার্ট চতুর্ভুজ প্রণয়ন করেন। বরিস আব্রামোভিচ রোজেনফিল্ড ল্যাম্বার্ট চতুর্ভুজের নামকরণ করেছেন 'ইবনে আল-হাইছাম ল্যাম্বার্ট চতুর্ভুজ'। হাইছামের প্রমাণের সঙ্গে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের মিল রয়েছে। ল্যাম্বার্টসহ তার অন্যান্য চতুর্ভুজ বিষয়ক স্বতঃসিদ্ধ ছিল ইউক্লিডের মডেল বহির্ভূত জ্যামিতিতে প্রথম তত্ত্ব। তার এসব তত্ত্বকে ইউক্লিডের প্রভাবমুক্ত জ্যামিতির সূচনা হিসাবে গণ্য করা হয়। জ্যামিতিতে তার কর্ম পার্সী জ্যামিতজ্ঞ ওমর খৈয়াম, নাসির আল-দীন আল-তুসি এবং ইউরোপীয় জ্যামিতজ্ঞ উইটেলো, ফরাসি দার্শনিক গারসোনাইডেস, আলফনসো, জন ওয়ালিস, ইতালীয় জেসুইট যাজক গিওভানি গিরলামো সাচারি ও জার্মান জেসুইট গণিতজ্ঞ ক্রিস্টোফার ক্লাভিয়াসের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এলিমেন্টারী জ্যামিতিতে ইবনে হাইছাম অর্ধচন্দ্রাকৃতির আয়তন ব্যবহার করে বৃত্তের বর্গ বের করার চেষ্টা চালান। পরে তিনি এ অসম্ভব কাজ পরিত্যাগ করেন। ইবনে হাইছাম এলিমেন্টারী ও এডভান্সড জ্যামিতির অন্যান্য সমস্যাও সমাধান করেন।

www.pathagar.com

সংখ্যা তত্ত্ব

ইবনে হাইছাম সংখ্যা তত্ত্বে যেসব অবদান রাখেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত বিভাজ্য সংখ্যার ওপর তার গবেষণা। প্রথম প্রকৃত বিভাজ্য সংখ্যা হচ্ছে ৬। কেননা, ১, ২ ও ৩ দিয়ে সংখ্যাটি বিভাজ্য। আবার ১, ২ ও ৩ এর যোগফল হচ্ছে ৬। একইভাবে ৬ হচ্ছে তার সব ইতিবাচক বিভাজকের যোগফলের অর্ধেকের সমান। যেমন- (১+২+৩+৬) %২= ৬। ৬ এর পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা হলো ২৮। ২৮-এর পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা হলো ৪৯৬ এবং তার পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা হলো ৮১২৮। এই প্রথম চারটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা কেবল গ্রীক গণিতজ্ঞদের জানা ছিল। প্রথম প্রকৃত বিভাজ্য সংখ্যা ৬-কে π অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হাইছাম তার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে প্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, প্রতিটি প্রকৃত বিভাজ্য সংখ্যার গঠন হলো 2π-1(2π----1) যেখানে 2π----1 হলো মুখ্য। তবে তিনি তার ফলাফল প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইস গণিতজ্ঞ লিয়নহার্ড ইউলার তা প্রমাণ করেন। হাইছাম উইলসনের সূত্র ব্যবহার করে তার তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। তার অপাসকিউলা'তে হাইছাম এ তত্ত্ব প্রমাণ করার একটি সমাধান দিয়েছেন। সমাধানের জন্য তিনি দু'টি সাধারণ পদ্ধতি বের করেন। তার প্রথম পদ্ধতি ছিল ক্যাননিক্যাল। এ পদ্ধতিতে উইলসনের সূত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তিনি একটি চীনা তত্ত্ব ব্যবহার করার কথা বলেছেন।

পশু-পাখির আত্মার ওপর সঙ্গীতের প্রভাব

মনস্তত্ত্ব ও সঙ্গীতবিদ্যায় ইবনে আল-হাইছামের 'ট্রীটিজ অন দি ইনফ্লুয়েন্স অব মেলোডিস অন দ্য সোলস অব এনিম্যালস' হলো প্রাণীদের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব সংক্রান্ত প্রথম বই। এ বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন সঙ্গীত ব্যবহার করে কিভাবে উটের গতি মন্থর ও বৃদ্ধি করা যায় এবং সঙ্গীত কিভাবে পশুদের আচরণ এবং তাদের মনস্তত্ত্ব বদলে দিতে পারে। তিনি তার ধারণা প্রমাণে ঘোড়া, পাখি ও সরীসৃপ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বাস করতেন, মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সঙ্গীতের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন থেকে পরিচালিত গবেষণাগুলো ইবনে হাইছামের অভিমত সমর্থন করে বলছে, পশু-পাখির ওপর সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে।

ধর্ম

ইবনে আল-হাইছাম ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তবে তিনি কোন্ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। পাকিস্তানি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন সরদার ও লরেন্স বেটানির মতে, তিনি সুন্নি মাযহাবের আশারী মতবাদের অনুসারী ছিলেন। অন্যদিকে, পিটার এডওয়ার্ড হাগসনের মতে, তিনি মুতাজিলা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবার এ. আই. সাব্রার মতে, তিনি ছিলেন শিয়া মাযহাবের অনুসারী। ইবনে

www.pathagar.com

আল-হাইছাম ইসলাম ধর্মের ওপর একটি বই লিখেছেন। তার আমলে কয়েকজন ভন্ড নবীর আবির্ভাব ঘটে। তাদের নবুয়তপ্রাপ্তির বিরোধিতা করে তিনি এ বইটি লিখেন। এছাড়া তিনি 'ফাইন্ডিং দ্য ডিরেকশন অব কিবলা বাই ক্যালকুলেশন' শিরোনামে আরেকটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি কিবলা খুঁজে বের করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল-হাইছাম বিশ্বাস করতেন, মানুষ ক্রটিমুক্ত নয়। একমাত্র মহান আল্লাহপাক ক্রটিমুক্ত।

বই পুস্তক

মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের মতে, ইবনে আল-হাইছাম ব্যাপক বিষয়ের ওপর দুই শতাধিক বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে ৯৬টি ছিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর লেখা। তার অধিকাংশ বই হারিয়ে গেলেও ৫০টির বেশি কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার বেঁচে যাওয়া বইগুলোর অর্ধেক হলো গণিতের ওপর লেখা। ২৩ টি বই জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ১৪টি আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক বই। আল-হাইছামের সব ক'টি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। ল্যাটিন অনুবাদের মধ্য দিয়ে আলোক বিজ্ঞানের ওপর তার লেখা কয়েকটি বই টিকে আছে। মধ্যযুগে মহাজগতের ওপর লেখা তার কয়েকটি বই ল্যাটিন, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হাইছামের কয়েকটি বইয়ের বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

(১) বুক অব অপটিক্স
(২) অ্যানালাইসিস এন্ড সিনথেসিস
(৩) ব্যালেন্স অব উয়িজডম
(৪) কারেকশন টু দি আলমাগেস্ট
(৫) ডিসকোর্স অন প্লেস
(৬) এগজাক্ট ডিটারমিনেশন অব পোল
(৭) এগজাক্ট ডিটারমিনেশন অব মেরিডিয়ান
(৮) ফাইন্ডিং দ্য ডিরেকশন অব কিবলা বাই ক্যালকুলেশন
(৯) হোরাইজোন্টাল সানডায়ালস
(১০) আওয়ার লাইন্স
(১১) ডাউটস কনসার্নিং টলেমি
(১২) মাকালা ফিল কারাসতান
(১৩) অন কম্প্লিশন অব দ্য কনিক্স
(১৪) অন সিয়িং দ্য স্টার্স
(১৫) অন স্কোয়ারিং দ্য সার্কেল
(১৬) অন দ্য বার্নিং স্ফিয়ার
(১৭) অন দ্য কনফিগারেশন অব দ্য ওয়ার্ল্ড
(১৮) অন দ্য ফর্ম অব এক্লিপস

www.pathagar.com

(১৯) অন দ্য লাইট অব স্টার্স
(২০) অন দ্য লাইট অব দ্য মুন
(২১) অন দ্য মিল্কিওয়ে
(২২) অন দ্য ন্যাচার অব শ্যাডোস
(২৩) অন দ্য রেইনবো এন্ড হ্যালো
(২৪) অপাসকিউলা
(২৫) রেজলিউশন অব ডাউটস কনসার্নিং দি ওয়ান্ডিং মোশন
(২৬) দ্য কারেকশন অব দি অপারেশন্স ইন এস্ট্রোনমি
(২৭) দ্য ডিফারেন্টস হাইটস অব দ্য প্ল্যানেটস
(২৮) দ্য ডিরেকশন অব মেক্কা
(২৯) দ্য মডেল অব দ্য মোশন অব ইচ অব দ্য সেভেন প্ল্যানেটস
(৩০) দ্য মোড অব দি ইউনিভার্স
(৩১) দ্য মোশন অব দ্য মুন
(৩২) দ্য রেশিওস অব আওয়ারলি আরক্স টু দেয়ার হাইটস
(৩৩) দি ওয়ান্ডিং মোশন
(৩৪) ট্রীটিজ অন লাইট
(৩৫) ট্রীটিজ অন দি ইনফ্লুয়েন্স অব মেলোডিস অন দ্য সোলস অব এনিম্যালস

সম্মান

ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) ১৯৩৫ সালে এ জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারই ভিত্তিতে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে হাইছামের নামে। ১৫ দশমিক ৯ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৭১ দশমিক ৮ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৩২ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। ১৯৯৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আবিষ্কৃত একটি তারকার নাম রাখা হয় '৫৯৩২৯ আল-হাজেন'। ইবনে আল-হাইছামের সম্মানে পাকিস্তানে আগা খান বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অপথালমোলজি বিভাগের চেয়ারম্যানের নামকরণ করেছে 'দি ইবনে আল-হাইছাম এসোসিয়েট প্রফেসর এন্ড চিফ অব অপথালমোলজি'। ২০০৩ সালে ইরাকের ১০ হাজার দিনারের ব্যাংক নোটে আল-হাইছামের ছবি মুদ্রণ করা হয়। তার আগে ১৯৮২ সালে সে দেশে ১০ দিনারের নোটে তার ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। ইরাকের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল তার নামে। সন্দেহ করা হতো যে, এ গবেষণাগারে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি করছেন।

www.pathagar.com

এনালিটিক্যাল জ্যামিতির জনক ওমর খৈয়াম

এনালিটিক্যাল জ্যামিতির জনক ওমর খৈয়াম ১০৪৮ সালের ১৮ মে ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৩১ সালের ৪ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। তার পূর্ণ নাম গিয়াস আল-দীন আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল-নিশাপুরী আল-খৈয়ামী। সংক্ষেপে তিনি 'ওমর খৈয়াম' নামে পরিচিত। জাতিতে খৈয়াম ছিলেন পার্সী। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পৃথিবীতে তার মতো এমন বিরল প্রতিভা খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি একাধারে ছিলেন একজন কবি এবং অন্যদিকে ছিলেন বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ। তবে বিজ্ঞানী ও কবি হিসাবে তিনি বিশ্বের যতটা মনোযোগ আকর্ষণ এবং প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, দার্শনিক ও শিক্ষক হিসাবে ততটুকু করতে পারেননি। পার্সী মুসলিম পণ্ডিত আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে ওমর আল-জামাখশারি তাকে 'বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। গণিত, দর্শন ও সাহিত্য ছাড়া তিনি মেকানিক্স, ভূগোল ও সঙ্গীতের ওপরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। ওমর খৈয়াম কোপার্নিকাসের আগে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীসহ গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ করার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

আক্ষরিকভাবে 'আল-খৈয়ামী' শব্দটির মানে হলো 'তাঁবু নির্মাতা'। তার পিতা ইব্রাহিম ছিলেন একজন তাঁবু নির্মাণকারী। প্রথম জীবনে খৈয়াম তাঁবু নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ কাজকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই নিশাপুরে তার সমাধিকে একটি তাঁবুর মতো দেখায়। খৈয়াম রুবাইয়াত লিখেছেন ফারসিতে। অন্যদিকে আরবী পারস্যের সরকারি ভাষা হওয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলো লিখেছেন আরবীতে।

গণিতে অবদান

খৈয়াম মধ্যযুগে নিজেকে একজন খ্যাতনামা গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গণিত জগতে তিনিই প্রথম এনালিটিক্যাল জ্যামিতির কল্পনা করেছিলেন। একজন গণিতজ্ঞ হিসাবে খৈয়াম গাণিতিক দর্শন বিশেষ করে পার্সী গণিত ও পার্সী দর্শনে মৌলিক অবদান রেখেছেন। গাণিতিক দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে সিনার মতো বিগত পার্সী দার্শনিকদের গ্রন্থের আলোকে খৈয়াম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গাণিতিক বিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানেন। তিনি দু'টি বিজ্ঞানের মধ্যকার সীমানার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন এবং ইবনে আল-হাইছাম এ রীতি ভঙ্গ করে একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করায় তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

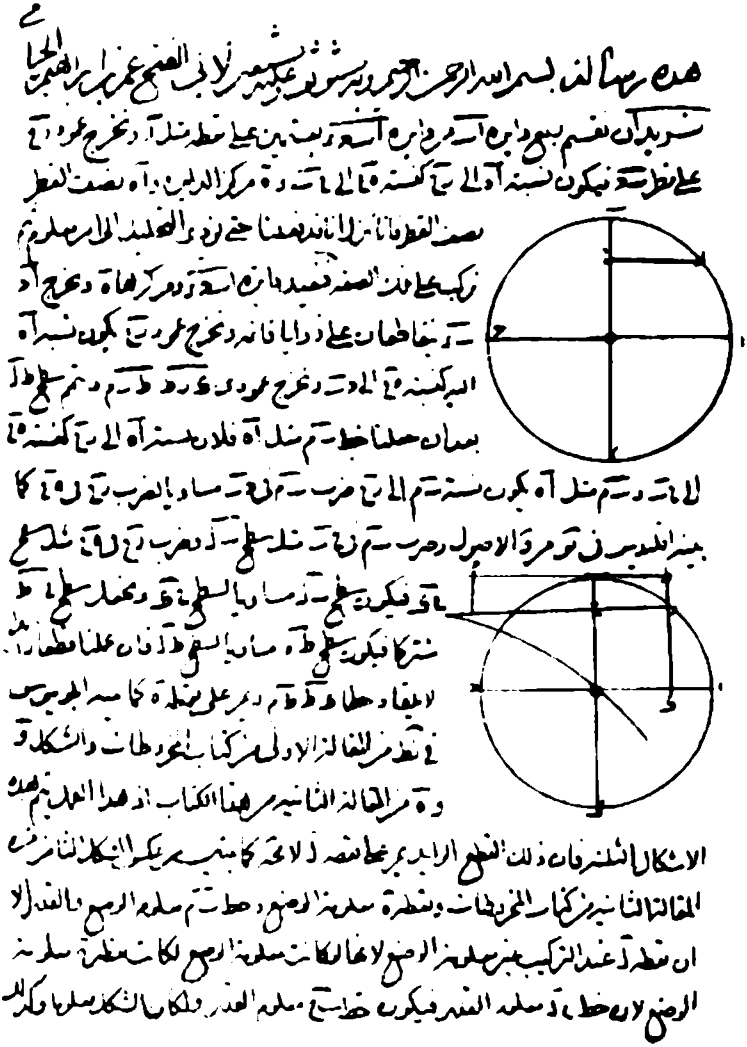

খৈয়ামের নিজের হাতে লেখা ঘন সমীকরণ ও কোণ দ্বিখণ্ডিতকরণের একটি বিবরণী

www.pathagar.com

খৈয়াম আধুনিক যুগের আবির্ভাবের আগে এলজাব্রা বা বীজগণিতের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক হিসাবে স্বীকৃত। বীজগণিতের ওপর তিনি তিনটি বই লিখেছেন। প্রথম বইটির নাম 'মুশকিলাত আল-হিসাব', দ্বিতীয় বইটির নাম 'শারাহ-ই-মুসকিল মিন কিতাব আল-মুসিকী' এবং তৃতীয় বইটির নাম 'রিসালা ফি আল-বারাহিন আলা মাসায়েল আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা'। খৈয়ামের তৃতীয় বইটি 'ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা' হিসাবে পরিচিত। ইংরেজি অনুবাদে বইটির শিরোনাম হলো 'দি এলজাব্রা অব ওমর খৈয়াম'। ১০৭০ সালে লিখিত বইটি সংক্ষেপে 'মুকাবিলা' নামেও পরিচিত। গ্রন্থটি লেখার সময় খৈয়ামের বয়স ছিল ২৫ বছরের কম। তাতে তিনি একটি ক্ষেত্রকে বৃত্তের সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে ঘন সমীকরণ সমাধানের জ্যামিতিক পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এলজাব্রার সমীকরণগুলোর শ্রেণী বিন্যাসের চেষ্টা করেন। জ্যামিতির সমাধানে বীজগণিত এবং বীজগণিতের সমাধানে জ্যামিতিক পদ্ধতি তারই বিস্ময়কর আবিষ্কার। এক পর্যায়ে এলজাব্রার ওপর লেখা খৈয়ামের তৃতীয় গ্রন্থটি ইউরোপে প্রবেশ করে। এ গ্রন্থে তিনি প্যাসকেলের ত্রিভুজ হিসাবে পরিচিত দ্বিপদ সহগের ট্রায়াঙ্গলার বিন্যাস ঘটান।

ইসলামের স্বর্ণযুগে এলজাব্রার ওপর খৈয়ামের লিখা 'মুকাবালা' ছিল চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পুস্তক। বিজ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির এলজাব্রা বই প্রকাশিত হওয়ার আড়াই শ' বছর পর খৈয়াম 'ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা' রচনা করেন। ইসলামী যুগে এলজাব্রার বিশেষজ্ঞগণ কোনো অজ্ঞাত সংখ্যার পরিমাণ জানার জন্য 'শাই' শব্দ ব্যবহার করতেন। খৈয়ামও 'শাই' শব্দটি ব্যবহার করতেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ঘন সমীকরণের একাধিক সমাধান থাকতে পারে। খৈয়াম সমীকরণের দু'টি সমাধানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি প্রমাণ করতে পারেননি যে, কোনো ঘন সমীকরণের তিনটি সমাধানও থাকতে পারে। মনে হয় তিনি গাণিতিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার আশা করছিলেন।

আনুমানিক ১২২৫ সালের দিকে ইতালীয় গণিতজ্ঞ লিওনার্দো ফিবোনাসি মহামান্য পোপের অনুরোধে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজদরবারে যান। সম্রাট ইউরোপের শীর্ষ গণিতজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। আলাপ আলোচনার সময় রাজদরবারের গণিতজ্ঞ ফিবোনাসিকে তিনটি গাণিতিক সমাধান দেয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। ফিবোনাসি খৈয়ামের 'মুকাবিলা'র অনুসরণে সমাধান দিতে সক্ষম হন। ফিবোনাসির 'লাইবার আবাসি'র 'ফ্লোজ' (Flowers) অধ্যায়ে এসব সমাধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গণিতজ্ঞ কাসির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড ইউজেন স্মিথের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে খৈয়ামের 'ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে এবং ইংরেজ গণিতবিদ উইপিক লাইডেন লাইব্রেরিতে গবেষণা চালান। ১৮৫১ সালে উইপিক পাণ্ডুলিপিটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বইটির

www.pathagar.com

আরবী পাণ্ডুলিপির প্রথম দুই পংক্তিতে এক লাইনে বর্ণিত সমান্তরাল সমীকরণের সহজতম সমাধান হলো: $2x-3=4x+2$। এটি হলো $x=-5^2$ এর একক সমাধান। x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার এক হওয়ায় এটি একটি সমান্তরাল সমাধান। পরবর্তী সমাধানটি হলো দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান। এ সমাধানটি হলো: $ax^2+bx=c=0$

১০৭৭ সালে খৈয়াম 'শারাহ মা আশকালা মিন মুসাদারাত কিতাব ইউক্লিডিস' রচনা করেন। বইটি 'অন দ্য ডিফিকাল্টিজ অব ইউক্লিডস ডেফিনিশন্স' শিরোনামে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে ইউক্লিডের বিখ্যাত সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় ছাবেত বিন কোরা আকৃষ্ট হন। তার আগে আল-হাইছাম এ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করেন। খৈয়ামের প্রচেষ্টা ছিল আরেক ধাপ অগ্রগতি এবং ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের জটিলতাগুলো ইউরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

পার্সী গণিতবিদ নাসিরুদ্দিন তুসি ১৩৮৭-৮৮ সালে বইটির পাণ্ডুলিপি পুনরায় লিখেছেন। এ পাণ্ডুলিপিই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তুসি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেছেন, তিনি খৈয়ামের ভাষায় বইটি পুনরায় লিখেছেন। খৈয়ামের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, *'বইটিতে ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস'-এর ২৮ নম্বর সম্পাদ্য থেকে পরের অংশটুকু যোগ করতে হয়েছে।'* ২৮ নম্বর সম্পাদ্যে সমতল ক্ষেত্রে পরস্পর সমান্তরাল দু'টি বাহু অঙ্কনের পর্যাপ্ত একটি শর্তের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী ২৯ নম্বর সম্পাদ্য হচ্ছে ২৮ নম্বর সম্পাদ্যের বিপরীত। ইউক্লিডের প্রমাণে তথাকথিত সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ (৫ নম্বর স্বতঃসিদ্ধ) ব্যবহার করা হয়েছে। সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি এবং ২৯ নম্বর সম্পাদ্যের বিকল্প খুঁজে বের করা ছিল ইউক্লিডের প্রভাবমুক্ত জ্যামিতি উদ্ভাবনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। খৈয়ামের বইটিকে সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ স্বতঃসিদ্ধ 'প্যাটিশিও প্রিন্সিপি' বা আনুমানিক সংখ্যাভিত্তিক নয় বরং এটি হচ্ছে আরো স্বজ্ঞাত সম্পাদ্য। খৈয়াম এ সম্পাদ্য প্রমাণে গ্রীক ও পার্সী গণিতজ্ঞদের প্রচেষ্টা ভুল হিসাবে আখ্যা দেন। এরিস্টোটলের মতো তিনিও জ্যামিতিতে গতিসূত্র ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানান এবং ইবনে হাইছামের ভিন্নতর প্রচেষ্টা নাকচ করে দেন। এ উদ্দেশ্যে খৈয়াম সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধের বিকল্প হিসাবে ইউক্লিডের প্রভাবমুক্ত একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান।

জ্যামিতিক এলজাব্রা

খৈয়ামের প্রচেষ্টা ইউক্লিডের প্রভাবমুক্ত জ্যামিতি উদ্ভাবনে অবদান রাখে। তিনি জ্যামিতি বিশেষ করে আনুপাতিক তত্ত্বের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা চালান। বিংশ শতাব্দীতে খৈয়ামের ঘন সমীকরণের ওপর শিরোনামবিহীন একটি বই উদ্ধার করা হয়। বইটিতে তিনি লিখেছেন, *'যে ব্যক্তি অজ্ঞাত সংখ্যা বের করার জন্য এলজাব্রাকে একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে সেই ব্যক্তির চেষ্টা ব্যর্থ। এলজাব্রা ও জ্যামিতি দৃশ্যত ভিন্ন। এ সত্য নিয়ে কারো মাথা ঘামানো উচিত নয়। এলজাব্রাতে জ্যামিতির সূত্র*

www.pathagar.com

রয়েছে। এসব সূত্র ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৫ ও ৬ নম্বর সম্পাদ্যে প্রমাণ করা হয়েছে।' খৈয়াম জ্যামিতিক এলজাব্রার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। প্রথমে তিনি একটি বৃত্তের চতুর্ভুজে বিন্দু খুঁজে বের করার চেষ্টা চালান। আবার এ সমস্যা সমাধানে একটি সঠিক ত্রিভুজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এ জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে তিনি একটি পরিধি নির্দিষ্ট করেন এবং $X^3 + 200X = 20^2 + 2000$ ঘন সমীকরণে পৌছান। বস্তুত তিনি একটি আয়তাকার পরাবৃত্ত দ্বিখণ্ডিত করে এই ঘন সমীকরণের একটি ইতিবাচক মূল বের করেন। এভাবে তিনি ত্রিকোণমিত্রিক তালিকা প্রক্ষেপের মধ্য দিয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যাগত সমাধান খুঁজে পান। খৈয়াম উল্লেখ করেছেন, এ ঘন সমীকরণ সমাধানে কোণ ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং রুলার ও কম্পাস পদ্ধতির মাধ্যমে তা সমাধান করা যাবে না। তার মৃত্যুর সাড়ে ৭শ' বছর পর এ অসম্ভব ঘন সমীকরণ প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছিল। খৈয়াম তার ১৪ টি ঘন সমীকরণের প্রত্যেকটির পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন্স অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা' রচনা করেন। এ গ্রন্থে ঘন সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধানের একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। কোণগুলোর পারস্পরিক ছেদনের মাধ্যমে তিনি এ সমাধান দেন। তারপর তিনি সরল, স্থূল ও সূক্ষ্ম কোণ ছেদন করার প্রচেষ্টা চালান এবং অভিমত দেন যে, সাচারির চতুর্ভুজের শীর্ষ কোণগুলো ছেদন করা সম্ভব। এ সংক্রান্ত কয়েকটি তত্ত্ব প্রমাণ করার পর তিনি তার নিজের স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে নির্ভুলভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম কোণ ছেদন করেন এবং ইউক্লিডের প্রাচীন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণে সক্ষম হন।

আধুনিক বিচারে বীজগণিতে ঘন সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। খৈয়াম নিজেও ঘন সমীকরণের গাণিতিক সমাধানের ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। সচেতন হলেও তিনি এ সমীকরণের গাণিতিক সমাধান দেননি। ষোড়শ শতাব্দীতে গিরিলামো কার্ডানো ছাড়া অন্য কোনো গণিতজ্ঞ অনুরূপ চেষ্টা করেননি। নিজের কাজের ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে খৈয়াম ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, *'গ্রীকরা ঘন সমীকরণ সমাধানে কোনো তত্ত্ব দিয়ে যাননি।'* তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, মাহানি ও খাজিনের মতো ইতিপূর্বের লেখকরা জ্যামিতির সমস্যাগুলোকে এলজাব্রার সমীকরণে রূপান্তরিত করেছেন। খৈয়াম হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘন সমীকরণের একটি সার্বিক তত্ত্ব উপস্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। তার এ তত্ত্ব এনালিটিক্যাল জ্যামিতি উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করেছে।

এনালিটিক্যাল জ্যামিতির উদ্ভাবক

গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড জ্যামিতির জনক হলেও খৈয়াম হলেন এনাটিক্যাল জ্যামিতির উদ্ভাবক। খৈয়ামকে জ্যামিতির এ শাখার উদ্ভাবক হিসাবে স্বীকার করে গণিতজ্ঞ বয়ার 'দি এরাবিক হিজিমনি'র ২৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'The eleventh century Persian mathematician Omar Khayyam saw a strong relationship between geometry and algebra and was moving in the right direction when he helped close the gap*

www.pathagar.com

between numerical and geometric algebra with his geometric solution of the general cubic equations, but the decisive step came later with Descartes.'

অর্থাৎ *'একাদশ শতাব্দীর পার্সী গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়াম জ্যামিতি ও বীজগণিতের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক দেখতে পেয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হন। তিনি সাধারণ ঘন সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান দেয়ার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগত ও জ্যামিতিক বীজগণিতের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে আনতে সহায়তা করেন। তবে পরবর্তীতে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ডেসকার্টেস।'*

ওমর খৈয়াম

www.pathagar.com

দ্বিপদ উপপাদ্য এবং বর্গমূল

এলজাব্রায় খৈয়ামের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে 'বাইনোমিয়াল থিওরেম' বা দ্বিপদ উপপাদ্য। এ সূত্র সর্বপ্রথম তিনি আবিষ্কার করলেও কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞানী নিউটনকে। এ ব্যাপারে খৈয়াম তার 'ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা'তে লিখেছেন, *'ভারতীয়রা ৯টি পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ ও ঘন মূল বের করার পদ্ধতি জানে। যেমন- ১, ২, ৩-এর বর্গ এবং ১, ২ ও ৩-এর ঘন। আমি এ পদ্ধতির সত্যতা প্রমাণে একটি প্রবন্ধ লিখেছি। আমার প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে। এছাড়া আমি চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ থেকে শুরু করে যে কোনো সংখ্যার বর্গ নির্ধারণে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি এবং ইউক্লিডের 'দি এলিমেন্টস'-এর ভিত্তিতে ঐসব প্রমাণ পুরোপুরি গাণিতিক।'*

খৈয়াম তার বইয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতে গণিতের ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করছেন, যে কোনো ঘাতের দ্বিপদ উপপাদ্যের সমাধান খৈয়ামের জানা ছিল। ইউক্লিডের এলিমেন্টসে সুস্পষ্টরূপে দ্বিঘাত সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ত্রিঘাত পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। খৈয়াম সাধারণ দ্বিপদ উপপাদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যে কোনো বর্গ মূল বের করার দক্ষতা সম্পর্কে তার উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি একটি সাধারণ উপপাদ্যের সমাধান বের করার পদ্ধতি জানতেন।

সাচারির দ্বিপদ সমীকরণের সমাধান

একাদশ শতাব্দীতে প্রথম ওমর খৈয়াম তার 'রিসালা ফি শার্থ মাশকালা মিন মুসা দারাত কিতাব ইউগলিডিস' (ডিসকাশন অব ডিফিকাল্টিজ ইন ইউক্লিডস)-এ সাচারির দ্বিপদ সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা করেন। তার এ সমাধান 'সাচারি-খৈয়াম কোয়াডরিল্যাটার‍্যাল' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতালীয় জেসুইট যাজক ও গণিতজ্ঞ গিওভানি গিরলামো সাচারি ব্যাপকভাবে 'ইউক্লিড'স প্যারালাল' বা ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করেন। তার নামে ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ 'সাচারি কোয়াডরিল্যাটার‍্যাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। সাচারি কোয়াডরিল্যাটার‍্যাল বলতে এমন একটি চতুর্ভুজকে বুঝায় যার ভূমি থেকে খাড়া দু'টি বাহু সমান। খৈয়াম 'ট্রীটিজ অন ডেমোন্সট্রেশন অব প্রবলেমস ইন এলজাব্রা'য় ইউক্লিড বহির্ভূত জ্যামিতিতে অবদান রাখেন। এমন কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে তিনি ইউক্লিড বহির্ভূত জ্যামিতিক সংখ্যাগুলোর ধর্ম প্রমাণ করে ফেলেন। জ্যামিতিতে ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে পরিচিত।

'রিসালা ফি শার্থ মাশকালা মিন মুসা দারাত কিতাব ইউগলিডিস'-এ কয়েকটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগের শিরোনাম 'অন দ্য প্যারালাল পসচিউলেট', দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম 'অন দি ইউক্লিডিয়ান ডেফিনিশন অব রেশিও এন্ড দি এনথিফায়ারটিক

www.pathagar.com

রেশিও', (আধুনিক অবিরত ভগ্নাংশ) এবং তৃতীয় অংশের শিরোনাম 'অন দ্য মালটিপ্লিকেশন অব রেশিও'। বইটির প্রথম অংশে কয়েকটি সম্পাদ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। খৈয়াম ইউক্লিডের সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করার চেষ্টা না করলেও দার্শনিক এরিস্টোটলের নীতির ভিত্তিতে তার নিজের তৈরি একটি সমমানের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, *'কেন্দ্রমুখী দু'টি সমান্তরাল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে এবং যেখানে দু'টি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে সেখান থেকে তাদের বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয়।'*

সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে গবেষণা শেষ হওয়ার পর খৈয়াম স্থূল, ঋজু ও সরল কোণ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখতে পান যে, সাচারির কোয়াডরিল্যাটার‍্যালে একটি শীর্ষ বাহু থাকতে পারে। কয়েকটি উপপাদ্য প্রমাণ করার পর তিনি তার নিজের স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে সঠিকভাবে স্থূল ও সরল কোণ খণ্ডন করেন এবং এভাবে তিনি ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন। ৬ শ' বছর পর ইতালীয় গণিতজ্ঞ গায়ারদানো ভিতালি তার বই 'ইউক্লাইড রেসটিটিউ'তে খৈয়ামের গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি প্রমাণ করেন, ভূমির AB এবং শীর্ষ CD বাহু সমান দূরবর্তী হলে AB ও CD বাহু একটি অন্যটি থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। খৈয়াম প্যাসকেলের ত্রিভুজ নিয়ে গবেষণা চালান। তার আগে আল-কারাজি এ ত্রিভুজ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন।

খৈয়ামের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত

নিশাপুর ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে ছিল প্রসিদ্ধ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে খ্যাতনামা উলামায়ে কেরামের সমাবেশ ঘটতো। এ মনোরম পরিবেশে খৈয়ামের শিক্ষা লাভ শেষ হয়। খৈয়াম পৈতৃক শহর নিশাপুরে কয়েক দশক ইবনে সিনার দর্শন শিক্ষা দেন। এখানে তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। একাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি খৈয়ামের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে সময় সেলজুক তুর্কিরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া আক্রমণ করে এবং মেসোপটেমিয়া, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরানের অধিকাংশ ভূখণ্ড নিয়ে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সেলজুকরা খোরাসানের সবুজ তৃণভূমি গ্রাস করে এবং ১০৩৮ থেকে ১০৪০ সালের মধ্যে তারা উত্তর-পূর্ব ইরান দখল করে। ১০৩৮ সালে সেলজুক শাসক তোঘরিল বেগ নিজেকে নিশাপুরের সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ১০৫৫ সালে বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেলজুক সুলতান তোঘরিল বেগ সাম্রাজ্যে ইসলামী শাসন কায়েম করার চেষ্টা করেন। এমন এক পরিবেশে খৈয়াম বড় হতে থাকেন। শৈশবের একটি অংশ তিনি আফগানিস্তানের বলখে কাটান। সেখানে তিনি শেখ মোহাম্মদ মনসুরীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি মোয়াফাক নিশাপুরীর অধীনে অধ্যয়ন করেন। মোয়াফাক নিশাপুরীকে খোরাসান অঞ্চলের মহান শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। প্রাচ্যের কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, খৈয়াম ইবনে সিনার ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

নিজের একটি কবিতায় খৈয়াম তাকে ইবনে সিনার আদর্শের অনুসারী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। তবে ইবনে সিনার সরাসরি ছাত্র না হলেও তিনি ছিলেন তার ভাবাদর্শে বিশ্বাসী।

নিশাপুরে খৈয়াম অংকশাস্ত্রের ওপর তার বিখ্যাত বই 'মুকাবালা' রচনা করেন। এতে এ শাস্ত্রের নানা ফর্মুলার উল্লেখ ছিল। নিশাপুরের ক্ষমতাসীনরা পুস্তকটি সুনজরে না দেখায় তিনি ভীষণ ব্যথিত হন। তার প্রতিভার প্রতি স্বদেশের সুধী গুণীজনদের অমর্যাদা তাকে দারুণভাবে আহত করে। তাই তিনি ১০৭০ সালে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক শহর সমরকন্দে স্থানান্তরিত হন। সেখানে বিখ্যাত আইনজ্ঞ আবু তাহির তাকে সহায়তা করেন। এ সহায়তা এলজাব্রার ওপর তাকে তার বিখ্যাত বই লেখার সুযোগ দেয়। সমরকন্দ থেকে তিনি বুখারায় আসেন এবং নিজেকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় সমরকন্দে এক মহাজ্ঞানী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। তার নাম ছিল আবু তাহের। তিনি ছিলেন শামসুল মুলকের (ইলখানি) ঘনিষ্ঠজনদের একজন। খৈয়ামের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা দেখে তিনি তাকে সরকারি কাজে নিয়োগ দেন এবং তার প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করেন। আবু তাহের নিজেও ছিলেন অংকশাস্ত্রের প্রতি দুর্বল। তারই অনুপ্রেরণায় খৈয়াম 'মুকাবালা' রচনা করেন। তিনি ২৮ বছর বয়সে ১০৬৭ সালে সমরকন্দে 'মুকাবালা'সহ তার দু'টি পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন এবং ৭ বছর কঠোর সাধনার পর ১০৭৪ সালে শেষ করেন।

সৌর পঞ্জিকা

খৈয়ামের এলজাব্রার সূত্র বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করায় সেলজুক সুলতান তার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। অংক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ হিসাবে তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তোঘরিল বেগ ইস্পাহানকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন এবং তার দৌহিত্র মালিক শাহ ১০৭৩ সালে এ নগরীর শাসনভার লাভ করেন। মালিক শাহ ওমর খৈয়ামের কাছে একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠান। তার উজির নিজাম উল মুলক একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য খৈয়ামকে আসার জন্য অনুরোধ করেন। হিজরী ৪৬৭ সালে দূর দূরান্তের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নক্ষত্র বিশারদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শীদের ডাকা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন আবুল মোজাফফর ইস্তেফজারী, মায়মুন ইবনে নাজীব ওয়াসেতী এবং ওমর খৈয়াম। মালিক শাহ সেলজুক ওমর খৈয়ামকে মানমন্দির নির্মাণ পরিষদের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেন। অন্যান্য শীর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানীকেও ইস্পাহানের মানমন্দিরে আনা হয়। ১৮ বছর খৈয়াম এসব বিজ্ঞানীর নেতৃত্ব দেন এবং অসাধারণ কাজ করেন। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকায় তিনি পুরোপুরি তার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান। এসময় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী সংকলন করেন এবং ১০৭৯ সালে পঞ্জিকা সংস্কারে অবদান রাখেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, *'এ মানমন্দির নির্মাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। খৈয়ামই এ মানমন্দিরের*

www.pathagar.com

জিজ বা মডেল তৈরি করেন।' একই ঐতিহাসিকের লেখা থেকে আরো জানা যায়, মালিক শাহের দরবারে ওমর খৈয়ামের একটি স্মরণীয় কীর্তি হচ্ছে 'জালালী ক্যালেন্ডার'। এ জালালী ক্যালেন্ডার মালিক শাহ তার সাম্রাজ্যে প্রবর্তন করেছিলেন। মালিক শাহ জালালীর নামানুসারে এ ক্যালেন্ডারের নামকরণ করা হয় 'আত তারিখ আল জালালী' বা জালালী সাল।

মালিক শাহের অল্পবয়স্ক পুত্র সাঞ্জারের একবার বসন্ত হয়েছিল এবং চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময় ওমর খৈয়ামকে তলব করা হয়। তার চিকিৎসায় সাঞ্জার আরোগ্য লাভ করেন। খৈয়ামের এ সাফল্যে মালিক শাহ তাকে রাজদরবারের শাহী তবীব অর্থাৎ রাজকীয় চিকিৎসকের পদে নিয়োগ দান করেন। সাঞ্জার সুলতান হওয়ার পর তিনি খৈয়ামকে অত্যন্ত ভক্তি সম্মান করতেন এবং রাজদরবারে সিংহাসনের পাশে তাকেও আসন প্রদান করতেন। তিনি খৈয়ামকে বার্ষিক ১ হাজার ২ শ' স্বর্ণমুদ্রা পেনশন দিতেন।

খৈয়াম সরকারের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করেন যে, ধর্মীয় বিষয়াদি যেমন-হজ, ঈদ, রমজান প্রভৃতি নির্ধারণ করা হবে চান্দ্র ও জালালী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি যেমন-রাজস্ব, উসুল এবং বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হবে ইরানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। মালিক শাহের মানমন্দিরে তিনি আকাশ সম্পর্কীয় যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ চালান তার ভিত্তিতে সৌর বর্ষের দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৪২১৯৮৫৮১৫৬ দিন বা ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট নির্ধারণ করেন। খৈয়াম সৌর ক্যালেন্ডারে প্রত্যেক চতুর্থ বর্ষ বা লীপ ইয়ারে একদিন বাড়িয়ে দেন। তার উদ্ভাবিত সৌর পঞ্জিকায় প্রতি ৩৩ বছরে লীপ ইয়ার ৬টি। খৈয়াম বর্ণিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস সবসময় সঠিক হতো এবং বাদশাহ এ ব্যাপারে তার শরণাপন্ন হতেন। ১০৭৯ সালের ১৫ মার্চ সেলজুক সুলতান মালিক শাহ খৈয়ামের সংশোধিত সৌর পঞ্জিকা গ্রহণ করেন। একাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৃহত্তর ইরানে এ পঞ্জিকা চালু ছিল। খৈয়াম উদ্ভাবিত পঞ্জিকাকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভুল পঞ্জিকা হিসাবে গণ্য করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞদের মতে, এ পঞ্জিকা জুলিয়ান পঞ্জিকার চেয়ে অনেক বেশি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। ঐতিহাসিক গিবনের মতে,*'The computation of this calender surpasses the Julian and approaches the accuracy of the Gregorian style.'* অর্থাৎ *'এ পঞ্জিকার গণনা জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে অতিক্রম করেছে এবং গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের নির্ভুলতার কাছাকাছি পৌঁছেছে।'* হিসাব করে দেখা গেছে, খৈয়াম উদ্ভাবিত পঞ্জিকায় প্রতি ১০ হাজার বছরে দিন ও মাসের হেরফের হয় সামান্য। খৈয়াম একটি স্টার ম্যাপ আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানে বিলুপ্ত এ স্টার ম্যাপ ইরান ও মুসলিম বিশ্বে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

দর্শন

খৈয়াম ছিলেন একজন সুফি দার্শনিক। তিনি দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 'ফালসাফি' বা ফিলসোফার উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

www.pathagar.com

দর্শনের ওপর তিনি পাঁচটি বই লিখেছেন। তার প্রথম বইটির নাম 'রিসালা ফি কুল্লিয়াত আল-ওয়াজুদ', দ্বিতীয় বইটির নাম 'আল-জাবাব আল-সালাসা', তৃতীয় বইটির নাম 'মাসায়েল জারুরাতু,' চতুর্থ বইটির নাম 'তাজাদ ফি আল-আলম ওয়াল জাবর ওয়াল-বাকা' এবং পঞ্চম বইটির নাম 'রিসালাত আল-কাওন ওয়াল তাকলিফ'।

'রিসালাত আল-কাওন ওয়াল তাকলিফ' হলো দর্শনে খৈয়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি ইবনে সিনার 'মাশা' দর্শন অনুসরণ করতেন এবং আত্মজিজ্ঞাসার ওপর জোর দিতেন। তিনি নিজের কাছে জানতে চান, পাপ করা ব্যক্তির জন্য স্বাভাবিক হলে কৃতকর্মের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে কেন? অথবা বেহেশতে যেসব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার অনুমতি দেয়া হবে পার্থিব জীবনে মানুষকে কেন সেসব সুখের উপকরণ ভোগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে? মানুষ তো এক ক্ষুদ্র নগণ্য জীব। সে তার নিজের অস্তিত্ব এবং জীবনের শুরু অথবা শেষ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়। অথবা বৃহত্তর পারলৌকিক জীবনে তার অবস্থান ও ভূমিকাও তার কাছে অজানা। তাহলে সৃষ্টি করার পর স্রষ্টা কেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করবেন?

খৈয়াম ছিলেন আল-ফারাবির চিন্তাধারার কাছাকাছি। তিনি তার নিজ শহর নিশাপুরে কয়েক দশক পর্যন্ত আমৃত্যু ইবনে সিনার দর্শন বিষয়ক বই 'দ্য বুক অব হীলিং' শিক্ষা দিতেন। আবুল বারাকাত নামে একজন দার্শনিক ইবনে সিনার কঠোর সমালোচনা করেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে খৈয়াম বলেন, তিনি ইবনে সিনার দর্শনের একটি শব্দের অর্থও অনুধাবনে সক্ষম নন। যা তিনি জানেন না তার জবাব দেবেন কিভাবে। আরেকটি ঘটনায় ইমাম গাজ্জালি (র.) তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, '*কোনো গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের ওপর ঘুরতে থাকে গোলকের সব অংশ এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি কিভাবে আলাদা করে জানা সম্ভব?*' এ প্রশ্নের জবাব দানে খৈয়াম তখনি অংকের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেলেও তার ব্যাখ্যা শেষ হয়নি। জবাবে ইমাম গাজ্জালি (র.) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, '*সত্যের সন্ধান পেয়ে মিথ্যার যবনিকাপাত হলো। ইতিপূর্বে আমার যে ধারণা ছিল তা মিথ্যা।*'

খৈয়াম গ্রীক দর্শন শিক্ষা দিতেন এবং সেই দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথা জানাজানি হওয়ায় সাধারণ লোকের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ তাকে 'কাফের' হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন বাধ্য হয়ে তিনি হজ করতে মনস্থ করেন। পবিত্র হারাম শরীফে কাউকে হত্যা করা যায় না বলে তিনি হজ করতে যান। হজ সম্পন্ন করে তিনি বাগদাদ যান। তার আগমনের কথা শুনে বাগদাদের লোকেরা চারদিক থেকে এসে তাকে ঘিরে ধরে। তারা তার কাছ থেকে দর্শন শিখতে চাইছিল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং বাগদাদ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন।

পদার্থ বিজ্ঞান

খৈয়াম মেকানিক্স ও পদার্থ বিজ্ঞানেও অবদান রেখেছেন। তিনি তার 'মিজান আল-হিকাম' নামে একটি গ্রন্থে পদার্থে স্বর্ণ ও রূপার পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

এফ. রোসেন 'দ্য ব্যালেন্স অব উয়িজডোমস' (The Balance of Wisdoms) শিরোনামে ইংরেজিতে বইটি অনুবাদ করেন। সঙ্গীতের ওপর খৈয়ামের লিখা একটি বই হারিয়ে গেছে। তিনি তার একটি জ্যামিতি বইয়ে সঙ্গীত বিষয়ক বইটির কথা উল্লেখ করেছেন।

খৈয়ামকে নাস্তিক হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা

সুফি দার্শনিক ওমর খৈয়ামকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বিশেষ করে তার রুবাইয়াতের ইংরেজি অনুবাদক ফিটজেরাল্ড নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী হিসাবে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। স্বজাতি ইরানিরা এ মহান সুফি সাধকের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করায় ফিটজেরাল্ড এ সুযোগ পেয়ে যান। এ সুযোগে তাকে মদ পিয়াসী এবং নারীভোগী হিসাবে চিত্রিত করা হয়। মূলত ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়েই খৈয়াম তার জাতির কাছে পরিচিত হন। খৈয়ামের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ইরানি ঐতিহাসিক এস. এইচ. নাসির লিখেছেন, '*If a correct study of the authentic rubaiyat is done, but along with the philosophical works, or even the spiritual biography entitled Sayr wa sulak, we can no longer view the man as a simple hedonistic wine lover or even an early skeptic, but a profound mystical thinker and scientist whose works are more important than some verses.*'

অর্থাৎ '*দার্শনিক কর্মের পাশাপাশি রুবাইয়াত নিয়ে নির্ভুল গবেষণা করা হলে অথবা সায়ার ওয়া সুলক শিরোনামের আধ্যাত্মিক জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হলে আমরা এ মানুষটিকে আর ভোগবাদী মাদক পিয়াসী অথবা প্রাথমিক জীবনে তাকে ধর্মের প্রতি সংশয়বাদী হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারবো না। বরং আমরা তাকে দেখতে পাবো একজন আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী হিসাবে যার কর্ম কয়েকটি কবিতার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।*'

ঐতিহাসিক সি. এইচ. এ. বাজারিগার্দ আরো সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, '*The writings of Omar Khayyam are good specimens of Sufism but are not valued in the West as they ought to be and the mass of the people know him only through the poems of Edward Fitzgerald which is unfortunate. It is unfortunate because Fitzgerald is not faithful to his master and his model and at times he lays words upon the tongue of the Sufi which are blasphemous. Such outrageous language is that of the eighty first quartrain for instance. Fitzgerald is doubly guilty because he was more of a Sufi than he was willing to admit.*'

অর্থাৎ '*ওমর খৈয়ামের গ্রন্থগুলো হলো সুফিবাদের সুন্দর নমুনা। তবে গ্রন্থগুলো পাশ্চাত্যে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিত ছিল সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। সাধারণ লোক তাকে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের অনূদিত কবিতার মাধ্যমেই চেনে। তাকে এভাবে চেনা দুর্ভাগ্যজনক। দুর্ভাগ্যজনক এজন্য যে, ফিটজেরাল্ড তার প্রভু ও প্রভুর আদর্শের*

www.pathagar.com

প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। মাঝে মধ্যে তিনি এ সুফির কণ্ঠে ধর্মদ্রোহিতামূলক শব্দ তুলে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ৮১টি রুবাইয়াতের ভাষা হলো এ ধরনের অপমানজনক। ফিটজেরাল্ড দু'টি অন্যায় করেছেন। কেননা যতটা স্বীকার করতে চেয়েছেন তিনি (খৈয়াম) ছিলেন তার চেয়ে বেশি সুফি।'

ওমর খৈয়াম সুফি সাধক হলেও মাওলানা রুমি, ফরিদউদ্দিন আত্তার ও সানাইয়ের মতো আধ্যাত্মিক সুফিদের মতো বিশাল মাপের ছিলেন না। ফিটজেরাল্ড বিকৃতভাবে অনুবাদ করায় রুবাইয়াতের প্রকৃত বাণী অনুধাবন করা কঠিন হয়ে উঠে। রুবাইয়াতের প্রতিটি ছত্রের একাধিক অর্থ হয়। খৈয়াম সুরা ও অপ্সরী সুন্দরীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি মদ্যপায়ী অথবা নারীভোগী ছিলেন। ইহ ও পারলৌকিক চিরন্তন সুখের প্রতীক হিসাবে তিনি সুরা ও নারীর কথা উল্লেখ করেছেন। সুরা পাত্র বলতে তিনি আক্ষরিক অর্থে সুরা পানের কোনো পাত্রের কথা বুঝাতে চাননি। সুরা পাত্রের প্রতীক ব্যবহার করে তিনি এক অপার্থিব সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

খৈয়ামের অভিমান

ইরানি গবেষকগণ খৈয়ামের একটি ভাষ্য উদ্ধার করেছেন। এ ভাষ্যে সহকর্মী পণ্ডিতদের সঙ্গে তার অস্বস্তিকর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। এ ভাষ্যে তিনি মন্তব্য করেছেন, *'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে বিজ্ঞানীদের অপবাদ দেয়া হয়। এজন্য মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত থাকছেন। আমাদের দার্শনিকগণ সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটাতে তাদের পুরো সময় ব্যয় করছেন এবং তারা বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আগ্রহী নন। তাদের বিদ্যা অত্যন্ত সামান্য। এ সামান্য বিদ্যাকে তারা তাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ব্যবহার করছেন। কিন্তু যখনি তারা নির্ভেজাল সত্যের অনুসন্ধানে কাউকে নিয়োজিত দেখেন তখনি তারা তাকে উপহাস করেন এবং তাকে ঘৃণা করেন।'*

উল্লেখিত ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, খৈয়াম নিজেকে বিজ্ঞানী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না। তিনি তার স্বাধীন মত প্রকাশে দার্শনিক এপিকিউরাসকে অনুসরণ করতেন। আবেগে কখনো কখনো বেসামাল হয়ে যেতেন। তার বেসামাল অবস্থার উক্তিগুলোকে তাকে নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজ পণ্ডিত রবার্টসন বিশ্বাস করেন, খৈয়াম ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন না এবং ধর্মের প্রতি তার কোনো অনুরাগ ছিল না। কোনো একটি রুবাইয়াতে খৈয়াম বলেছেন, *'সুরা ও মেয়ে উপভোগ করো। ভয় পেয়ো না। আল্লাহ দয়ালু।'* তার এ উক্তি প্রমাণ করছে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন না। আধুনিক ইরানি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে, খৈয়ামের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। খৈয়ামের প্রতীকী উক্তি এবং তার এপিকিউরিয়ান দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা করায় এমন একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়েছে।

www.pathagar.com

রুবাইয়াত

ওমর খৈয়াম রচিত 'রুবাইয়াত' ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি প্রায় এক হাজার রুবাইয়াত লিখেছেন। তবে জীবদ্দশায় তার কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। ইরান ও ফারসিভাষী দেশগুলোর বাইরে ওমর খৈয়ামের সাহিত্যের অনুবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ পণ্ডিত টমাস হাইড পারস্যের বাইরে প্রথম খৈয়ামকে নিয়ে গবেষণা করেন। ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর ৭৩৪ বছর পর ১৮৫৯ সালে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড তার রুবাইয়াত গ্রন্থ 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাকে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। একই বছর ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের ওপর লেখা বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'অন দ্য অরিজিন অব স্পিশীজ' প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ডে রুবাইয়াত প্রকাশিত হওয়ার ১০ বছর পর আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। ফিটজেরাল্ড খৈয়ামের চার পংক্তির প্রায় ৬ শ' কবিতা অনুবাদ করেন। তবে তিনি অনুবাদ করেছেন তার নিজের ইচ্ছা মতো। রুবাইয়াত শব্দের অর্থ হলো চার ছত্রের কবিতা। খৈয়াম কখনো চার ছত্রের চেয়ে দীর্ঘ কোনো কবিতা লিখেননি। দুনিয়ার বহু ভাষায় রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকদের প্রশংসা লাভ করেছে। বিজ্ঞানে তার অবদান বাদ দিলেও রুবাইয়াতের জন্য তিনি ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে অনেকেই খৈয়ামকে ভুল বুঝতে শুরু করেন। ফিটজেরাল্ড এমনভাবে রুবাইয়াতের অনুবাদ করেন যাতে মনে হয় খৈয়াম নাস্তিক ছিলেন। আসলে তা মোটেও ঠিক নয়। ১৯৩৪ সালে ইরানের অত্যন্ত প্রভাবশালী লেখক সাদেক হেদায়েত 'সংগস অব খৈয়াম' (Songs of Khayyam) শিরোনামে একটি বই রচনার মধ্য দিয়ে খৈয়ামকে তার সত্যিকার চেহারায় ফুটিয়ে তোলেন।

সম্মান

ওমর খৈয়ামের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৭০ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে। ৫৮ দশমিক শূন্য এস দ্রাঘিমাংশ এবং ১০২ দশমিক ১ ডব্লিউ অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৭০ দশমিক শূন্য ৫ কিলোমিটার। '৩০৯৫ ওমর খৈয়াম' নামে একটি গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী লুদমিলা ঝুরাভলিয়োভা এ গ্রহ আবিষ্কার করেন।

রচনাবলী

মহাকালের করাল গ্রাস থেকে ওমর খৈয়ামের ১০টি বই ও ৩০টি প্রবন্ধ রক্ষা পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে চারটি হলো গণিতের, একটি এলজাব্রার, একটি জ্যামিতির, একটি পদার্থবিদ্যার এবং তিনটি মেটাফিজিক্সের ওপর লেখা বই। বইগুলো হলো:

(১) রুবাইয়াত

(২) মিজান-উল-হিকাম

www.pathagar.com

(৩) নিজাম-উল-মুলক

(৪) রিসালা ফি আল-বারাহিন আলা মাসায়েল আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা

(৫) মুশকিলাত আল-হিসাব

(৬) নাওয়াজিম আশকিনা

(৭) আল-কাউল ওয়াল তাকলিক

(৮) রিসালা মুকাবাহ

(৯) দার ইলমে কুল্লিয়াত

(১০) নওরোজ নামা

ইমাম বুখারির মাজারে মৃত্যু

বিশ্ববিখ্যাত এ মনীষী ১১২৩ সালে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর ১২ দিন আগে খৈয়াম ইমাম বুখারীর (র:) মাজারে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। বিশেষ উপদেশ দানে শিষ্যদের শেষবারের মতো ডেকে আনেন। তারপর তিনি অজু করে এশার নামাজ আদায় করেন। শিষ্যদের উপদেশ দানের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। নামাজ শেষে সেজদায় গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, *'হে আল্লাহ, আমি কেবল তোমাকে পাওয়ার জন্য এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দয়া ও করুণার গুণে আমাকে মাফ করে দাও।'* এতটুকু বলে তিনি আর মাথা তোলেননি। সেজদারত অবস্থায় তিনি নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। নিশাপুরে তার সমাধি ইরানি স্থাপত্য কলার একটি মূল আকর্ষণ হিসাবে এখনো বিদ্যমান। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক তার মাজার পরিদর্শন করে থাকে।

www.pathagar.com

সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারকারী আল-কিন্দি

আনুমানিক ৮০০ সালে সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারকারী আল-কিন্দি কুফায় ইয়েমেনের কিন্দা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত মোহাম্মদের (সা.) এর সাহাবা। তার পূর্ণ নাম আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আস সাবাহ ইবনে ওমর ইবনে ইল আল-কিন্দি। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আল-কিন্দাস' (Alkindus) নামে পরিচিত। আল-কিন্দি ছিলেন একজন মুসলিম আরব বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন এরিস্টোটলবাদী প্রথম মুসলিম দার্শনিক। আরব বিশ্বে তিনি গ্রীক ও হেলেনীয় সভ্যতার দর্শন প্রচারের প্রচেষ্টা চালান। আরব ঐতিহাসিকদের ভাষায় তিনি শুধু এরিস্টোটলকে ন্যায়শাস্ত্রের গুরু নয়, তাকে দর্শনের গুরু বলেও মেনে নিয়েছিলেন। তার অতি ভক্তির জন্যই আরবীয় অঞ্চলে এরিস্টোটলীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আরব দার্শনিকদের মধ্যে সিরীয় ভাষায় অনূদিত গ্রীক দর্শন নিয়ে যে সব ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সেগুলো সংশোধন করেন এবং এরিস্টোটলের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পাশ্চাত্য জগতে আল-কিন্দি 'দ্য ফিলসোফার অব অ্যারাব' নামে পরিচিত। তবে তিনি শুধু দর্শন নয়, তখনকার দিনের সব জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা করেছিলেন। কিন্দি তার সময়ে বিজ্ঞানী হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। প্রথমত: তিনি পরিচিত ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষী হিসাবে। তিনি সে সময় জ্যোতিষী হিসাবে খ্যাত ৯ জন পণ্ডিতের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। উদ্ভট ভবিষ্যদ্বাণী করতে এই ৯ জন পণ্ডিত খুবই দক্ষ ছিলেন। এমনি একটি ঘটনায় আল-কিন্দির নাম জড়িত। আব্বাসীয় বংশ কত কাল রাজত্ব করবে সে ব্যাপারে তিনি প্রাচীন পার্সী জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোকে তার 'ট্রীটিজ অন দ্য ডোমিনিশন অব দি অ্যারাবস এন্ড ইটস ডিউরেশন'-এ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার পূর্বাভাস অনুসারে আব্বাসীয় বংশের শাসন ১২৯৩ সাল পর্যন্ত টিকে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ৩৫ বছর আগে ১২৫৮ সালে মোঙ্গল হামলায় আব্বাসীয়রা ক্ষমতাচ্যুত হয়। আব্বাসীয় বংশের শাসন অবসানে আল-কিন্দির ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি সঠিক না হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তার রচনাবলী তাকে কালজয়ী খ্যাতি এনে দিয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, সঙ্গীত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অবদান রেখে গেছেন। রসায়নকে তিনি খুব একটা সুনজরে দেখেননি। তখনকার দিনের রসায়নবিদদের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি।

www.pathagar.com

আল-কিন্দি ছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাসের অন্ধ ভক্ত এবং তার মতবাদে বিশ্বাসী। সঙ্গীতের রাগ রাগিনীকে তিনি গণিতের ছকে ফেলে কয়েকটি বই লিখেছেন। এভাবেই আরব সঙ্গীতে গণিতের প্রবেশ ঘটে। গ্রীক বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই সঙ্গীতের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন। তাই আরবীয় সঙ্গীতে গণিতের প্রয়োগ বিস্ময়কর কোনো ঘটনা ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ এবং গাণিতিক ব্যবস্থাপত্র চালু করার প্রয়াস ছিল আল-কিন্দির উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ওষুধের উপাদানের গুণাগুণের সঙ্গে গণিতের জ্যামিতিক অগ্রগতির সামঞ্জস্য বিধানে আল-কিন্দির উদ্যোগ শুধু অভিনব ছিল তাই নয় বরং এ থেকে তার সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার প্রমাণও পাওয়া যায়। সময়োপযোগী না হওয়ায় তখনকার দিনে তার এ বৈজ্ঞানিক সূত্র খুব বেশি আদৃত হয়নি। চিকিৎসাবিদ হিসাবে তিনি বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন। আল-কিন্দি ২৭০টির বেশি বই লিখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ২৭টি ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর, ৩২টি জ্যামিতির ওপর, ৯টি যুক্তিবিদ্যার ওপর এবং ১২টি পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর লেখা বই। ল্যাটিন অনুবাদ ছাড়া তার মূল আরবী বই খুব কমই পাওয়া গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার ২৭টি বইয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২টির সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবনী

আল-কিন্দির পিতা ছিলেন কুফার গভর্নর। কুফায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে উচ্চশিক্ষা লাভে বাগদাদ যান। আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশীদ ও খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিক্ষার প্রতি তার গভীর অনুরাগ দেখে খলিফা মামুন তাকে বাগদাদের হাউজ অব উয়িজডোম বা বায়তুল হিকমায় নিযুক্তি দেন। চমৎকার ক্যালিগ্রাফির জন্য আল-কিন্দি সুপরিচিত ছিলেন। একপর্যায়ে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল তাকে ক্যালিওগ্রাফার হিসাবে নিযুক্তি দেন। আল-কিন্দি প্রথমে অনুবাদের দিকে মনোযোগ দেন। গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদের তখন ছিল হিড়িক। তিনিও এই হিড়িকে যোগ দেন। অনুবাদে সাফল্য লাভ করার পর তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনায় মন দেন। গ্রীক দর্শন অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি দর্শনের অনুরাগী হয়ে পড়েন। গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে নিউপ্লেটোনিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম এরিস্টোটলের দার্শনিক মতবাদ আরব জগতে প্রচার করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন মুতাজিলা মতবাদের সমর্থক। খলিফা আল-মামুনের দরবারে মুতাজিলা মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুতাজিলা মতবাদের প্রতি আল-কিন্দির অনুরাগ দেখে আল-মামুন তাকে হাউজ অব উয়িজডোমে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। ৮৩৩ সালে খলিফা আল-মামুন ইন্তেকাল করলে তার ভাই মুতাসিম বিল্লাহ উত্তরাধিকারী হিসাবে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহন করেন। মুতাসিম বিল্লাহ খলিফা হওয়ায় আল-কিন্দির প্রতি রাজ অনুগ্রহ অব্যাহত থাকে। খলিফা মুতাসিম তাকে তার পুত্র আহমদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ৮৪২ সালে মুতাসিম বিল্লাহ ইন্তেকাল করলে ওয়াসিক উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে বসেন। ৮৪৭ সালে আল-মুতাওয়াক্কিল

www.pathagar.com

ওয়াসিকের স্থলাভিষিক্ত হলে আল-কিন্দির ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে। মুতাজিলা মতবাদ নিয়ে হাউজ অব উয়িজডোমে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মুতাজিলা মতবাদের বিরোধী মুসা ভ্রাতৃত্রয় এ মতবাদের সমর্থক আল-কিন্দির বিরুদ্ধে খলিফার কান ভারি করতে থাকেন। তাদের প্ররোচনায় তিনি আল-কিন্দির লাইব্রেরি বাজেয়াপ্ত করেন। এমনকি তাকে প্রহার করা হয়। অবশ্য কিছুদিন পরে তিনি তার সব কিছু ফেরত পান।

দার্শনিক আল-কিন্দি

মৃত্যুর পর আল-কিন্দির দার্শনিক রচনাবলী দ্রুত উধাও হয়ে যায়। পরবর্তীকালের মুসলিম পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা তার বহু বই খুঁজে পাননি। জার্মান গণিতজ্ঞ ফেলিক্স ক্লেইন ফ্রাঙ্কি তার বই নিখোঁজ হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু খলিফা মুতাওয়াক্কিল নয়, মোঙ্গলরাও তার বই নিখোঁজ হওয়ার জন্য দায়ী। মোঙ্গল আক্রমণে বাগদাদের অসংখ্য লাইব্রেরি ধ্বংস হয়। ফেলিক্স আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো পরবর্তীকালের প্রভাবশালী দার্শনিকদের কাছে তার বই জনপ্রিয় না হওয়ায় সেগুলো অন্ধকারে তলিয়ে যায়। ক্রিমোনার গেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় আল-কিন্দির কয়েকটি বই অনুবাদ করেছিলেন। এ

www.pathagar.com

বইগুলো কালের সাক্ষী হিসাবে টিকে রয়েছে। আরো কয়েকটি আরবী পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তুরস্কের একটি লাইব্রেরিতে তার ২৪ টি নিখোঁজ বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

দর্শন

আল-কিন্দি গ্রীক দর্শন মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে ইসলামী দর্শনের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছেন। বাগদাদের হাউজ অব উয়িজডোম থেকেই তিনি এ মিশন শুরু করেছিলেন। খলিফা আল-মামুনের উৎসাহে তিনি থিয়লজি অব এরিস্টোটল'সহ বহু গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করেন। এ পাণ্ডুলিপি অনুবাদের সূত্র ধরেই তিনি এরিস্টোটলের বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন। তার অনূদিত গ্রীক রচনাবলী আরবী দর্শনের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। তিনি এসব বই অনুবাদ না করলে আল-ফারাবি, ইবনে সিনা অথবা ইমাম গাজ্জালির মতো পণ্ডিতদের জন্ম হতো কিনা সন্দেহ। একদিকে দর্শন ও ধর্ম এবং অন্যদিকে অহী ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ছিল তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, জ্ঞানের উৎস হিসাবে যুক্তির চেয়ে অহী শ্রেষ্ঠতর। কেননা অহী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে। যুক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন না ঘটায় পরবর্তী দার্শনিকগণ আল-কিন্দির দর্শনের সমালোচনা করেছেন। তবে তিনিই ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি আরবী ভাষায় লেখালেখি করেছেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আরব দার্শনিক। আল-কিন্দির সত্যিকার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে এ. এ. আল-দাফা 'দ্য মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স'-এ লিখেছেন, '*To his people he became known as the philosopher of the Arabs. He was the only notable philosopher of pure Arabian blood and the first one in Islam. Al-Kindi was the most leaned of his age, unique among his contemporaries in the knowledge of the totality of ancient scientists, embracing logic, philosophy, geometry, mathematics and astrology.*'

অর্থাৎ '*তিনি তার জাতির কাছে আরব দার্শনিক হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আরব রক্তের একমাত্র উল্লেখযোগ্য এবং ইসলামের প্রথম দার্শনিক। আল-কিন্দি ছিলেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর এবং প্রাচীন বিজ্ঞানীদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ তার সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য। তিনি যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।*'

আল-কিন্দি এরিস্টোটলের মতবাদ ও নব্য প্লেটোবাদী চিন্তাধারাকে ইসলামী দার্শনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রীক দর্শনকে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে জনপ্রিয় করে তুলতে তার এ অবদানের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। দর্শনের ওপর আল-কিন্দি যেসব বই লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কিতাবুল আল-কিন্দি এলা আল-মুতাসিম বিল্লাহ ফিল ফালসাফাতুল উলা', 'কিতাবুল

www.pathagar.com

ফালসাফাতুদ দাখেলা ওয়াল মাসায়েলেল মনতাকিয়া ওয়াল মুয়াতাসাহ ওয়া মা ফাওকাতুত তাবিয়াত', 'কিতাবু ফি আন্নাহু লা তুনালিল ফালসাফা ইল্লা বেএলমে রিয়াজিয়াত' ইত্যাদি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র

সৌরমণ্ডল সম্পর্কে আল-কিন্দির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল টলেমির অনুরূপ। টলেমি পৃথিবীকে এককেন্দ্রিক জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর কেন্দ্র বলে মনে করতেন। তার মতে, এ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীতে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও নক্ষত্র। একটি প্রবন্ধে আল-কিন্দি লিখেছেন, এসব জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী হলো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা। আল্লাহর হুকুমে তারা নিজ নিজ কক্ষপথে বৃত্তাকারে আবর্তন করছে। আল-কিন্দি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করা হলো তাদের দায়িত্ব। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে বলেছেন, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঋতু পরিবর্তন হয়। নিজ নিজ অঞ্চলে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রভাবে মানুষের চেহারা ও চালচলনে পার্থক্য হয়। তবে কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় বস্তু জগৎকে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী প্রভাবিত করছে সে ব্যাপারে তার জবাব ছিল অস্পষ্ট। তিনি তার লেখায় এরিস্টোটলের একটি তত্ত্ব উল্লেখ করেছিলেন। এরিস্টোটল ধারণা করছিলেন, গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তনে সাব-লিউনার অঞ্চলে সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষ ভূমি, আগুন, বাতাস ও পানিকে আন্দোলিত করে এবং এসংঘর্ষ থেকে বস্তু জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। 'অন রেস' শিরোনামে তার একটি লেখায় তিনি বিকল্প অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, গ্রহ নক্ষত্রগুলো সরল রেখায় তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে। দু'টি লেখার প্রতিটিতে তিনি বাহ্যিক মিথস্ক্রিয়া, সংযোগ ঘটিত এবং দূরত্ব জনিত কার্যক্রম সম্পর্কে মৌলিকভাবে ভিন্ন দু'টি মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। তার অপটিক্স সংক্রান্ত লেখায়ও অনুরূপ বিভাজিত মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি জ্যামিতিক অপটিক্সে অবদান রাখেন এবং এ ব্যাপারে একটি বই লিখেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি বৃত্তাকার জ্যামিতিতে অবদান রেখেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর তার উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলোঃ 'রিসালাতু ফি তাকদিমাতুল মারিফা বেলইসতিদলাল বেল আশখাসুল আলিয়া', 'রিসালাতু ফি মাদখালেল আহকাম', 'রিসালাতু উলা ওয়াছ ছানিয়া ওয়াছ ছালেছা এলা সানায়েতেল আহকাম', 'রিসালাতু ফি দালায়েলেন নাহসায়েন ফি বুরজেস সারতান' ইত্যাদি।

অপটিক্স

অপটিক্সে আল-কিন্দির অবদান এ ক্ষেত্রে গবেষণায় ইবনে হাইছামকে পথ দেখিয়েছিল। তার মতে, আলো সরল পথে চলে। অপটিক্সের ওপর তার বই ল্যাটিন ভাষায় 'দি এসপেকটিবাস' শিরোনামে অনূদিত হয়। বইটি মধ্যযুগের ইউরোপে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। রজার ব্যাকন এ গ্রন্থের অনুসরণে গবেষণা চালান। আকাশ নীল দেখা যায় কেন তা নিয়েও আল-কিন্দি আলোচনা করেছেন। জোয়ার ভাটা নিয়েও গবেষণা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। আল-কিন্দির লেখায়

www.pathagar.com

অপটিক্স সম্পর্কে এরিস্টোটল ও ইউক্লিডের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন, চোখ কোনো বস্তুকে তখনি দেখতে পায় যখন আলোতে পরিপূর্ণ একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে (বাতাস) উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটে। এ শর্ত পূরণ হলে বস্তুতে বিদ্যমান সেন্সিভল ফর্ম ঐ মাধ্যমের সাহায্যে চোখে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে ইউক্লিড বিশ্বাস করতেন, চোখের রশ্মি কোনো উজ্জ্বল বস্তুতে পৌঁছলে সরল রেখা বরাবর দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন রশ্মি পুনরায় প্রতিফলিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের তত্ত্বে আল-কিন্দি যে ধরনের পরস্পরবিরোধী মতামত দিয়েছেন, অপটিক্সে সংযোগ ও দূরত্ব সম্পর্কে লেখালেখিতেও তার অনুরূপ পরস্পরবিরোধিতা বিদ্যমান। দু'টি মতবাদের মধ্যে কোনটি দৃষ্টিশক্তির ব্যাখ্যা দানে যথেষ্ট, আল-কিন্দি সে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে কোনো বস্তু দেখতে পেলে তা তার অনুভূতিকে কেন প্রভাবিত করে, পাশ থেকে কোনো বৃত্ত দেখা হলে তাকে কেন একটি রেখার মতো দেখাবে তিনি এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। এরিস্টোটলের মতে, একটি বৃত্তের পূর্ণাঙ্গ রূপ চোখে স্থানান্তরিত হবে। অন্যদিকে ইউক্লিডের অপটিক্সে একটি জ্যামিতিক মডেলের কথা বলা হয়েছে। এ জ্যামিতিক মডেল স্বাভাবিক রূপ এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য ও আয়নার প্রতিফলন খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। কেননা ইউক্লিড বিশ্বাস করতেন, ভিজিউয়াল রশ্মি কেবলমাত্র সরল রেখায় চলতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানে তা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে আল-কিন্দি ইউক্লিডের তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি অপটিক্স বিষয়ক তার বইয়ে কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক গণিতজ্ঞ এন্থিমিয়াসের একটি বর্ণনার সমালোচনা করেন এবং তার বর্ণনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। এন্থিমিয়াস দাবি করেছিলেন যে, কোনো এক যুদ্ধের সময় একটি আতসি কাঁচের সাহায্যে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। জে. জলিভেট. আর. রাশেদ 'বায়োগ্রাফি ইন ডিকশনারি অব সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফি'তে আল-কিন্দির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, '*Anthemius should not have accepted information without proof. He tells us how to construct a mirror from which twenty four rays are reflected on a single point, without showing how to establish the point where the rays unite at a given distance from the middle of the mirror's surface. We, on the other hand, have described this with as much evidence as our ability permits, furnishing what was missing, for he has not mentioned a definite distance.*'

অর্থাৎ '*প্রমাণ ছাড়া কোনো তথ্য সত্য বলে গ্রহণ করা এন্থিমিয়াসের উচিত হয়নি। কিভাবে একটি আতসি কাঁচ তৈরি করতে হয় তিনি আমাদের কাছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণিত আতসি কাঁচ থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ২৪ টি রশ্মি প্রতিফলিত হয়। তবে আতসি কাঁচের পৃষ্ঠদেশের মাঝামাঝি থেকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো যেখানে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে মিলিত হয় সেখানে কিভাবে বিন্দু স্থির করতে হবে তিনি তা দেখাননি। পক্ষান্তরে, আমরা আমাদের সাধ্য মতো প্রমাণ সাপেক্ষে*

www.pathagar.com

আতসি কাঁচের বর্ণনা দিয়েছি এবং যা অদৃশ্য ছিল আমরা তা উপস্থাপন করেছি। কেননা তিনি কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব উল্লেখ করেননি।'

চিকিৎসা

আল-কিন্দি চিকিৎসা বিষয়ক অন্তত ২৭ টি বই লিখেছিলেন। মূলত এসব লেখায় তার ওপর গালেনের প্রভাব ছিল। 'দ্য গ্রাডিবাস' হলো চিকিৎসা বিষয়ক তার শ্রেষ্ঠ কর্ম। এতে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষ করে ফার্মাকোলজিতে গণিতের প্রয়োগ দেখান। আল-কিন্দি বিশ্বাস করতেন, গণিত হলো সব বিজ্ঞানের উৎস এবং গণিতের সহায়তায় বিজ্ঞানের সব সমস্যার সমাধান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ওষুধের শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্টকরণে একটি গাণিতিক পদ্ধতি বের করেন এবং চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির ভিত্তিতে একজন চিকিৎসক যাতে রোগীর অসুস্থতার চরম অবনতির দিনগুলো আগেভাগে নির্ধারণ করতে পারেন সেজন্য আরেকটি ব্যবস্থাপত্র উদ্ভাবন করেন। আল-কিন্দি হলেন পারফিউম শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুরভিত পারফিউম তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও ভেষজ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। এছাড়া তিনি পারফিউম, কসমেটিক্স ও ওষুধ তৈরির ফর্মুলার বিবরণ দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তার উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো: 'রিসালাতু ফিত তিব্ব বুকরাতি', 'রিসালাতু ফিল গাজায়ে ওয়াদ দাওয়ায়েল মুহলিক', 'রিসালাতু ফিল আবখিরাল মুসলিহ্যাতিল জাওয়ে মিনাল আওবায়ে', 'রিসালাতু ফিল আদাবিয়াতিল মুশাফিয়াত মিনার রাওয়াহেল মাওজিয়াহ' ইত্যাদি।

রসায়ন

আল-কিন্দি ছিলেন একজন বাস্তববাদী রসায়নবিদ। একজন অগ্রসর রসায়নবিদ হিসাবে তিনি আলকেমির বিপক্ষে ছিলেন। সরল ধাতুকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মতো মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করার রূপকথা তিনি খণ্ডন করেন। তিনি মনে করতেন, সোনা ও রূপা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। মানুষের বুদ্ধি ও কলা কৌশল দিয়ে এগুলো তৈরি করা সম্ভব নয়। আল-কিন্দির একটি বইয়ে রয়েছে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করার ব্যবস্থাপত্র। বইটিকে রসায়নের একটি বই হিসাবে গণ্য করা যায়। বইটির নাম হলো 'কিতাবু ফি কিমিয়া আল-ইতর ওয়াততাসিদাত'। জাবির ইবনে হাইয়ানের মতো বিজ্ঞানী আল-কিন্দিও প্রসাধন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে প্রসাধান শিল্পের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুগন্ধি দ্রব্য তৈরিতে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অন্যান্য পদর্থের সংমিশ্রণ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। তিনি প্রসাধন ও কসমেটিক্স তৈরির বেশ কয়েকটি প্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্দি গবেষণাগারে 'ঘালিয়া' নামে একটি প্রসাধনী তৈরি করতেন। এ প্রসাধনীতে ছিল মৃগনাভি, অম্বর ও আরো কয়েকটি উপাদন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ী ও ক্রুসেডাররা মৃগনাভি ও সুগন্ধি প্রসাধনী ইউরোপে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

গণিত

আল-কিন্দি আধুনিক গণিতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি গণিত, জ্যামিতি, ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী, সংখ্যার সমতা, রেখা এবং সংখ্যা দিয়ে গুণ, আপেক্ষিক পরিমাণ, অনুপাত ও সময় পরিমাপ, সংখ্যাগত পদ্ধতি এবং বিলোপ করার নিয়মসহ গণিতের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। আল-কিন্দি মধ্যযুগে মুসলিম গণিতের ইতিহাসে ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী ছড়িয়ে দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি চার খণ্ডে বিভক্ত 'কিতাব ফি ইসতিমাল আল-আদাদ আল-হিন্দি' (অন দি ইউস অব দি ইন্ডিয়ান নিউমার্যালস) রচনা করেন। তার এ বই মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী পৌঁছে দিতে বিরাট অবদান রাখে। অন্যান্য লেখালেখির মধ্যে তিনি জ্যামিতিতে সমান্তরাল তত্ত্বের ওপর একটি বই রচনা করেন। আল-কিন্দি জ্যামিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপটিক্সের ওপর আরো দু'টি বই লিখেছেন। একজন দার্শনিক হিসাবে গণিতের আশ্রয় নিয়ে তিনি বিশ্বের অবিনশ্বরতা ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে, গাণিতিক ও যৌক্তিকতার বিচারে অবিনশ্বরতা অসম্ভব। গণিতের ওপর আল-কিন্দির উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো: 'রিসালাতু ফি আগরাজে কিতাবে উকলিদাস' (ইউক্লিডের গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা), 'রিসালাতু ফি এসতেমালেল হিসাবেল হিন্দি' (ভারতীয় হিসাব পদ্ধতি), 'রিসালাতু ফিল এবানাত আনিল আদাদেল লাতি জাকারাহা আফলাতুন ফিস সিয়াসাত' (প্লেটোর পলিটিক্সে উল্লেখিত সংখ্যার ব্যাখ্যা), 'রিসালাতু ফি তালিফেল আদাদ' (সংখ্যার সামঞ্জস্য) ইত্যাদি।

ক্রিপটোগ্রাফি

আধুনিক যুদ্ধে ক্রিপটোগ্রাফি একটি অতি পরিচিত শব্দ। শত্রুপক্ষ যাতে প্রেরিত বার্তার অর্থ উদ্ধার করতে না পারে সেজন্য গোপন সংকেতের মাধ্যমে বার্তা আদান প্রদান করা হয়। বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারো পক্ষে গোপন বার্তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। প্রাচীনকালেও অগোছালোভাবে গোপন বার্তা আদান প্রদান করা হতো। তবে কখন এবং কিভাবে গোপন বার্তার আদান প্রদান শুরু হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে বৈজ্ঞানিকভাবে সাংকেতিক বাতার অর্থ উদ্ধার করা হয়। তিনজন মুসলিম বিজ্ঞানী সাংকেতিক বার্তার অর্থ উদ্ধারে অবদান রেখেছেন। তারা হলেন: আল-কিন্দি, আল-মাসুদি এবং আল-কালাসাদি। তবে এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী আল-কিন্দির অবদান অগ্রগণ্য। বিজ্ঞানের এ শাখায় মুসলমানদের অবদান অসামান্য হলেও কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে ইতালীয় বিজ্ঞানী লিও বাতিস্তা আলবার্তিকে। তাকে পাশ্চাত্যের ক্রিপটোগ্রাফির জনক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাতিস্তা ১৪৬৬ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে 'পলিএলফাবেটিক' পদ্ধতির ধারণা প্রকাশ করেন। মূল বার্তার বাণী সাংকেতিক লিপিতে একটি বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হলে তাকে বলা হয় 'সিম্পল সাবসটিটিউশন'। আর অনেকগুলো বর্ণ ব্যবহার করা হলে তাকে বলা হয় 'পলিএলফাবেটিক'।

www.pathagar.com

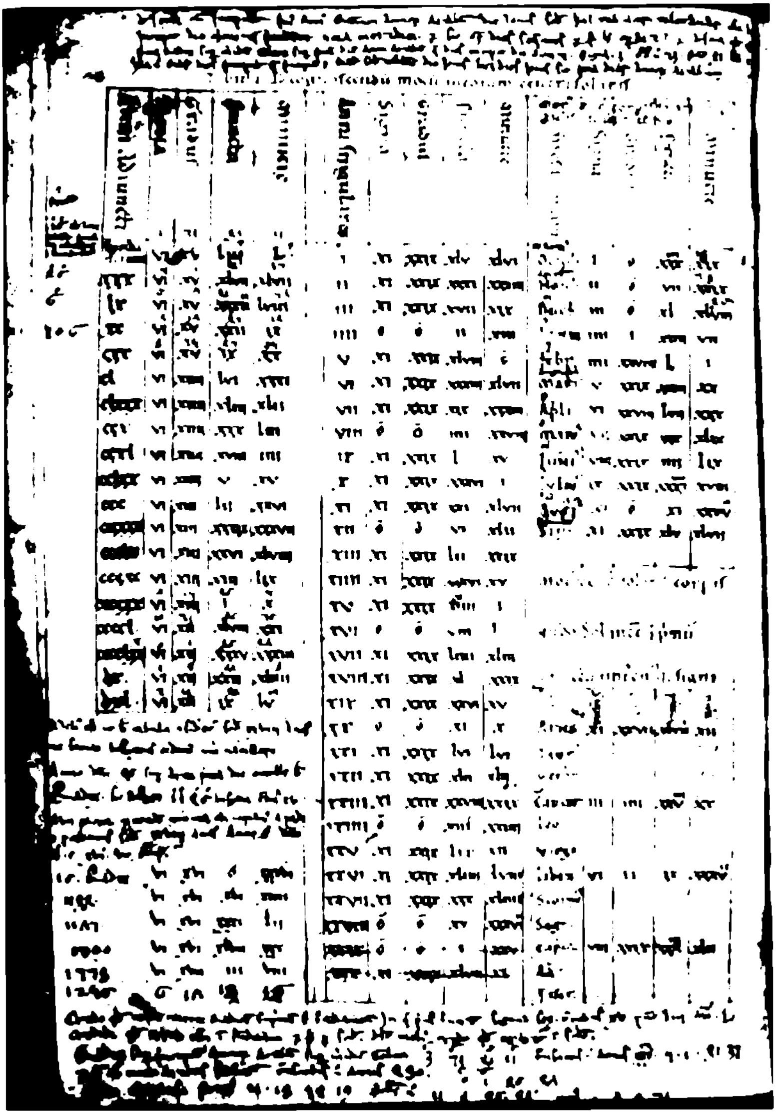

আল-কিন্দির আবিষ্কৃত গুপ্ত বার্তা

www.pathagar.com

বাতিস্তার কয়েক শ' বছর আগে বিজ্ঞানী আল-কিন্দি 'পলিএলফাবেটিক'সহ ক্রিটোগ্রাফির মূল ধারণা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

আল-কিন্দি ছিলেন সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার এবং ক্রিপটোলজির অগ্রদূত। তিনি এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে সাইফার বা সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারে বর্ণগুলোর ফ্রিকোয়েন্সির ভিন্নতা বিশ্লেষণ করা যেতো। 'ফ্রিকোয়েন্সি এনালাইসিস' নামে পরিচিত আল-কিন্দির কৌশলটি ছিল খুব সহজ। এ কৌশলে প্লেইন টেক্সটে কোনো একটি বিশেষ ভাষার বর্ণ এবং সাইফারের বর্ণগুলোর পার্সেন্টেজ গণনা করা হতো। তারপর গণনাকৃত বর্ণগুলোর জায়গায় সমান পার্সেন্টেজের প্রতীক বসানো হতো। এ নিয়ে তিনি 'রিসালা ফি ইসতিখরাজ আল-মুয়াম্মা' শিরোনামে একটি বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'এ ম্যানিউসক্রিপ্ট অন দ্য ডিসাইফারিং ক্রিপটোগ্রাফিক মেসেজেজ' শিরোনামের বইটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অটোমান মোহাফেজখানায় পাওয়া গেছে। বইটিতে ক্রিপটানালাইসিস, এনসাইফারমেন্টস, কয়েকটি নির্দিষ্ট এনসাইফারমেন্টসের ক্রিপটানাইলিসিস এবং বর্ণগুলোর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং আরবীতে বর্ণগুলোর সমন্বয় ঘটানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিপটোগ্রাফির পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাইমন সিং 'দ্য কোড বুক'-এর ১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'It was probably religiously motivated textual analysis of the Qur'an which led to the invention of the frequency analysis technique for breaking monoalphabetic substitution ciphers, possibly by Al-Kindi, an Arab Mathematician sometimes around AD 800. It was the most fundamental cryptanalytic advance until WW11. Al-Kindi wrote a book on cryptography entitled `Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma' (A Manuscript on the Deciphering Cryptographic Messages), in which he described the first cryptanalysis techniques including some for polyalphabetic ciphers, cipher classification, Arabic phonetics and syntax and most importantly gave the first descriptions on frequency analysis.'*

অর্থাৎ 'সম্ভবত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোরআনের নিগুঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু বর্ণবিশিষ্ট সংকেত ভাঙ্গার জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণের কলা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্ভবত ৮০০ সালের দিকে আরব গণিতজ্ঞ আল-কিন্দি ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণের কলা কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ তার উদ্ভাবিত কলা কৌশল ছিল গোপন বার্তার পাঠোদ্ধারে *সবচেয়ে মৌলিক ক্রিপটানালাইটিক অগ্রগতি। আল-কিন্দি ক্রিপটোগ্রাফির ওপর 'রিসালা ফি ইসতিখরাজ আল-মুয়াম্মা' (ক্রিপটোগ্রাফিক বার্তার পাঠোদ্ধারের পাণ্ডুলিপি) শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটিতে তিনি প্রথম অসংখ্য বর্ণের সাইফার, সাইফার শ্রেণীকরণ, আরবী ধ্বনি ও বাক্যপ্রকরণসহ ক্রিপটানালাইসিসের কলা কৌশলের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, তিনিই প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণের বর্ণনা দিয়েছেন।'*

www.pathagar.com

সঙ্গীত

সঙ্গীতে আল-কিন্দি হলেন আরব বিশ্বের প্রথম তাত্ত্বিক। তিনি আরব অঞ্চলে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র 'ওদ'-এ পঞ্চম তার সংযোজনের প্রস্তাব করেন এবং সঙ্গীতের গূঢ় রহস্য নিয়ে আলোচনা করেন। আল-কিন্দি সঙ্গীতের কলাকৌশল নির্ধারণে গ্রীক সঙ্গীতজ্ঞদের অতিক্রম করে যান। তিনি রোগ নিরাময়ে সঙ্গীতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং মিউজিক্যাল থেরাপি দিয়ে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত একটি ছেলেকে সুস্থ করার চেষ্টা করেন। ছেলেটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলে তিনি তার ছাত্রদের বীণা বাজাতে বলেন। ছাত্রদের বীণার সুমধুর সুরে ছেলেটি শ্বাস ফেলতে শুরু করে। সে বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসে। ছেলেটি ছিল এক সওদাগরের সন্তান। সে পিতার ব্যবসা দেখাশোনা করতো। কথা বলতে শুরু করলে আল-কিন্দি ছেলেটির পিতাকে তার কাছ থেকে ব্যবসার যাবতীয় তথ্য নোট করে নেয়ার পরামর্শ দেন। ছেলেটি পিতার কাছে ব্যবসার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আবার অচেতন হয়ে পড়ে। আল-কিন্দি অপারগতা প্রকাশ করে জানান যে, বীণা বাজালেও আর কাজ হবে না। তার আয়ু শেষ। সঙ্গীতের ওপর আল-কিন্দি ১৫টি বই লিখেছিলেন। এসব বইয়ের মধ্যে মাত্র ৫টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। তার একটি বইয়ে তিনি আরবীতে প্রথম 'মিউজিকা' শব্দটি ব্যবহার করেন। আরবী, ফারসি, তুর্কি এবং মুসলিম বিশ্বের আরো দেশের ভাষায় এ শব্দটির অর্থ হলো 'সঙ্গীত'। সঙ্গীতের ওপর আল-কিন্দির উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো: 'রিসালাতু কুবরা ফিততালিফ', 'রিসালাতু ফি তারতিবুন নাগাম আলদাল্লাত আলা তাবায়েল আসখাসুল আলিয়া ওয়া তাশাবুহুত তালিফ', 'রিসালাতু ফিল মাদখাল এলা সানায়াতেল মুসিকি' ইত্যাদি।

অধিবিদ্যা

আল-কিন্দির মতে, অধিবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। এ উদ্দেশ্যে তিনি দর্শন ও ধর্মের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, উভয় বিষয়ের লক্ষ্য অভিন্ন। পরবর্তীকালের দার্শনিকগণ বিশেষ করে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনা এ প্রশ্নে তার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা কোয়া বিয়িংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং আল্লাহর প্রকৃতি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক। অধিবিদ্যায় আল্লাহর নিরংকুশ একত্বকে স্বীকার করে নেয়া ছিল আল-কিন্দির মূল বক্তব্য। তিনি মনে করতেন, নিরংকুশ একত্ববাদ একমাত্র আল্লাহর অদ্বিতীয় গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এ গুণ আর কারো নেই। এ কথার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আমরা যখন কোনো একক সত্তা নিয়ে চিন্তা করি তখন একইসঙ্গে একজন এবং বহুজনকে বুঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেছেন, শরীর একটি একক সত্তা হলেও তাতে বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি হয়তো বলতে পারে,

www.pathagar.com

'আমি একটি হাতি দেখছি।' এ কথার অর্থ সে একটি' হাতি দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু হাতি শব্দটি একটি পশুর প্রজাতিকে বুঝায়। বহু প্রাণী নিয়ে একটি প্রজাতি। অতএব বাস্তব ও তত্ত্বগতভাবে আল্লাহ নিরংকুশভাবে একক সত্তা। তার মধ্যে কোনো বহুত্ব নেই। তার এ দর্শন একটি কঠোর নেতিবাচক ধর্মীয় তত্ত্বের জন্ম দেয়। কেননা আল-কিন্দির দর্শনে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল, যে কারো সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা দেয়া যায় আল্লাহ্ সম্পর্কে সেভাবে বর্ণনা দেয়া যায় না। চূড়ান্ত একক সত্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল-কিন্দি আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মানে আল্লাহ একটি চূড়ান্ত এবং উপযুক্ত কারণ উভয়টি হিসাবে কাজ করছেন। আল-কিন্দি আল্লাহকে একটি সক্রিয় সত্তা (একটিভ এজেন্ট) হিসাবে ধারণা করেছিলেন। মধ্যবর্তী অন্যান্য সব প্রতিনিধি আল্লাহর হুকুমের অধীন হওয়ায় তাকে একটিভ এজেন্ট হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। মূল কথা হচ্ছে, সৃষ্ট মধ্যবর্তী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আল্লাহ্ কাজ করেন। বিনিময়ে মধ্যবর্তী প্রতিনিধিরা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একটি সুশৃঙ্খল কারণ ও ফলাফলের মধ্য দিয়ে একের পর এক কাজ করে। সত্যিকার অর্থে এসব মধ্যবর্তী প্রতিনিধি আদৌ কোনো কাজ করে না। তারা হলো আল্লাহর নিজস্ব কর্মকাণ্ডের বাহন মাত্র। আল্লাহকে ফার্স্ট কজ হিসাবে আখ্যায়িত করায় আল-কিন্দির ধারণা ইসলামী দর্শনের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট হিসাবে পরিচিত একটি পৃথক, অশরীরী ও সর্বজনীন ইন্টিলেক্ট রয়েছে। ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট হলো স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি এবং এই মধ্যবর্তী প্রতিনিধির মাধ্যমে অন্যান্য সব প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এ তত্ত্বের দৃশ্যত মেটাফিজিক্যাল গুরুত্ব থাকার পাশাপাশি এটা ছিল আল-কিন্দির সৃষ্টি তত্ত্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আল-কিন্দির সৃষ্টি তত্ত্বের ওপর প্লেটোর রিয়ালিজমের প্রভাব ছিল। প্লেটোর মতে, বস্তু জগতে যা কিছু বিদ্যমান তার প্রতিটির সঙ্গে মহাজগতের বিশ্বজনীন রূপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কোনো প্রাণী অথবা গুণ হিসাবে এ বিশ্বজনীন রূপের প্রকাশ ঘটে। এ রূপ সত্যিকারভাবে একটি বিমূর্ত ধারণা। এগুলো বস্তু ও প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি লাল আপেলের গুণ হলো লালিমা। এ লালিমার উৎপত্তি হয়েছে বিশ্বজনীন রূপ বা গুণ থেকে। আল-কিন্দি বলেছেন, মানুষ তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে এসব গুণ অনুধাবন করতে পারে। ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট থেকে এ গুণের সঞ্চার হয়েছে। এ ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিয়ে অনবরত ভাবছে। আল-কিন্দি যুক্তি দেন যে, মানুষের বিচার বুদ্ধির জন্য বাইরের এই ফার্স্ট ইন্টিলেক্টের প্রয়োজন। কেননা মানুষ কেবলমাত্র কল্পনার মধ্য দিয়ে একটি সর্বজনীন ধারণায় পৌঁছতে পারে না। অন্য কথায়, কোনো ইন্টিলেক্ট একটি অথবা অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোনো বস্তুর প্রাণশক্তি উপলব্ধি করতে পারে না। আল-কিন্দির মতে, তাতে শুধু একটি নিকৃষ্ট সেন্সিবল ফর্ম জন্ম নেবে এবং আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তা বিশ্বজনীন হবে না। কেবলমাত্র ফার্স্ট ইন্টিলেক্টের পরিকল্পনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে এই সর্বজনীনতা অর্জন করা যেতে পারে। আল-কিন্দি কাঠ ও আগুনের মধ্যকার

www.pathagar.com

সম্পর্কের তুলনা করে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যুক্তি দেন, কাঠ হলো সম্ভাব্য গরম (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের সম্ভাব্য ধারণার মতো)। তাহলে তাকে গরম করার জন্য ইতিমধ্যে যা উত্তপ্ত (যেমন আগুন) তার প্রয়োজন হবে। তার মানে ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট ইতিমধ্যে যা চিন্তা করতে পেরেছে মানুষের বিচার বুদ্ধি তখনো তা পারেনি। তিনি বলেন, তাহলে ফার্স্ট ইন্টিলেক্ট অবশ্যই বরাবর সবকিছু নিয়ে চিন্তা করবে। এ প্রক্রিয়ায় মনুষ্য ইন্টিলেক্ট একটি সর্বজনীন ধারণায় সক্ষম হলে তা ব্যক্তির অর্জিত ইন্টিলেক্টের অংশে রূপান্তরিত হবে এবং তখন সে যা ইচ্ছা করবে তাই ভাবতে পারবে। ইন্টিলেক্ট'কে আল্লাহর অতি নিকটের চিরজীবী সৃষ্টি হিসাবে প্রশংসা করায় আল-কিন্দি তার জীবদ্দশায় সমালোচিত হয়েছিলেন। তিনি ইন্টিলেক্ট বলতে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন, ফেরেশতারা ছিলেন সে ধরনের মর্যাদার অধিকারী।

আত্মা ও পারলৌকিক জীবন

আল-কিন্দি বলেছেন, আত্মা অবিনশ্বর একটি উপাদান। শুধুমাত্র প্রয়োজনে বস্তুগত পৃথিবীতে আত্মা অবস্থান করে। শারীরিক সত্তার মধ্য দিয়ে আত্মা তার দায়িত্ব পালন করে। আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল-কিন্দি আত্মাকে একটি জাহাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহাসাগরে যাত্রাকালে জাহাজ ক্ষণিকের জন্য কোনো অচেনা দ্বীপে নোঙ্গর ফেললে যাত্রীরা নেমে বাইরে ঘোরাফেরা করতে যায়। যাত্রীরা বেশিক্ষণ দ্বীপে অবস্থান করলে জাহাজ তাদেরকে ফেলে নোঙ্গর তুলে পুনরায় যাত্রা করবে। আল-কিন্দি একটি স্টোয়িক ধারণার অবতারণা করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, জাহাজের যাত্রীদের মতো দ্বীপরূপী পার্থিব জগতের প্রতি আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা একসময় এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। আল-কিন্দি এ ধারণাকে নিউপ্লেটোনিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন, জ্ঞানের অনুসন্ধান করা আমাদের আত্মার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথমোক্তটি আত্মাকে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবে। অতএব শরীরের মৃত্যু হলে আত্মারও মৃত্যু ঘটবে। তবে শেষোক্তটি শরীর থেকে আত্মাকে মুক্তি দেবে এবং তাকে জ্ঞানের বিশুদ্ধ জগতে স্রষ্টার আলোয় তাকে অনন্তকাল বাঁচার সুযোগ দেবে।

অহী ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক

আল-কিন্দির দৃষ্টিতে সত্যের নাগাল পাওয়ার জন্য নবুয়ত ও দর্শন হলো দু'টি ভিন্ন রাস্তা। তিনি দু'টির অবস্থানকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত: দার্শনিক হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং অধ্যয়ন করতে হয়। অন্যদিকে আল্লাহ মনোনীত ব্যক্তি নবুয়ত লাভ করেন। দ্বিতীয়ত: দার্শনিককে অবশ্যই অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিজস্ব ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে সত্যে পৌছাতে হয়। পক্ষান্তরে, নবীর কাছে স্বয়ং আল্লাহ সত্য প্রকাশ করেন। তৃতীয়ত: অহীপ্রাপ্ত হওয়ায় নবীর উপলব্ধি

www.pathagar.com

দার্শনিকের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং আরো ব্যাপক। চতুর্থত: সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচারে নবীদের কৌশল সর্বোৎকৃষ্ট। আল-কিন্দি বলেন, অতএব নবীরা দু'টি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। এক: আল্লাহর কাছ থেকে যেভাবে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নিশ্চিতভাবে বাণী লাভ করেন এবং দুই: যেভাবে তিনি সত্য প্রচার করেন। তার বক্তব্যের মূল কথা হলো নবী ও দার্শনিকের জ্ঞানের বিষয়বস্তু অভিন্ন। আল-কিন্দি আরো বলেছেন, ধ্যান বা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কোনো কোনো শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ আত্মা ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এ স্বপ্ন বা ধ্যানকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অহী বলে মনে করেননি। তবে ব্যাখ্যা দেন যে, কল্পনা মানুষকে এমন সব তথ্য জানার সুযোগ দেয় যেখানে শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। যেসব লোক নিজেদের পরিশুদ্ধ করেছেন কেবলমাত্র সেসব লোক স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। ইমাম গাজ্জালি (র:) তার 'ইনকোহারেন্স অব দ্য ফিলসোফার্স' নামে গ্রন্থে আল-কিন্দির এ ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

প্রভাব

মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইতিপূর্বে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেও আল-কিন্দিকে প্রথম প্রকৃত মুসলিম দার্শনিক হিসাবে গণ্য করা হয়। কোনো হেলেনীয় মতবাদের কাছে ঋণী না হলেও তার চিন্তাধারায় বাইজন্টাইনীয় দার্শনিক প্রোক্লাস লাইসিয়াস, গ্রীক দার্শনিক ও নব্য প্লেটো দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা প্লটিনাস এবং মিসরীয় দার্শনিক জন ফিলোপোনাসের মতো নয়া প্লেটোবাদীদের দর্শনের প্রভাব ছিল। তিনি তার লেখালেখিতে এরিস্টোটলের বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞতাবশত তার এসব উদ্ধৃতিকে নয়া প্লেটোবাদী কাঠামোতে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হয়। অধিবিদ্যা এবং কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট অনিবার্য একটি ঘটনা হিসাবে আল্লাহর প্রকৃতির মতো ক্ষেত্রগুলোতে এ ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে। গ্রীক বিজ্ঞানী পরফাইরির দর্শনের আশ্রয় নিয়ে তিনি খ্রিস্টানদের ত্রিত্ব মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। মুতাজিলা মতবাদে প্রভাবিত হলেও তিনি নিজে এবং মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসীগণ উভয়ে তাওহিদের প্রতি অবিচল আস্থা ব্যক্ত করেন। এটমে বিশ্বাস করায় তিনি মুতাজিলাদের সমালোচনা করেছিলেন। দার্শনিক ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে সংঘাতে আল-কিন্দির ভূমিকা ভবিষ্যৎ বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তিনি বহু মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার প্রভাবে তার নাম ম্লান হয়ে গেলেও তাকে তার সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। ঐতিহাসিক ইবনে আল-নাদিম তার সম্পর্কে বলেন, *'The best man of his time, unique in his knowledge of all the ancient sciences. He is called the Philosopher of the Arabs. His books deal with different sciences, such as logic, philosophy, geometry, arithmetic, astronomy etc. We have conneeted him with the natural philosophers because of his prominence in Science.'*

www.pathagar.com

অর্থাৎ *'তিনি ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের সব জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাকে আরবদের দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তার রচনাবলীতে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, জ্যামিতি, পাটিগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে তার অতুলনীয় দখল থাকায় আমরা তাকে মৌলিক দার্শনিকদের অন্যতম হিসাবে গণ্য করছি।'* রেনেসাঁ যুগের ইতালীয় পণ্ডিত গারালমো কার্ডানো আল-কিন্দিকে মধ্যযুগের ১২ জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্যতম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ বই নিখোঁজ হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় কয়েক শ' বছর পর্যন্ত আল-কিন্দির প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল।

রচনাবলী

দার্শনিক আল-কিন্দির বহু বই হারিয়ে গেলেও ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে তার কয়েকটি বই টিকে আছে। বইগুলো হলো:

(১) দ্য বুক অব দ্য জাজমেন্ট অব দ্য স্টার্স
(২) দ্য ফরটি চ্যাপ্টার্স
(৩) অন দ চেঞ্জিং অব দ্য ওয়েদার
(৪) ট্রীটিজ অন দ্য ডোমিনিশন অব দি অ্যারাবস এন্ড ইটস ডিউরেশন
(৬) দ্য চয়েজেস অব ডেজ
(৭) অন দ্য রেভলিউশন্স অব দ্য ইয়ার্স
(৮) অন দ্য সায়েন্স অব এস্ট্রোনমি এজ এপ্লাইড টু মেডিসিন
(৯) ট্রীটিজ অন দ্য স্পিরিচুয়ালিটি অব দ্য প্ল্যানেটস

'দ্য ফরটি চ্যাপ্টার্স' হলো সভ্যতায় আল-কিন্দির সবচেয়ে বড় অবদান। আলী আল-রিজাল এবং উইলিয়াম লিলির মতো মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ যুগের জ্যোতিষীরা তার বইটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। বইটির ভূমিকায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের নীতিমালা এবং পূর্ণতা অর্জনের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আল-কিন্দি কিভাবে আইনগত বিরোধ, নিখোঁজ বস্তু, চুরি ও পলাতক ব্যক্তি, ভ্রমণ, সম্মান লাভ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবরোধ, যুদ্ধ ও শান্তি, সম্পদ, ভূসম্পত্তি, জাহাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, বিয়ে শাদি, গর্ভধারণ, বন্ধুত্ব, ওষুধ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তালিকা গণনা এবং ব্যাখ্যা করতে হয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিভাবে গ্রহ নক্ষত্র সাফল্য ও ব্যর্থতার আভাস দেয় বইটিতে তার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

মৃত্যু

আল-কিন্দির মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। অধ্যাপক নিকলসনের মতে, তিনি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর সময় ৮৫০ সালে ইন্তেকাল করেন। অধ্যাপক মাসিগননের মতে, ৮৬০ সালে তার মৃত্যু হয়। অধ্যাপক সি. এন. নালিনোর মতে, তার

www.pathagar.com

মৃত্যু ঘটে ৮৭৩ সালে। শেষোক্ত তারিখই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। মুসলিম ইতিহাসের পণ্ডিত হেনরি করবিনের ভাষায় আল-কিন্দি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর আমলে ৮৭৩ সালে বাগদাদে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। আল-কিফতির মতে, গোড়ালির একটি রোগে তার মৃত্যু হয়। গোড়ালির ব্যথা উপশমে তিনি পুরনো মদ পান করতেন। তওবা করে মদ পান ছেড়ে দিয়ে মধুর শরবত খাওয়া শুরু করেন। কিন্তু তাতে তার রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখা দেয়ায় তার ধমনীর ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। তার গোড়ালি ফুলে যায় এবং মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাতে তার মৃত্যু ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।

www.pathagar.com

গুটিবসন্ত আবিষ্কারক আল-রাজি

মুসলিম ইতিহাসে রসায়ন চর্চার ইতিহাসে প্রকৃত রসায়নবিদ হিসাবে জাবিরের পরেই যার নাম আসে তিনি হলেন আল-রাজি। স্বর্ণযুগে জাবিরের মৃত্যুর এক শ' বছরের মধ্যে রাজি ছাড়া তার আর কোনো যোগ্য উত্তরসূরির জন্ম হয়নি। গুটিবসন্ত আবিষ্কারক রাজির পূর্ণ নাম আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া। জন্ম তারিখ অনুসারে তিনি জাবিরের পরবর্তী যুগের হলেও মুসলিম রসায়নবিদ হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল-রাজি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে ইরানের রাজধানী তেহরানের অদূরে এলবুরজ পাহাড়ের দক্ষিণে রাই নামে একটি নগরীতে ৮৬৫ সালের ২৬ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। এ জায়গার নামানুসারে তিনি রাজি নামে পরিচিত। ফারসিতে রাজি শব্দের অর্থ হলো রাই নগরী থেকে। তাকে 'রাজেস' (Rhazes) বা 'রাসিস' (Rasis) বলেও সম্বোধন করা হতো। ল্যাটিন ভাষায় তিনি এ দু'টি নামে পরিচিত। জাতিতে তিনি ছিলেন পার্সী।

রাজি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী, আলকেমিস্ট, রসায়নবিদ, দার্শনিক ও পণ্ডিত। তাকে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। রাজির লেখালেখির ভিত্তিতে তার জীবনীকাররা তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লিনিশিয়ান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বহু আবিষ্কারে তিনি ছিলেন প্রথম। তিনিই প্রথম গুটিবসন্ত ও হামের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। এলকোহল ও কেরোসিনসহ অসংখ্য যৌগিক ও রসায়নিক উপাদানের প্রথম উদ্ভাবক হলেন তিনি। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড গ্রানভাইল ব্রাউনি তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানী এবং একজন সিদ্ধহস্ত লেখক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজি চিকিৎসা, আলকেমি, সঙ্গীত ও দর্শনে মৌলিক ও চিরস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক অন্তত ২ শ' বই লিখেছেন। রাজি পার্সী, গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসা জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তিনি বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি সঙ্গীত, গণিত, দর্শন ও অধিবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করলেও চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। রাজি হলেন মেডিকেল রিসার্চের প্রবক্তা এবং তাকে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন অপথালমোলজির অগ্রদূত। একটি সংক্রামক ব্যাধি থেকে অন্যটিকে পৃথক করতে তিনিই প্রথম হিউমরালিজম ব্যবহার করেছিলেন। একজন আলকেমিস্ট হিসাবে রাজি সালফিউরিক এসিড নিয়ে গবেষণা, ইথানল আবিষ্কার এবং ওষুধে পরিশোধিত ইথানল ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত। তিনি রাই এবং বাগদাদের

www.pathagar.com

হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। রাজি হলেন রাবিং এলকোহল হিসাবে পরিচিত উপাদানের উদ্ভাবক। আধুনিক বিচারে তিনিই প্রথম গবেষণার স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং যুক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। তার সমসাময়িক এবং জীবনীকাররা তাকে উদার, কুসংস্কারমুক্ত ও মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। রাজি ব্যাপকভাবে সফর করেন। তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু। শিক্ষক হিসাবে সব ধর্মমতের ছাত্রদের সমান দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব রোগীর সেবায় নিবেদিত ছিলেন। বিনা ফি'তে চিকিৎসা করতেন। রোগীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতেন। তিনি রোগের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন।

শিক্ষা

রাজির জন্মস্থান রাই ছিল পারস্যের জিবাল প্রদেশের উত্তর পূর্ব দিকের একটি বড় শহর। রাইয়ের প্রাচীন নাম ছিল রাঘা। আভেস্তায় এ নগরীকে রাগা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেই রাজির পড়াশোনা শুরু হয়। প্রথম জীবনে গভীর চিন্তামূলক বিষয়ের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি কিছুদিন অধিবিদ্যা এবং ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে কবিতা লিখেন এবং গানের দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি এ সময় গান নিয়ে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এ বিশ্বকোষের নাম 'ফি জুমালিল মুসিকি'। শুধু গানের বই লিখা নয়, তিনি গান গাইতেন এবং বাঁশিও বাজাতেন। বংশীবাদক হিসাবে তার বেশ খ্যাতি ছিল। কিছুদিন পর তিনি গান বাজনা ছেড়ে দেন। ইচ্ছে করলে তিনি সহজে বংশীবাদক অথবা গায়ক হতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গীত থেকে তার আগ্রহ আলকেমিতে স্থানান্তরিত হয়। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিক আল-বালখির কাছে দর্শন অধ্যয়ন করেন। রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষাও এখানেই শুরু হয়। কোনো একটি রাসায়নিক পরীক্ষার সময় একপ্রকার বিষাক্ত গ্যাসের ঝাঁঝে তার চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তাকে চিকিৎসা গ্রহণে হেকিমের শরণাপন্ন হতে হয়। হেকিম সাহেব তাকে নিরাময় করে তোলেন। তবে এজন্য সাড়ে তিন হাজার দিনার দাবি করেন। এই সামান্য কাজের জন্য হেকিম সাহেবের বিরাট বিল দেখে তিনি বলে উঠেন, *'আমি আলকেমি বা সোনা বানানোর রহস্য বুঝতে পেরেছি।'* তারপরই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি অনবরত অধ্যয়ন করতেন। হয়তো লিখতেন নয়তো বই পড়তেন।

রাজি ঠিক কোন সময় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন তা বলা মুস্কিল। প্রথম জীবনে যে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি সে বিষয়ে সবাই একমত। আল-বেরুনির মতে, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তার ভাষায়, *'রাজির জীবনী সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি কিমিয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তারপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেন।'* অন্য একটি সূত্র দাবি করছে,

www.pathagar.com

রাজি বাগদাদের আজুদী হাসপাতালে ব্যাধি নিরাময়ের কাজ দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারো কারো মতে, তিনি ৪০ বছর বয়সে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। রাজি মার্ভের তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আলী ইবনে সহল রাব্বান আল-তাবারির অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং গুরুকে সব বিষয়ে অতিক্রম করে যান। চিকিৎসক হিসাবে তিনি নিজ শহরে খ্যাতি অর্জন করেন। মনসূর ইবনে ইসহাক ইবনে আহমদ ইবনে আসাদের রাজত্বকালে তিনি রাইয়ের হাসপাতালের পরিচালক নিযুক্ত হন। মনসূর ইবনে ইসহাক তার চাচাতো ভাই আহমদ ইবনে ইসমাইল ইবনে আহমদের পক্ষে রাজত্ব চালাতেন। রাজি তার 'আল-তিব্ব আল-মনসূর' শিরোনামের বইটি দ্বিতীয় সামানীয় শাসক মনসূর ইবনে ইসহাককে উৎসর্গ করেন। তার আগ্রহে রাজি রাইয়ের হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। খলিফা মুকতাফিরের আমলে উচ্চ শিক্ষা লাভে তিনি নিজের দেশ ছেড়ে বাগদাদে গমন করেন। এখানে তিনি খলিফার চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং সেখানকার হাসপাতালগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে একের পর এক তিনি সব রাজ্যের রাজচিকিৎসক ও সভাসদ নিযুক্ত হন। চিকিৎসক হিসাবে তার খ্যাতি তাকে যাযাবর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিল। মাঝে মধ্যে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যেতেন। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারতেন না। ৯০৭ সালে খলিফা মুকতাফি্র ইন্তেকাল করলে রাজি ফের রাইয়ে ফিরে আসেন। তার চারপাশে বহু ছাত্রের ভিড় জমে। ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সার্কেল, দ্বিতীয় সার্কেল এমন কয়েকটি ভাগ ছিল। বাগদাদ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রি নেয়ায় রাজিকে সম্মানজনক শায়েখ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কেউ কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে এলে তা প্রথম সার্কেলের ছাত্রদের কাছে পাঠানো হতো। এ সার্কেলের ছাত্ররা ব্যর্থ হলে প্রশ্নটি পাঠানো হতো দ্বিতীয় সার্কেলে। দ্বিতীয় সার্কেলের ছাত্ররা জবাব দিতে না পারলে পরবর্তী সার্কেলে প্রেরণ করা হতো। সব সার্কেলের ছাত্ররা ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি পাঠানো হতো খোদ রাজির কাছে।

আবিষ্কার

জাকারিয়া ইবনে আল-রাজি ছিলেন তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক। পেট্রোল থেকে পাতনের মধ্য দিয়ে কেরোসিন উৎপাদন করা হতো। নবম শতাব্দীতে আল-রাজি কেরোসিন তৈরির এ ফর্মুলা দেন। তিনি তার 'কিতাব আল-আসরার' (Book of Secrets)-এ কেরোসিন উৎপাদনের দু'টি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম পদ্ধতিতে প্রয়োজন হতো শোষণক্ষম হিসাবে কাদামাটির ব্যবহার। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজন হতো এমোনিয়াম ক্লোরাইডের ব্যবহার। একই গ্রন্থে তিনি প্রথম কেরোসিনের বাতির (নাফফাতাহ) বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণিত কেরোসিনের বাতি এ শিল্পে ব্যবহার করা হতো। রাজি ও তার মুসলিম পূর্বসূরিরা সীসা, লাল সীসা, টিন, অক্সাইড, ধাতব অক্সাইড, তামা এসিটেট, কপার, এন্টিমনি অক্সাইড, লোহার মরিচা, আয়রন এসিটেট, ইস্পাত, সিঁন্দূর, আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, আলকালি, কস্টিক সোডা, কালিমিয়া, লীড সালফাইড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া তিনি পারদ, সাল এমোনিয়াক, আর্সেনিক, সালফার, স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, পারদ, ১৩টি পাথর, ৬টি

www.pathagar.com

ভিট্রিওল, ৭ ধরনের সোহাগা, ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, ন্যাপথানেট, ক্যালশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সাল নিউট্রাম প্রভৃতি আবিষ্কারে অবদান রেখেছেন। রাজিসহ মুসলিম আলকেমিস্টরা 'উশনান' নামে একটি উদ্ভিদের ছাই ব্যবহার করতেন এবং এ ছাই থেকে তারা আলকালি ধাতু ও আলকালি লবণ তৈরি করেন। তিনি প্রাণী দেহের ১০টি উপাদান ব্যবহার করতেন। সেগুলো হলোঃ চুল, মাথার খুলি, মগজ, রক্ত, পিত্ত রস, দুধ, প্রস্রাব, ডিম, ঝিনুক ও শিং। সাল এমোয়িাক তৈরিতে চুল, মগজ, পিত্ত রস, ডিম, মাথার খুলি ও রক্ত ব্যবহার করা হতো।

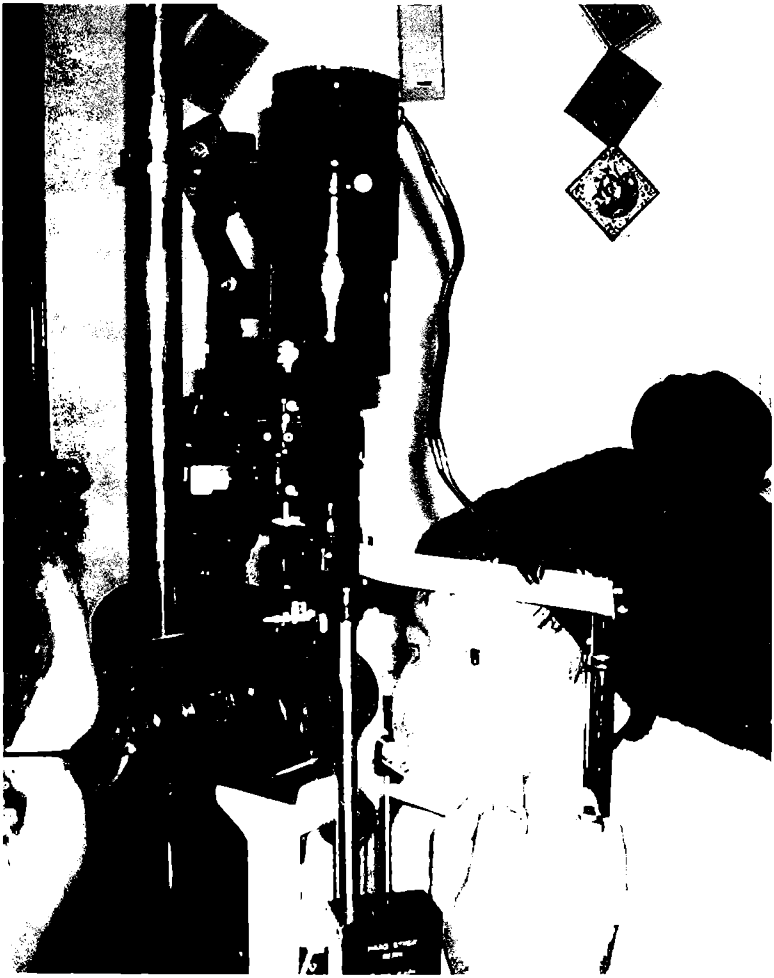

রাজির অপথালমোলজিক্যাল যন্ত্র

www.pathagar.com

দর্শন

রাজি শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি ছিলেন তার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। 'আসসিরাত আল-ফালাসাফিয়া'য় তিনি দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি প্লেটোর 'টাইমাস', এরিস্টোটলের 'লজিক', হিপোক্রেটসের 'এফোরিজমস' এবং পরফাইরির মতবাদের প্রতিবাদ করে ভাষ্য লিখেছেন। তিনি তার 'ডাউটস অ্যাবাউট গালেন'-এ একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বস্তুজগৎ গঠনে এরিস্টোটলের তত্ত্ব এবং গালেনের হিউমারিজম তত্ত্ব উভয়টি ভুল প্রমাণ করেন। তিনি বিভিন্ন তাপমাত্রায় শরীরে তরল পদার্থ ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা চালান। তিনি দেখতে পান, তাতে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের তাপমাত্রা ঐ নির্দিষ্ট তরল পদার্থের অনুরূপ। তারপর রাজি উল্লেখ করেন যে, উষ্ণ পানীয় স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে শরীরকে অনেক বেশি উষ্ণ করে তোলে। দার্শনিক হিসাবে রাজি সক্রেটিসকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং তার জীবনধারাকে তিনি নিজের জীবনে অনুসরণ করেছেন। তবে সক্রেটিসের জীবন যাপন নিয়ে প্রচলিত কাহিনী বিশ্বাস করতেন না। লোক মুখে শোনা যেতো, সক্রেটিস প্রথম জীবনে বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে বিরাগীর জীবন যাপন করতেন, মানুষের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতেন না এবং নির্জনে একটি পিপার মধ্যে থাকতেন। সক্রেটিস সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীগুলো রাজি অবিশ্বাস্য বলে বাতিল করে দেন এবং অনুসরণযোগ্য নয় বলে মত দেন। রাজি তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'স্পিরিচুয়াল ফিজিক' (Spiritual Physick)-এ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন, *'দয়াময় আল্লাহ তার প্রিয় মানুষকে এসব নিগ্রহের বোঝা বইতে দেখে নিশ্চয়ই খুশি হতে পারেন না।'* রাজির এসব দার্শনিক মতবাদ ছিল ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কোথাও কোথাও তার দর্শন ছিল ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি তার 'অ্যা ওয়ে অব লাইফ'র ১৫৫ পৃষ্ঠায় দর্শন চর্চায় রাজির দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, *'Al-Razi like his predecessor Al-kindi and his successor Ibn Sina was also a philosopher but unlike them, he made no attempt to reconcile Greek philosophy and Islamic religion. To him the two were irreconcilable. In fact, he was a radical thinker, a trationalist who rejected the concept of prophecy, challenged Koranic dogma and sub-ordinate it to philosophy. In this respect, he was rare if not exceptional in Islam.'*

অর্থাৎ *'তার পূর্বসূরি আল-কিন্দি এবং উত্তরসূরি ইবনে সিনার মতো আল-রাজিও ছিলেন একজন দার্শনিক। তবে তিনি তাদের মতো ছিলেন না। তিনি গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের ঐক্য সাধনের কোনো প্রচেষ্টা চালাননি। তার মতে, এ দু'টির মধ্যে ঐক্য সম্ভব ছিল না। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক ও একজন যুক্তিবাদী। তিনি নবুয়তের ধারণা প্রত্যাখ্যান এবং কোরআনের মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কোরআনকে দর্শনের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু ইসলামে ব্যতিক্রম ছিলেন তাই নয়, ছিলেন বিরল।'*

www.pathagar.com

ধর্ম সম্পর্কে রাজির লেখা তিনটি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে 'দ্য প্রোফেটস ফ্রডিউলেন্ট ট্রিকস', 'দ্য স্ট্র্যাটাজেমস অব দৌজ হো ক্লেইম টু বি প্রোফেটস' এবং 'অন দ্য রিফিউটেশন অব রিভিল্ড রিলিজিয়ন'-এর প্রতি লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক হিট্টি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বইগুলোতে রাজি ধর্ম বিশেষ করে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যাদেশ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে অন্য মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপের কর্তৃত্ব দিতে পারেন না। ধর্ম ও সহিংসতার মধ্যে যোগসাজশ সম্পর্কে রাজি বলেন, *'বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বহু মতবিরোধ বিবেচনায় আল্লাহ অবশ্যই জ্ঞাত যে, এ মতবিরোধে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় দেখা দেবে এবং পারস্পরিক সংঘাত ও লড়াইয়ে ধর্মগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এভাবে বহু জাতিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি।'*

ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যুক্তিবোধের ঘাটতির সমালোচনা করে তিনি আরো বলেছেন, *'ধর্মের অনুসারীদের তাদের ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং যারা এ ধরনের প্রশ্ন করে তারা তাদের রক্ত ঝরাতে চায়। তারা যুক্তিবাদিতার বিরোধিতা করে এবং তাদের প্রতিপক্ষদের হত্যা করার চেষ্টা করে।'*

বহু লেখক ও ঐতিহাসিক উল্লেখিত বই ও উক্তিগুলো রাজির কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, বইগুলোর ভাষা ও ভাব কোনো মুসলিম লেখকের হতে পারে না। অন্য কারো বই রাজির নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামের দুশমনরাই এ কাজ করেছে। ইবনে সিনাসহ পরবর্তীকালের বহু মুসলিম দার্শনিক রাজির কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, একটি পার্সী ধর্মের প্রতি দুর্বল হওয়ায় তিনি ইসলামের সঙ্গে বেমানান দর্শন প্রচার করেছেন।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি

রাজি ধাতু গলানোর পাত্র, কাঁচি, হাতুড়ি, ডিসেন্সরী ও কিউকারবিটসহ ২০টি যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন এবং সেগুলো ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যেসব রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন সেগুলো আজো ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া তিনি টিউব, ফ্লাক্স, এল্যুডেল, কড়া, চুলা, ঝাঁজরি, ফানেল, পানপাত্র ও ফিল্টার আবিষ্কার করেন। তিনি পাতন ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া শেষ করেছিলেন। তার গবেষণা 'আল-যাজাত' (ভিট্রিওল) ও এলকোহল পাতনের মাধ্যমে সালফিউরিক এসিড উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করে। আলকেমির অগ্রদূত হিসাবে রাজি প্রথম পেট্রোলিয়াম পাতন ও পরিশোধন করেন এবং কেরোসিন তৈরি করেন। রাজি আবে হায়াত এবং জাদুমন্ত্রের ধারণা পরিত্যাগ করে কার্যকারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। প্রাকৃতিক জগতে ব্যাখ্যাতীত কিছু ঘটনা থাকায় তিনি অলৌকিকতার ধারণা পরিত্যাগ করেননি। তার গবেষণাগারে পার্সীয় খনিজ. পদার্থ থেকে শুরু করে চীনে উদ্ভাবিত সাল এমোনিয়াক পর্যন্ত ছিল। তিনি বাস্তব অস্তিত্বের ধারণার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। রসায়নের ইতিহাসে রাজির অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি তার 'আল-আসরার' (দ্য সিক্রেট)-এ প্রথমবার সুশৃঙ্খলভাবে

www.pathagar.com

রাসায়নিকের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণ দিয়েছেন। রসায়নবিদ হিসাবে রাজির যোগ্যতার প্রশংসা করতে গিয়ে ডা. স্ট্যাপালন 'কেমিস্ট্রি ইন ইরাক এন্ড পার্সিয়া ইন দ্য টেন্থ সেঞ্চুরী'র ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,' *If Al-Razi had been followed by men as keen as himself on experimental work, Chemistry might have come into being several hundred of years before it actually was born. As it was, subsequent writers on Alchemy were content either to copy or in many cases, to pervert with results that are only too evident when we follow up to any particular experiment given by Jabir or Al-Razi.'*

অর্থাৎ *'রসায়ন নিয়ে গবেষণায় আল-রাজির যতটা আগ্রহ ছিল লোকজন যদি তার মতো আগ্রহী হতো তাহলে কয়েক শ' বছর আগে রসায়নের জন্ম হতো। পরবর্তীকালে আলকেমি নিয়ে যারা লেখালেখি করেছেন তারা হয়তো জাবির অথবা আল-রাজির কোনো গবেষণার ফলাফলে সন্তুষ্ট থেকেছেন নয়তো হুবহু তারা তাদের অনুকরণ করেছেন।'*

ধাতু রূপান্তর

আলকেমির প্রতি রাজির গভীর আগ্রহ ছিল এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সাধারণ ধাতুকে মূল্যবান স্বর্ণ বা রৌপ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পর ঐতিহাসিক ইবনে আল-নাদিম তার 'দ্য ফিলসোফার্স স্টোন' নামে বইয়ে একথা নিশ্চিত করেছেন। রাজি 'আল-আসরার' (দ্য সিক্রেটস) এবং 'সার আল-আসরার' (দ্য সিক্রেট অব সিক্রেটস) নামে তার দু'টি সুপরিচিত বইয়ে ধাতুকে সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজির সমসাময়িকরা বিশ্বাস করতেন, তিনি লোহাকে রূপা ও স্বর্ণে রূপান্তরের গোপন রহস্য আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। জীবনীকার খসরু 'মোয়েতাজেদ মোহাম্মদ জাকারিয়া রাজি' শিরোনামে তার জীবনীমূলক গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সেনাপতি সিমজার একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজির মুখোমুখি হয়ে জানতে চান, ধাতুকে সোনা বা রূপাতে রূপান্তরিত করাই কি ফি ছাড়া তার রোগীদের চিকিৎসা করার রহস্য কিনা। রাজি জবাব দানে অনিচ্ছুক ছিলেন। সেনাপতিকে পাশ কাটিয়ে যাবার আগে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, *'আলকেমি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। আমি দীর্ঘদিন ধাতুর গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা করছি। তবে এখনো বুঝতে পারছি না কিভাবে মানুষ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি। ধাতুকে সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'*

রাজি ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে না পারলেও সোনার চেয়ে দামী কর্ম রেখে গেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে তার 'আল-আসরার' ও 'মাদখাল আল-তালিম'-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডা. স্ট্যাপালন 'কেমিস্ট্রি ইন ইরাক এন্ড পার্সিয়া ইন দ্য টেন্থ সেঞ্চুরী'র ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*We believe we may safely claim that heneforward Al-*

www.pathagar.com

Razi must be accepted as one of the most remarkable seekers after knowledge that the world has ever seen- not only unique in his age and unequalled in his time, but without a peer until the modern science began to dawn in Europe with Galileo and Robert Boyle. The evidence of his passion for objective truth that is furnished by almost every page of the Kitab al-Asrar and Madkhl al-Talima.'

অর্থাৎ *'আমরা নিশ্চিন্তে এ দাবি করতে পারি যে, এখন থেকে আল-রাজিকে জ্ঞান অন্বেষায় নিয়োজিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী হিসাবে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। বিশ্ব তার মতো একজন সত্যানুসন্ধানী কখনো দেখেনি। তিনি শুধু তার সময়ের বিস্ময়কর এবং তার যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নন, গ্যালিলিও এবং রবার্ট বয়েলের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হওয়া নাগাদ তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহের প্রমাণ কিতাব আল-আসরার এবং মাদখাল আল-তালিম-এর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে।'*

ফার্মেসিতে অবদান

রাজি বইপুস্তক সংকলনের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক ফার্মেসি চর্চায় বহুভাবে অবদান রেখেছেন। তিনি পারদের তৈরি মলম ব্যবহার চালু করেন এবং হামান দিস্তা, ফ্লাস্ক, ছুরি ও শিশির মতো যন্ত্রপাতি উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর ফার্মেসিতে রাজির ব্যবহৃত এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান

ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি বসন্ত ও হামের মতো কয়েকটি মহামারী নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি সঠিকভাবে বসন্তের বর্ণনা দেন। তার 'আল-জুদারি ওয়া আল-হাসবাহ' (অন স্মলপক্স এন্ড মীসলস) ছিল দু'টি পৃথক রোগ হিসাবে বসন্ত ও হামের বর্ণনা সম্বলিত প্রথম বই। ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় বইটি এক ডজনের বেশি বার অনুবাদ করা হয়। রাজি এ মহামারী রোগের বর্ণনায় উল্লেখ করেন, *'গুটিবসন্ত হওয়ার আগে কয়েকদিন অনবরত জ্বর থাকে। পিঠ ব্যথা করে, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা পড়ে, চুলকানি এবং ঘুমের মধ্যে কম্পন অনুভূত হয়। রোগী রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে। রোগের প্রধান নিদর্শন হলো জ্বরের সঙ্গে পিঠে ব্যথা, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা, চোখ মুখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীরের ওপর যেন বোঝা চেপে রয়েছে এমনি অনুভূতি হওয়া। গলা ব্যথা, শ্বাস কষ্ট, মুখের মধ্যে শুষ্কতা, মাথা ধরা, উদ্বেগ, অস্থিরতা। রোগীকে পৃথক করে রাখতে হবে। নয়তো এ রোগ মহামারীর রূপ নিতে পারে।'* *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*'য় বসন্ত নির্ণয়ের এ বিবরণ সম্পর্কে এক মন্তব্যে বলা হয়, *'The most trustworthy statements as to the early existence of the disease are found in an account by the 9th century Persian physician Rhazes by whom*

www.pathagar.com

its symtoms were clearly described, its pathology explained by a humoral theory and directions given for its treatment.'

'নবম শতাব্দীর পার্সী চিকিৎসক রাজেসের একটি ভাষ্যে এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। যিনি এ রোগের লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, ব্যাকটেরিয়া প্রতিষেধক তত্ত্বের মাধ্যমে রোগটির প্যাথলজির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এ রোগের চিকিৎসার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।'

এ ব্যাপারে ডা. ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের একটি উদ্ধৃতিও উল্লেখযোগ্য। ডা. ক্যাম্পবেল 'এরাবিয়ান মেডিসিন'-এর এক নম্বর ভলিউমের ৬০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'He was a great clinician and ranks with Hippocrates as one of the original portrayers of disease. He is the first to introduce chemical preparations into the practice of medicine. His `Liber de Varioliset Morbillis' is the oldest and most original work on Small Pox and Measles and constitute a distinct original contribution to medicine by the Arabians. He was the first to distinguish them* one from another and to write a lucid account that was almost modern in its presentation of clinical detail.'

অর্থাৎ *'তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ক্লিনিশিয়ান এবং রোগ শনাক্তকারী হিসাবে হিপোক্রিটাসের সমকক্ষ। তিনিই প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা চালু করেন। তার 'লাইবার দ্য ভ্যারিওলিসেট মোরবিলিস' হলো গুটিবসন্ত ও হামের চিকিৎসায় প্রাচীন ও সবচেয়ে মৌলিক কর্ম। বইটি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মোলিক অবদান। তিনিই প্রথম একটি থেকে আরেকটি রোগকে পৃথক করেছেন এবং চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রোগের বিস্তারিত বর্ণনায় তার এ উপস্থাপনা আধুনিক বর্ণনার কাছাকাছি।'*

রাজি শিশু রোগ নিয়ে সর্বপ্রথম বই লিখেন। শিশু রোগকে তিনি ২৩ টি ভাগে ভাগ করেন। উদরাময় একটি শিশু রোগ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। রাজি শিশুদের খিঁচুনি জাতীয় একটি রোগ চিহ্নিত করেছিলেন। ল্যাটিন অনুবাদকগণ রোগটির অনুবাদ করেন 'ম্যাটার পিউররাম' (Mater puerorum) হিসাবে। আল-রাজি প্রথম নিউরোসাইকিয়াট্রিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মাথা ধরার জন্য গোলাপ পানি ব্যবহার করা ছাড়াও চন্দন ব্যবহার করার ব্যবস্থাপত্র দিতেন। রাজি তার 'কিতাবুল মনসুরী'তে মাতলামির জন্য ভিনিগার মিশিয়ে পানি খাওয়ানোর এবং তার সঙ্গে গোলাপ পানি, নাকে কর্পূর এবং রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা পানির মধ্যে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। একই বইয়ে তিনি সন্ন্যাস রোগ ও পক্ষাঘাত নিয়েও আলোচনা করেছেন। সন্ন্যাস রোগের চিকিৎসায় তিনি ভেজা বাটি (wet cupping) চেপে ধরার এবং টাইফয়েডে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, পক্ষাঘাতের সময় উদরাময় দেখা দিলে রোগ সেরে যায়। তার মতে, পক্ষাঘাতের জন্য রক্ত বা শ্লেষ্মা (Cerebral defluxion) দায়ী। পক্ষাঘাতের সঙ্গে 'আলফাসিয়া' বা মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিতে পারে বলে তিনি অভিমত দেন। রাজি প্রথম 'ইনট্রাভেনটিকিউলার হাইড্রোসিফালাস' বা মস্তিষ্কের প্রধান কোষে রোগের আক্রমণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি তার 'আল-হাবি'তে এ রোগের চিকিৎসায় মাথা কামানো, মাথার খুলির

www.pathagar.com

জোড় ও শিরার রক্তকোষে ছ্যাকা অনুমোদন করেন। বিষাক্ত জন্তু বা কোনো বিষাক্ত পোকা মাকড়ে কামড়ালে বা হুল ফুটালে প্রথমে কোনো কিছু দিয়ে জায়গাটি চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার এবং তারপর ঘায়ের ওপর লবণ ঘষে দেয়ার পরামর্শ দেন। বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেললে রোগীকে তিনি বমি করাতে বলতেন। রাজি পারদের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পারদকে বিষাক্ত বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। রাজি একটি বানরের ওপর পারদের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। 'আল-মনসুরী'তে তিনি লিখেছেন, *'আমি একটি বানরকে এক ডোজ পারদ খাইয়ে দেই। এতে তার খুব অসুবিধা হলো বলে মনে হয়নি। হাত দিয়ে চেপে ধরায় মনে হচ্ছিল তার পেট ব্যথা করছে। আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ পারদ খেলে পেটে বা অন্ত্রে ব্যথা ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় না।'* রাজি লাইকানথ্রোপি নামে এক ধরনের মানসিক ব্যাধি এবং প্রেমরোগের চিকিৎসা করতেন। তার উদ্ভাবিত চিকিৎসার মধ্যে ছিল উপবাস, কায়িক পরিশ্রম, চিত্ত বিনোদন, মনের গতি পরিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত অবিরাম মদ পানের ব্যবস্থাপত্র।

এলার্জি ও জ্বর

রাজি এলার্জিজনিত হাঁপানি রোগ চিহ্নিত করেন এবং তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি এলার্জি ও ইমিউনোলজির ওপর বই লিখেছেন। তিনি 'সেন্স অব স্মেলিং'-এ বসন্ত কালে গোলাপের গন্ধ নেয়া থেকে রাইনিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাখা দেন। এ ব্যাপারে তার বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম ছিল 'আর্টিকেল অন দ্য রিজন হোয়াই আবু জায়েদ বলখি সাফার্স ফ্রম রাইনিটিস হোয়েন স্মেলিং রোজেস ইন স্প্রিং'। এ বইয়ে তিনি বসন্তকালীন রাইনিটিস নিয়ে আলোচনা করেন। রাইনিটিস হলো এলার্জিজনিত হাঁপানির অনুরূপ একটি রোগ। রাজি প্রথম অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, জ্বর হলো একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা কৌশল অর্থাৎ রোগের বিরুদ্ধে শরীরের লড়াই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিমোনার গেরার্ড 'রিকুইল ডেস ট্রেইটেস দ্য মেডিসিন' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় এলার্জির ওপর লেখা রাজির একটি বই অনুবাদ করেন।

চিকিৎসকদের নৈতিকতা

চিকিৎসকদের নৈতিকতা বজায় রাখার ওপর রাজি জোর দিয়েছেন। তিনি পেশাগত দিক থেকে কয়েকটি বাস্তব, প্রগতিশীল ও মনস্তাত্ত্বিক আদর্শ প্রচার করেছেন এবং হাতুড়ে চিকিৎসকদের সমালোচনা করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বহু উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারও সব রোগের জবাব দিতে এবং প্রতিটি রোগ সারিয়ে তুলতে পারেন না। তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে সব রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। রাজি চিকিৎসকের নিয়মিত অধ্যয়ন এবং অগ্রসর জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তাদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরোগ্য ও দুরারোগ্য ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন, ক্যান্সার ও লেপরজির মতো দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে ব্যর্থ হলে চিকিৎসককে দোষ দেয়া ঠিক নয়।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর রচনাবলী

রাজির মোট ২৮৯ টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা বেশি। তার রচনাবলীর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এসব বই ল্যাটিনসহ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। নিচে রাজির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম দেয়া হলো:

(১) কিতাবুল হাবি
(২) কিতাবুল মনসুরী
(৩) কিতাবু ফিলজুদরী ওয়াল হাসবাত
(৪) কিতাবু সিররিল আসরার
(৫) কিতাবু রিসালাতেল খাছছাহ
(৬) কিতাবুল হাজারিল আছগার
(৭) কিতাবু রাসায়েল মুলুক
(৮) কিতাবু রাদ্দে আল-কিন্দি
(৯) কিতাবু সিরাতুল হিকমাতে
(১০) মাকালাতুন ফি আন্নাহ তিনাল মুকানাককালা বিহি ফিহে মানাফিজু
(১১) মাকালাতুন ফিল হাছাফিল কুলালি ওয়াল মাছানাহ

আলকেমির ওপর কয়েকটি বই:

(১) কিতাবু মাদখাল আল-তালিম
(২) কিতাবু ইলালে মা'দেন
(৩) কিতাবু ইসবতে সানাত
(৪) কিতাবু তদবীর
(৫) কিতাবু স্যাং
(৬) কিতাবু আকসির
(৭) কিতাবু শারাফি সানাত
(৮) কিতাবু তারবীব
(৯) কিতাবু শাভাহিদ
(১০) কিতাবু আজমায়েশী জার ভা সিম
(১১) কিতাবু সানি হাকিমান
(১২) কিতাবু সের
(১৩) কিতাবু সেরি সের
(১৪) রিসালায়ে বি ফান
(১৫) কিতাবু আরিজুয়েহ আরিজুখা
(১৬) কিতাবু তাবভিব

www.pathagar.com

১২৮০ সালে সিসিলির ইবনে ফারাজ 'দ্য কন্টিনেন্স' শিরোনামে রাজির কিতাবুল হাবি অনুবাদ করেন। ক্রিমোনার গেরার্ড কিতাবুল মনসুরী অনুবাদ করেন 'লাইবারাড আল-মনসোরেম' শিরোনামে। ল্যাটিন ভাষায় রাজির অন্যান্য যেসব বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো 'লাইবার ডিভিশনাম', 'এন্টিডোটারিয়াম', 'ডি এগ্রিটুডিনিবাস প্রোয়েকোনাম', 'ডি প্রোপ্রাইটাটিবাস মেমব্রোরাম ইট ইউটিলিটাফিবাসেট নোকামেনটিস এনিমাটিয়াম এগ্রিগাটাস এক্স ডিকটিস এন্টিকুরাম', 'ডি সেকটিবাসেট কুটেরিস ইট ভেনট্রিজ', 'ডি ফেব্রিডাস', 'লাইবার ডি ভারিওলিস ইট মরবিলিস ইট সালস', 'এপিসটোলা ডি ফিলোস', 'এক্সপেরিমেন্টারাম, 'প্রোপারেটো সালিস', 'লিউমেন লিউমিনাম' এবং 'এক্সপ্লানশিও ভারবোরাম হারমিটিস'।

মৃত্যু

রাজি অন্ধ হয়ে মারা যান। তার ক্ষতিগ্রস্ত চোখ কখনো ভালো হয়নি। সারাজীবন তার চোখ থেকে পানি ঝরতো। একসময় তার চোখে ছানি পড়ে। ছানিতে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তাবারিস্তান থেকে এক ছাত্র তার সেবা করার জন্য এগিয়ে আসে। তিনি ছাত্রটিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তার দিন শেষ। সেবা করার প্রয়োজন নেই। সত্যি সত্যি তিনি মারা যান। তবে তার মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। আল-বেরুনির মতে, আল-রাজি ৬২ বছর বয়সে ৯২৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইবনে খাল্লিকানও এই মত সমর্থন করেছেন। সারটনও অনেকটা একই মত দিয়েছেন। হোমইয়ার্ড এবং এলডোমিয়েলির মতে, ৯২৫ সালে ২৭ অক্টোবর তিনি মারা যান। ক্যাম্পবেলের মতে, তার মৃত্যু হয় ৯২৬ সালে। তবে যতদূর মনে হয়, হোমইয়ার্ড এবং এলডোমিয়েলির প্রদত্ত তারিখই সঠিক তারিখের কাছাকাছি। জন্ম মৃত্যুর তারিখের মতো তার মৃত্যুর স্থান নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে, তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেছেন। আবার কারো মতে, তিনি তার জন্মভূমি রাইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

টলেমির মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণকারী আল-বাত্তানি

টলেমির মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণকারী আল-বাত্তানি ৮৫৮ সালে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত উরফার কাছে হাররান শহরের বাত্তান নামে একটি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বাত্তানে জন্মগ্রহণ করায় তিনি ইতিহাসে 'বাত্তানি' নামে পরিচিত। বর্তমানে হাররান তুরস্কের আনাতোলিয়ার অংশ। রোমানরা হাররানকে কারহে নামে চিনতো। বাত্তানির পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-রাক্কি আল-সাবি আল-বাত্তানি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বাত্তানি ছিলেন টাইকো ব্রাহি, কেপলার, গ্যালিলিও এবং কোপার্নিকাসের অনুকরণীয় আদর্শ। বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, তিনি বাত্তানির কাছে ঋণী। তিনি তার বই 'দ্য রেভলিউশনিবাস অরবিয়াম কোলেসটিয়াম'-এ বাত্তানির কাছে ঋণী থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। কোপার্নিকাসের বইটি বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

আল-বাত্তানির কর্ম ও চিন্তাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আলবাতেগনিয়াস' (Albategnius), 'আলবাতেগনি' (Albategni) এবং 'আলবাতেনিয়াস' (Albatenius) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন নক্ষত্রের পূজারী সাবীয় বংশের সন্তান। গ্রহ নক্ষত্রের পূজারী হওয়ায় সাবীয় বংশে ছাবেত ইবনে কোরার মতো বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। বাত্তানি সাবীয় ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ মুসলমান। তার পিতার নাম জাবির ইবনে সিনান আল-হাররানি। তার পিতাও ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। আল-বাত্তানি পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবকাল থেকেই শিক্ষা লাভের প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। তিনি নিজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতেন। পিতার কাছ থেকে তিনি এসব যন্ত্রপাতি তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি যে কাজেই হাত দিতেন তা নিখুঁতভাবে শুরু করতেন এবং ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ইউফ্রেটিস নদীর নিকটবর্তী রাক্কা শহরে যান। বর্তমানে রাক্কা শহরটি সিরিয়ার অংশ। পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ রাক্কায় বেশ কয়েকটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। তার নামে শহরের নামকরণ করা হয়। কিন্তু বাত্তানি যখন বসবাস করছিলেন তখন শহরটি আবার পূর্বের নাম ফিরে পায়। এ শহরে বসবাস করতে থাকায় বাত্তানি 'আল-রাক্কী' নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। প্রাচীন সিরিয়ার রাজধানী এন্টিয়ক ও রাক্কায় তিনি নির্ভুলভাবে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন।

www.pathagar.com

আল-বাত্তানি

www.pathagar.com

৮৭৭ থেকে ৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। ৮৮০ সালকে ভিত্তি করে তিনি ৪৯৮টি তারকার একটি গ্রহপুঞ্জি তৈরি করেন। বাত্তানি চাঁদ, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলো নির্ভুলভাবে পরিমাপ করেন। তিনি এমন জায়গায় বসবাস করতেন যেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যবেক্ষণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। তার কোনো কোনো পর্যবেক্ষণ ছিল কোপার্নিকাসের চেয়ে নির্ভুল। তার ৫ বছর বয়সের সময় বাগদাদের খলিফা মুতাওয়াক্কিল ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনে তরুণ বয়সেই তাকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। পরিণত বয়সে তিনি সিরিয়ার গর্ভনর পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রীয় কাজের শত ব্যস্ত তার মধ্যেও তিনি বিজ্ঞান সাধনায় বিরতি দেননি। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, বাত্তানি ছিলেন একজন অভিজাত, যুবরাজ অথবা সিরিয়ার রাজা। কিন্তু কোনো আরব লেখকই তাকে এসব বিশেষণে ভূষিত করেননি।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মাত্র ২০ বছর বয়সে বাত্তানি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ৪১ বছর তিনি পর্যবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পর্যবেক্ষণ কাজে তিনি দিকনির্দেশক যন্ত্র, সমতল ও খাড়া সূর্যঘড়ি, ট্রাইকুয়াট্রাম, রুলার, এস্ট্রোল্যাব, নয়া আর্মিলারি স্ফিয়ার এবং আবক্ষ কোয়াড্রান্ট ব্যবহার করতেন। তার প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা ছিল আল-খাওয়ারিজমির চেয়ে অনেক জটিল ও তথ্যবহুল। তিনি তার 'আস জিজ আস-সাবি'তে তথ্যাদির বিশ্লেষণ ছাড়াও নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেন। আল-খাওয়ারিজমি জিজ প্রণয়নে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও আল-বাত্তানি সে পথে অগ্রসর হননি। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছিলেন। বাত্তানি পূর্বেকার আরবীয় ও গ্রীক উপায় অবলম্বনে অক্ষরগুলোকে সংখ্যার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে একটি তালিকা তৈরি করেন। ১৮৯৯-১৯০৭ সালের মধ্যে ইতালীয় পণ্ডিত সি. এ. নিলানো মিলান থেকে বাত্তানির এ তালিকার তিনটি খণ্ডের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা, সৌর আয়নমণ্ডলীর শক্তি, চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বছরের দৈর্ঘ্য, চান্দ্র মাসের বিশৃঙ্খলা, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, ঋতুর সঠিক সময় নির্ধারণ ইত্যাদি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল-বাত্তানির অবদান। এসব পর্যবেক্ষণে তিনি গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন। তিনি সূর্যের সঠিক ও মধ্যমান সম্পর্কে আগের ধারণা সংশোধন করেন। বাত্তানি নিজের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আগের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফল যাচাই করেন। আল-বাত্তানির হিসাবে বছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। তার হিসাবে হেরফের ছিল মাত্র ২৭ মিনিটের। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালির মতে, বছরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণে আল-বাত্তানির এ সামান্য ভুলের জন্য টলেমির ওপর তার নির্ভরশীলতা দায়ী। হিপোক্রেটসের ফলাফলের সঙ্গে তিনি তার নিজের পর্যবেক্ষণের ফলাফল মিলিয়ে নিলেই এ ভুল থেকে রক্ষা পেতেন। বাত্তানি নতুন নতুন

www.pathagar.com

যন্ত্রপাতি দিয়ে অয়নচলন বা প্রেসিশন অব ইক্যুয়িনক্স পরিমাপ করেন। তিনি দেখান যে, প্রতি বছর অয়নচলনের পরিমাণ হলো ৫৪. ৫″ অথবা ৬৬ বছরে এক ডিগ্রি। বাত্তানি গ্রহণের ক্রান্তিবৃত্তের আনতির জন্য ২৩ক্র.৩৫ মান নির্ধারণ করেন।

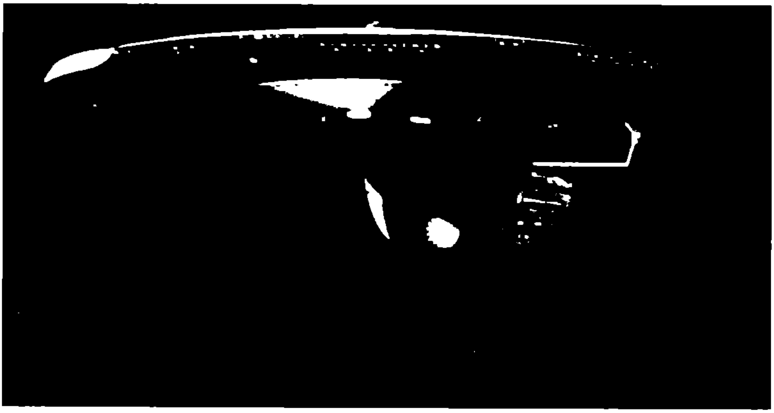

বাত্তানির সম্মানে তার নামে মহাশূন্যে প্রেরিত একটি মহাকাশযান

টলেমির মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণ

রাক্কা ও এন্টিয়ক থেকে বাত্তানি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা চালাতেন। তিনি ছিলেন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের গতি প্রকৃতি এবং সৌরজগৎ সম্পর্কে তার সঠিক তথ্য ছিল অভিনব। তার পর্যবেক্ষণে টলেমি ও হিপোক্রেটসের ভুল ধরে পড়ে। তিনি তাদের ভুলগুলো সংশোধন করেন। টলেমি সূর্যের কৌণিক ব্যাস পরিবর্তনের পরিমাণ ১০০ বছরে ১ ডিগ্রি এবং হিপোক্রেটস ৭০ বছরে এক ডিগ্রি পরিমাপ করেছিলেন। আল-বাত্তানি হিসাব করে দেখিয়ে দেন, সূর্যের কৌণিক ব্যাস পরিবর্তনের পরিমাণ ৭২ বছরে এক ডিগ্রি। বর্তমান গণনায় ডিগ্রির পরিমাণ বাত্তানির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তিনি নির্ভুলভাবে সূর্যের বার্ষিক গ্রহণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং এ ভিন্নতার জন্য কখনো আংশিক কখনো বা পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হয়। বাত্তানি 'কিতাব আল-জিজ' (On the motion of the Stars)-এ একটি ফর্মুলার সাহায্যে এসব তত্ত্ব প্রমাণ পেশ করেন।

ফর্মুলাটি হলো:

$$b \sin(A) = b \sin(90^{\circ} - A)$$ ।

কয়েক শতাব্দী পর বাত্তানির এ ফর্মুলার ভিত্তিতে ডানথর্প চাঁদের নির্ভুল হ্রাস বৃদ্ধি নির্ধারণে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

প্রতি বছর দু'বার দিন ও রাত সমান হয়। একটি তারিখ হলো ২০/২১ মার্চ এবং আরেকটি ২২/২৩ সেপ্টেম্বর। তাকে বলা হয় প্রেসিশন অব ইক্যুয়িনক্স বা অয়নচলন। বাত্তানি রাক্কায় নিজ খরচে একটি ব্যক্তিগত মানমন্দির স্থাপন করেন। এ মানমন্দির থেকে তিনি ৯০১ সালের ২৩ জানুয়ারি এন্টিয়কে সূর্য এবং ২ আগস্ট চন্দ্র গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেন। আল-বাত্তানি গ্রহণের সময় সূর্য বা চাঁদের ২৩ ডিগ্রি ৩৫ ডিগ্রি কোণে বেঁকে যাওয়া (ট্রেপিডেশন) গণনা করেন। তিনি হিসাব করে বের করেন যে, প্রতি বছর তার মান দাঁড়ায় ৫৪' ৫" বা ৬৬ বছরে এক ডিগ্রি। বাত্তানি তার তালিকায় অয়নচলনের একটি সমরূপ হার ব্যবহার করেন। এ তালিকা প্রণয়নে তিনি তার সহকর্মী ছাবেত বিন কোরার ট্রেপিডেশন তত্ত্ব গ্রহণ করেননি। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা ছিল স্পষ্ট। আল-বাত্তানি তার নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করেন, সূর্য স্থির নয়। টলেমির মতবাদ ভ্রান্ত। সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে গতিশীল। টলেমি প্রচার করেছিলেন, সূর্য স্থির। তার প্রচারিত তত্ত্ব আরব বিশ্বসহ গোটা পৃথিবী গ্রহণ করেছিল। এ তত্ত্বের বিপরীত কোনো মতবাদ প্রচার করা ছিল কঠিন। আল-বাত্তানি আরো প্রমাণ করেন, টলেমির সময় থেকে তার সময় পর্যন্ত সূর্যের দূরত্ব ১৬ ডিগ্রি ৪৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সূর্য স্থির নয় এবং তা নিজস্ব কক্ষে গতিশীল। তাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, কক্ষগুলো নিশ্চল নয়। এ ধারণা থেকে 'ইকুয়েশন অব টাইম'-এর বিষয়টিও পরিষ্কার হয়।

বাত্তানি টলেমির আরো কয়েকটি মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। ভ্রান্ত মতবাদগুলোর অন্যতম ছিল সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাস রেখা পরিবর্তন। বাত্তানির আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত টলেমির ভ্রান্ত ধারণাই চালু ছিল। বাত্তানি আরো প্রমাণ করেন, বার্ষিক সূর্য গ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডানথর্ন বাত্তানির সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদের ওপর নির্ভর করে চাঁদের গতি নির্ণয় করেন। বাত্তানি গ্রহের গতি সম্পর্কে টলেমির মতবাদের অসম্পূর্ণতা ও ভুল চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধন করেন। সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাস রেখা পরিবর্তনে টলেমির মতবাদের ভুল ধরা পড়ায় বাত্তানি অন্যান্য গ্রহের গতির অসমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। সন্দেহ হওয়ায় তিনি সবগুলোর গতি পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এই পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরেই টলেমির তালিকার পরিবর্তে নতুন তালিকা প্রস্তুত করেন। অমাবস্যার সঠিক গণনার জন্য আল-বাত্তানি জ্যোতির্বিজ্ঞানে অমর হয়ে রয়েছেন। সূর্য বিষুব রেখা অতিক্রমকালে দিন ও রাত সমান (প্রেসিশন অব ইক্যুয়িনক্স) হওয়ার কথা বিজ্ঞানীরা আগেও জানতেন। কিন্তু তাদের গণনায় ভুল ছিল। পরবর্তীকালে এ ভুল সংশোধন করা হয়। বাত্তানি সঠিক গণনা করে ভুলগুলো দেখিয়ে দেন।

পরবর্তীকালে বাত্তানির প্রভাব

বাত্তানির প্রভাবকে পরবর্তীকালের কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড়িয়ে যেতে পারেননি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক নিকোলাস কোপার্নিকাস-ও পারেননি। তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডি রেভলিশনিবাস'-এ বাত্তানির কথা বারবার স্মরণ করেছেন।

www.pathagar.com

এব্যাপারে নিধাল গুসুম তার 'ডাস দ্য কোপার্নিকান রেভলিউশন হেভ ইসলামিক রুট? শিরোনামে একটি বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Muhammad Al-Battani, one of the greatest Muslim astronomers of the whole era, one who was cited 23 times by Copernicus in De Revolutionibus.*' অর্থাৎ '*কোপার্নিকাস তার ডি রেভলিউশনিবাস-এ মোহাম্মদ আল-বাত্তানির নাম ২৩ বার উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন একটি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্যতম।*'

হেনরি বেট, আলবার্ট ম্যাগনাস, লেভি বেন গারসন ও রিগিওমন্টানাসের মতো মধ্যযুগের বহু খ্যাতনামা লেখক আল-বাত্তানির 'জিজ' ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন এবং তার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। টাইকো ব্রাহির লেখালেখিতেও বারবার তার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। কেপলার ও গ্যালিলিও তাদের পর্যবেক্ষণে বাত্তানির পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন।

ত্রিকোণমিতিকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মর্যাদাদান

আল-বাত্তানিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, ত্রিকোণমিতি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। তিনি বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির কিছু সমস্যার বিস্ময়কর সমাধান দিয়েছেন। তার আগে অন্য বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের এই শাখার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। আল-বাত্তানির অসাধারণ প্রতিভার সংস্পর্শে নির্জীব ত্রিকোণমিতি সজীব হয়ে উঠে। সাইন ও কোসাইনের সঙ্গে টানজেন্টের সম্পর্ক আল-বাত্তানিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি সেকান্ট এবং কোসিকান্টের পারস্পরিক কার্যক্রম উদ্ভাবন করেন এবং প্রথম কোসিকান্টের তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি এ তালিকাকে 'টেবল অব শ্যাডো' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ত্রিকোণমিতিতে বাত্তানির এ মৌলিক আবিষ্কার সম্পর্কে **'মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স এন্ড এস্ট্রোনমি'**তে বলা হয়, '*He was the first person to use in his works the expression `sine' and `cosine'. He discovered trigonomitrical ratios and invented sine, cosine, tangent and cotangent.*'অর্থাৎ '*তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তার রচনাবলীতে 'সাইন' ও 'কোসাইন'-এর প্রতীক ব্যবহার করেন। তিনি ত্রিকোণমিত্রিক অনুপাত উদ্ভাবন করেন এবং সাইন, কোসাইন, টানজেন্ট ও কোটানজেন্ট আবিষ্কার করেন।*'

ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত সিকান্ট ও কোসিকান্ট আবিষ্কার এবং কোসিকান্টের প্রথম সারণীও তৈরি করেছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় বলা হয়, '*Muhammad Ibn Jabir al-Battani discovered the reciprocal functions of secant and cosecant and produced the first table of cosecants for each degree from 10 to 90°.*' অর্থাৎ '*মোহাম্মদ ইবনে জাবির আল-বাত্তানি সিকান্ট ও কোসিকান্টের পারস্পরিক কার্যক্রম আবিষ্কার করেন এবং প্রথম ১০ থেকে ৯০° পর্যন্ত প্রতিটি ডিগ্রির জন্য কোসিকান্টের সারণী উপস্থাপন করেন।*'

যথার্থভাবেই 'মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স এন্ড এস্ট্রোনমি' এবং এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় বাত্তানির সত্যিকার অবদান তুলে ধরা হয়েছে। ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোণমিতির সম্পর্কও তারই আবিষ্কার। বাত্তানি প্রথম

www.pathagar.com

ত্রিকোণমিত্রিক অনুপাতের ধারণা জনপ্রিয় করে তোলেন। আমরা আজকাল তার ব্যবহৃত ত্রিকোণমিত্রিক অনুপাতের ধারণা ব্যবহার করছি। গ্রীক স্বরগ্রামের পরিবর্তে তিনি লম্বের ব্যবহার করেন। বাত্তানি জ্যামিতিক পদ্ধতির পরিবর্তে ত্রিকোণমিত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। টলেমিও একই কাজ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বাত্তানি সমবাহু ত্রিভুজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিকোণমিত্রিক সমাধান দিয়েছিলেন। বাত্তানি ত্রিকোণমিতির বেশ কয়েকটি সম্পর্ক উদ্ভাবন করেন। একটি হলো এরকম:

$$\tan = \frac{\sin}{\cos a}$$

$$\sec a = \sqrt{1 + \tan^2 a}$$

তিনি নিচের ফর্মুলা উদ্ভাবন করে sine x= a cos x এর সমাধানও করেছেন।

$$\text{sine } x = \underline{a}\ \sqrt{1 + a^2}$$

এককথায়, আল-বাত্তানির জীবন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি ও অঙ্কশাস্ত্রের ওপর তার রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি অক্ষরমালাকে সংখ্যার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে ব্যবহারোপযোগী জিজ-এর একটি তালিকা তৈরি করেন। এ তালিকা ইউরোপীয় পণ্ডিতরা অনুবাদ করে ৩ খণ্ডে প্রকাশ করেন। সাইন, কোসাইন, টানজেন্ট বা স্পর্শক ও কো-টানজেন্টের মতো ত্রিকোণমিতির সাংকেতিক নিয়মগুলো বাত্তানির আগে আর কোনো বিজ্ঞানী তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেননি। টলেমি জ্যায়ের ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন। জ্যায়ের ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি একটি উপপাদ্যের সাহায্য নিয়েছিলেন। তার উপপাদ্য একদিকে ছিল জটিল এবং অন্যদিকে ছিল দুস্প্রাপ্য। প্রথম প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে টলেমি সহজ বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছিলেন। নবম শতাব্দী নাগাদ বিজ্ঞানীরা টলেমির এ জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। আল-বাত্তানি সবাইকে এ জটিলতা থেকে মুক্তি দেন।

সাইন প্রতীক ব্যবহারের উদ্ভাবক

আরবীতে সাইন'কে বলা হয় 'জাইব'। বাত্তানিই প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন। তার ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ল্যাটিন অনুবাদগুলোই ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবীতে এ শব্দটি কিভাবে 'জাইব' হলো তার একটি ইতিহাস আছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এ প্রথম সাইনের সারণী দেয়া হয়েছিল। তিনি অর্ধ-জ্যায়ের জন্য ব্যবহার করেছিলেন 'অর্ধ-জ্যা' শব্দটি। কোনো এসময় তিনি ব্যবহার করেন 'জ্যা-অর্ধ'। যথাসময়ে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে লিখেন 'জ্যা বা 'জিভা'। মুসলিম গণিতজ্ঞরা 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অনুবাদ করলেও 'জিভা' শব্দটির কোনো পরিবর্তন করেননি। সেমিটিক ভাষায় সাধারণত ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে শব্দ গঠন করা হয়। লুপ্ত স্বরবর্ণগুলো উচ্চারণ করা হয় সাধারণ রীতি অনুযায়ী। এভাবে 'জিভা'কে

www.pathagar.com

'জিবা' বা 'জাইব' হিসাবে উচ্চারণ করা হয়। আরবীতে 'জাইব' শব্দটির অর্থ হলো 'ভাঁজ' বা 'উপসাগর'। ল্যাটিনে আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করা হলে 'জাইব' শব্দটি হয়ে যায় 'সাইনাস' (sinus)। ল্যাটিন ভাষায় 'সাইনাস' শব্দটির অর্থ হলো 'উপসাগর'। ক্রিমোনার গেরার্ডের ল্যাটিন অনুবাদে প্রথম 'সাইনাস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী ইউরোপীয় লেখকগণ গেরার্ডকে অনুসরণ করেন এবং দ্রুত ইউরোপীয় গণিতে 'সাইনাস' বা 'সাইন' শব্দটি ব্যবহার করা হতে থাকে। ১৬৩২ সালে ইংরেজ মন্ত্রী ও যন্ত্রনির্মাতা এডমান্ড গুন্টার প্রথম সংক্ষিপ্তাকারে 'সিন' (sin) প্রতীক ব্যবহার করেন।

সাইন ও কোসাইনের সঙ্গে টানজেন্টের সম্পর্ক আবিষ্কার

আল-বাত্তানি সাইন ও কোসাইনের সঙ্গে টানজেন্টের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। টানজেন্ট (tangent) ও কো-টানজেন্টের (co-tangent) সূত্রপাতের সঙ্গে সূর্যের গতিবিধির একটি নিকটতম সম্পর্ক ছিল। ছায়াঘড়ির উর্ধ্বতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকে টানজেন্ট এবং ওপরের সমতল ছায়ার ধারণা থেকে কো-টানজেন্টের উৎপত্তি হয়েছে। বাত্তানির উদ্ভাবিত ফর্মুলা ত্রিকোণমিতিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তার ফর্মুলার সাহায্যে কোনো কোণের সাইন জানা থাকলে তার টানজেন্ট এবং টানজেন্ট জানা থাকলে সাইন বের করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত প্রতীক ব্যবহার করলে ফর্মুলাটি হবে এ রকম:

$\text{Sine}\propto\ = \tan\propto\ \ 1+\tan^2\propto$ এবং $\cos\propto = \sqrt{1}\ \ 1+\tan^2\propto$

এ ফর্মুলাটি আজকাল প্রচলিত। ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোণমিতির সম্পর্ক আল-বাত্তানিই আবিষ্কার করেন। তার নিয়মটি হলো:

$\cos a=\cos b \cos c+\text{sine } b \text{ sine } c \cos A.$

বাত্তানি কোণের ডিগ্রি অনুযায়ী টানজেন্ট এবং কো-টানজেন্টের মান বের করার একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। গ্রীক পণ্ডিতগণ যেসব প্রতিপাদ্য জ্যামিতির সহায়তা নিয়ে সম্পন্ন করতেন, আরব বিজ্ঞানীরা সেগুলো বীজগণিতের সাহায্যে সম্পন্ন করতেন। আল-বাত্তানি বীজগণিতের সাহায্যে অতি সহজে $\text{sine}\theta/\cos\theta=D$ থেকে θ এর মান নির্ণয় করেন।

$\text{sine}\theta=D/\ \sqrt{1+D^2}$ এই সহজ ফর্মুলাটি বাত্তানির আগে অন্য কোনো বিজ্ঞানী ব্যবহার করেননি। সূর্যের উচ্চতা নির্ণয়ে তিনি যে প্রণালীর আশ্রয় নিয়েছিলেন বর্তমান ত্রিকোণমিতি অনুযায়ী তা হবে:

$x= 2\text{sine }(90-\propto)/\text{sine }\propto =2 \text{ Cot }\propto$

সম্মান

স্টার ট্রেক: ভয়েজার ছবিতে একটি যুদ্ধজাহাজের নামকরণ করা হয়েছিল 'এক্সেলশিয়র ক্লাস স্টারশীপ ইউএসএস আল-বাত্তানি'। নাইট অব দ্য হিউমেন্স-এ 'বাত্তানি-০৪৫'

www.pathagar.com

নামে একটি সৌর চুল্লি ব্যবহার করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) ১৯৩৫ সালে এ গণিতজ্ঞকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে 'আল-বাতেগনিয়াস'। ১১ দশমিক ৭ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৪ দশমিক ৩ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ১১৪ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

রচনাবলী

আল-বাত্তানি অঙ্কশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু বই রচনা করেন। 'আস জিজ আস সাবি' নামে পরিচিত 'কিতাব আল-জিজ' হলো তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সংক্ষেপে বইটি 'জিজ' নামেও পরিচিত। প্রাচীন ইরানের পাহলভী 'জিক' শব্দ থেকে আরবীতে 'জিজ' শব্দটি এসেছে। 'জিজ' শব্দের মানে হলো 'কারুকাজ করা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো'। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা সংরক্ষণে 'জিজ' একটি টেকনিক্যাল শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। 'জিজ'-এ বাত্তানি উল্লেখ করেছেন যে, তার পূর্বসূরিদের ভুল ক্রটি তাকে নয়া পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে টলেমির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বইটি লিখতে বাধ্য করেছে। 'কিতাব আল-জিজ' লিখতে তিনি টলেমির আলমাগেস্টের আরবী সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছিলেন। বাত্তানি পুরোপুরি বাস্তব সংজ্ঞা ও সমস্যার ভিত্তিতে বইটি লিখেছেন। এতে রয়েছে ৫৭টি অধ্যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকা সম্বলিত বইটি টিভলির প্লেটো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ল্যাটিন ভাষায় বইটির নাম দেয়া হয় 'দ্য মতু স্টেলারাম'। ১৫৩৭ ও ১৬৪৫ সালে বইটি ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনুবাদ করা হয় স্পেনীয় ভাষায়। বাত্তানির বইটির ল্যাটিন ও স্পেনীয় অনুবাদ এখনো টিকে রয়েছে। 'কিতাব আল-জিজ' ছাড়া বাত্তানির অন্য বইগুলো হলো:

(১) কিতাব মা'রেফাত মাতালী আল-বুরুজ ফি মা বায়না আবর আল-ফালাক (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক)।

(২) রিসালা ফি তাহকিক আকদার আল-ইত্তিসালাতে (জ্যোতির্বিজ্ঞানের ত্রিকোণমিত্রিক সমাধান বিষয়ক)।

(৩) সারাহ আল-মাকালাত আল-আরবা লি বাতমিয়াস (টলেমির ট্রেট্রাবিবলোসের ভাষ্য)।

মৃত্যু

রাক্কায় কর বৃদ্ধি করা হলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। রাক্কার অধিবাসী বাত্তানি একদল লোক সঙ্গে নিয়ে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য বাগদাদে খলিফার দরবারের উদ্দেশে রওনা হন। খলিফার দরবারে তিনি নালিশও করেন। কিন্তু বাগদাদ থেকে ফিরে আসার পথে এ মহামনীষী ৯২৯ সালে ৭২ বছর বয়সে টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীরে সামারার কাছে কাসর আজ জিস নামে একটি গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

ত্রিকোণমিতির জনক আবুল ওয়াফা

৯৪০ সালের ১০ জুন খোরাসান প্রদেশের বুজ্জান নগরে নবম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও ত্রিকোণমিতির জনক আবুল ওয়াফার জন্ম হয়। কারো কারো মতে, তার জন্ম ৯৩৯ সালে। তার পূর্ণ নাম আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসমাইল ইবনে আল-আব্বাস আল-বুজ্জানি। আবুল ওয়াফা হলেন গ্রীক পাণ্ডুলিপির শেষ আরবী অনুবাদক ও ভাষ্যকার। তিনি আরব নাকি পারস্য বংশোদ্ভূত সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। তবে অধিকাংশের মতে, তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পারস্যবাসী। আবুল ওয়াফার অস্পষ্ট জীবনীতে দেখা যায়, তিনি প্রথম জীবনে তার দূরসম্পর্কের দুই পিতৃব্য আবু আমর আল-মুগাজিনি এবং আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে কাম্বাসার কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখেছিলেন।

বাগদাদের বুয়েদীয় শাসক আদুদ আদ-দৌলা ছিলেন বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বেশ কয়েকজন গণিতজ্ঞকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। ৯৫৯ সালে ২০ বছর বয়সে আবুল ওয়াফা বাগদাদে আদুদ আদ-দৌলার দরবারে গমন করেন। বাগদাদের দরবারে আল-কুহি ও আল-সিজ্জির মতো গণিতজ্ঞরাও কাজ করতেন। আদুদ আদ-দৌলার পুত্র শরাফ-উদ-দৌলা ৯৮৩ সালে বাগদাদের খলিফা নিযুক্ত হন। নয়া খলিফা শরাফ-উদ-দৌলা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতি সমর্থন দান অব্যাহত রাখেন। আবুল ওয়াফা ও আল-কুহি নয়া খলিফার অধীনে বাগদাদের রাজদরবারে অবস্থান করতে থাকেন। খলিফা শরাফ উদ-দৌলা একটি মানমন্দির নির্মাণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রাজপ্রাসাদের বাগানে এ মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৯৮৮ সালের জুনে এ মানমন্দির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবুল ওয়াফা ও আল-কুহির মতো বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। মানমন্দিরে অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল ৬ মিটার দীর্ঘ কোণ পরিমাপক একটি যন্ত্র এবং ১৮ মিটার দীর্ঘ পাথরের তৈরি একটি সেক্সট্যান্ট। আবুল ওয়াফাই প্রথম তারকাপুঞ্জের কৌণিক দূরত্ব পর্যবেক্ষণে কোণ পরিমাপক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। 'কিতাব আল-জিজ'-এ আল-বাত্তানি কোণ পরিমাপক যন্ত্রের বর্ণনা দেয়ায় আবুল ওয়াফা তার কর্মে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। খলিফা শরাফ উদ-দৌলা মারা গেলে বাগদাদের মানমন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

আবুল ওয়াফা অঙ্কশাস্ত্রের সব বিভাগ নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতি ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়। এ দু'টি বিষয়ে

www.pathagar.com

তার অবদান অতুলনীয়। অন্যান্য বিভাগেও তার অবদান কম নয়। অঙ্ক, বীজগণিত এবং জ্যামিতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় তার প্রতিভা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

চাঁদের তৃতীয় অসমতা আবিষ্কার

আল-বাত্তানির উত্তরাধিকারী হিসাবে তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার ব্রত নিয়ে আবুল ওয়াফা তার কাজ শুরু করেন। দশম শতাব্দীতে আল-বাত্তানি এবং আবুল ওয়াফার প্রভাবই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনিই প্রথম মহাকাশ পর্যবেক্ষণে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানির পরে অন্য কোনো বিজ্ঞানী তার বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসরণ করে গবেষণায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। আবুল ওয়াফার হাতে তার ৪০ বছরের মৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী পুনর্জীবন লাভ করে। 'জিজ-আল-সামিল' বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। আবুল ওয়াফাই এ জিজের রচয়িতা। তিনি বিগত বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণগুলোকে নতুন করে পরীক্ষা শুরু করেন। তার প্রচেষ্টায় অনেক নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়। কেন্দ্র ও স্থানচ্যুতির সমীকরণ আবুল ওয়াফারই অবদান। তার আগে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয়নি। চাঁদের তৃতীয় মাত্রার অসমতা সম্পর্কে আলোচনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবুল ওয়াফাকে অমর করে রেখেছে। গ্রীক বিজ্ঞানীরা চাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার অসমতার কথা জানতেন। এ সম্পর্কে তারা বিস্তারিত তথ্যও লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু তৃতীয় মাত্রার অসমতার কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনো বিজ্ঞানীরই জানা ছিল না। এমনকি আবুল ওয়াফার মৃত্যুর ৬ শ' বছর পরও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই অসমতা 'ভ্যারিয়েশন' (Variation) নামে পরিচিত। এই ভ্যারিয়েশন হলো আবুল ওয়াফার আবিষ্কার। তিনি চাঁদের তৃতীয় অসমতার নাম দিয়েছিলেন 'ইখতিলাফ আরমুহাজত'। চাঁদের তৃতীয় অসমতা সম্পর্কে তিনি সত্যি সত্যি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মাঝে মতবিরোধ চলছে। তারা বলছেন, আবুল ওয়াফা চাঁদের তৃতীয় অসমতা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা ছিল আসলে 'ইভেকশন'-এর দ্বিতীয় অংশ। তবে ফরাসি গণিতজ্ঞ মঁসিয়ে সিডাটের মতে, আবুল ওয়াফা যা আবিষ্কার করেছিলেন, ৬ শ' বছর পর টাইকো ব্রাহি ঠিক একই জিনিস আবিষ্কার করেন। এফ. কাজোরি মঁসিয়ে সিডাটের মত সমর্থন করে বলছেন *'He (Abul wafa) forms an important exception to the unprogressive spirit of Arabian scientists by his brilliant discovery of the variation of the Moon, an inequality usually supposed to have been first discovered by Tycho Brahe.'* অর্থাৎ *'চাঁদের অসমতার অনন্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি (আবুল ওয়াফা) আরব বিজ্ঞানীদের অনগ্রসর চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। টাইকো ব্রাহি প্রথম চাঁদের এ অসমতা আবিষ্কার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।'*

আবুল ওয়াফার প্রাপ্য সম্মান দিতে গিয়েও মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি কাজোরি কটাক্ষ করেছেন। তার এ মানসিকতা হলো ইউরোপীয়দের সাধারণ মানসিকতার ধারাবাহিকতা মাত্র। প্যারিসের একাডেমি অব সায়েন্সে ৩৫ বছর ধরে এ নিয়ে

www.pathagar.com

বাদানুবাদ চলছে। কিন্তু তারা কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারেননি। বিরুদ্ধবাদীদের মতে, আরব বিজ্ঞানীরা চাঁদের প্রথম দু'টি অসমতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। তারা পৃথক পৃথকভাবে দু'টি অসমতা নিয়ে আলোচনা করতেন। এতে মনে হয়, তারা তৃতীয়টির কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তাদের মতে, আবুল ওয়াফার 'মুহাজত' টলেমির প্রসনিউসিস'-এর (Prosneusis) উন্নত আরবী সংস্করণ মাত্র।

ত্রিকোণমিতিতে অবদান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবুল ওয়াফার অবদান নিয়ে মতভেদ থাকলেও ত্রিকোণমিতিতে তার অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। তাকে এ শাস্ত্রের জনকের মর্যাদা দেয়া হয়। আল-বাত্তানির স্বপ্ন আবুল ওয়াফার প্রচেষ্টায় বাস্তবে পরিণত হয়। তার প্রতিভার ছোঁয়ায় ইতিপূর্বের অস্ফুট ত্রিকোণমিতি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আবুল ওয়াফা ত্রিকোণমিতিতে উপপাদ্য প্রমাণে সুষ্ঠু নিয়ম প্রচলন করেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে একটি ফর্মুলা বের করেন। এ ফর্মুলা ত্রিকোণমিতির পরিচয় বহন করছে।

ফর্মুলাটি হলো: sin (a,b)=sin (a) cos (b) cos (a) sin (b)
cos (2a)=1- 2 sin 2 (a)
sin (2a)= 2 sin (a) cos (a)

এছাড়া তিনি প্যারাবোলিক জ্যামিতির জন্য আরেকটি ফর্মুলা বের করেন। ফর্মুলাটি হলো: x^4=a এবং x^4 ax^3=b।

ত্রিকোণমিতি শব্দটি এসেছে ত্রিগুণন থেকে। ত্রিগুণন হচ্ছে তিনটি কোণ, মেট্রো ও পরিমাপের সমাহার। গণিতের এ শাখা সাইন, কোসাইন ও টানজেন্ট নিয়ে আলোচনা করে। আবুল ওয়াফা টানজেন্টের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। তার ব্যাখ্যা সমবাহু বৃত্তাকার ত্রিভুজ প্রমাণে সহায়তা করে। তিনি সাইনের তালিকা গণনার একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাতে তিনি তার পূর্বসূরিদের চেয়ে নির্ভুল তালিকা তৈরিতে সক্ষম হন। আবুল ওয়াফা চাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ত্রিকোণমিতির ৬টি রেখার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালান। তার ত্রিকোণমিত্রিক তালিকা ছিল ৮ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল। অন্যদিকে টলেমির ত্রিকোণমিত্রিক তালিকা ছিল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল। তিনি সাইন (a+b) এর মতো কয়েকটি ত্রিকোণমিত্রিক পরিচিতিকে তাদের আধুনিক আকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে প্রাচীন গ্রীক গণিতজ্ঞগণ জ্যায়ের সাহায্যে সম পরিচিতিগুলোকে প্রকাশ করতেন। আবুল ওয়াফা বৃত্তাকার ত্রিভুজে সাইনের নিয়ম আবিষ্কার করেন।

যেমন: $\underline{\text{sine A}\quad\text{sine B}\quad\text{sine C}}$
sine a = sine b = sine c

www.pathagar.com

এখানে A, B, C হচ্ছে তিনটি বাহু এবং a, b, c হচ্ছে তিনটি পরস্পর বিপরীত কোণ।

আবুল ওয়াফাই প্রমাণ করেন যে, সাইন এবং কোসাইন দিয়ে দুই কোণের সাইনের সমষ্টি নির্ণয় করা যায়। বর্তমান ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা হলো সাইন (A+B)= সাইন (A) Cos (B)+Cos A সাইন B। এ ফর্মুলা ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক পাঠ। কিন্তু আবুল ওয়াফার আগে অঙ্কশাস্ত্রবিদদের এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না।

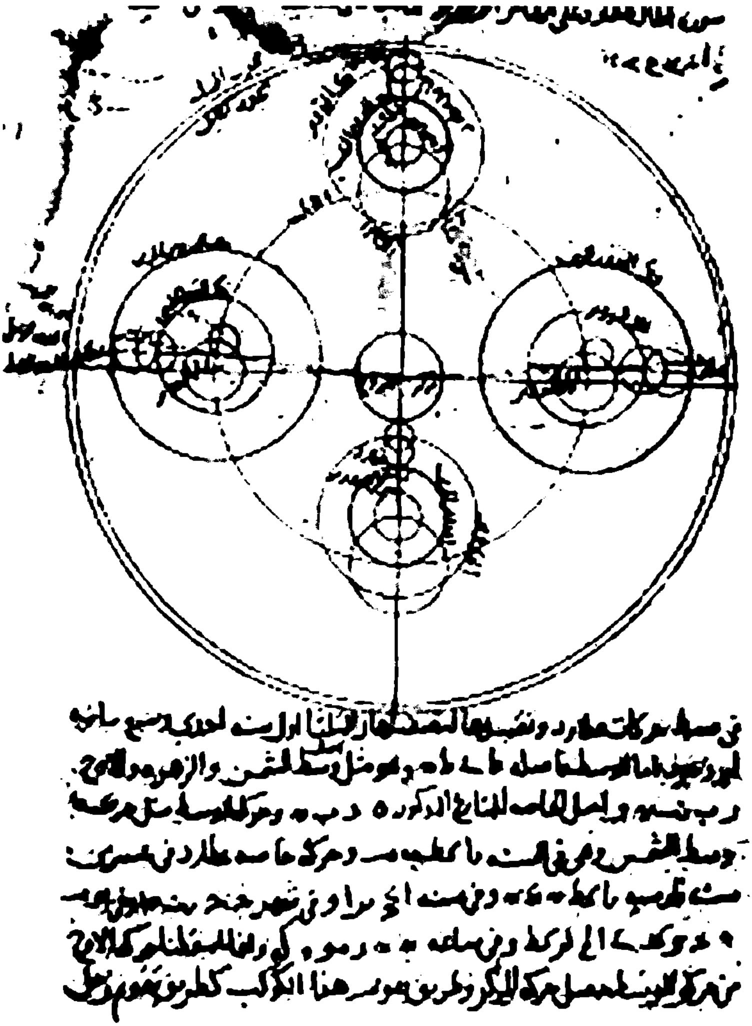

আবুল ওয়াফার নিজ হাতে লেখা জ্যামিতির একটি বর্ণনা

www.pathagar.com

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসেরও কোনো ধারণা ছিল না। কোপার্নিকাসের প্রিয় শিষ্য রাটিকাসার রচনাবলীতেও এ সহজ ফর্মুলার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে অনুরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ছিল একদিকে জটিল এবং অন্যদিকে কুটিল। বৃত্তাকার ত্রিভুজের সঙ্গে কোণের সাইনের সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করে ত্রিকোণমিতিকে বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিচালনা করার প্রথম কৃতিত্ব আবুল ওয়াফারই প্রাপ্য। তিনি ত্রিকোণমিতির নতুন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেন।

আবুল ওয়াফা সাইনের তালিকা প্রস্তুত করার এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি ৩০ ডিগ্রি কোণে সাইনের মূল্য দশমিক ভগ্নাংশের নবম স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করেন। এছাড়া প্রত্যেক দশ ডিগ্রির সাইন এবং টানজেন্টের মূল্য নিরূপণ করে একটি তালিকাও তৈরি করেন। আল-বাত্তানি টানজেন্টের সঙ্গে সাইন ও কোসাইনের সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন। তিনি তার চেয়ে বেশি কিছু করে যেতে পারেননি। সে দায়িত্ব এসে পড়ে আবুল ওয়াফার ওপর। তিনি প্রথম ত্রিকোণমিতিতে দুই কোণের সমষ্টির সাইন, কোণের অর্ধাংশের সাইনের বর্গের সঙ্গে কোসাইনের সম্পর্ক, কোণের সাইনের সঙ্গে সেই কোণের অর্ধেকের সাইন ও কোসাইনের সম্পর্ক সংযোজন করেন। আবুল ওয়াফা প্রথম প্রতি ১৫ক্র ডিগ্রি বিরতি দিয়ে সাইন ও টানের তালিকা তৈরির জন্য গণিতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। চাঁদের কক্ষপথ নিয়ে গবেষণার অংশ হিসাবে তিনি এ নিয়ম চালু করেন। এ নিয়ম 'থিওরিজ অব দ্য মুন'-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবুল ওয়াফা sec ও cosec ব্যবহার করেন এবং তিনি সাইনের তালিকা গণনার একটি নয়া পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবুল ওয়াফার সংজ্ঞা হবে এমন:

$$\text{Sine }(A+B)=\text{Sine }A \text{ Cos }B+\text{Cos }A \text{ Sine }B$$
$$2 \text{ Sine}^2\propto /2=1-\text{Cos }\propto$$
$$\text{Sine }\propto= 2 \text{ Sine }\propto/ 2 \text{ Cos }\propto 2$$

টানজেন্ট ও কোণ নিয়ে আবুল ওয়াফা বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। ত্রিকোণমিতিতে ৬টি রেখার পারস্পরিক সাধারণ সম্পর্ক বিদ্যমান দেখা যায়। আবুল ওয়াফাই এ সাধারণ সম্পর্ক উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে প্রচলিত ফর্মুলা এ সাধারণ সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। পূর্ব প্রচলিত সমকোণী ত্রিভুজের জায়গায় বৃত্তাকার ত্রিভুজের ব্যবহার এবং সঙ্গে সঙ্গে মেনিলাসের সম্পাদ্যের সাহায্যে 'রুলস অব ফোর ম্যাগনিচিউড' (Rules of four magnitude) বা বাহুর সাইনের সঙ্গে কোণের সাইনের সম্পর্ক এবং টানজেন্ট উপপাদ্যের প্রচলন হলো ত্রিকোণমিতিতে আবুল ওয়াফার অসামান্য অবদান। আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে রুলস অব ফোর ম্যাগনিচিউড লিখতে গেলে দাঁড়াবে সাইন a: সাইন c= সাইন A: সাইন C এবং স্পর্শক উপপাদ্য অনুসারে দাঁড়াবে টান a: টান A= সাইন b। আবুল ওয়াফা বাহুগুলোর কোসাইনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করে কয়েকটি ফর্মুলা বের করেন। তার ফর্মুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো Cos c=Cos a Cos b। আবুল ওয়াফাই সর্বপ্রথম স্থূলকোণী

www.pathagar.com

বৃত্তাকার ত্রিভুজের বাহু এবং কোণের সাইনের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আজকের ত্রিকোণমিতির বৃহৎ অংশ তার কাছে ঋণী।

আবুল ওয়াফাসহ মুসলিম গণিতজ্ঞরাই হলেন ত্রিকোণমিতির জনক। দ্য উইকিপিডিয়া: দ্য ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া'র নিচের ভাষ্য তার প্রমাণ। তাতে বলা হয়, 'The *Indian works were later translated and expanded in the medieval Islamic world by Muslim Mathematicians of mostly Persian and Arab descent, who enunciated a large number of theorems which freed the subject of Trigonometry from dependence upon the complete quadrilateral, as was the case in Hellenistic mathematics due to the application of Menelaus' theorem. According to E. S. Kennedy, it was after this development in Islamic mathematics `that the first real trigonometry emerged' in the sense that only then did the object of study become the spherical or plane triangle, its sides and angles.*'

অর্থাৎ *'পরবর্তীকালে পার্সী ও আরব বংশোদ্ভূত মুসলিম গণিতজ্ঞগণ ভারতীয় গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে মধ্যযুগের ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এসব মুসলিম গণিতজ্ঞ বিপুলসংখ্যক তত্ত্ব প্রকাশ করেন যেসব তত্ত্ব ত্রিকোণমিতিকে পুরোপুরিভাবে চতুর্ভুজের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে। মেনিলাসের তত্ত্ব প্রয়োগ করায় হেলেনীয় যুগের গণিতে এ শাস্ত্র চতুর্ভুজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ই. এস. কেনেডির মতে, ইসলামী গণিতে এ শাস্ত্রের উন্নতি ঘটার পর প্রথম সত্যিকার ত্রিকোণমিতির জন্ম হয়। এই অর্থে যে, একমাত্র তখন থেকে এ বিষয়ের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বৃত্তাকার ও সমতল ত্রিভুজ, তার বাহু এবং কোণ নিয়ে গবেষণা করা।'*

মক্কা শরীফের অবস্থান নির্ণয়

মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান আলোচনার প্রাথমিক স্তর থেকেই যে কোনো স্থান থেকে মক্কা শরীফের (কিবলা) অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করার আগ্রহ দেখাতে থাকেন। প্রায় প্রত্যেক জিজে এ নিয়ে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোনো স্থান থেকে কিবলার দিক নির্ণয় করার কথা উঠলে সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সঙ্গে মক্কা শরীফের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার পার্থক্য খুব বেশি না হলে সূক্ষ্ম গণনার মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে গণনা করা হতো। এতেই বেশ চলে যেতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তানি ও ইবনে ইউনূস অনেক সময় এ পন্থা অনুসরণ করেছেন। উপায়টি বেশ সরল। একটি বৃত্ত অঙ্কন করে দক্ষিণ এবং উত্তর দিক থেকে স্থানটির দ্রাঘিমার সঙ্গে মক্কা শরীফের দ্রাঘিমার পার্থক্য নিয়ে দু'টি সমান চাপ কেটে নেয়া হতো। বৃত্তের উপরিস্থ দু'টি ছেদ বিন্দু যোগ করে দেয়া হতো। অক্ষরেখার বেলায়ও তেমনিভাবে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে স্থানটির অক্ষরেখার সঙ্গে মক্কা শরীফের অক্ষরেখার পার্থক্য নিয়ে দু'টি সমান চাপ কেটে নেয়া হতো। বৃত্তের উপরিস্থ ছেদ বিন্দু যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যেতো তা পূর্বের রেখাকে যে কোনো বিন্দুতে ছেদ করতো। এই শেষোক্ত বিন্দুকে

www.pathagar.com

বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যেতো সেই রেখাটি মক্কা শরীফের অবস্থান নির্দেশ করতো। আন নাইরেজী সর্বপ্রথম এ গণনায় ক্ষান্ত না হয়ে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম গণনা করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তার গণনা সঠিক হয়নি। আবুল ওয়াফাই তার আল-মাজিস্তি'তে বিশুদ্ধ গাণিতিক হিসাব দেন।

জ্যামিতিতে অবদান

উপপাদ্য ও সম্পাদ্যের সমাধানে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আবুল ওয়াফা জ্যামিতিতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি ভাষ্যও তিনি প্রণয়ন করেন। বিন্দুর সাহায্যে পরাবৃত্ত অঙ্কন করেছেন এবং সমীকরণে তার সমাধান দিয়েছেন এভাবে: $x^4= a$ এবং $x^4+ax^3=b$। কোনো বর্গের সমান করে অন্য একটি বর্গ অঙ্কন, সমবাহু ও বহুভুজ অঙ্কনের নিয়ম পদ্ধতি, একই বৃত্তে অঙ্কিত সমবাহু ত্রিভুজের অর্ধেক বাহু নিয়ে একটি সাধারণ সপ্তভুজ তৈরি, $x^4=a$, $x^4+ax^3=6$ প্রভৃতি সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান দেয়ায় আবুল ওয়াফা স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কম্পাসের সাহায্যে তিনি জ্যামিতির কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেছেন। তার জ্যামিতির অঙ্কন প্রণালীগুলো আজও প্রশংসিত। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, তিনি এসব জ্যামিতিক সমাধানে ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা অঙ্কশাস্ত্রের কোনো শাখায়ই অবিমিশ্রভাবে আলোচনা করার আগ্রহ দেখাননি। তারা সবগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বজায় রেখে আলোচনা করেছেন। তাই ভারতীয় এবং গ্রীক পণ্ডিতদের অনুসরণকারী হয়েও জ্যামিতির তথাকথিত বিশুদ্ধতার প্রতি মনোযোগ দেয়ার অবসর তাদের কারো হয়ে উঠেনি। জ্যামিতি নিয়ে বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের আলোচনায় ব্যতিক্রম ঘটে। দ্বিতীয়বার ব্যতিক্রম ঘটে আবুল ওয়াফার আলোচনায়। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের মতো আবুল ওয়াফাও অবিমিশ্র জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করে একটি বই লিখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার নিজের হাতে লিখিত বইটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার ছাত্রের একটি ফারসি অনুবাদে ওয়াফার মূল কর্ম টিকে রয়েছে। এতে জ্যামিতিক অঙ্কনের সর্বপ্রথম মূলমন্ত্র থেকে শুরু করে পরিলিখিত গোলকের ওপর বহুতলের কৌণিক অঙ্কনসহ বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কণিক অধিবৃত্তের অঙ্কন, ক্ষেত্রফল স্থিরীকরণ এবং ঘনফল নির্ণয়ে আবুল ওয়াফার আলোচনা অনেক উন্নতমানের।

বীজগণিতে অবদান

গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাসের অনুবাদ বীজগণিতে আবুল ওয়াফার অনবদ্য কীর্তি। কাজোরির মতে, আবুল ওয়াফাই হলেন সর্বশেষ গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদক ও সমালোচক। তারপরে আর কোনো আরব গ্রীক রচনা অনুবাদ করেননি। আল-খাওয়ারিজমির বীজগণিতের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন আবুল ওয়াফা। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণ সম্পর্কেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। গণিতজ্ঞদের জীবনী

www.pathagar.com

সংগ্রাহক আবুল ফারদাসের 'কিতাবুল ফিহরী'তে আবুল ওয়াফার তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের উল্লেখ দেখা যায়। তার মধ্যে একটি সমীকরণের বর্তমান রূপ হলো $x^4+Px^3=P$। কণিকের সাহায্যে এ সমীকরণের সমাধান করা হয়েছে। $x^2-y=0$ সমীকরণে অধিবৃত্ত এবং $y^2+axy+b=0$। এ সমীকরণ সমাধানে পরাবৃত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থ

'কিতাব ফি মাইয়াহতাজু ইলাইহে আল-কুত্তাব ওয়াল ওম্মুল মিন ইলমু' হলো আবুল ওয়াফার মূল কর্ম। ৯৬১ থেকে ৯৭৬ সালের মধ্যে তিনি বইটি লিখেছেন। বইটি লিখার সময় আরবীয় অঞ্চলে দু'ধরনের গণিত বই পাওয়া যেতো। ভারতীয় প্রতীক ব্যবহার করে লিখা হতো এক ধরনের এবং আঙ্গুলে গণনার পদ্ধতিতে লিখা হতো আরেক ধরনের গণিত বই। আবুল ওয়াফা দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বনে বইটি রচনা করেন। তার বইয়ে সংখ্যার কোনো প্রতীক নেই। সবগুলো সংখ্যা লিখা হয়েছে কথায় এবং সব হিসাব করা হয়েছে মনে মনে। মরিজ ক্যান্টরের মতে, প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন, দু'ধরনের অঙ্কশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। একটি শ্রেণী ছিলেন ভারতীয় পদ্ধতি এবং আরেকটি শ্রেণী ছিলেন গ্রীক পদ্ধতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, গণিতজ্ঞগণ ভিন্নধর্মী দু'শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বই লিখতেন। আবুল ওয়াফা ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু খিলাফতের পূর্বাঞ্চলের লোকজন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতির প্রচলন দেখতে না পেয়ে তিনি আঙ্গুলে গণনা করার পদ্ধতিতে 'কিতাব ফি মাইয়াহতাজু' লিখতে বাধ্য হন। ৭ খণ্ডে বিভক্ত তার বইয়ের প্রতিটি খণ্ড আবার ৭টি অধ্যায়ে ছিল বিভক্ত।

প্রথম খণ্ড: অনুপাত নিয়ে আলোচনা। (এ খণ্ডে ½, ¼ মতো মূল ভগ্নাংশগুলো ব্যবহার করা হয়।)

দ্বিতীয় খণ্ড: গুণ ও ভাগ নিয়ে আলোচনা। (সংখ্যা ও ভগ্নাংশের সাহায্যে গণিতের সমাধান।)

তৃতীয় খণ্ড: পরিমাপ নিয়ে আলোচনা। (ফিগারের আয়তন, দূরত্ব এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমাণ।)

চতুর্থ খণ্ড: কর নিয়ে আলোচনা। (শস্যের ধরন এবং মূল্য ও বিনিময় সংক্রান্ত সমস্যা।)

পঞ্চম খণ্ড: পাঁচমিশালী বিষয় নিয়ে আলোচনা। (অর্থের একক, সৈন্যদের বেতন, নদীতে জাহাজ চলাচলের অনুমতি প্রদান অথবা অনুমতি প্রত্যাহার।)

সপ্তম খণ্ড: ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়।

বইটিতে আবুল ওয়াফা একটি সাধারণ নিয়মের ধারণা দেয়ার জন্য দেখান যে, ৫ থেকে ৩ বিয়োগ করলে ফল দাঁড়ায় ২। তারপর এ নিয়মে ২০ বের করার জন্য ২ কে ১০ দিয়ে গুণ করেন। এভাবে তিনি (১০-৩)(১০-৫)=৩৫ বের করেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য রচনা

আবুল ওয়াফা গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর বহু বই লিখেছেন। তবে তার অধিকাংশ বই হারিয়ে গেছে অথবা সংশোধিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে। 'কিতাব ফি মাইয়াহতাজু ইলাইহে আল-কুত্তাব ওয়াল ওম্মুল মিন ইলমু' ছাড়া সন্ধান পাওয়া রচনাগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

(১) আল-কিতাবুল কামিল (সম্ভবত ইবনুল কিফতী এ বইটিকে আলমাগেস্ট নামে উল্লেখ করেছেন। বইটির কিছু অংশ কারা দ্য ভো অনুবাদ করেছেন)

(২) কিতাবুল হান্দাসা (ব্যবহারিক জ্যামিতি। প্যারিসের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)

(৩) কিতাবুল মানাজিল ফিল হিসাব (অঙ্কের ক্রমিক স্তরের পুস্তক। এ বইটির সঙ্গে প্রথম দু'টি বইয়ের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। এতে রয়েছে আল-খাওয়ারিজমি, ডায়োফেন্টাস এবং ইবনে ইয়াহিয়ার বীজগণিতের ব্যাখ্যা)

(৪) কিতাবুল মাদখিল

(৫) কিতাবুল বারাহিন ফিল কাদায়া ফি মা স্তামালাহু দাওয়োফালতোম ফি কিতাবিহ

(৬) কিতাবু ইসতিখারাজ মাবালিগুল কাব বি মাল মাল ওয়া মা ইয়াতারাককাব মিনহা

(৭) আলমাগেস্ট

(৮) সেক্সাজেসিম্যাল (৬০ ভিত্তিক সংখ্যা প্রণালীর তালিকার একটি বই)

সম্মান

ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল অর্গানাইজেশন (আইএইউ) আবুল ওয়াফার নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করেছে। চাঁদের বিষুব রেখার কাছে ১০ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ১১৬ দশমিক ৬ অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৫৫ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার। ১৯৭০ সালে তাকে এ বিরল সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মৃত্যু

৯৯৮ সালের জুলাইয়ে বাগদাদে আবুল ওয়াফা পরলোকগমন করেন। জন্ম তারিখের মতো তার মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে, তার মৃত্যু হয়েছিল ৯৯৭ সালে।

www.pathagar.com

স্টাটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ছাবেত ইবনে কোরা

স্টাটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ছাবেত ইবনে কোরার পূর্ণ নাম আবু হাসান ছাবেত ইবনে কোরা ইবনে মারওয়ান আল-হাররানি। ছাবেত খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে ৯০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত হাররানে জন্মগ্রহণ করেন। হাররানে জন্মগ্রহণ করায় তিনি আল-হাররানি নামেও পরিচিত ছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় তিনি ছাবিত (Thebit), ছাবিথ (Thebith) ও তাবিত (Tebit) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ইসলামের স্বর্ণযুগের একজন গণিতজ্ঞ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও অনুবাদক। ছাবেত ইবনে কোরা এলজাব্রা, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন। তাকে টলেমি ব্যবস্থা সংস্কারের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি প্রথম $\sqrt{x}$ এর অখণ্ড সংখ্যা গণনা করেন। এছাড়া তিনি প্রথম অধিবৃত্তের পরিমাণ নির্ধারণ এবং গ্রহণের ক্ষেত্রফল খুঁজে বের করেন। বিজ্ঞানের সব শাখায় ছিল ছাবেতের পদচারণা। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন তা বলা কঠিন। তার বহুমুখী প্রতিভা স্বীকার করতে গিয়ে ড. সিরিল এলগুড 'অ্যা মেডিকেল হিস্টরি অব পার্সিয়া'র ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Judging from his recorded works, which are many, and his existing works which are few, it is difficult to say in which branch of learning Sabit excelled.'*

অর্থাৎ 'তার তালিকাভুক্ত কর্মের সংখ্যা বহু এবং তার বিদ্যমান কর্মের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এসব কর্মের ভিত্তিতে বিচার করতে গেলে ছাবেত জ্ঞানের কোন শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন তা বলা মুস্কিল।'

জীবনী

ছাবেত ইবনে কোরার পূর্বপুরুষ ছিল সাবীয় বংশের লোক। সাবীয়রা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করলেও গ্রহ উপগ্রহের পূজা করতো। ৬৩৯ সালে মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর সাবীয়রা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। জন্মগতভাবে এ অঞ্চলের লোকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল। সাবীয় গোত্রে বহু খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। গ্রীকদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এ গোত্রের লোকজন ছিল গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত। সেই সূত্রে তারা গ্রীক ভাষাও জানতো। মুসলিম শাসন কায়েম হলে সাবীয়রা আরবীভাষীতে রূপান্তরিত হয়। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় তুরস্কে সিরীয় নামে আরেকটি ভাষা ছিল। এ ভাষা ছিল ছাবেত ইবনে কোরার মাতৃভাষা।

www.pathagar.com

জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করছেন ছাবেত ইবনে কোরা

www.pathagar.com

তবে তিনি গ্রীক ও আরবী উভয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। অভিজাত বংশের সন্তান হওয়ায় ছাবেত বাগদাদে গিয়ে অঙ্ক এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি প্রথম অর্থের দালালি ব্যবসা করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দর্শন প্রচার শুরু করেন। ব্যবসা সহ্য হলেও তার দর্শনের উদার মতবাদ আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীর সহ্য হলো না। তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন। আদালত তাকে তার সব মতবাদ পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়। আদালতের রায় শুনে ছাবেত হাররান থেকে পালিয়ে সুদূর দারার কাছাকাছি কাফার তুসায় চলে যান এবং জীবিকার্জনে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখানেই মোহাম্মদ বিন মুসা বিন শাকিরের সঙ্গে তার দেখা হয়। মোহাম্মদ বিন মুসা গ্রীক পণ্ডিতদের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলীর অনুসন্ধানে বাইজান্টাইন ভ্রমণ করে বাগদাদে ফিরছিলেন। পথে ছাবেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। প্রথম আলাপেই তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় জ্ঞানস্পৃহা দেখে মোহাম্মদ মুসা তাকে সঙ্গে করে বাগদাদে নিয়ে আসেন। তখন থেকে জীবনের অধিকাংশ সময় ছাবেত এখানেই অতিবাহিত করেন। আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যৎ খলিফা আল-মুতাজিদ ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তার সঙ্গে ছাবেতের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। মোহাম্মদ মুসা তার প্রতিভার কথা উল্লেখ করে রাজকীয় সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তখন পর্যন্ত ছাবেতের বিজ্ঞান প্রতিভার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মুতাজিদ ছাবেতকে তেমন সাহায্য করতে পারেননি। পিতার মৃত্যুর পর অকর্মণ্য পিতৃব্য সিংহাসন থেকে অপসারিত হওয়া মাত্র মুতাজিদ ছাবেতের প্রতি মনোযোগ দেন এবং তাকে রাজদরবারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে নিয়োগ করেন।

গ্রীক পাণ্ডুলিপির আরবী অনুবাদ

তখনকার দিনে গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য যোগ্য লোকদের নিয়োগ দেয়া হতো। কয়েকটি ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা থাকায় ছাবেতকে অনুবাদক হিসাবে নিযুক্তি দেয়া হয়। অনুবাদক হিসাবে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদ ও সংশোধন করেন। আল-হাজ্জাজ ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস'-এর দু'টি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিছু ভগ্নাংশ ছাড়া দু'টি বইয়ের প্রায় সবই খোয়া যায়। ছাবেতের সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হুনায়ন ইবনে ইসহাক ইউক্লিডের জ্যামিতির তৃতীয় আরবী সংস্করণ অনুবাদ করেন। ছাবেত অনুবাদটি সংশোধন করেন এবং তার সঙ্গে একটি উপক্রমণিকা জুড়ে দেন। ছাবেত ইবনে কোরার মতো আরব বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান আজো টিকে রয়েছে।

জ্যামিতিতে ছাবেতের অবদান

ছাবেত চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হলেও দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণায় নিয়োজিত হন। তাকে আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

ইউক্লিডের জ্যামিতি শেখার মধ্য দিয়ে তিনি গণিতজ্ঞ হিসাবে জীবন শুরু করেন। ছাবেত একটি ত্রিভুজের মাধ্যমে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সমাধান দেন। তিনি পরাবৃত্ত ও কোণকে ত্রিখণ্ডিতকরণ নিয়েও আলোচনা করেছেন। পরাবৃত্ত ও অধিবৃত্তের ওপর ছাবেতের কর্ম অখণ্ড ক্যালকুলাস উদ্ভাবনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। গ্রীকরা জ্যামিতির পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করেছিল। তবে তারা তাতে গাণিতিক নিয়ম ব্যবহার করার কথা ভাবেনি। ইতিপূর্বে জ্যামিতিক এবং সংখ্যা বহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত পরিমাপের গাণিতিক সমাধান দিতে গিয়ে ছাবেত এমন একটি নিয়ম উদ্ভাবন করেন যা সংখ্যা তত্ত্বের পথ প্রশস্ত করে। এ ধারণা ছাবেতের সংখ্যা তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। ছাবেত গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের সমকোণী ত্রিভুজের ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় অখণ্ড $\sqrt{x}$ গণনা করতে সক্ষম হন।

ম্যাজিক স্কোয়ার, সমরূপী সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি কয়েকটি বই রচনা করেন। ম্যাজিক স্কোয়ার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে সাধারণ, নাসিক, সেমিনাসিক, এসোসিয়েট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাসিক, সেমিনাসিক প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। অনেকে মনে করেন, মুম্বাইয়ের অন্তর্গত নাসিকের কোনো অঙ্কশাস্ত্রবিদ এসব শব্দ প্রথম প্রচলন করেন। তবে নাসিক, সেমিনাসিক ছাড়া অন্যগুলোর প্রথম উদ্ভব কোথায় ঘটেছিল সে বিষয়ে সঠিক কিছুই জানা যায়নি। খুব সম্ভব চীনে। অনেকের মতে, চীনেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম উদ্ভব। ম্যাজিক স্কোয়ার উচ্চাঙ্গের না হলেও গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তাও একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ছাবেত ম্যাজিক স্কোয়ারের একটি স্পষ্ট রূপ দিয়েছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি যেমন বীজগণিতের প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার জন্য জ্যামিতি ব্যবহার করেছেন, ছাবেত ঠিক তার উল্টো বীজগণিতের সমস্যাগুলো জ্যামিতিতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। তার আগে অন্য কেউ এভাবে বীজগণিতের সমস্যাকে জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করেননি। জ্যামিতির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেও তিনি বীজগণিতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেননি। সমসাময়িক বিজ্ঞানী আল-মাহানির তৃতীয় মাত্রার সমীকরণ সমাধানের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি তৃতীয় মাত্রার কয়েকটি সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা করেন। এগুলোর মধ্যে একটি ঘনকে দুই ঘনতে বিভক্ত করার উপায় ছিল অন্যতম। জ্যামিতির সাহায্যে এগুলোর সমাধান ছিল খুবই সুন্দর এবং বিজ্ঞানসম্মত। তবে তার কোনো সাধারণ সমাধান প্রণালী তিনি স্থির করতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তার এলজাব্রার একটি অংশ প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। বইটির একটি পরিচ্ছেদে ত্রিমাত্রিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যামিতির সাহায্যে তার সমাধান করা হয়েছে।

সমীকরণটি ছিল এরকম: $x^3+6x = 20$ বা $x^3+px = q$

www.pathagar.com

এ সমীকরণ সমাধানে তিনি এমন দু'টি ঘন নেয়ার পরামর্শ দেন যাতে তাদের ধারের আয়তক্ষেত্র হয় 2 বা 1/3p এবং তাদের ঘন এর পার্থক্য হয় ২০ (বা q)। তাহলে x হবে দুই ঘন এর ধারের পার্থক্যের সমান। তার জ্যামিতিক উদাহরণ হলো:

A------------------- B ----------------------C

AC একটি সরল রেখা। যদি AC রেখা থেকে CB অংশ কেটে নেয়া যায় তাহলে AB এর ওপরের ঘন AC এবং BC এর ওপরের ঘন-এর পার্থক্যের চেয়েও কম হবে। তার পরিমাণ হবে AC, BC এবং AB এর ধারের ওপরের ৬টি সমান্তরিকের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের সমান।

এলজাব্রার ভাষায় $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab\ (a-b)$। এ থেকে x বেরিয়ে যাবে। ঘন দু'টির ধারের দৈর্ঘ্য বের করতে শুধু মাত্র একটি দ্বিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান দরকার। ত্রিকোণমিতি সম্পর্কেও ছাবেত কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। আল-বাত্তানির হাতে ত্রিকোণমিতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তার সূত্রপাত হয় ছাবেতের আলোচনার মধ্য দিয়েই।

ক্যালকুলাসের পথ প্রদর্শক

গণিতের অন্যতম শাখা ক্যালকুলাস বা উচ্চতর গণিতের সঙ্গে ছাবেতের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্যালকুলাসের দু'টি অংশ। একটি হলো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং আরেকটি হলো ইনটেগর‍্যাল ক্যালকুলাস। শেষোক্ত ক্যালকুলাসে ছাবেতের অবদান বেশি। পরাবৃত্ত ও অধিবৃত্তের ঘনফল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি আধুনিক ক্যালকুলাসের পথ প্রদর্শন করেন। তার প্রদর্শিত পথ ধরে জার্মান গণিতজ্ঞ গটফ্রিড উইলহেম লিবনিজ এবং ইংরেজ গণিতবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন এগিয়ে যান।

স্টাটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা

ছাবেত ইবনে কোরা হলেন স্টাটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা। স্টাটিক্স হলো যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি শাখা। মেকানিক্সের ওপর ছাবেতের লেখা 'কিতাব ফিল কারাসতাম' (দ্য বুক অন দ্য বীম ব্যালেন্স) বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। ক্রিমোনার গেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় বইটি অনুবাদ করেন এবং মেকানিক্সের ওপর একটি কর্ম হিসাবে বইটি ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিতাব ফিল কারাসতাম-এ ছাবেত লীভারের ইকুয়িলিব্রিয়াম বা ভারসাম্যের নীতি প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখান যে, তৃতীয়টির ভারসাম্য রক্ষাকারী দু'টি সমান বোঝা ইকুয়িলিব্রিয়াম ধ্বংস করা ছাড়া মধ্যবর্তী একটি পয়েন্টে স্থাপিত তাদের যোগফল প্রতিস্থাপন করতে পারে। তারপর শ্রেণীকরণ করার পর ছাবেত সমানভাবে বণ্টিত বোঝার কাঠামো বিবেচনা করেন এবং একটি ভারি বীমের ইকুয়িলিব্রিয়ামের শর্ত খুঁজে পান।

www.pathagar.com

গণিতে এমিক্যাবল সংখ্যা উদ্ভাবন

গণিতে 'এমিক্যাবল' সংখ্যা উদ্ভাবন ছাবেতের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। 'বুক অন দ্য ডিটারমিনেশন অব এমিক্যাবল নাম্বার' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত বইয়ে তিনি উল্লেখ করেন, পিথাগোরাস পূর্ণাঙ্গ ও এমিক্যাবল সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রকাশিত পিথাগোরাসের জীবনীতে ল্যাম্বলিসাস প্রথম এ দাবি করেন। পিথাগোরাসের জীবনীতে তিনি এমিক্যাবল সংখ্যা ২২০ ও ২৮৪ বলে উল্লেখ করেন। ২২০ ও ২৮৪ হলো সর্বনিম্ন এমিক্যাবল সংখ্যা। এমিক্যাবল সংখ্যা হলো দু'টি ভিন্ন রাশি বা সংখ্যা। এ দু'টি সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক হলো এরকম যে, প্রতিটি সংখ্যার বিভাজকগুলোর যোগফল হবে অন্য সংখ্যাটির সমান। যেমন- ২২০ এর বিভাজক হলো ১, ২, ৪, ৫, ১০, ১১, ২০, ২২, ৪৪, ৫৫ ও ১১০। এ সংখ্যাগুলোর যোগফল দাঁড়াবে ২৮৪। আবার ২৮৪ এর বিভাজকগুলো হলো ১, ২, ৪,৭১ ও ১৪২। এ সংখ্যাগুলোর যোগফল দাঁড়াবে ২২০। এই হলো এমিক্যাবল সংখ্যার রহস্য। আসলে পিথাগোরাস এ ধরনের সংখ্যা বের করার চেষ্টা করেননি। ল্যাম্বলিসাসের দাবি পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তারপর ছাবেত সঠিকভাবে উল্লেখ করেন যে, ইউক্লিড ও নিকোমাচাস পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেন এবং ইউক্লিড পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা নির্ণয় করার একটি নিয়ম বের করেছেন। তবে তাদের কেউ এমিক্যাবল সংখ্যা নির্ণয়ে কোনো আগ্রহ দেখাননি। ইউক্লিড ও নিকোমাচাস উভয়ে বিষয়টি উপেক্ষা করায় তিনি প্রয়োজনীয় লিমাসের সাহায্যে এমিক্যাবল সংখ্যা বের করে তা প্রমাণ করেন। ৯টি লিমাস বের করার পর ছাবেত তার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করেন। p, q এবং r প্রাইম নাম্বার (যে সংখ্যাকে শুধু ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না) হলে এবং P=3 ⌊2n^⌋-1, q= 3=⌊2^(n-1)⌋-1 এবং r= 9⌊2^(2n-1)⌋-1 হলে (2^n) pq এবং (2^n) r হবে এমিক্যাবল সংখ্যা। এভাবে ছাবেত প্রথম এমিক্যাবল সংখ্যা বের করার নিয়ম উদ্ভাবন করেন। ছাবেতের নিয়মে বলা হয়, যদি

$$p=3\times 2^{n-1}-1,$$
$$q=3\times 2^{n}-1$$
$$r=9\times 2^{2n-1}-1$$

তাহলে $n>1$হবে একটি অখণ্ড সংখ্যা এবং p, q ও r হবে প্রাইম নাম্বার। $2^n pq$ এবং $2^n r$ হলো এক জোড়া এমিক্যাবল সংখ্যা। ছাবেত n=2 এর জন্য (২২০, ২৮৪), n=4 এর জন্য (১৭২৯৬, ১৮৪১৬) এবং n=7 এর জন্য (৯৩৬৩৫৮৪, ৯৪৩৭০৫৬) নির্ধারণ করে। এ ফর্মুলা ছাবেতের সংখ্যা হিসাবে পরিচিত।

অনুবাদকারী হিসাবেও ছাবেত কম যাননি। তিনি এপোলনিয়াসের কণিকের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ড অনুবাদ করেন ও ভাষ্য লিখেন। এছাড়া আর্কিমিডিস, ইউক্লিড, থিওডোসিয়াস ও টলেমির কয়েকটি বইও অনুবাদ করেন। ছাবেত তার একটি বইয়ে অনুপাত গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি জ্যামিতির পরিমাপে প্রযোজ্য অনুপাতের গাণিতিক সমাধান দিয়েছেন।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ছাবেত বহু বই লিখলেও টিকে আছে মাত্র ৮টি। তিনি 'কনসারনিং দ্য মোশন অব দি এইটথ স্ফিয়ার'- এ সূর্যের দূরত্ব, সৌরবর্ষ, সূর্যঘড়ি বা ছায়াঘড়ি এবং গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাগদাদের মানমন্দিরে দিনের পর দিন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন এবং তার ফলাফল লিখে রাখতেন। পরে সেসব ফলাফল থেকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য, সূর্যের দূরত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি যেসব তথ্য রেখে গেছেন সেগুলো আজো তার অমর কীর্তি ঘোষণা করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার গণনায় একটি ভুল ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ ভুল সংশোধন করা হয়নি। ছাবেতের পরবর্তী বিজ্ঞানীরা এমনকি কোপার্নিকাস পর্যন্ত এ ভুলকেই সঠিক বলে মনে নিয়েছিলেন। তার নির্ণীত ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতার মান হলো ২৩ ডিগ্রি ৩৩´৩২″। বিষুবীয় বিন্দুগুলো স্থির না থাকায় বিষুব রেখার পরিবর্তে নক্ষত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি সূর্যের গতি বের করার প্রস্তাব করেন। তার নাক্ষত্রিক বছরের পরিমাপ বর্তমান পরিমাপের প্রায় কাছাকাছি। বোসো (Bossaut) অবশ্য তার নির্ণীত ফলকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি তার ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আরবরা সাধারণত টলেমিকে অনুসরণ করতেন। টলেমির এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ছাবেতেরও নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না। হিপোক্রেটস এবং টলেমির মতো তিনিও মনে করতেন, গ্রহগুলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় এবং পূর্বস্থানে ফিরে আসে। আবার আগের মতো চলতে থাকে এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে এগুলো পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে। এ থেকেই 'ট্রেপিডেশন' (Trepidation) উপস্থিত হয়। গ্রহ উপগ্রহের গতি সম্পর্কে টলেমির মতবাদকে উন্নত ও সংশোধিত করার জন্য বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগস্থলের (কাল্পনিক) কম্পনকে প্রমাণ করতে তিনি টলেমির অষ্টম গোলকের সঙ্গে অন্য একটি গোলক সংযোগ করে দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্র গোলাকার এস্ট্রোল্যাব তৈরিতে তিনি অবদান রেখেছিলেন। 'ইরেশনাল ট্রান্সভারস্যাল ফিগার' (Irrational transversal figure) বা অখণ্ড আড়াআড়ি সংখ্যা সম্পর্কে ছাবেতের কয়েকটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্যান্য বইয়ের মতো এসব বইয়ে ইউক্লিড এবং প্লেটোর অনেক নিয়ম পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রবর্তিত কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

তুলাদণ্ডের ব্যবহার

তুলাদণ্ডের ব্যবহার পৃথিবীতে কোন সময় প্রথম প্রচলিত হয় তা সঠিকভাবে বলা যায় না। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছাবেতই সর্বপ্রথম তুলাদণ্ড বা দাড়িপাল্লা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করে একটি বই লিখেন। তার বইটির নাম ' কিতাব ফিল কারাসতান'। বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আরবী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। এ বইয়ে প্রথম অসম বাহু বিশিষ্ট তুলাদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়। যে সময় ছাবেত ইবনে কোরা তুলাদণ্ড

www.pathagar.com

নিয়ে বই লিখছিলেন সে সময় বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ও একই বিষয়ে বই লিখেছিলেন। ক্রিমোনার গেরার্ড ছাবেতের বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ল্যাটিন ভাষায় বইটির নাম দেয়া হয় 'লাইবার ক্যারাসটনিস সায়ার ডেসটারবারা' (Liber carastonis sire destarbera)। গেরার্ড এবং জোহানেস ছাবেতের অনেক বই ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।

চিকিৎসা বিদ্যা

ছাবেতের প্রণীত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক বই গালেনের বইয়ের অনুবাদ। তবে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পেশার মহত্ত্ব, বসন্ত, হাম এবং পাখির এনাটমি সম্পর্কে তিনি মৌলিক রচনা করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী বাহাউদৌলা তার 'খোলাসাতুল তাজাবীর'-এর বহু জায়গায় ছাবেতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ছাবেতের 'আল-জাখিরা' সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। ইউরোপে বইটি সমাদৃত হয়েছিল।

রচনাবলী

ছাবেত ইবনে কোরা বহু বইপত্র লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে ১৮৭টি বইয়ের নাম জানা গেছে। নিচে কয়েকটির নাম দেয়া হলোঃ

(১) ইখতিয়ার কিতাবু মা বাদেল তাবিয়াত
(২) মাসায়েলাতুল মাশুকাত
(৩) কিতাবু ফি আগালিতুস সুফসতাইন
(৪) কিতাবু ফি মারাতিবুল উলুম
(৫) কিতাবু ফির রাদ্দে আলা মান কালা ইন্নান নাফসা মিযাজ
(৬) জাওয়ামিউ কিতাবুল আদবিয়াতুল মুফরেদাত লেজালিনুস
(৭) জাওয়ামিউ কিতাবুল মাররাতেস সুদা লেজালিনুস
(৮) জাওয়ামিউ কিতাবু সুওয়েল মিযাজ আল-মুখাতেলাফ লেজালিনুস
(৯) জাওয়ামিউ কিতাবুল আমরাজিল হাদাত লেজালিনুস
(১০) জাওয়ামিউ কিতাবুল কাহুরাত লেজালিনুস

শিক্ষক হিসাবে ছাবেত

ছাবেতের একজন খ্রিস্টান ছাত্র ছিল। তার নাম ছিল আবু মুসা ইসা ইবনে উসায়েদ। সে ছিল ইরাকের সন্তান। উসায়েদ তার শিক্ষক ছাবেতকে অনবরত প্রশ্ন করতো। ছাবেত ছাত্রের প্রশ্নের জবাব দিতেন। ছাত্রের কাছে দেয়া তার জবাব নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করা হয়। ছাবেত প্লেটোর সংখ্যা ধারণা অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন, কেউ জানুক না জানুক, প্লেটোর সংখ্যাগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেগুলো গণনীয় সংখ্যা থেকে পৃথক। তিনি প্লেটো ও এরিস্টোটলের অন্যান্য ধারণা বিশেষ করে গতি তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তবে নিচের একটি উক্তি থেকে মনে হয় তিনি তার জ্যামিতিক গতি বিশ্লেষণে প্লেটোর রিপাবলিকের ধারণা মেনে নিয়েছিলেন। তার

www.pathagar.com

বইয়ের ইংরেজি অনুবাদে বলা হয়, '....*logic, psychology, ethics, the classification of sciences, the grammar of the Syriac language, politics, the symbolism of Plato's Republic..... religion and the customs of the Sabians.'* অর্থাৎ '.......*যুক্তি, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞানের শ্রেণীকরণ, সিরীয় ভাষার ব্যাকরণ, রাজনীতি, প্লেটোর রিপাবলিকের প্রতীক চিহ্ন..........সাবীয়দের ধর্ম ও রীতিনীতি।'*

সম্মান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছাবেত ইবনে কোরার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৫ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে। ২২ দশমিক শূন্য এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৪ দশমিক শূন্য অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৫৬ দশমিক ০৫ কিলোমিটার।

মৃত্যু

জন্মভূমির স্মৃতি ছাবেতের মনকে দোলা দিতো। তাকে চঞ্চল করে তুলতো। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যান। শেষ দিনগুলো তিনি হাররানেই কাটান। ৯০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৫ বছর বয়সে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন। ছাবেতের মৃত্যুতে তার বন্ধু আহমদ ইয়াহিয়া একটি শোক গাথায় বলেন, *'আল্লাহ ছাড়া সব জীবকেই একদিন মরতে হবে। একজন মুসাফির একদিন ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যে মৃত্যুবরণ করে সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না।'* ছাবেতের পুত্র সিনান ইবনে ছাবেত এবং তার নাতি ইব্রাহিম ইবনে সিনান ছাবেত উভয়েই ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত। গণিতে বিরাট অবদান রাখলেও তাদের দু'জনের কেউ ছাবেত ইবনে কোরার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি।

www.pathagar.com

পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ধারণকারী বানু মুসা

পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ধারণকারী জাফর মোহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির, আহমদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির এবং আল-হাসান ইবনে শাকির ছিলেন তিন ভাই। তিন ভাইয়ের কাজ ছিল এত অভিন্ন যে, তাদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। তিন ভাই প্রায় সব কাজই একসঙ্গে করেছেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাই জাফর মোহাম্মদই সর্বাধিক গুণী ছিলেন। গণিতের ইতিহাসে সংক্ষেপে তারা 'বানু মুসা' নামে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ ভাই জাফর মোহাম্মদ এবং কনিষ্ঠ ভাই আল-হাসান কাজ করতেন মূলত জ্যামিতি নিয়ে এবং মেজো ভাই আহমদ কাজ করতেন মেকানিক্স নিয়ে। তারা ছিলেন মুসা ইবনে শাকিরের পুত্র। যৌবনে মুসা ইবনে শাকির খোরাসানে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন। খলিফা হওয়ার আগে খোরাসানের গভর্নর হিসাবে আল-মামুন আধুনিক তুর্কিস্তানের মার্ভে অবস্থান করছিলেন। এসময় মুসা ইবনে শাকির তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। খলিফা হারুনুর রশীদের মৃত্যুর পর ভাই আল-আমিনের সঙ্গে আল-মামুনের যুদ্ধ বেধে যায়।

৭৯১ সালে খলিফা হারুনুর রশীদ প্রথম স্ত্রী জুবাইদার গর্ভজাত সন্তান দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদকে 'আল-আমিন' উপাধি দিয়ে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। ৭৯৮ সালে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী মারাজিলের সন্তান তার প্রথম পুত্র আবদুল্লাহকে 'আল-মামুন' উপাধি দিয়ে পরবর্তী খলিফা হিসাবে মনোনীত করেন। তৃতীয় পুত্র কাসিমকে তিনি 'মুতামিম' উপাধি দিয়ে মামুনের পরবর্তী খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দেন। ৮০২ সালে খলিফা হারুনুর রশীদ সমাজ্ঞী জুবাইদা এবং দু'পুত্র আল-আমিন ও মামুনকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা শরীফে হজ করতে যান। সেখানে তিনি তাদের কাছ থেকে দু'টি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর নেন। এ দু'টি অঙ্গীকারনামা পবিত্র কাবা শরীফে সংরক্ষিত রাখা হয়। আল-আমিন ও আল-মামুন পিতার মীমাংসা মেনে নেন। খলিফা হারুনুর রশীদ জোর দিয়ে ওছিয়ত করে যান যে, আল-আমিনের মৃত্যু হলে খলিফা হবেন আল-মামুন। কিন্তু হারুনুর রশীদের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাইয়ের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব বেধে যায়। মার্ভের গভর্নর আল-মামুনের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে আল-আমিন তাকে রাজধানী বাগদাদে ডেকে পাঠান। মামুন এ আদেশ অমান্য করলে আল-আমিন ৮১০ সালে তার প্রথম পুত্র মুসাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। তার কিছুদিন পর দ্বিতীয় পুত্র কায়িসকে পরবর্তী খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দেন। কাবাঘর থেকে তিনি অঙ্গীকারনামা এনে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলেন। এ পরিস্থিতিতে দু'ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। শিয়াদের অষ্টম

www.pathagar.com

ইমাম আলী রেজা বাগদাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে মামুনকে অবহিত করেন। আল-মামুন রমজানের শেষদিন ৮১২ সালের ১২ এপ্রিল বাগদাদ যাত্রা করেন। তুসে তিনি পিতা হারুনুর রশীদের মাজারে যাত্রাবিরতি করেন। ২৬ মে ইমাম আলী রেজা আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। তাকে খলিফা হারুনুর রশীদের পাশে সমাহিত করা হয়। তার রহস্যজনক ইন্তেকালে খোরাসানে ভয়াবহ বিদ্রোহ শুরু হয়। ইমাম আলী রেজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য মামুনকে সন্দেহ করা হতো। কিন্তু তিনি তার মৃত্যুতে চোখের পানি ফেলেন এবং শোক প্রকাশ করেন যাতে কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে।

আল-আমিন মামুনের বিরুদ্ধে ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে আল-আমিনের সেনাপতি আলী ইবনে ইসা নিহত হন। সেনাপতি নিহত হলে আল-আমিন নিজে মামুনের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তাতেও তিনি সফল হতে পারেননি। আল-মামুন বাগদাদ অবরোধ করেন। সিরিয়ায় পালিয়ে যাবার সময় আল-আমিন আক্রান্ত হয়ে ইউফ্রেটিসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এসময় মামুনের একদল উগ্রপন্থী সৈন্য তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ৮১৩ সালের যুদ্ধে আল-আমিন পরাজিত ও নিহত হলে মামুন সিংহাসন দখল করেন।

খলিফার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় মুসা ইবনে শাকিরের মধ্যে পরিবর্তন আসে। তিনি একজন গুণী ব্যক্তিতে পরিণত হন। জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবীর মতো আকাশমণ্ডল ও গ্রহগুলোর কক্ষপথ পদার্থ বিজ্ঞানের একই নিয়মের অধীন। গ্রীক বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল বিপরীত। তার বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী থেকে ভিন্নতর নিয়মে আকাশমণ্ডল ও গ্রহগুলো পরিক্রমণ করছে। মুসা ইবনে শাকির তুর্কিস্তানে একটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা তত্ত্বাবধান করেন। এ গবেষণায় তিনি নিজেও জড়িত ছিলেন। পৃথিবীর আয়তন এবং পরিধি নির্ধারণে এ গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সাড়ে ৬ হাজার মাইল এবং পরিধি ২০ হাজার ৪ শ' মাইল নির্ণয় করা হয়।

মুসা ইবনে শাকির আল-খাওয়ারিজমির সঙ্গে খোরাসান থেকে খলিফার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দলভুক্ত হয়ে বাগদাদে এসে উপস্থিত হন। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। তবে তিনি বেশিদিন জ্ঞান সাধনা চালিয়ে যেতে পারেননি। তিন পুত্র জাফর মোহাম্মদ, আহমদ এবং হাসানকে খলিফা আল-মামুনের হেফাজতে রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিন ভাই তখন নিতান্ত শিশু। খলিফা মামুন বাগদাদের একসময়ের গভর্নর ইসহাক ইবনে মুসাবির হাতে তিন ভাইয়ের ভার অর্পণ করেন। পরে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয় তার বিজ্ঞান সভার অন্যতম সদস্য ইয়াহিয়া বিন আবি মনসুরের হাতে। অতি শৈশবকাল থেকেই ভ্রাতৃত্রয় তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের সংস্রব লাভ করায় বিজ্ঞানের প্রতি তাদের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। বাগদাদের রাজদরবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তিন ভাই প্রচুর বিত্তের মালিক হন। ভ্রাতৃত্রয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সন্ধানে গ্রীস, বাইজান্টাইন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাইজান্টাইন সফর শেষে ফেরার সময় হাররানে জ্যেষ্ঠ ভাই জাফর মোহাম্মদের সঙ্গে ছাবেত ইবনে কোরার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বাগদাদে নিয়ে এসে খলিফার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

www.pathagar.com

বায়তুল হিকমাহয় নিযুক্তি লাভ

খলিফা আল-মামুন তিন ভাইকে বায়তুল হিকমাহয় নিযুক্তি দেন। বাগদাদে দ্রুত ক্ষমতার পালাবদল চলতে থাকে। ৮৩৩ সালে মামুন ইন্তেকাল করলে তার ভাই আল-মুতাসিম উত্তরাধিকারী হিসাবে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের খলিফা হন। ৮৩৪ সালে খলিফা আল-মুতাসিম ইন্তেকাল করলে আল-ওয়াছিত তার স্থলাভিষিক্ত হন। ৮৪৭ সালে খলিফা হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন আল-মুতাওয়াক্কিল। মামুনের পরবর্তী খলিফাদের আমলে বায়তুল হিকমাহয় অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বানু মুসা এ অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তারা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দির সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। তাদের পরামর্শে খলিফা মুতাওয়াক্কিল তার লাইব্রেরি বাজেয়াপ্ত করেন। বানু মুসা বায়তুল হিকমাহয় আল-খাওয়ারিজমির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। খাওয়ারিজমি ছিলেন বীজগণিতের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে বানু মুসা ছিলেন জ্যামিতিতে বেশি আগ্রহী। তাদের দিকনির্দেশনায় যেসব বিখ্যাত আরব অনুবাদক কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন হুনায়ন ইবনে ইসহাক ও ছাবেত ইবনে কোরা। হুনায়নের সঙ্গে জাফর মোহাম্মদের বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি তার কাছ থেকে চিকিৎসা বিষয়ক বহু অনূদিত বই সংগ্রহ করেন। অনুবাদকগণ গ্রীক, সিরীয় ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় বায়তুল হিকমাহয় কর্মরত অনুবাদক দলকে প্রতি মাসে পাঁচ শত দিনার করে প্রদান করতেন। আরব বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম যারা গ্রীক গণিত নিয়ে গবেষণা চালান এবং আরবী গণিতের ভিত্তিস্থাপন করেন বানু মুসা ছিলেন তাদের অন্যতম। এ ব্যাপারে আল-দাবাগ তার 'বায়োগ্রাফি ইন ডিকশনারী অব সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফি'তে লিখেছেন, *'The Banu Musa were among the first Arabic scientists to study the Greek mathematical works and to lay the foundation of the Arabic school of mathematics. They may be called disciples of Greek mathematics, yet they deviated from classical Greek mathematics in ways that were very important to the development of some mathematical concepts.'*

অর্থাৎ *'যেসব আরব বিজ্ঞানী গ্রীক গণিত নিয়ে গবেষণা চালান এবং আরব গণিতের ভিত্তি স্থাপন করেন বানু মুসা হলেন তাদের অন্যতম। তাদেরকে গ্রীক গণিতের শিষ্য হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও বহু ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন গ্রীক গণিত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। গ্রীক গণিত থেকে তাদের এ বিচ্যুতি ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাণিতিক ধারণার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'*

পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ধারণ

পাশ্চাত্যে পৃথিবীকে যখন চ্যাপ্টা ও সমতল হিসাবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চলছিল মুসলিম বিজ্ঞানীগণ তখন পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি পরিমাপের চেষ্টা করছিলেন। বর্তমান ভূগোলের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষরেখার কেন্দ্রস্থল গ্রীনউইচ ছিল তখনকার বিশ্বে অজ্ঞাত। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা কল্পনা করে বানু মুসা লোহিত সাগরের তীরে ডিগ্রি মেপে নির্ভুলভাবে পৃথিবীর প্রকৃত আকার ও আয়তন নির্ণয় করেন। বর্তমান বিজ্ঞানীদের ডিগ্রির মাপের সঙ্গে আরবদের নির্ধারিত মাপের পার্থক্য অতি সামান্য। ঐতিহাসিক গিবনের মতে, পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ধারণে আরবদের পরিমাপ সম্পূর্ণ ঠিক। একসময় মুসলিম

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গতি সম্পর্কেও স্থির নিশ্চিত হন। মুসলিম বিজ্ঞানীদের ৭ শ' বছর পর টাইকো ব্রাহি ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। একথা প্রচার করায় তাকে ইতালি থেকে পালাতে হয়। সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পালিয়ে বেড়ানো শেষে ইতালিতে ফিরে এলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অবশেষে তাকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে ঘোষণা করে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ব্রাহির পদাঙ্ক অনুসরণে গ্যালিলিও ঘোষণা করেন যে, সূর্য স্থির এবং পৃথিবী গতিশীল। এই মতবাদের জন্য তাকে বহু অপমান এবং দীর্ঘ কারা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ১৬৩৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান এবং কিছুদিন পর বধির হন। ১৬৪২ সালে বন্দিশালাতে তার মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় ইনকুয়িজিশনের নেতারা তার মৃতদেহ সমাহিত করতে নিষেধ করেন। গ্যালিলিওর বন্ধুরা সান্তাক্রুজে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে চাইলে পোপের আদেশে তাও নিষিদ্ধ হয়। অন্যদিকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ছিলেন কতই না ভাগ্যবান! তখনকার দিনে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা কম ছিল না। কিন্তু কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীকে বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য কখনো নিগ্রহের শিকার হতে হয়নি।

পৃথিবীর আকার সম্পর্কে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। খলিফা আল-মামুনের আমলে তাদের প্রচেষ্টা থেকেই তা বুঝা যায়। ভারতবর্ষে এ সত্য আবিস্কৃত হলেও প্রচার পায়নি। ইংরেজদের আগমনের আগ পর্যন্ত পুঁথির পাতায় তা সীমাবদ্ধ ছিল। টলেমি পৃথিবী গোলাকার বলে প্রমাণ করলেও তারপর আর এ নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় তাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তারা এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর আয়তন নিয়ে পরীক্ষা চালান। ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (The obliquity of the ecliptic) সম্পর্কে আগেকার বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং নির্ভুলভাবে তা নির্ধারণ করেন। চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি (Variation of the luner altitude) পর্যবেক্ষণ, সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা বা অপভূ, সূর্যের সর্বনিম্ন উচ্চতা বা অণুভূ প্রভৃতিসহ আরো কয়েকটি নতুন আবিষ্কারের জন্য মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে থাকবে।

বছরে দু'দিন দিন ও রাত সমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই দু'দিন পৃথিবী বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগস্থলে অবস্থান করে। পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গে এ সংযোগস্থলেরও পরিবর্তন হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে এ সত্য প্রমাণিত। পুরাকালের বিজ্ঞানে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয়নি। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় তা প্রথম আবিষ্কার করেন। তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তিন ভাই একসঙ্গে গবেষণা করতেন। একসঙ্গে মানমন্দিরে সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন। শেষ পর্যন্ত তিন ভাইয়ের নামেই সব আবিষ্কার রেকর্ড করা হয়। সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা বা অপভূ এবং এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা বা অনুভূ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞা। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, অপভূ ও অনুভূ স্থির। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল ভিন্ন। তাদের মতে, অপভূ ও অনুভূ একেবারে স্থির নিশ্চল নয়। তাদের পরিক্রমণ পরীক্ষিত সত্য হলেও নবম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। গ্রীকদের তো নয়ই। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই প্রথম এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং সূর্যের সর্বোচ্চ ও

www.pathagar.com

সর্বনিম্ন উচ্চতা পরিমাপ করেন। তারা ইরাকের সামারাকে গ্রহ নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন এবং এখানেই তাদের প্রথম গবেষণার কাজ চালান। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইবনে ইউনুসের গ্রন্থে তাদের প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা এবং সূর্য সম্পর্কে বহু তথ্য উল্লেখ করা হয়। নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বানু মুসার কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতিভার নির্দশন বিদ্যমান। জ্যামিতি ও বলবিজ্ঞান বা মেকানিক্সে তারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের আগে আর কোনো মুসলিম বিজ্ঞানী বলবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে গ্রীক বিজ্ঞানী পাপাস এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বলবিজ্ঞান আলেক্সান্দ্রিয়ার হিরনের উদ্ভাবিত এবং বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের আগ পর্যন্ত তার প্রচারিত নিয়ম ও তথ্যগুলো ছিল কিতাবী।

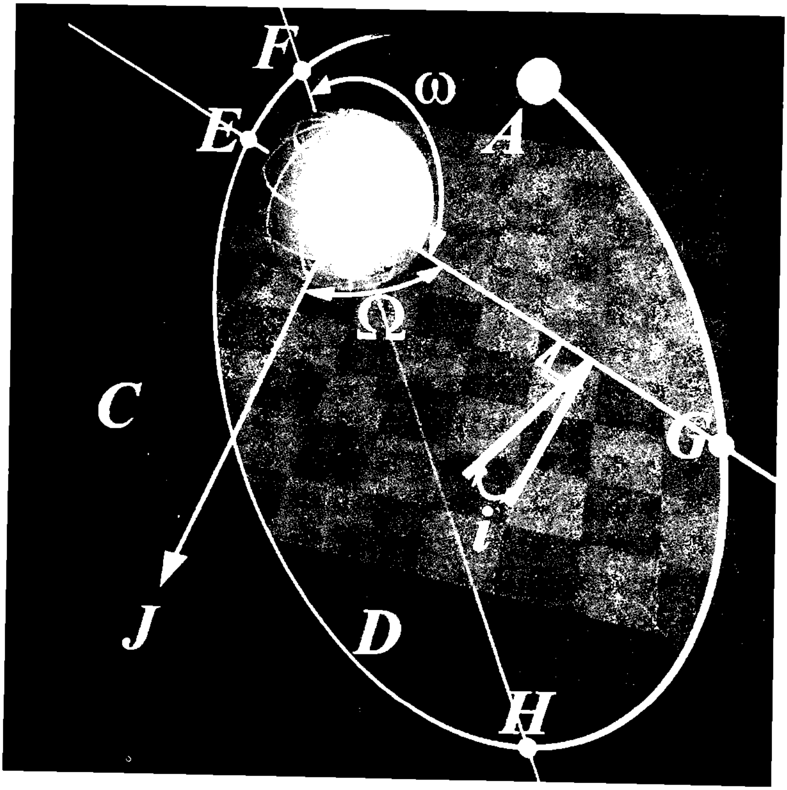

সূর্যের এপোজী

www.pathagar.com

হিরনের গ্রন্থগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশলের মধ্যে তার গ্রন্থের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ ছিল। বানু মুসা হিরনকে অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করেননি। তারা তাদের বইগুলোতে বলবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। বানু মুসার হাতে বর্তমান বলবিজ্ঞান নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। হিরনের গ্রন্থ তাদের এ নতুন পথে অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কুস্তা বিন-লুকা হিরনের গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন। এজন্য ধারণা করা হয় যে, বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় বইটির ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হন। হিরনের বইটি মুসা ভ্রাতৃত্রয়কে অনুপ্রাণিত করে থাকলেও তাদের অনুসৃত পন্থা ছিল তার প্রচারিত তথ্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিশীল যন্ত্রপাতি নির্মাণে তাদের অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জাফর মোহাম্মদ ও আহমদ হিসাব করে বছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা বের করেন।

জ্যামিতিতে অবদান

মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের আগেই জ্যামিতির প্রতি মুসলিম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। বানু মুসার প্রতিভার স্পর্শে গণিতের এ শাখা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কোণ দ্বিখণ্ডিত করার উদ্ভাবক হলেন ইউক্লিড। আর ত্রিখণ্ডিত করার উদ্ভাবক হলেন বানু মুসা। মুসা ভ্রাতৃত্রয় বিশুদ্ধ গতি বিজ্ঞান (Kinematic) ব্যবহার করে কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা যায় কিনা তা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। তাদের আলোচনার সূত্র ধরে সাফল্য অর্জিত হয়। এছাড়া তারা বাহুর পরিমাপ দিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার বিখ্যাত ফর্মুলাও আবিষ্কার করেন। তাদের প্রণীত জ্যামিতি বইয়ে ফর্মুলাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

রচনাবলী

এ পর্যন্ত তাদের যে সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে ফারাস্তান, গোলকের পরিমাপ সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং দু'টি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যকার সমানুপাত নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। উপবৃত্ত গঠন প্রণালীতে মৌলিক পন্থা উদ্ভাবনের সঙ্গে বানু মুসার নাম জড়িত। দু'টি কেন্দ্রের সঙ্গে রশি বেঁধে উপবৃত্ত অঙ্কন প্রণালীর উদ্ভাবক হলেন তারা। উপবৃত্তের সাধারণ ধর্মগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে এ অঙ্কন প্রণালী উদ্ভাবন করা হয়। বানু মুসার বিখ্যাত কর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কিতাব মারিফাত মাসাখাত আল-আসখাল' (The book of the Measurement of Plane and Spherical Figures)। ক্রিমোনার গেরার্ড ল্যাটিনে বইটি অনুবাদ করেন। ল্যাটিন অনুবাদকে ভিত্তি করে এম. কার্টেজ (M.Curtze) একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতে মোট ১৮টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃত্তের পরিধি, ত্রিভুজের তিনটি বাহু থেকে তার পরিধি নির্ণয়, শঙ্কুর আয়তন, গোলকের বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ আয়তন, কোণ ত্রিখণ্ডিতকরণ প্রভৃতি। কনিষ্ঠ ভাই আল-হাসান ইবনে শাকির গ্রহণের ওপর লিখেছেন 'দি এলংগেটেড সার্কুলার ফিগার' (The elongated circular figure)। আর্কিমিডিস তার 'মেজারমেন্ট অব দ্য সার্কেল এন্ড অন দ্য স্ফিয়ার এন্ড সিলিন্ডার'

www.pathagar.com

(Measurement of the Circle and On the Sphere and Cylinder)-এ ইউডোক্সাস পদ্ধতিতে (Eudoxus) বৃত্ত ও তল এবং গোলকের উচ্চতার ক্ষেত্রফল খুঁজে বের করেন। ইউডোক্সাস পদ্ধতিকে পরবর্তীতে 'মেথড অব এগজসচন' (method of exhaustion) হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। আর্কিমিডিসের পরে কোনো উন্নয়ন ছাড়া এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হতে থাকে। নবম শতাব্দী নাগাদ ক্ষেত্রফল ও উচ্চতার পরিমাপে কোনো কাজ করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বানু মুসা আর্কিমিডিস থেকে ভিন্নতর একটি পদ্ধতিতে বৃত্তের ক্ষেত্রফল খুঁজে পান। তবে তারা তার অতি ক্ষুদ্র (infinitesimal) ধারণাকে কাজে লাগান। বানু মুসা মেথড অব এগজসচন ব্যবহার করেন। তবে তারা এ পদ্ধতির মূল অংশ বাদ দেন। জিওসায়েন্সের শাখা ভূমিতিক বা আর্টস অব সার্ভেইং (arts of surveying) সম্পর্কে তাদের একটি সুন্দর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কেউ কেউ কোনো কারণ না দেখিয়ে ধরে নিয়েছিল যে, বইটি ইউক্লিডের। বানু মুসা গ্রীক বিজ্ঞানের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন। তারা চিকিৎসা প্রণালী, জ্যামিতি, কোণ, পরিমিতি প্রভৃতি বিষয়ে আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ক্রিমোনার গেরার্ড 'লাইবার ট্রায়াম এরাট্রাম' (Liber Trium Eratrum) শিরোনামে তাদের সমতলভূমি ও গোলকের পরিমাপ নির্ণয়কারী একটি বই ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। বইটিতে পরিমাপ নির্ণয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিতাব আল-হিয়াল' (Book of Ingenious devices) হলো গতি বিজ্ঞানে আহমদ ইবনে মুসা শাকিরের একটি অনবদ্য অবদান। মেকানিক্সের প্রতি বিশেষ আগ্রহ মেজো ভাই আহমদ ইবনে মুসা শাকিরকে 'অন মেকানিক্স' (On Mechanics) লিখতে অনুপ্রাণিত করে। বইটি হলো বায়ুচালিত যন্ত্রের ওপর লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক মেকানিক্স এবং অণু গবেষণায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

নিজস্ব মানমন্দির প্রতিষ্ঠা

প্রথম জীবনে বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজকীয় জ্যোতির্বিদ হিসাবে তারা অগাধ ধন সম্পত্তির অধিকারী হন। তবে তাদের এই অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় হয়নি। গ্রীক গ্রন্থাদি সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের নেশা অল্প বয়সেই তাদের পেয়ে বসেছিল। এতে তাদের মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। এছাড়া মানমন্দির নির্মাণ এবং পর্যবেক্ষণ কাজের জন্যও তাদের বেশ ব্যয় হয়। নিজেদের বিজ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য রাজকীয় মানমন্দির থাকা সত্ত্বেও তারা বাগদাদে নিজেদের বাড়িতে টাইগ্রিস নদীর তীরে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন এবং ৮৫০ থেকে ৮৭০ সাল পর্যন্ত অক্লান্তভাবে পর্যবেক্ষণ কাজ চালান।

আবিষ্কার

বহু আবিষ্কারের সঙ্গে বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম জড়িত। তারা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসহ বহু ডিভাইস আবিষ্কার করেন এবং তাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যা শতাধিক। তাদের

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে ফ্লুট ভাল্ব, ভাল্ব ও প্লাগ ভাল্ব, যান্ত্রিক ট্রিক ডিভাইসেস, স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনশীল ফাউন্টেন পেন, হ্যারিকেন ল্যাম্প, স্বয়ংক্রিয় ল্যাম্প, গ্যাস মাস্ক, ট্রিমিং ল্যাম্প ইত্যাদি।

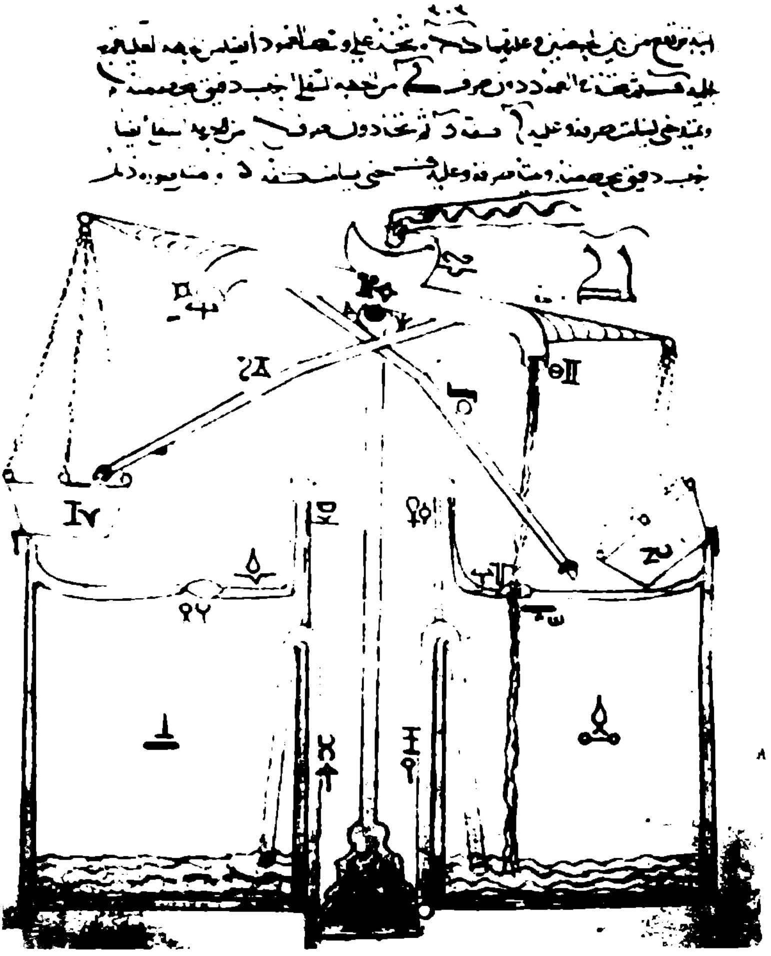

বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের আবিষ্কৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

www.pathagar.com

বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয় স্বয়ংক্রিয় বাঁশিও আবিষ্কার করেন। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ এ যন্ত্রটি সঙ্গীত জগতের একমাত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছিল। রাজ দরবারের সভাসদদের মনোরঞ্জনে তারা এসব যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বানু মুসার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে ক্লিফোর্ড এডমান্ড বোসওয়ার্থ তার 'হিস্টরি অব সিভিলাইজেশন অব সেন্ট্রাল এশিয়া'র চার নম্বর ভলিউমের দ্বিতীয় অংশের ২৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Banu Musa's work in this field was never surpassed by later Islamic engineers whose work was often superior in the design and construction of larger machines. Indeed, there is nothing comparable to the Kitab al-Hiyal until the introduction of pneumatic instrumentation in the twentieth century.'*

অর্থাৎ *'এ ক্ষেত্রে বানু মুসার আবিষ্কার পরবর্তীকালের মুসলিম প্রকৌশলীগণ কখনো অতিক্রম করতে পারেননি যদিও কোনো কোনো সময় তাদের নকশা ছিল তাদের চেয়ে উন্নততর এবং তারা আরো বৃহত্তর যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীতে বায়ুচালিত যন্ত্রপাতি চালু হওয়া নাগাদ কোনো কিছুই 'কিতাব আল-হিয়াল'-এর সমতুল্য নয়।'*

মৃত্যু

বানু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে যতদূর জানা যায়, আবু জাফর মোহাম্মদ ৮৭২ সালে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মিল্কিওয়ের গঠন শনাক্তকারী নাসিরুদ্দিন তুসি

মহাবিশ্বের অন্যতম ছায়াপথ মিল্কিওয়ের গঠন শনাক্তকারী নাসির আল-দীন আল-তুসি ১২০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রাচীন খোরাসানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণ নাম মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাসান তুসি। বন্ধুদের কাছে তিনি 'মুয়াক্কিক-ই-তুসি', 'খাজায়ে তুসি' বা 'খাজা নাসির' নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি নাসিরুদ্দিন তুসি এবং সংক্ষেপে 'তুসি' (Tusi) নামেই পরিচিত। জাতিতে তিনি ছিলেন পার্সী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তুসি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বায়োলজিস্ট, রসায়নবিদ, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি ছিলেন ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের লোক এবং দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী। আরব সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন তুসিকে শ্রেষ্ঠতম পার্সী পণ্ডিত হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। মুসলিম চিন্তাজগতে তাকে একজন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। নাসিরুদ্দিন তুসি বর্তমান ইরানের তাব্রিজের পূর্বদিকে মারাগায় একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইউক্লিডের গণিতের ব্যাখ্যা দেন এবং এ গণিতের আরো উন্নতি সাধন করেন। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে ভূখণ্ডের অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, আইন, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ও নীতিশাস্ত্রের ওপর আরবী ও ফারসিতে ৮০ টি প্রভাবশালী বই লিখেছেন।

জীবনী

তুসির পিতা ছিলেন তুসে দ্বাদশ শিয়া মতবাদের একজন আইনজ্ঞ। তার কাছেই তিনি ধর্ম শিক্ষা শুরু করেন। একই শহরে তিনি তার মামার কাছে যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন ও অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এসময় তিনি এলজাব্রা ও জ্যামিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি তার পিতাকে হারান। পিতার ইচ্ছা পূরণে তরুণ তুসি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণে ব্যাপকভাবে সফর করেন। ফরিদউদ্দিন আল-দামাদের কাছে দর্শন এবং মোহাম্মদ হাসিবের কাছে গণিত অধ্যয়নে তিনি তখনকার দিনে জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র নিশাপুরে যান। তুসি কিংবদন্তী সুফি ফরিদউদ্দিন আত্তারের সঙ্গেও দেখা করেন। পরবর্তীতে ফরিদউদ্দিন আত্তার মোঙ্গল হামলায় নিহত হলে তিনি কুতুবউদ্দিন আল-মাসরির কাছে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

www.pathagar.com

এসময় তিনি গভীরভাবে ইবনে সিনার 'কানুন' অধ্যয়ন করেন। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন মাওসিলে কামালউদ্দিন ইউনুসের কাছে। পরে তিনি ইবনে আল-আরাবির আত্মীয় আল-কুনওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসময় সুফিবাদ তার মনে আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। মানসিকতায় পরিবর্তন এলে তিনি সুফিবাদের ওপর নিজস্ব দর্শন প্রকাশ করেন। 'আওসাফ আল-আশরাফ'-এ তার দর্শন প্রকাশ পায়।

মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগদান

তুসির জীবনে এ উত্থান পতনকালে ইসলামী বিশ্ব এক ক্রান্তিকালের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী মধ্য এশিয়া থেকে খোরাসানের পথে ধেয়ে আসছিল। নিশাপুরে পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও তুসি নিজের জন্য একটি সম্মানজনক স্থান খুঁজে পাননি। পাহাড় পর্বত পরিবেষ্টিত খোরাসান ছিল একমাত্র শান্তির ঠিকানা। সেখানে ছিল ইসমাঈলীয়দের দুর্গ। ইসমাঈলীয় গভর্নর নাসিরুদ্দিন মুহতাসিম আবদুর রহমান তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং তাকে সেখানে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তুসি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কুহিস্তানে যান। সেখানে তাকে অতি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ইসমাঈলীয় রাজদরবারে তাকে জ্যোতিষী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। বাগদাদের রাজদরবারে যোগ দেয়ার চেষ্টা করায় তাকে আলামুত দুর্গে বন্দি করা হয়। আলামুত দুর্গ ছিল হাসান বিন সাবাহর নেতৃত্বাধীন একটি গুপ্তঘাতক চক্রের প্রধান ঘাঁটি। ইসমাঈলীয় শাসকের চাকরিতে তিনি কবে যোগদান করেছিলেন তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। জীবনের এ দুঃসময়ে তিনি ইসমাঈলীয় শাসকের জন্য তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আখলাক-ই-নাসিরি' রচনা করেন। বইটি রচনার তারিখ ছিল ১২৩২ সাল। তাতে মনে হয় তিনি ১২৩২ সালের আগে খোরাসানে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এক দুর্গ থেকে আরেক দুর্গে স্থানান্তরিত হতে থাকেন। আলামুত দুর্গসহ অন্যান্য দুর্গে অবস্থানকালে তিনি নীতিশাস্ত্র, দর্শন ও গণিতের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেন। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আসাস আল-ইকতিবাস' (যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক) ও 'রিসালায়ে মুয়িনিয়া' (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক)। পণ্ডিত হিসাবে তার খ্যাতি সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১২৫৬ সালে মোঙ্গল শাসক হালাগু খাঁ পারস্যে ইসমাঈলীয় আলামুত দুর্গে আক্রমণ চালালে তুসি পক্ষ পরিবর্তন করে মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি মোঙ্গলদের সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন। তার নেতৃত্বে আলোচনার সূত্র ধরে ইসমাঈলীয় দুর্গ প্রধান রুকনউদ্দিন আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও তাকে মঙ্গোলিয়ার উলানবাতোর নিয়ে হত্যা করা হয়। তুসির ভূমিকায় হালাগু খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মোঙ্গল দরবারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে নিয়োগ দেন। নিষ্ঠুর হলেও হালাগু খাঁ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি তুসির সুনাম শুনেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে তার উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেন। একইসঙ্গে তাকে ধর্মীয়

www.pathagar.com

আওকাফের দায়িত্বও দেয়া হয়। এত বড় পণ্ডিত হয়েও তুসি জীবনে এখানেই মস্তবড় ভুল করেন। তার ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে বাগদাদের মুসলিম খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে। সেই সঙ্গে খেসারত দিতে হয়েছে আব্বাসীয় বংশের গৌরব এবং মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের প্রদীপ বাগদাদ নগরীকে। ১২৫৮ সালে তুসি বাগদাদ অভিযানে হালাগু খাঁর সঙ্গী হন। তার সঙ্গে তুসির যোগদানের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত। তার মধ্যে একটি কাহিনী হলো যে, তিনি খলিফা আল-মুতাসিমের দরবারে অবস্থানকালে তার রোষানলে পতিত হন। তুসির কয়েকটি কবিতা ছিল তার প্রতি খলিফার ক্রোধের কারণ। খলিফা তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে হালাগু খাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এসব ঘটে হালাগু খাঁর বাগদাদ অভিযানের আগে। এমন কথাও শোনা গেছে, তিনি হালাগু খাঁকে সব অন্ধি সন্ধি জানিয়ে দেয়ায় তার পক্ষে সহজে বাগদাদ অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। হালাগু খাঁর দরবারে তিনি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হন। চিকিৎসায় দক্ষতা তাকে তার কৃপা লাভে সহায়তা করে। কথিত আছে যে, তার চিকিৎসায় হালাগু খাঁর জীবন রক্ষা পায়। এক রক্তমোক্ষণকারী তার রক্তমোক্ষণ করতে গিয়ে ভুল করে শিরার পরিবর্তে ধমনী কেটে রক্ত বের করে দেয়। হালাগু খাঁর নিগ্রো ক্রীতদাস ভুল ধরতে পেরে তৎক্ষণাৎ ধনুকের শক্ত ছিলা দিয়ে বাঁধ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে। কিছুদিন পরে জায়গাটায় পচন ধরলে নাসিরুদ্দিন তুসির ডাক পড়ে। তুসি চিকিৎসায় সফল হন এবং হালাগু খাঁ বেঁচে যান। এভাবে হালাগু খাঁর পূর্ণ আস্থা অর্জন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহের সুযোগ নিয়ে তুসি মারাগায় একটি বৃহদাকার মানমন্দির নির্মাণে তার অনুমোদন লাভে সক্ষম হন। ১২৫৯ সালে এ মানমন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং হালাগু খাঁর মৃত্যুর পর আবাকার অধীনে ১২৭২ সালে ইলখানি মানমন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

গণিতে অবদান

যুক্তিবিদ্যায় তুসি ইবনে সিনাকে অনুসরণ করেন। তবে তিনি যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে একটি নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তুসি শর্তযুক্ত সংযোজকের (ইকতিরানি) ব্যাখ্যা দেন। তার যুক্তি ছিল ইবনে সিনার চেয়ে উত্তম। তিনি যৌক্তিক শব্দগুলোকে গাণিতিক সংকেতে রূপান্তরিত করেন এবং আবুল বারাকাত তার 'কিতাবুল মুতাবার'-এ যেসব গাণিতিক সংকেত উল্লেখ করেন তিনি সেগুলোর ব্যাখ্যা দেন। তুসি দার্শনিক যুক্তিতে পদার্থের অর্থ এবং একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ হিসাবে তার ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করেন। গণিতে তুসির অবদান ছিল মূলত পাটিগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতিতে। তিনি অমূলদ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংখ্যার অর্থ সম্প্রসারণ করার মধ্য দিয়ে খৈয়ামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি তার 'কিতাবু শাকাল আল-কাত্তা'য় অনুপাতের জোড়াগুলোর মধ্যে গুণনের পরিবর্তনশীল ধর্ম প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা দেন যে, প্রতিটি অনুপাত হলো একটি সংখ্যা। 'জয়রামি আল-হিসাব' ছিল ভারতীয় সংখ্যা লিখন প্রণালী উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তুসির এ বইয়ে প্যাসকেলের ত্রিভুজ

www.pathagar.com

এবং সংখ্যার চতুর্থ ও সর্বোচ্চ বর্গ নির্ণয়ে ইতিপূর্বে বিদ্যমান পদ্ধতির উদাহরণ দেয়া হয়। মারাগায় সহকর্মীদের সহযোগিতায় তুসি উচ্চতর গণিতের উন্নয়নে কাজ করতে শুরু করেন। জ্যামিতিতে তিনি ওমর খৈয়ামের কর্মকে অনুসরণ করেন এবং তার 'আল-রিসালা আল-শাফিয়া'য় (Treatise that heals the doubt raised by parallel lines) ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করেন। ওমর খৈয়াম, আল-জাওয়াহিরি ও ইবনে হাইছামের স্বতঃসিদ্ধের ব্যাখ্যা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার বইটি শুরু হয়। বইটি লিখার সময় তুসি ছিলেন বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। বইটি লেখার ব্যাপারে তিনি আলম আল-দীন আল-হানাফির সঙ্গে মতবিনিময় করতেন। ১২৫১ সালে হানাফি মারা যান। তাতে মনে হয় বইটি এ সময়ের আগে লিখা শেষ হয়েছিল। ইবনে হাইছাম ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস'-এর ওপর একটি ভাষ্য লিখেছিলেন। তুসি এ ভাষ্যের কথা জানতেন। হাইছামের বইটিতে ইউক্লিডের সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের একটি নিয়ম ছিল। তুসি হাইছামের এ নিয়ম অনুসরণ করে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি দেখতে পান যে,

সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ হলো তৃতীয় একটি সরল রেখার সমান্তরাল পরস্পরছেদী দু'টি সরল রেখার অস্তিত্বের মতো অসম্ভব এবং শেষোক্তটির প্রমাণ সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধের চেয়ে আরো বেশি অনুমান নির্ভর। তিনি তখন এ উপসংহারে পৌঁছান যে, হাইছাম সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের কোনো চেষ্টা করেননি। তিনি কেবলমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিস্থাপন করেছেন মাত্র। তবে তিনি খৈয়ামের মতো সাচারির একটি চতুর্ভুজ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি দেখান যে, যে, যদি কোনো নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ ABCD-তে AB এবং DC বাহু সমান এবং উভয়ে BC-এর লম্ব এবং কোণ A এবং B সমান হয় এবং A এবং D কোণ এক সমকোণের কম হয় তাহলে সেই ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি হবে ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে কম। রুশ গণিতজ্ঞ নিকোলাই আইভানোভিচ লোবচেভস্কির জ্যামিতিতে তুসির জ্যামিতির প্রতিফলন ঘটেছে। লোবচেভস্কি দেখান যে, তুসি ও খৈয়াম উভয়ে ইউক্লিড বহির্ভূত অজ্ঞাত জ্যামিতির কয়েকটি ধর্ম প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন। তুসির কয়েক শ' বছর আগে ছাবেত ইবনে কোরা ও খৈয়াম ইতালীয় জেসুইট গণিতজ্ঞ সাচারি উদ্ভাবিত এ চতুর্ভুজ উপস্থাপন করেছিলেন।

ত্রিকোণমিতি

ত্রিকোণমিতিতে তুসির অবদান অসাধারণ। তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্রভাবে ত্রিকোণমিতির ওপর লিখেছেন। তার লেখালেখির ভিত্তিতে ত্রিকোণমিতি বিশুদ্ধ গণিতের একটি পৃথক শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে দীর্ঘদিন ত্রিকোণমিতি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তার 'কিতাবু শাকাল আল-কাত্তা'য় আবুল ওয়াফা, মনসুর ইবনে ইরাক ও আল-বেরুনিকে অনুসরণ করা হয়েছে। বইটিতে তুসি প্রথম মেনিলাসের উপপাদ্য অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যবহার করা ছাড়া

www.pathagar.com

ত্রিকোণমিতির উন্নয়ন ঘটান। ত্রিকোণমিতির ইতিহাসে এ বইটি ছিল একটি প্রথম কর্ম এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার মেনিলাসের মতো গ্রীক গণিতজ্ঞ এবং মুসলিম গণিতজ্ঞ আবুল ওয়াফা ও আল-জায়ানির গ্রন্থের আলোকে বইটিতে প্রথম স্ফেরিক্যাল ত্রিকোণমিতিতে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ৬টি নির্দিষ্ট সম্পর্ক তালিকাভুক্ত করা হয়। তুসির 'কিতাবু শাকাল' বা 'ডিসক্লোজিং দ্য সিক্রেটস অব দ্য ফিগার অব সিকান্ট'-এ সমতল ত্রিভুজের সাইনের বিখ্যাত নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিয়মটি হলো এরকম:

$$a/\sin A= b/ \sin B=c/\sin C$$

তুসি বৃত্তাকার ত্রিভুজের জন্য সাইনের নিয়ম বর্ণনা করেন এবং বৃত্তাকার ত্রিভুজের জন্য টানজেন্ট ব্যবহারের নিয়ম উদ্ভাবন করেন। তিনি দেখান যে, যদি c একটি বৃত্তাকার ত্রিভুজের অতিভুজের সমান হয় তাহলে

$$\cos c= \cos a \cos b \quad \cot A= \tan b \cot c$$
$$\cos c= \cot A \cot B \quad \sin b= \sin c \sin B$$
$$\cos A= \cos a \sin B \quad \sin b= \tan a \cot A.$$

তুসির 'কিতাব আল-শাকাল আল-কাত্তা'য় প্রথম এ ত্রিকোণমিত্রিক সমাধান দেয়া হয় এবং গণিতের ইতিহাসে তা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বৃত্তাকার জ্যামিতিতে তুসির অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে বরিস আব্রামোভিচ রোজেনফিল্ড তার 'অ্যা হিস্টরি অব নন-ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি: ইভল্যূশন অব দ্য কনসেপ্ট অব অ্যা জিওমেট্রি'র ২০পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*The most complete exposition of spherical geometry in the East in the Middle ages is found in the treatise Disclosing the secrets of the figure of secants (Kashf al-qina an asrar al-Shakl al-qatta) by the greatest mathematician and astronomer of the 13th century, Nasir al-Din al-*Tusi.'

অর্থাৎ '*ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসির আল-দীন আল-তুসির পুস্তিকা ডিসক্লোজিং দ্য সিক্রেটস অব দ্য ফিগার অব সিকান্টে (কাশফ আল-কিনা আন আসরার আল-শাকল আল-কাত্তা) মধ্যযুগে প্রাচ্য দেশে বৃত্তাকার জ্যামিতির সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।*'

১২৬৫ সালে তুসি একটি অখণ্ড সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। তিনি দ্বিপদ ফর্মুলার সহায়তায় একটি দ্বিপদকে যে কোনো পাওয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারণে সহগগুলো প্রকাশ করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন তুসি। হালাগু খাঁর কাছ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ করেন এবং আধুনিক বিচারে প্রথম মানমন্দির

www.pathagar.com

নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। রাসাদ খান নামে পরিচিত ইলখানি মানমন্দির ছিল বর্তমান আজারবাইজানের পশ্চিমে ইলখানি সাম্রাজ্যের রাজধানী মারাগায়। রাসাদ খান মানমন্দিরে কুতুবউদ্দিন শিরাজি, মহিউদ্দিন আল-মাগরেবি, ফখরুদ্দিন মারাগি, মহিউদ্দিন আল-উর্দি, আলী ইবনে ওমর আল-কাজওয়ানি, নাজিমুদ্দিন দাবিরান, আল-কাতিবি আল-কাজওয়ানি, আছিরুদ্দিন আভারি, তুসির পুত্র আসিল আল-দীন ও সদর আল-দীন, চীনা পণ্ডিত ফাও মানজি এবং গ্রন্থাগারিক কামালউদ্দিন আল-আয়কি প্রমুখ গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ১২৬১-৬২ সালে মহিউদ্দিন আল-উর্দি মানমন্দিরের জন্য চমৎকার যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল প্রাচীরে বসানো একটি কোণ পরিমাপক যন্ত্র, পাঁচটি আংটাসহ একটি আর্মিলারি স্ফিয়ার, একটি জরিপ যন্ত্র, একটি আয়ন যন্ত্র, দু'টি কোণ পরিমাপক যন্ত্র সম্বলিত একটি দিগবলয় রিং এবং একটি পর্যবেক্ষণ রুলার। এছাড়া মানমন্দিরে ছিল একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিতে ৪ লাখ বই সংরক্ষিত ছিল। রাসাদ খান মানমন্দিরে ১২ বছর পর্যবেক্ষণ এবং গণনা শেষে ১২৭১ সালে তুসি 'জিজ-ই-ইলখানি' রচনা করেন। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন আল-মাগরেবি বইটির ওপর একটি ভাষ্য লিখেন। মারাগা মানমন্দিরের কর্মকাণ্ড কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, এ মানমন্দির সব বিজ্ঞান ও দর্শন পুনরুজ্জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'জিজ-ই ইলখানি' এবং টলেমির আলমাগেস্টের ভাষ্য রচনা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তুসির অবদানের মধ্যে রয়েছে তার গ্রন্থ 'তাধকিরাহ'য় টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমালোচনা। মধ্যযুগে টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘাটতি সম্পর্কে তার সমালোচনা ছিল সবচেয়ে ক্ষুরধার। এছাড়া তুসি গ্রহ নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে একটি নয়া তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। মধ্যযুগে তার এ নয়া তত্ত্বই ছিল একমাত্র গাণিতিক মডেল।

'তাধকিরাহ'য় তিনি সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর আবর্তনের নির্ভুল তালিকা, তাদের অবস্থান এবং নাম সংযোজন করেন। সৌরজগৎ সম্পর্কে তুসির মডেল ছিল তার সময়ের সবচেয়ে অত্যাধুনিক এবং নিকোলাস কোপার্নিকাসের সময়ে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের উন্নতি নাগাদ এ মডেলের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। টলেমি ও কোপার্নিকাসের মধ্যবর্তী সময়ে তুসিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার কর্ম ও তত্ত্বকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানী শেন কাওয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি তার সৌর মডেলের জন্য 'তুসি কাপল' নামে একটি জ্যামিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি এ পদ্ধতিকে টলেমির ত্রুটিপূর্ণ ইকুয়্যান্ট প্রতিস্থাপনে ব্যবহার করেন। মধ্যযুগে তুসির এই একমাত্র গাণিতিক মডেল শুধু কুতুব আল-দীন শিরাজি অথবা ইবনে আল-শাতির নয়, খোদ কোপার্নিকাসকেও প্রভাবিত করেছিল। কোপার্নিকাস বাইজান্টাইনে তুসির ছাত্রদের সৌর মডেল ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করছিলেন।

'আল-তাধকিরাহ ফি ইলম আল-হায়াহ'র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তুসি তার বিশ্ববিখ্যাত 'তুসি কাপল' বা মডেলের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, '*একটি বৃত্ত অন্য*

www.pathagar.com

একটি স্থির বৃত্তের পরিধির অভ্যন্তরে ঘুরতে থাকলে প্রথমটির যে কোনো বিন্দু থেকে একটি সরল রেখা টানা হলে তা হবে দ্বিতীয়টির ব্যাসের সমান।'

ই.এস. কেনেডি প্রথম তুসির এ তত্ত্বের সন্ধান পান এবং তিনি তাকে 'তুসি কাপল' নামে আখ্যায়িত করেন। গ্রহ নক্ষত্রের গতি নির্ধারণে তুসি, কুতুব আল-দীন শিরাজি ও ইবনে আল-শাতির কিভাবে 'তুসি কাপল' প্রয়োগ করতেন কেনেডি তা প্রদর্শন করেন। এছাড়া তিনি টলেমির মডেলের সঙ্গে তুসি কাপলের তুলনা করেন। তুসির এ আবিষ্কার ছিল নিঃসন্দেহে টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে পিছু হটার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সূর্যকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কল্পনা করার হেলিওসেন্ট্রিক মডেল ছাড়া কোপার্নিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রাপ্ত সব তথ্য ইতিপূর্বে তুসি ও তার অনুসারীদের গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, বাইজান্টাইনীয় মাধ্যমের সহায়তায় কোপার্নিকাসের কাছে 'তুসি কাপল' পৌছেছিল। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী তুসির জ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভ করে তিনি ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ সত্য স্বীকার করেননি। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কোপার্নিকাস হুবহু তুসির মডেল অনুকরণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে জর্জ সালিবা 'হোজ সায়েন্স ইজ অ্যারাবিক সায়েন্স ইন রেনেসাঁ ইউরোপ?' শিরোনামে একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, *'It is now evident that the same Tusi Couple appears again in the works of Copernicus in the sixteenth century and is deployed to solve the same problems that it was used to solve in the Arabic sources where it was first conceived. In a seminal article written in the early seventies, the late German historian of science Willy Harter pushed the discussion yet another step further. He drew attention to the fact that even the geometric points employed in the diagram preserved in the Copernicus works were phonetically identical to the same geometric points used in the diagram employed by Tusi three centuries earlier. In effect, he noticed that where the Arabic diagram has a geometric point designated with the alphabetic letter `Alef' the Copernican diagram would have the corresponding point marked with the phonetically equivalent letter `A', where the Arabic has `Ba' the Copernican diagram would have `B' and so on.'*

অর্থাৎ *'এখন এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের কর্মে পুনরায় তুসি কাপলের আবির্ভাব ঘটে এবং আরবীয় সূত্রগুলো তুসি কাপলের সাহায্যে যেভাবে সমস্যার সমাধান দিয়েছিল কোপার্নিকাসও একই সমস্যার সমাধানে তা প্রয়োগ করেন। আরবীয় সূত্রগুলোই প্রথম এ ধারণা দিয়েছিল। সত্তর দশকের শুরুতে বিজ্ঞানের পরলোকগত জার্মান ঐতিহাসিক উইলি হার্টার এ বিতর্ক আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এ সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, এমনকি কোপার্নিকাসের রচনাবলীতে সংরক্ষিত নকশায় ব্যবহৃত জ্যামিতিক বিন্দুগুলো তিন শতাব্দী আগে তুসির নকশায় ব্যবহৃত জ্যামিতিক বিন্দুগুলোর সঙ্গে ধ্বনিগতভাবে অভিন্ন। বস্তুত: তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, আরবী নকশায় যেখানে জ্যামিতিক বিন্দু*

www.pathagar.com

'আলেফ' অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে কোপার্নিকাসের নকশায় 'এ' ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর যেখানে আরবী 'বা' সেখানে কোপার্নিকাসের নকশায় 'বি' ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে পর পর বিন্দুগুলো ধ্বনিগতভাবে সমতুল্য করা হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক জোসে মারিয়া মিলাসের একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য। তিনি 'অ্যা শেয়ার্ড লেগ্যাসি: ইসলামিক সায়েন্স ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,' *But then there is a `Smoking gun' in this case. There was one geometric point that indicated the centre of the smaller sphere in the Tusi Couple where Tusi had designated it with the Arabic letter `Zain'. All other points were the same, that is the Arabic letters used by Tusi were duplicated, point for point, with their Latin phonetic equivalents by Copernicus. For this particular point, Copernicus used the Latin letter `F', instead of the expected `Z'. This single variation could only mean that he, or someone helping him, obviously misread the Arabic `Zain' for an Arabic `Fa'. In fact, the two letters are very similar in the Arabic script.'*

অর্থাৎ *'তবে এ ঘটনায় 'অপরাধের একটি চূড়ান্ত প্রমাণ' রয়েছে। তাতে ছিল একটি জ্যামিতিক বিন্দু। তুসি কাপলে এ জ্যামিতিক বিন্দু একটি ক্ষুদ্রতর বৃত্তের কেন্দ্র নির্দেশ করছিল। তুসি আরবী অক্ষর 'জিম' দিয়ে এ বিন্দু চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যান্য বিন্দুগুলো ছিল একই। অর্থাৎ কোপার্নিকাস সমতুল্য ধ্বনিবিশিষ্ট ল্যাটিন অক্ষরমালার সহায়তায় তুসি ব্যবহৃত আরবী অক্ষরগুলো বিন্দু থেকে বিন্দু নকল করেছেন। এ নির্দিষ্ট বিন্দুতে কোপার্নিকাস প্রত্যাসিত 'জেড'-এর পরিবর্তে ল্যাটিন অক্ষর 'এফ' ব্যবহার করেছেন। এ একক বিচ্যুতির একমাত্র অর্থ হতে পারে যে, তিনি অথবা তাকে সহায়তাদানকারী অন্য কেউ স্পষ্টত আরবী 'জিম'কে আরবী 'ফা' হিসাবে ভুল পাঠ করেছিলেন। বস্তুত, আরবী ভাষায় এ দু'টি অক্ষর দেখতে প্রায় একই রকম।'*

১৯৬৯ সালে মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে দেখানো হয় যে, কোপার্নিকাস তার তৃতীয় বই 'দ্য রেভলিউশনিবাস' (De revolutionibus) বা 'অন দ্য রেভলিউশন অব দ্য হেভেনলি স্ফিয়ার্স' (On the Revolution of the Heavenly spheres)-এর চতুর্থ অধ্যায়ে তুসির গ্রন্থ থেকে মৌলিক লিমা গ্রহণ করেছিলেন।

তুসি বার্ষিক অয়নচলন বা প্রেসিশন অব ইক্যুয়িনক্সের জন্য মান নির্ধারণ করেন, এস্ট্রোল্যাবসহ কয়েকটি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি তৈরি এবং ব্যবহার করেন। টলেমি তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী স্থির। তুসি টলেমির এ পর্যবেক্ষণের সমালোচনা করে বলেন, তার প্রমাণ চূড়ান্ত নয়। তবে তার মানে এই নয় যে, তুসি পৃথিবীর আবর্তনের সমর্থক ছিলেন। তিনি এবং তার বইয়ের ভাষ্যকার ষোড়শ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদাল আলী ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আল-হোসেন আল-বিরজান্দি উভয়ে জোর দিয়ে বলছিলেন, পৃথিবীর স্থিরতা প্রমাণ করা সম্ভব। তবে

www.pathagar.com

তা কেবলমাত্র প্রাচীন বিজ্ঞানে বর্ণিত বৈষয়িক নীতির ভিত্তিতে। টলেমির সমালোচনায় তুসি যেসব যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন ১৫৪৩ সালে পৃথিবীর আবর্তনের পক্ষে কোপার্নিকাস ঠিক একই যুক্তি দেখিয়েছিলেন। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগুলোর নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করার ধারণা তুসিই দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে কেপলার ও কোপার্নিকাসকে।

মিল্কিওয়ের গঠন শনাক্ত

রাতের আকাশে আমরা অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার একটি 'মেঘ' দেখি। মনে হয় কে যেন আকাশে গুড়ো গুড়ো করে দুধ ছিটিয়ে দিয়েছে। এই দুধের মতো জ্বলন্ত মেঘের নাম 'মিল্কিওয়ে'। আসলে মিল্কিওয়েতে কোনো মেঘ নেই। মিল্কিওয়ে হলো একসঙ্গে অগণিত তারার একটি মিলনমেলা মাত্র। প্রকৃতির এ রহস্য নিয়ে কত বিজ্ঞানী সাধনা করেছেন তার শেষ নেই। গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিস্টোটল তার 'মীটিয়রলজি'তে মিল্কিওয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, অতি দূরবর্তী তারকাপুঞ্জ নিয়ে মিল্কিওয়ে গঠিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্বলন্ত তারকার বাষ্পের প্রজ্বলন থেকে মিল্কিওয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশে এ প্রজ্বলন ঘটে। কিন্তু পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীগণ তার ধারণা বাতিল করে দিয়ে বলেন, বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে কোনো প্রজ্বলন ঘটে থাকলে মিল্কিওয়ের দিক পরিবর্তিত হতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন তুসি-ও এরিস্টোটলের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন.। তিনি প্রথম মিল্কিওয়ের সঠিক গঠন চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। পূর্বসূরি মুসলিম বিজ্ঞানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি মিল্কিওয়ে নিয়ে গবেষণা করেন। এই মহাজাগতিক বস্তুর গঠন সম্পর্কে তিনি তার গ্রন্থ 'আল-তাধকিরাহ্ ফি ইলম আল-হায়াহ'তে লিখেছেন, *'অগণিত গুচ্ছ গুচ্ছ তারকাপুঞ্জ নিয়ে মিল্কিওয়ে গঠিত। গুচ্ছ গুচ্ছ তারকাগুলো অতি কাছাকাছি থাকায় এবং এগুলো দেখতে অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় তাদেরকে মেঘমণ্ডলের মতো মনে হয়। এরকম হওয়ায় তাদের বর্ণ মিল্ক বা দুধের মতো।'*

তিন শ' বছর পর ১৬১০ সালে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে মিল্কিওয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি দেখতে পান যে, সত্যি মিল্কিওয়ে বিপুলসংখ্যক ক্ষীণ আলোর তারকা নিয়ে গঠিত। মিল্কিওয়ে হলো দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ২ শ' কোটি ছায়াপথের একটি। এতে রয়েছে ২০০-৪০০ বিলিয়ন তারকা এবং পৃথিবী থেকে ২ লাখ আলোক বর্ষ দূরে। গ্রীক পুরাকথায় বলা হয়েছে, জিউসের স্ত্রী ও তার তিন বোনের অন্যতম হিরা তার সন্তান হিরাক্লিসকে স্তন্য পান করাচ্ছিলেন। এসময় তার স্তন থেকে পতিত দুধ থেকে মিল্কিওয়ের জন্ম হয়েছে। এ রূপকথা অনুসারে এ ছায়াপথের নামকরণ করা হয় 'মিল্কিওয়ে'। মিল্কিওয়ের আরেক নাম 'মিল্ক রোড' বা দুধের পথ।

www.pathagar.com

নাসিরুদ্দিন তুসির আবিষ্কৃত ছায়াপথ

তুসির পূর্ববর্তী মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও মিল্কিওয়ে নিয়ে গবেষণা করেছেন। পার্সী মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে আল-হাইছাম প্রথম মিল্কিওয়ে পর্যবেক্ষণ এবং তার লম্বন পরিমাপের চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা চালানোর পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোনো লম্বন না থাকায় মিল্কিওয়ে পৃথিবী থেকে বহু দূরে এবং তা বায়ুমণ্ডলের অংশ

www.pathagar.com

নয়। আরেক পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল-বেরুনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মিল্কিওয়ে মেঘের মতো তারকাপুঞ্জের অগণিত ভগ্নাংশের একটি সমষ্টি। আল-আন্দালুসের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে বাজ্জাহর মতে, অসংখ্য তারকা নিয়ে মিল্কিওয়ে গঠিত এবং তারকাগুলো একে অন্যের নিবিড় সংস্পর্শে অবস্থান করছে এবং নিচের আকাশের কোনো বস্তু থেকে প্রতিসরণের প্রভাবে তাকে একটি অবিচ্ছিন্ন অবয়বে দেখা যায়। তার অভিমতের সমর্থনে তিনি ১১০৭ সালে বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের একটি সংযোগ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা উল্লেখ করেন। একই ধারাবাহিকতায় ইবনে কায়িম আল-জাওজিয়া ঘোষণা করেন যে, মিল্কিওয়ে হলো স্থির তারকা মণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত জ্যোতিষ্কের একটি সমষ্টি।

ছায়াপথ পর্যবেক্ষণে পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবদ আল-রহমান আল-সুফির কৃতিত্ব অনেকের চেয়ে বেশি। তিনি ৯৬৪ সালে প্রথম 'এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি' পর্যবেক্ষণ করে তাকে একটি 'ক্ষুদ্র মেঘ' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। 'এন্ড্রোমেডা' পৃথিবী থেকে ২৫ লাখ আলোক বর্ষ দূরে। গ্রীক রূপকথার যুবরাজ এন্ড্রোমেডার নামে এ ছায়াপথের নামকরণ করা হয়। আল-সুফি 'লার্জ ম্যাগিলানিক ক্লাউড'-ও চিহ্নিত করেন। ইয়েমেন থেকে 'লার্জ ম্যাগিলানিক ক্লাউড' দৃশ্যমান হলেও ইস্পাহান থেকে দেখা যেতো না। পৃথিবী থেকে এ ছায়াপথের দূরত্ব ১ লাখ ৬০ হাজার আলোক বর্ষ। ১৫০৩-৪ সালে ইতালীয় অভিযাত্রী আমেরিগো ভেসপুচি দ্বিতীয়বার 'লার্জ ম্যাগিলানিক ক্লাউড' পর্যবেক্ষণ করেন। ১৫১৯ সালে তৃতীয়বার পর্যবেক্ষণ করেন পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাগিলান। ম্যাগিলানের বিশ্ব ভ্রমণের আগে ইউরোপীয়রা তা দেখতে পায়নি। ম্যাগিলানের নামে এ ছায়াপথের নামকরণ করা হয় 'লার্জ ম্যাগিলানিক গ্যালাক্সি'।

কত হতভাগ্য আবদ আল-রহমান আল-সুফি! তিনি ছিলেন মুসলিম সুফি দার্শনিক। ৯৬৪ সালে আল-সুফি 'কিতাব সুয়ার আল-কাওয়াকিব' (The Book of Fixed stars) রচনা করেন। বইটি বোডলিয়ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। এ বইয়ে আল-সুফি 'এন্ড্রোমেডা' ও 'লার্জ ম্যাগিলানিক ক্লাউড' পর্যবেক্ষণ করার তথ্য লিখে রেখে গেছেন। প্রথমবার পর্যবেক্ষণ করলেও তার কৃতিত্বকে অস্বীকার করে তৃতীয় পর্যবেক্ষক ম্যাগিলানকে সম্মান দেয়া হয়েছে।

খনিজ বিজ্ঞান

'তানসুখ-নামা' হলো খনিজ বিজ্ঞানে তুসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। ফারসি ভাষায় লিখিত বইটিতে জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-কিন্দি, মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি, উতারিদ ইবনে মোহাম্মদ বিশেষ করে আল-বেরুনির 'কিতাব আল-জামাহির ফি মারিফাত আল-জাওয়াহির'-এর মতো পূর্ববর্তী মুসলিম সূত্রগুলোর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আল-বেরুনির বইটি ছিল তুসির মূল সূত্র। মুসলিম খনিজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে আল-বেরুনির 'কিতাব আল-জামাহির ফি মারিফাত আল-জাওয়াহির'কে

www.pathagar.com

প্রথম স্থান দেয়া হলে তুসির 'তানসুখ-নামা' দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার। তুসির বইটিতে চারটি অধ্যায়। তিনি প্রথম অধ্যায়ে চারটি যৌগিক ধাতুর প্রকৃতি, তাদের মিশ্রণ এবং মেজাজ নামে পরিচিত পঞ্চম গুণটির অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মেজাজ বা টেম্পারামেন্ট বিভিন্ন প্রজাতির আকার গ্রহণ করতে পারে। এ আলোচনায় তুসি ইবনে সিনার 'দ্য মিনারালিবাস'কে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। বইটির একটি চিত্তাকর্ষক অংশে ধাতুর রং নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুসি বিশ্বাস করতেন, রং হলো সাদা ও ফাঁকা মিশ্রণের ফল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি একান্তভাবে রত্ন, রত্নের গুণাবলী ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় রুবি, চিকিৎসা এবং জাদুবিদ্যার প্রতি। জাদুবিদ্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তুসি ধাতুর প্রতি মনোযোগ দেন এবং ধাতু গঠনে একটি আলকেমিক্যাল তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। সালফারকে তিনি ধাতুর পিতা এবং পারদকে মাতা হিসাবে উল্লেখ করেন। তুসি খারসিনি'সহ ৭টি সুপরিচিত ধাতুর বর্ণনা দেন। বহু মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মতো তিনিও সাধারণ ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরে আলকেমির কসমোলজিক্যাল ও খনিজ বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা মেনে নেন। বইটির শেষ অধ্যায়ে সুগন্ধির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সুগন্ধি ছিল মুসলিম খনিজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পারস্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একটি মূল্যবান সূত্র।

রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান

রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে তুসি 'কনসারভেশন অব মাস'-এর নিয়ম কানুনের ওপর একটি বই লিখেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, যে কোনো পদার্থ রাশি নিজেকে পরিবর্তনে সক্ষম। তবে সে ধ্বংস হয় না। তিনি লিখেছেন, *'কোনো পদার্থ রাশির অবয়ব পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না। পদার্থ কেবলমাত্র নিজের আকার, অবস্থা, গঠন, বর্ণ ও অন্যান্য ধর্ম পরিবর্তন করে ভিন্ন একটি মৌলিক অথবা জটিল পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে।'* তুসি জীববিজ্ঞানের ওপরও ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। পাচ শঁ বছর পর রুশ বিজ্ঞানী এম. লমনোসভ এবং ফরাসি বিজ্ঞানী এন্টোয়িন লরা ল্যাভুয়াশিয়েঁ 'কনসারভেশন অব মাস'-এর নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে একই ধারণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। 'কনসারভেশন অব মাস' বলতে বুঝায় দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বস্তুপিণ্ড অথবা শক্তির টিকে থাকা। 'কনসারভেশন অব মাস'-এর নিয়মে বলা হয় যে, কোনো বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করা যায় না। তবে বিভিন্ন উপাদানে তা বিভক্ত হতে পারে।

বিবর্তনবাদের পথ প্রদর্শক

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক নাসিরুদ্দিন তুসি হলেন বিবর্তনবাদের পথ প্রদর্শক। 'কনসারভেশন অব মাস' নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার প্রমাণ। তিনি তার বিবর্তনবাদী

www.pathagar.com

ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন দর্শন ও ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির পর বিশ্ব তার নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হচ্ছে। আল্লাহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে তত্ত্বাবধান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। পূর্ণতা অর্জনে তুসির অভিমতের সঙ্গে পরিচিত প্রাচ্যের বিজ্ঞানীরা তার তত্ত্বকে ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করছেন। অধিকাংশ মুসলিম তার বিবর্তনবাদী ধারণার সঙ্গে একমত নন। খ্রিস্টানদের অনেকেও দ্বিমত পোষণ করছে। প্রাচ্যের অধিবাসী ও মুসলিম বিজ্ঞানী হওয়ায় তাকে বিবর্তনবাদের জনক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, ডারউইনের ৬ শ' বছর আগে তুসি বিবর্তনবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। ডারউইন যেসব নীতির ভিত্তিতে তার 'থিওরি অব ইভলিউশন'কে ব্যাখ্যা করেছেন, তুসিও অভিন্ন নীতিতে তার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'আখলাক-ই-নাসিরি'তে তিনি তার এ তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। বইটির প্রথম সংস্করণ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কুহিস্তানের শাসক নাসিরুদ্দিন মুহতাসিম আবদুর রহমানকে। বইটিতে তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে নৈতিকতা বা আখলাক, দ্বিতীয় খণ্ডে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বা তাদবির-ই-মঞ্জিল এবং তৃতীয় খণ্ডে রাজনীতি বা সিয়াসাত-ই-মাদুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি জি. এম. উইকেন্স ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১৯৬৪ সালে জর্জ এলেন এন্ড আনউইন বইটি প্রকাশ করে। একটি সন্ত্রাসী গুপ্তঘাতক চক্রের হাতে আলামুত দুর্গে বন্দি থাকার সময় তুসি 'আখলাক-ই-নাসিরি' লিখেছিলেন। মোঙ্গল শাসক হালাগু খাঁর সৌজন্যে তিনি বইটি সংশোধন করেন।

'আখলাক-ই-নাসিরি'তে তিনি মানুষের পূর্ণতা অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুসি পূর্ণতা অর্জনকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে বৈষয়িক এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক পূর্ণতা। তার বইয়ে তিনি 'তাকামুল' নামে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় এ শব্দের অর্থ 'পূর্ণতা' এবং আধুনিক আজারবাইজানী ভাষায় তার অর্থ 'বিবর্তন'। তুসির যুগে বেবিলনীয়, মিসরীয় ও মাদিয়ানসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও লোককথায় বহু বিবর্তনবাদী ধ্যান ধারণা চালু ছিল। তবে এসব ধারণা ছিল রূপকথা; বৈজ্ঞানিক নয়। এমপিডোক্লস ও এরিস্টোটলের মতো প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রচলিত এসব ধারণা গ্রহণ করে আরো উন্নতি করেন। এরিস্টোটল লিখেছেন, *'প্রকৃতি ধীরে ধীরে এক পা দু'পা করে জড় অবস্থা থেকে জীবন্ত প্রাণী জগতে বিকাশ লাভ করছে।'* পরবর্তীকালে আবু রায়হান আল-বেরুনি, ইবনে বাজ্জাহ ও ইবনে তোফায়েলের মতো মুসলিম পণ্ডিতগণ এরিস্টোটলের বিবর্তনবাদী ধারণাকে উন্নত করার চেষ্টা করেন। ডারউইনের ' 'অন দ্য অরিজিন অব স্পিশীজ' এবং তুসির ধারণার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। ডারউইন অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং বাস্তব থেকে একটি তত্ত্বে উত্তরণে প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে তুসি ব্যবহার করেছেন আরো উন্নত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

www.pathagar.com

তিনি একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং পরে তত্ত্বের আলোকে বাস্তবকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিবর্তনকে তিনি একটি তত্ত্ব হিসাবে উল্লেখ করলেও বিস্তারিত আলোচনা করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রাণী জগতে অস্তিত্বের লড়াইয়ে যোগ্যতমের বিজয়ী হওয়ার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলেননি। তুসির ধারণা ছিল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাকলিটাসের অনুরূপ।

তুসি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী একসময় অভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং এসব উপাদান ছিল সমান এবং একে অন্যের অনুরূপ। অভিন্ন মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় বস্তু কণাগুলো একে অন্যের ওপর সুবিধা ভোগ করতে পারতো না। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তুসি বর্ণিত বস্তু কণাগুলোকে এটম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তুসির মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে সব বস্তু কণাই ছিল অভিন্ন ও অনড়। পরবর্তীতে স্থির পৃথিবীর অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রারম্ভিক বিশ্বের অভ্যন্তরে অপরিহার্য বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠে। তাতে কয়েকটি উপাদান অন্য উপাদানগুলোর তুলনায় দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে থাকে। তুসি বলেছেন, প্রাথমিক বস্তু কণাগুলো ছিল বিবর্তনমূলক শৃঙ্খলার প্রথম সংযোগ। প্রকৃতির চারটি উপাদান আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি প্রাথমিক উপাদান থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এভাবে পর পর প্রাথমিক বস্তুকণা থেকে খনিজ পদার্থ, খনিজ পদার্থ থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

তুসি বিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভিন্নতাকে দায়ী করেছেন। তার মতে, সব জীবন্ত প্রাণী ছিল নিজেকে পরিবর্তনে সক্ষম এবং জন্মগত ভিন্নতার জন্য জীবিত প্রাণী বিকশিত হয়েছে। নতুন বৈশিষ্ট্য উন্নীত প্রাণশক্তির দ্রুততর গতিতে বিকশিত হওয়ার মূলে ছিল তাদের ভিন্নতা। ফলে তারা অন্যান্য প্রাণীর ওপর সুবিধা অর্জন করে। বস্তু কণাগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মিথস্ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হচ্ছে। তুসির মতে, উপাদানগুলো একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং এ প্রতিযোগিতায় কোনো কোনোটি অন্যদের তুলনায় উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তুসি লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রাণীগুলো অদ্ভূত উপায়ে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। তিনি বলেছেন, যদি কোনো প্রাণীর গঠন পরিবেশের অনুরূপ হয় তাহলে সে পূর্ণাঙ্গ। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ পূর্ণাঙ্গ। কেননা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ তাদের রয়েছে। তুসি লিখেছেন, *প্রাণী ও পাখির দিকে তাকাও। শক্তি, সাহস ও উপযুক্ত হাতিয়ারসহ প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তাদের রয়েছে।*

তুসি বিশ্বাস করতেন যে, উন্নততর প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি মানুষ ও প্রাণী জগতের মধ্যকার বিভিন্ন আকার পরিবর্তন সম্পর্কে লিখছেন, *এ ধরনের মানুষ (সম্ভবত বন মানুষ) পশ্চিম সুদান ও বিশ্বের অন্যান্য দূরবর্তী প্রান্তরে বসবাস করতো। স্বভাব, আচরণ ও কাজকর্মে তারা ছিল মানুষের কাছাকাছি।* তিনি বলেছেন, মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের সব জীবিত ও জড় বস্তুর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। তবে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তাকে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ এমনকি জড় বস্তুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে প্রেরণা যোগায়। পার্থক্য সম্পর্কে তুসি লিখেছেন, *মানুষ কেবলমাত্র জৈবিক নয়, সে সামাজিক জীবও বটে। মানুষের সৃষ্টি হওয়ার আগে প্রাণের মধ্যকার সব পার্থক্য ছিল প্রকৃতি উদ্ভূত। পরবর্তী ধাপ ছিল আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, ইচ্ছাশক্তি, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান।*

তুসির মতে, মানুষ তার পেশাগত হাতিয়ার (যন্ত্র) তৈরিতে সক্ষম হওয়ায় সে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। উপসংহারে তুসি লিখেছেন, *এসব বাস্তবতা প্রমাণ করছে যে, মানব জাতিকে বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপে স্থাপন করা হয়েছে। জন্মগত প্রকৃতির তাগিদে সে নিম্নতর প্রাণী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে সে উন্নতির সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছতে পারে।*

যুক্তিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যায় তুসি ফারসি ভাষায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। একটি বইয়ের নাম 'আখলাক-ই-মুহতাসিমী' এবং আরেকটি হলো 'আখলাক-ই-নাসিরি'। 'তাহধিব আল-আখলাক' (দ্য রিফাইনমেন্ট অব ক্যারেক্টার)-এর ভিত্তিতে রচিত 'আখলাক-ই-নাসিরি'তে এরিস্টোটল এবং প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে একটি নয়া দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপন করা হয়। বইটিতে মনস্তত্ত্ব ও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভারত ও পারস্যের মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে তুসির বইটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়ারা 'তাজরিদ'-এর জন্য তুসিকে বিজ্ঞানী অথবা দার্শনিকের চেয়ে একজন ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে গণ্য করে। তাজরিদ এখনো শিয়া ধর্মমতের মূলস্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত।

ইসলামের ইতিহাসে তুসির মতো এমন একজন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া সত্যি দুষ্কর। যুক্তিবিদ্যায় তিনি ছিলেন ইবনে সিনার সমর্থক এবং ইবনে সিনার চূড়ান্ত 'প্রপজিশন' তত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন: *'এসারটোরিক সিলোগিস্টিক এরিস্টোটল তাকে এই মতবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং অন্যরা কখনো কখনো চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে পরস্পরবিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছে। এই ধারণা থেকে যে, তারা চূড়ান্ত এবং এজন্য বহু লোক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, চূড়ান্ত সবকিছুই চূড়ান্তভাবে পরস্পরবিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। ইবনে সিনা তা ভুল প্রমাণ করেন এবং তিনি এরিস্টোটলের মতবাদ থেকে উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করার উপায় খুঁজতেন।'*

দর্শন

তুসি হলেন মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। তিনি ইবনে সিনার এরিস্টোটলীয় দর্শনের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তার 'ইশারাত ওয়াল তানবিহাত'-এর ওপর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেন। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে আল-রাজি বইটির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। মূলত গণিতজ্ঞ হলেও নাসিরুদ্দিন তুসি

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় দর্শনের আলো জ্বালাতে সফল হন। ইশারাত ওয়াল তানবিহাত-এ নিজেকে তিনি ইবনে সিনার অনুসারী হিসাবে দাবি করলেও মহাবিশ্ব এবং মানুষ সৃষ্টির রহস্যের মতো কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তুসির ওপর তার ছাত্র শিহাব উদ্দিন আল-সোহরাওয়ার্দী এবং আরো কয়েকজন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদের প্রভাব ছিল। বস্তুত তুসিই প্রথম নব্য এরিস্টোটলবাদী দর্শন এবং আলোকপ্রাপ্ত বা ইশরাকি মাযহাবের প্রথম পর্যায়ের সূচনা ঘটান। তার ঘনিষ্ঠ ছাত্র কুতুব আল-দীন-আল-শিরাজির লেখালেখিতে এ প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফারসি ভাষায় তিনি দর্শনের ওপর বহু লেখালেখি করেছেন। একই সময় নাসিরুদ্দিন খসরু, শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী এবং আফদাল আল-দীন আল-কাশানির মতো আরো অনেকে ফারসি ভাষায় লিখেছেন। তবে ফারসিতে তুসির লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

তুসি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তত বেশি আগ্রহী ছিলেন না। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গের মেজাজ সম্পর্কে ইবনে সিনার মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি মূলত তার শিক্ষা অনুসরণ করতেন। তুসির চিকিৎসা বিষয়ক মতামত ছিল আসলে এক ধরনের দার্শনিক অভিমত। 'আখলাক-ই-নাসিরি' ছিল সাইকোসমেটিক চিকিৎসায় তার সবশ্রেষ্ঠ অবদান। চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর তিনি মাত্র কয়েকটি বই লিখেছেন। আখলাক-ই-নাসিরি'র পরে দ্বিতীয় বইয়ের নাম হলো 'কাওয়ানিন আল-তিব্ব' (প্রিন্সিপলস অব মেডিসিন)। তৃতীয় বইটির নাম 'কিতাবুল বাক আল-বাহিয়া ফিত তারাকিবুস সুলতানিয়া'। তুসি কাজানের সুলতানের পুত্রের চিকিৎসা উপলক্ষে এ বইটি লিখেছিলেন। ভলগা নদীর তীরে কাজান শহরের আশপাশে কাজান খানের রাজত্ব ছিল। কথিত আছে যে, কাজান শহরটি ১২৫৪-১২৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাটু। বাটুকে বলা হতো 'খান অব গোল্ডেন হোর্ড'। 'কিতাবুল বাক আল-বাহিয়া' তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তুসির চতুর্থ বইটি হলো ইবনে সিনার কানুনের ভাষ্য। এ চারটি বই ছাড়া তিনি হালাগু খাঁর জন্য 'দারিয়াকুল ফারুকি' নাম দিয়ে সব ধরনের প্রতিষেধক ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে একটি সচিত্র বই প্রণয়ন করেন। বইটি তার নিজের লেখা কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ভূগোল

নাসিরুদ্দিন তুসির ভূগোল বিষয়ক বইয়ের নাম 'কিতাব সুরাতিল আকালিম'। বইটিতে অনেকগুলো মানচিত্র দেয়া হয়। অনেকে ধারণা করছেন যে, বইটি দশম শতাব্দীর ভূগোলবিদ আল-বালখির ভূগোল বইয়ের অনুবাদ। কিন্তু তাদের ধারণা সঠিক নয়। তুসি তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও সারণীগুলোতে ভৌগোলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তার খনিজ বিজ্ঞান বিষয়ক বই 'তানসুখ-নামা'তেও

www.pathagar.com

ভৌগোলিক বিবরণ স্থান পেয়েছে। তুসির শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ তাধকিরাহ'র তৃতীয় খণ্ডে সমুদ্র ও সামুদ্রিক বায়ুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক ওয়াইডম্যানের মতে, কেবলমাত্র নাসিরুদ্দিন তুসি তার তাধকিরাহয় এবং আল-বেরুনি তার গ্রন্থে বহর ওয়ারনাকের উল্লেখ করেছেন। তাদের পর আবুল ফিদার বইয়ে বহর ওয়ারনাকের বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তুসি তার 'রিসালা-ই-ফি ফসল' গ্রন্থে হিন্দু সংখ্যা লিখন পদ্ধতির পরিবর্তে আরবী সংখ্যা লিখন পদ্ধতি 'আবজাদ' ব্যবহার করেছেন।

প্রভাব

পূর্বাঞ্চলের ইসলামে নাসিরুদ্দিন তুসির প্রভাব ছিল অসামান্য। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনে তার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। মারাগা মানমন্দিরে তাকে কেন্দ্র করে সুযোগ্য মুসলিম বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের ভিড় জমেছিল। তার উদ্যোগে শুধু মুসলিম বিশ্বে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল তাই নয়, ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেরও পুনর্জাগরণ ঘটে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুসির বইপত্র বহু শতাব্দী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের মর্যাদা লাভ করে। কুতুব আল-দীন শিরাজি ও আল্লামা হিলির মতো তার বহু ছাত্র অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী হিসাবে সুনাম কুড়িয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান সমরকন্দ ও ইস্তাম্বুলের মানমন্দিরগুলোকে প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্যে তার প্রভাব ছিল ধারণার চেয়ে বেশি। সেখানে তার পরিচয় ছিল কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ হিসাবে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বে তিনি হেকিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। গণিতে তার গবেষণা পরবর্তী মুসলিম গণিতজ্ঞদের দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তুসি ও মারাগায় কর্মরত তার সহকর্মীদের প্রণীত গ্রন্থাদি পূর্বদিকে চীনের জ্ঞান বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছে। মোঙ্গল আক্রমণে মুসলিম সভ্যতার ক্ষতি হয়েছিল ঠিকই। তবে লাভও হয়েছিল। এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। মোঙ্গল আমলে তুসির মতবাদ ভারতীয় বিজ্ঞানকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভারতে তার প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। মারাগার আদলে জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয় সিং দিল্লি, জয়পুর, উজ্জায়ন ও ভারতের আরো কয়েকটি জায়গায় মানমন্দির নির্মাণ করেন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের অনুরোধে দিল্লিতে যন্তর মন্তর মানমন্দির স্থাপন করা হয়।

সম্মান

নাসিরুদ্দিন তুসির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৩৫ সালে চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ৪১ এস দ্রাঘিমাংশ এবং শূন্য দশমিক ২ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৫২ দশমিক শূন্য ৫ কিলোমিটার। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাই স্তেপানোভিচ চারনিখ আবিষ্কৃত একটি ক্ষুদ্র গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে '১০২৬৯ তুসি'। ইরানের কে. এস. তুসি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আজারবাইজানের শামখি মানমন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে।

www.pathagar.com

তুসির ১৫০টি বই ও চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ২৫টি ফারসি ভাষায় এবং বাদবাকিগুলো আরবীতে লেখা। তিনটি ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে তিনি আরবী, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় জ্যামিতির ওপর একটি বই লিখেছেন। তুসি গ্রীক ভাষাও জানতেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে দর্শন, আধ্যাত্মবাদ এবং ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ওপর বই পুস্তক লিখেছেন। চিকিৎসক হিসাবে ইবনে সিনা ছিলেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। অন্যদিকে গণিতজ্ঞ হিসাবে তুসি ছিলেন ইবনে সিনার চেয়ে অগ্রসর। ফারসি ভাষায় তার দখল ছিল ইবনে সিনার চেয়ে বেশি। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও প্রভাব ছিল প্রায় সমান। তুসির বহু বই মুসলিম বিশ্বে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি যুক্তিবিদ্যার ওপর ৫টি বই লিখেছেন। বইগুলোর মধ্যে ফারসি ভাষায় লিখিত 'আসাস আল-ইকতিবাস' (ফাউন্ডেশন অব ইনফারেন্স) হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এত ব্যাপক যে, ইবনে সিনার 'আল-শিফা' ছাড়া যুক্তিবিদ্যার ওপর আর কোনো বই তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। গণিতে তিনি অটোলাইকাস, এরিস্টারচাস, ইউক্লিড, এপোলনিয়াস, আর্কিমিডিস, হিপসিক্লস, থিওডোসিয়াস, মেনিলাস ও টলেমির বইয়ের ভাষ্য লিখেছেন। গণিতের ছাত্ররা ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' এবং টলেমির 'আলমাগেস্ট'-এর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত যেসব বই অধ্যয়ন করতো সেগুলো 'ইন্টারমেডিয়েট ওয়ার্ক' (মুতাওয়াসিতাত) নামে পরিচিত ছিল। ইউক্লিড ও টলেমির ওপর তুসির ভাষ্যসহ ইন্টারমেডিয়েট শ্রেণীর অন্ত র্ভুক্ত তার রচনাবলী গণিত শিক্ষায় পাঠ্য পুস্তকের মর্যাদা লাভ করে। তিনি গণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির ওপর বহু মৌলিক বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'জাওয়ামি আল-হিসাব বিল-তাখত ওয়াল তুরাব' ((The Comprehensive Work on Computation with Board and Dust), 'আল রিসালা আল-শাফিয়া' ((The Satisfying Treaties) এবং 'কাশফ আল-কিনা আন আসরার আল-শাকল আল-কাত্তা' (Disclosing the secrets of the figure of secants)। শেষোক্ত বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হলে রিগিওমন্টানাস (Regiomontanus) প্রভাবিত হন। তুসির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হলো 'জিজ-ই-ইলখানি' (দ্য ইলখানি টেবলস)। ফারসি ভাষায় লিখিত বইটি পরবর্তীতে আরবীতে অনুবাদ করা হয়। জন গ্রীভস্ ১৬৫০ সালে লন্ডনে 'এস্ট্রোনমিয়া কোয়াডাম এক্স ট্রাডিশন্স শাহ্ চোলগি পার্সি ইউনা কাম হাইপোথেসিবাস প্লানেটারাম' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় বইটির আংশিক অনুবাদ করেন। এস্ট্রোল্যাবের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্র নিয়ে তুসি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তিনি আবদ আল-রহমানের 'কিতাব সুয়ার আল-কাওয়াকিব' (দ্য বুক অব ফিক্সড স্টার্স) আরবী থেকে ফারসিতে অনুবাদ করেন। তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানের ওপর আরো বহু বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে 'তানসুখ-নামা' (দ্য বুক ইফ প্রেশাস ম্যাটেরিয়ালস) উল্লেখযোগ্য। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপরও বই লিখেছেন। তুসি দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে

www.pathagar.com

ইবনে সিনার 'আল-ইশারাত ওয়াল-তানবিহাত' (দ্য বুক অব ডিরেক্টিভস এন্ড রিমার্কস), ফারসি ভাষার ওপর সুপরিচিত নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত কর্ম 'আখলাক-ই-নাসিরি' (নাসিরিন এথিক্স) এবং শিয়া ধর্মমতের মূল সূত্রের বই 'তাজরিদ' (ক্যাথারসিস)-এর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি 'তাসাউওরাত'সহ ইসমাঈলীয় মাযহাবের ওপর কয়েকটি অসাধারণ ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং 'আওসাত আল-আশরাফ'-এর মতো কয়েকটি আধ্যাত্মিক নিবন্ধ সংকলন করেন। তুসি ফারসি ভাষায় কবিতাও লিখেছেন। নিচে তার আরো কয়েকটি বইয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

(১) কিতাবু শাকালুল কাত্তা (বুক অন দ্য কম্প্লিট কোয়াডরিল্যাটার‍্যাল)। ত্রিকোণমিতির ওপর পাঁচ খণ্ডে লিখিত বই

(২) আল-তাধকিরাহ ফি ইলম আল-হায়াহ। (এ মেমোয়ের অন দ্য সায়েন্স অব এস্ট্রোনমি)। এ বইটির ওপর 'শার আল-তাধকিরাহ' (এ কমেন্টারি অন আল-তাধকিরাহ) নামে পরিচিত বহু ভাষ্য রচনা করা হয়। ভাষ্যটি লিখেছিলেন আবদাল আলী ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল-বিরজান্দি ও নিজাম নিশাপুরী

(৩) আল-রিসালাহ আল-আসতারলাবিয়াহ (এস্ট্রোল্যাব সংক্রান্ত একটি বই)

(৪) শারহে আল-ইশারাত (ইবনে সিনার ইশারাতের ওপর একটি ভাষ্য)

(৫) আউসাফ আল-আশরাফ (ফারসিতে লিখা একটি সংক্ষিপ্ত মরমী কর্ম)

(৬) কিতাবুল বাক আল-বাহিয়া ফিত তারাকিবুস সুলতানিয়া (চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক)

(৭) আখলাক-ই-মুহতাসিমী (নীতিশাস্ত্র বিষয়ক বই)

(৮) তাজরিদ

মৃত্যু

১২৭৪ সালে বাগদাদে অবস্থানকালে তুসি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাস পর ইন্তেকাল করেন। একই বছর সেন্ট টমাস একুইনাসও পরলোকগমন করেন। তুসিকে তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাগদাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে কাজিমিয়ায় সপ্তম শিয়া ইমাম মুসা আল-কাজেমের মাজারের কাছে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

এলজাব্রায় প্রথম উচ্চতর পাওয়ার ব্যবহারকারী আবু কামিল

এলজাব্রায় প্রথম উচ্চতর পাওয়ার ব্যবহারকারী আবু কামিলের পূর্ণ নাম আবু কামিল ইবনে আসলাম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে শুজা। ল্যাটিন ভাষায় তার নাম 'আউকামেল' (Auoquamel)। সংক্ষেপে তিনি আল-হাসিব আল-মিসরি নামে পরিচিত। হাসিব আল-মিসরি শব্দের আক্ষরিক মানে হলো 'মিসরের গণনাকারী'। ৮৫০ সালে মিসরে তার জন্ম। তিনি ইসলামের স্বর্ণযুগের একজন গণিতজ্ঞ। আবু কামিল হলেন খাওয়ারিজমির ঠিক পরবর্তী গণিতজ্ঞ বা তার উত্তরাধিকারী। তবে খাওয়ারিজমির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি বীজগণিতে খাওয়ারিজমির ভূমিকাকে আবিষ্কারকের সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য করেছেন, '*... the one who was first to succeed in a book of algebra and who pioneered and invented all the principles in it.*' অর্থাৎ '*তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম বীজগণিতের ওপর একটি বই লিখেছেন এবং যিনি এ শাস্ত্রের সব নিয়ম নীতির দিকনির্দেশনা দান এবং উদ্ভাবন করেছেন।*' আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, '*I have establised in my second book proof of the authority and precedent in algebra of Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi and I have answered that impetuous man Ibn Barza on his attribution to Abd al-Hamid, whom he said was his grandfather.*'

অর্থাৎ '*আমি আমার দ্বিতীয় বইয়ে বীজগণিতের ওপর মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির প্রাধিকার ও পূর্বগামিতা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ইবনে বারজা তার দাদা আবদ আল-হামিদকে বীজগণিতের স্রষ্টা বলে যে দাবি করেছে আমি তার জবাব দিয়েছি।*'

আবু কামিলের প্রথম উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি খাওয়ারিজমি প্রতিষ্ঠিত বীজগণিতের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। বস্তুত তিনি বীজগণিতের উন্নয়নে খাওয়ারিজমি ও আল-কারাজির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি সমাধান হিসাবে অমূলদ সংখ্যা এবং সমীকরণে সহগের প্রথম ধারাবাহিক ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইতালীয় জেসুইট যাজক ও গণিতজ্ঞ লিওনার্দো ফিবোনাসি তার গাণিতিক কৌশল গ্রহণ করেন। ফিবোনাসি তার কৌশল গ্রহণ করায় আবু কামিল ইউরোপের সঙ্গে এলজাব্রা বা বীজগণিতকে পরিচিত করে তোলার সুযোগ পান। আবু কামিল তিনটি অজ্ঞাত মানের সহায়তায় রৈখিক বহির্ভূত বেশ কয়েকটি অবিরত সমীকরণ (Simultaneous equations) সমাধান করেন।

www.pathagar.com

প্রথম উচ্চতর পাওয়ার ব্যবহার

আবু কামিলই প্রথম মুসলিম গণিতজ্ঞ যিনি বীজগণিতে অতি সহজে x^2 এর চেয়ে বেশি পাওয়ারের সমীকরণ সমাধানে সক্ষম হন। পাওয়ারগুলো প্রতীকের পরিবর্তে অক্ষর দিয়ে লিখা হয়। $x^n x^m = x^{n4m}$ ইত্যাদি প্রতীকগুলো আবু কামিল উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি x^5 বা (x^2, x^2, x) এর জন্য আরবী শব্দ 'মাল, মাল শাই' (বর্গ, বর্গ, মূল), x^6 বা (x^3 x^3) এর জন্য 'ঘন, ঘন', x^8 বা (x^2 x^2 x^2 x^2) এর জন্য 'বর্গ, বর্গ, বর্গ, বর্গ,' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার বই পুস্তকে দেখা যাচ্ছে, আবু কামিল x^8 পাওয়ার পর্যন্ত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বীজগণিতে ৬৯টির মধ্যে খাওয়ারিজমি ৪০টি সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন। তবে তার পদ্ধতি ছিল ভিন্নতর। আবু কামিল একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর মূল বুঝাতে আরবী গাদর (Gadhr) শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে তিনি স্কোয়ার ইউনিট দিয়ে তাকে গুণ করেন। তার এ পদ্ধতি খাওয়ারিজমির চেয়ে পুরনো এবং এ পদ্ধতি ১৫০ সালের প্রাচীন হিব্রু 'মিশনাত হা মিদুত' (Mishnat ha-Middot)-এ দেখা গেছে। আবু কামিল আলেক্সান্দ্রিয়ার হিরন ও ইউক্লিড থেকে প্রচুর ধারণা লাভ করেন। আবুল ওয়াফা তার বই আরবীতে অনুবাদ করার আগে তিনি আরবদের কাছে ছিলেন অপরিচিত।

কিতাব ফি আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা

'কিতাব ফি আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা' (Book of Algebra) নামে পরিচিত বইটিতে আবু কামিল ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীর বর্ণনা দেন। তিনিই প্রথম দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে দু'টি স্পষ্ট রূপ তুলে ধরেন এবং দ্বিঘাত সমীকরণে সহগ গ্রহণ করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক দ্বিঘাত সমীকরণের দু'টি সমাধান থাকে। তিনি মূলদ চিহ্নগুলোর যোগ বিয়োগের নিয়ম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। তার পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান লিখন প্রণালী অনুরূপঃ

$$\sqrt{a} \pm \sqrt{b} = \sqrt{a+b} \pm 2\sqrt{ab}$$

বইটি হলো আবু কামিলের সবচেয়ে প্রভাবশালী বই। আল-খাওয়ারিজমিকে অতিক্রম করে যেতে তিনি 'বুক অব এলজাব্রা' লিখেছিলেন। বীজগণিত সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেয়া ছিল খাওয়ারিজমির লক্ষ্য। অন্যদিকে আবু কামিল ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস'-এর সঙ্গে পরিচিত অন্যান্য গণিতজ্ঞ বা পাঠকদের জটিলতা দূর করতে 'বুক অব এলজাব্রা' লিখেছিলেন। বইটির প্রথম অধ্যায়ে বীজগণিতে জ্যামিতি প্রয়োগের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় কখনো কখনো অজ্ঞাত মান এবং বর্গমূল ব্যবহার করা হয়। এ অধ্যায়ে নিয়মিত পঞ্চভুজ ও দশভুজ এবং জ্যামিতির সমস্যা সমাধানে বীজগণিতের সূত্র প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল-খাওয়ারিজমির বইয়ে প্রাপ্ত ৬ ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব সমস্যার মধ্যে একটি ছিল x এর পরিবর্তে সরাসরি x^2 এর সমাধান করা। বইটির

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়ে সমাধান হিসাবে দ্বিঘাত সমীকরণ এবং সহগ স্থান পায়। চতুর্থ অধ্যায়ে এসব সমাধানকে বহুভুজ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়। বইটির বাদবাকি অংশে কয়েক প্রকার অনির্দিষ্ট সমীকরণ এবং বাস্তবসম্মত ও অবাস্তব পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থা প্রয়োগের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আল-ইশতাখরি আল-হাসিব ও আলী ইবনে আহমদ আল-ইমরানিসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম গণিতজ্ঞ আবু কামিলের এ বইয়ের ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তবে তাদের দু'জনের ভাষ্যই হারিয়ে গেছে। ইউরোপে লিওনার্দো ফিবোনাসির রচনাবলীতে আবু কামিলের বইয়ের অনুরূপ বিষয়বস্তু দেখা গেছে। সেভিলের জন 'লাইবার মাহামেলেথ' (Liber Mahameleth) শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় একটি বই অনুবাদ করেন। বইটিতে আবু কামিলের বইয়ের বেশকিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে লুনার উইলিয়াম ল্যাটিন ভাষায় বইটি আংশিক অনুবাদ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোরদেকাই ফিঞ্জির হিব্রু অনুবাদে 'বুক অব এলজাব্রা' পুরোটা স্থান পায়।

কিতাব আল-তারা ইফ ফিল হিসাব

'কিতাব আল-তারা ইফ ফিল হিসাব' (বুক অব রিয়ার থিংগস ইন দি আর্ট অব ক্যালকুলেশন)-এ অনির্দিষ্ট সমীকরণের অখণ্ড সমাধান খুঁজে বের করার কয়েকটি ধারাবাহিক পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বইটি হলো একমাত্র জ্ঞাত আরবী সূত্র যেখানে গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাসের 'এরিথমেটিকা'য় (Arithmetica) বিদ্যমান অনির্দিষ্ট সমীকরণের সমাধান দেখা যায়। আবু কামিল বইটিতে এমন কয়েকটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন যা এরিথমেটিকা'র বিদ্যমান কোনো কপিতে দেখা যায়নি। তিনি একটি সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং এ সমস্যার ২ হাজার ৬৭৮টি সমাধান খুঁজে বের করেছেন। আবু কামিলের এ বইটি তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত. তিনি হলেন প্রথম আরব গণিতজ্ঞ যিনি ডায়োফেন্টাসের গ্রন্থে প্রাপ্ত অনির্দিষ্ট সমীকরণের সমাধান দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত. আরবরা ডায়োফেন্টাসের এরিথমেটিকা নিয়ে গবেষণা করার আগে আবু কামিল এ বিষয়ের ওপর বই লিখেছেন। তৃতীয়ত. তিনি এমন কয়েকটি পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেগুলো ডায়োফেন্টাসের এরিথমেটিকা'য় পাওয়া যায়নি।

কিতাব আল-মুখামামাস ওয়াল-মুয়াশশার

'কিতাব আল-মুখামামাস ওয়াল-মুয়াশশার' (অন দ্য পেন্টাগন এন্ড ডেকাগন)-এ জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে বীজগণিতের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আবু কামিল $x^4+3125=125x^2$ সমীকরণে ১০ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তে নিয়মিত পঞ্চভুজের একটি বাহুর সংখ্যাসূচক ফল গণনা করেন। কয়েকটি গণনায় গোল্ডেন অনুপাত ব্যবহার করা হয়। লিওনার্দো ফিবোনাসি বইটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং তিনি তার 'প্র্যাকটিকা জিওমেট্রি' (Practica geometriae)- তে বইটির নিয়ম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

কিতাব আল-তাইর

'কিতাব আল-তাইর' (Book of Birds) হলো একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। বইটিতে ইতিবাচক অখণ্ড সমীকরণের সহায়তায় কিভাবে অনির্দিষ্ট রৈখিক পদ্ধতির সমাধান খুঁজে বের করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ক্রয়ের সমস্যার সঙ্গে বইটির একটি সম্পর্ক রয়েছে। বইটির শিরোনাম এসেছে এসব সমস্যা থেকেই। বইটির সূচনায় আবু কামিল লিখেছেন, *'I found myself before a problem that I solved and for which I discoverd a great many solutions; looking deeper for its solutions, I obtained two thousand six hundred and seventy six correct ones. My astonishment about that was great, but I found out that when I recounted this discovery, those who did not know me were arrogant, shocked and suspicious of me. I thus decided to write a book on this kind of calculations with the purpose of facilitating its treatment and making it more accessible.'*

অর্থাৎ 'আমি একটি সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধান করি এবং এ সমস্যা সমাধানে বহু সমাধান খুঁজে পাই। সমস্যার গভীরে তাকিয়ে ২ হাজার ৬৭৬ টি নির্ভুল সমাধান বের করি। এতগুলো সমাধান খুঁজে পাওয়ায় আমি চরম বিস্মিত হই। কিন্তু আমি যখন সমাধানগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম যারা আমাকে চেনে না তারা আমার প্রতি রুষ্ট, বিরক্ত ও সন্দিহান। আমি তখন এ ধরনের গণনার ওপর একটি বই লিখার সিদ্ধান্ত নেই। সমাধানগুলো সহজতর ও সহজলভ্য করাই ছিল আমার বই লিখার উদ্দেশ্য।'

কিতাব আল-মিসায়া ওয়াল আল-হান্দাসা

'কিতাব আল-মিসায়া ওয়াল আল-হান্দাসা' (অন দ্য মেজারমেন্ট এন্ড জিওমেট্রি) হলো ভূমি জরিপকারী এবং অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য গণিত বহির্ভূত একটি সংক্ষিপ্ত জ্যামিতি। আরবীতে জ্যামিতিকে বলা হতো 'হান্দাসা'। 'কিতাব আল-হান্দাসা'য় বেশ কয়েকটি নিয়ম দেখা যায়। কয়েকটি নিয়ম বেশ জটিল। আবু কামিল জ্যামিতিক সমস্যার গাণিতিক সমাধান দিয়েছেন। প্রতিটি নিয়মের পাশেই গাণিতিক সমাধান দেয়া হয়েছে। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র ও বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, পরিসীমা ও কর্ণ ইত্যাদি পরিমাপের নিয়ম দেয়া হয়েছে। বইটির শেষাংশে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ এবং ১০টি বাহুর নির্দিষ্ট বহুভুজের বাহুগুলোর পরিমাণ বের করার নিয়ম দেয়া হয়েছে। প্রমাণ ছাড়া বইটিতে পঞ্চভুজ ও দশভুজের যেসব নিয়ম উল্লেখ করা হয় তার বীজগণিত বইয়ে সেগুলো প্রমাণ করা হয়েছে।

সমান্তরাল সমীকরণ

আবু কামিল সমান্তরাল সমীকরণের সমাধান দিয়েছেন। এ সমাধানে তিনি তিনটি অজ্ঞাত মান ব্যবহার করেছেন। (1) x+y+z=10, (2) x^ 2+y^ 2= z^ 2, (3) xy=z^ 2। কামিল ঐচ্ছিকভাবে প্রথমে x (তিনি x = 1 কল্পনা করেন) এর জন্য x^0 ধরে নেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী y ও z এর জন্য যথাক্রমে y_ 0 এবং z _0 ধরে নিয়ে (2) ও (3) নম্বর সমাধান করেন। তার মতে, x, y ও z কে যে কোনো অপরিবর্তনীয় সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে 2 ও 3 নম্বর সমাধান করা যাবে। 10/ (x^0+y^0+z^0) কে গুণ করা হলে অঙ্কনের মাধ্যমে (2) ও (3) এবং (1) নম্বর সমীকরণও সমাধান করা সম্ভব।

হারিয়ে যাওয়া রচনাবলী

আবু কামিল 'কিতাব আল-খাতা আইন' (Book of the two errors) নামে পরিচিত 'ডাবল ফলস পজিশন'-এর ব্যবহার নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বর্তমানে বইটি হারিয়ে গেছে। 'কিতাব আল-জাম ওয়াল তাফরিক' (বুক অব অগমেন্টেশন এন্ড ডিমিনিউশন) শিরোনামে আবু কামিলের আরেকটি বইও নিখোঁজ। ঐতিহাসিক ফ্রাঞ্জ উইপিক 'লাইবার অগমেন্টি ইট ডিমিনিউশনিসিস'-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা প্রকাশ করার পর বইটির প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। 'কিতাব আল-ওয়াসায়া বিয়াল জাবর ওয়াল-মুকাবালা'য় (বুক অব এস্টেট শিয়ারিং ইউজিং এলজাব্রা) মুসলিম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী স্থান পেয়েছিল। এছাড়া এতে সুপরিচিত আইনজ্ঞদের মতামত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এ বইটিও নিখোঁজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

খাওয়ারিজমি সম্পর্কে অভিমত

খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক হিসাবে যেসব গণিতজ্ঞ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আবু কামিল হলেন তাদের অন্যতম। ইবনে বারজার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি খাওয়ারিজমিকে সমর্থন করেন। ইবনে বারজা দাবি করেছিলেন, তার দাদা আবদ আল-হামিদ ইবনে তুর্কি হলেন বীজগণিতের জনক। আবদ আল-হামিদ ছিলেন একজন তুর্কি মুসলমান। তিনি বীজগণিতের ওপর 'লজিক্যাল নেসেসিটিজ ইন মিক্সজড ইকুয়েশন' শিরোনামে একটি বই লিখেন। বইটির দ্বিপদ সমীকরণ সংক্রান্ত একটি মাত্র অধ্যায় টিকে রয়েছে। আল-হামিদের এ বইটি খাওয়ারিজমির আল-জাবর-এর খুব কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়। এ কারণে তার নাতি ইবনে বারজা তাকে বীজগণিতের জনক হিসাবে দাবি করছিলেন।

তার দাবি খণ্ডন করে আবু কামিল লিখেছেন, '*I have studied with great attention the writings of the mathematicians, examined their assertions, and scrutinized what they explain in their works; I thus observed that the book* by Muhammad Ibn Musa al- Khwarizmi known as `Algebra' is superior in the accuracy of its principle and the exatness of its argumentation. It thus behooves us, the community of mathematicians, to recognize his priority *and to admit his knowledge and his superiority, as in writing his book on algebra he was an initiator and the discoverer of its principles.*'

অর্থাৎ '*আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে গণিতবিদদের রচনাবলী অধ্যয়ন করেছি, তাদের উক্তি পরীক্ষা করেছি এবং তারা তাদের বই পুস্তকে যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন*

www.pathagar.com

সেগুলো যাচাই করেছি। অতঃপর আমি দেখতে পেয়েছি যে, 'এলজাব্রা' নামে পরিচিত মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির বইটি তার নীতির বিশুদ্ধতা এবং যুক্তির নির্ভুলতায় শ্রেষ্ঠ। এ বইটি আমাদের গণিতজ্ঞ সমাজকে তার অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দান এবং তার জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে বাধ্য করছে। এলজাব্রার ওপর এ বইটি লিখায় তিনি ছিলেন একজন উদ্ভাবক এবং এ শাস্ত্রের নীতিমালার আবিষ্কারক।'

আবু কামিলের অবদানের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি

বীজগণিতে অসামান্য অবদান রাখায় আবু কামিল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 'অ্যা হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্স'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে কার্ল বি. বয়ার লিখেছেন, *'By the end of the 9th century, the Egyptian mathematician Abu Kamil had stated and proved the basic laws and identities of algebra and solved such complicated problems as finding x, y and z such that* $x+y+z=10$, $x^2+y^2=z^2$ *and* $xz=y^2$*.'* অর্থাৎ *'নবম শতাব্দী নাগাদ মিসরীয় গণিতজ্ঞ আবু কামিল বীজগণিতের মৌলিক নিয়ম নীতি ও পরিচিতির বর্ণনা দেন এবং সেগুলো প্রমাণ করেন। এছাড়া তিনি x, y ও z- এর মান খুঁজে বের করার মতো জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন যেখানে* $x+y+z=10$, $x^2+y^2=z^2$ *এবং* $xz=y^2$ *।'*

প্রভাব

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আল-কারখি আবু কামিলের বীজগণিত ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি অনেক জায়গায় তাকে অনুসরণ করেছেন। আবু কামিলের রচনাবলী আল-কারাজি এবং লিওনার্দো ফিবোনাসির মতো বহু গণিতজ্ঞকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীতে ফিবোনাসি তার 'প্র্যাকটিকা জিওমেট্রি'তে তার বীজগণিতের বহু উদাহরণ ও কৌশল নকল করেছেন। ফিবোনাসির 'লাইবার আবাসি'তে-ও আবু কামিলের বইয়ের নিশ্চিত সহায়তা নেয়া হয়েছে। তবে তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। আবু কামিলের অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ডি. ই. স্মিথ তার 'হিস্টরি অব ম্যাথমেটিক্স'-এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'No writer of his time showed more genius than he in the treatment of equations and their application to the solution of geometric problems.'*

অর্থাৎ *'সমীকরণ সমাধান এবং জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে সমীকরণের প্রয়োগে তিনি (আবু কামিল) যে মেধার পরিচয় দিয়েছেন তার সময়ের আর কোনো গ্রন্থকার তা দিতে পারেননি।'*

রচনাবলী

আবু কামিলের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর নাম নিচে দেয়া হলো:

(১) বুক অব ফর্চুন

(২) বুক অব দ্য কী টু ফর্চুন

www.pathagar.com

(৩) কিতাব ফি আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা (বুক অব এলজাব্রা)

(৪) বুক অন সার্ভেয়িং এন্ড জিওমেট্রি

(৫) বুক অব দি এডিকুয়েট

(৬) বুক অন ওমেন্স

(৭) বুক অব দ্য কার্নেল

(৮) বুক অব দ্য টু ইরর্স

(৯) বুক অব অগমেন্টেশন এন্ড ডিমিনিউশন

(১০) কিতাব আল-তারা ইফ ফিল হিসাব

(১১) কিতাব আল-মুখামামাস ওয়াল-মুয়াশশার

(১২) কিতাব আল-তাইর (বুক অব বার্ডস)

(১৩) কিতাব আল-মিসায়া ওয়াল আল-হান্দাসা

www.pathagar.com

ল' অব মোশনের পথপ্রদর্শক ইবনে বাজ্জাহ

ল' অব মোশনের পথপ্রদর্শক ইবনে বাজ্জাহর পুরো নাম আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আল-সায়িগ। তিনি ছিলেন একজন আন্দালুসীয় পণ্ডিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী, সঙ্গীতবিদ, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, কবি ও বিজ্ঞানী। পাশ্চাত্যে তিনি তার ল্যাটিন নাম 'অ্যাভামপেস' (Avempace) নামে পরিচিত। তিনি বর্তমান স্পেনের জারাগোজায় জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম

সারাগোজা ছিল তখন ইবনে হুদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র রাজ্য তাইফার রাজধানী। ইউসূফ ইবনে মুতামিন ইবনে হুদ রাজত্ব করেন ১০৮১ থেকে ১০৮৫ সাল এবং তার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মোস্তাসিন ১১১০ সাল পর্যন্ত। ইবনে বাজ্জাহ দ্বিতীয় মোস্তাসিনের অধীনে কাজ করতেন। আরগনের যুদ্ধে দ্বিতীয় মোস্তাসিন নিহত হলে তার পুত্র ইমামউদ্দৌলা ইবনে হুদ সুলতান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র কয়েক মাস। একই বছর ১১১০ সালে আলমোরাভীয় খলিফা আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে তাশুফিন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাশুফিন ১১১০ থেকে ১১৪৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাশুফিন সারাগোজা দখলে ভালেন্সিয়ার গভর্নর আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আল-হাজকে মোরাভীয় সৈন্যসহ পাঠান। আবু আবদুল্লাহ সারাগোজা অবরোধ করলে ইমামউদ্দৌলা শহর ছেড়ে পালিয়ে যান এবং সারাগোজার অদূরে রোয়েদা দুর্গে আশ্রয় নেন। ইবনে আল-হাজের মৃত্যুর পর আলমোরাভীয় সুলতান আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে তাশুফিন তার শ্যালক আবু বকর আলী ইবনে ইব্রাহিমকে সারাগোজার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেন। ইবনে তিফিলউইত নামে পরিচিত গভর্নর আবু বকর আলী ইবনে ইব্রাহিমের সঙ্গে ইবনে বাজ্জাহর পরিচয় হয়। একসময় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তিনি গভর্নর ইব্রাহিমের জন্য মুওয়াসশাহাত জাতীয় কবিতা লিখেছিলেন। তার এ কবিতায় গভর্নর ইব্রাহিম মুগ্ধ হয়েছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে সঙ্গীত উপভোগ করতেন। আবু বকর আলী ইবনে তিফিলউইত তাকে তার মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। ইবনে বাজ্জাহ ক্ষমতাচ্যুত সুলতান ইমামউদ্দৌলা ইবনে হুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক কূটনৈতিক মিশনে তার দুর্গে যান। তার মিশন ব্যর্থ হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কয়েক মাস তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। ১১১৬ সালে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইবনে তিফিলউইত নিহত হলে ইবনে বাজ্জাহ তার

www.pathagar.com

স্মরণে শোক গাথা রচনা করেন। দীর্ঘ অবরোধ শেষে খ্রিস্টান রাজা আলফনসো ১১১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর সারাগোজা দখল করেন। পৃষ্ঠপোষক ইবনে তিফিলউতের মৃত্যুর পর ইবনে বাজ্জাহর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। তিনি আলমোরাভীয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক সফর করেন। এ দুঃসময়ে ইবনে বাজ্জাহ জাতিবায় আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইউসূফ ইবনে তাশুফিনের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তায়াশাত নামে পরিচিত আবু ইসহাক ইব্রাহিম ছিলেন খলিফার ভাই এবং আল-আন্দালুসের পূর্বাঞ্চল ও মার্সিয়ার গভর্নর। ইবনে বাজ্জাহকে জাতিবায় বন্দি করা হয়। আবু মারওয়ান আবদ আল-মালিক ইবনে আবিল আলা জোহর ছিলেন গভর্নর আবু ইসহাক ইব্রাহিমের দরবারের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। আবু মারওয়ান আবদ আল-মালিক গভর্নর ইব্রাহিমের জন্য 'কিতাব আল-ইকতিসাদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার পিতা আবুল আলা জোহরও ছিলেন একজন চিকিৎসক। আবুল আলা জোহর ও ইবনে বাজ্জাহর মধ্যে সম্পর্ক ছিল চরম শত্রুতাপূর্ণ। পরিস্থিতি ক্রমেই ইবনে বাজ্জাহর প্রতিকূলে বইতে থাকে। আবু নাসির আল-ফাতাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খাকানও ছিলেন গভর্নর ইবনে তায়াশাতের একজন সভাসদ। তিনি গভর্নর ইবনে তায়াশাতের নামে 'কিতাইদ আল-ইকয়ান' শিরোনামে একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। ইবনে বাজ্জাহর প্রতি গভর্নর ইব্রাহিম তায়াশাতের মন বিষিয়ে তোলার জন্যই এ বিষোদগারপূর্ণ কবিতা লিখা হয়েছিল। এসব অঘটন সত্ত্বেও তিনি আলমোরাভীয়দের ক্ষমতার বলয়ে অবস্থান করেন। পরবর্তী ২০ বছর তিনি মরক্কোতে আলমোরাভীয় খলিফা ইউসূফ ইবনে তাশুফিনের আরেক ভাই আবু বকর ইয়াহিয়া ইবনে ইউসূফ ইবনে তাশুফিনের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। ইবনে বাজ্জাহর প্রধান বন্ধু ও শিষ্য ইবনে আল-ইমাম তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তার বেশ কয়েকটি বই তার নামে উৎসর্গ করেন। এসময় তিনি রচনা করেন 'দ্য রুল অব দ্য সলিটারি' (The rule of the solitary) এবং 'ম্যান্স কন্টাক্ট উইদ দ্য ইন্টেলিক্ট' (Man's contact with the intellect)। আল-ফারাবির নয়া প্লেটোবাদী দর্শনের আলোকে তিনি দর্শনে আত্মনিয়োগ করেন। মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও আলমোরাভীয়রা ইবনে বাজ্জাহকে সবর্তোভাবে সহায়তা করে। আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে তাশুফিন তাকে উজির পদে নিযুক্তি দেন এবং তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। আলী ইবনে ইয়াহিয়া তাকে সেভিল থেকে মারাকাশে ডেকে এনে কাজী হিসাবে নিযুক্তি দেন। তিনি তাকে আলমোরাভীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে তুমার্টের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দেন।

বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখালেখি

সেভিলের খ্যাতনামা চিকিৎসক আবু জাফর ইবনে হারুন ছিলেন ইবনে বাজ্জাহর শিক্ষক। ইবনে বাজ্জাহ হলেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-নাবাত' (দ্য বুক অব প্ল্যান্টস)-এর রচয়িতা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর লিখিত এ বইটিতে উদ্ভিদের

www.pathagar.com

যৌনক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি এসব বিষয়ের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এছাড়া তিনি এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স' (Physics), 'মীটিওরোলজিকা' (Meteorologica), 'ডি জেনারেশনি ইট করাপশনি' (De Generatione et Corruptione), 'হিস্টোরিয়া এনিমেলিয়াম' (Historiae Animalium) এবং 'ডি পারটিবাস এনিমেলিয়াম' (De Partibus Animalium)-এর ওপর ভাষ্য রচনা করেন।

ইবনে রুশদ ও জার্মান বিশপ আলবার্ট ম্যাগনাসকে তার দার্শনিক চিন্তা ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। অকাল মৃত্যু হওয়ায় তার অধিকাংশ কর্ম অসমাপ্ত থেকে যায়। সৌল ফিনোমলজি সংক্রান্ত ইবনে বাজ্জাহর ধারণা ছিল ইসলামী দর্শনে তার মূল অবদান। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এ কর্ম শেষ করতে পারেননি। তিনি ঘারিব ও মুতাওয়াহিদ ধারার আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের জন্ম দেন। ইসলামী রীতিতে এ দু'টি ধারার সঙ্গীত অনুমোদিত এবং বেশ জনপ্রিয়। ইবনে বাজ্জাহ একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তার জজলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ই. জি. গোনাস 'মুরিস স্পেন' শিরোনামে একটি নিবন্ধে লিখেছেন, '*There is some evidence for the belief that it was invented by the famous philosopher and musician known as Avempace.*'

অর্থাৎ '*এ বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, অ্যাভামপেস নামে পরিচিত বিখ্যাত দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ এ সুর সৃষ্টি করেছিলেন।*'

জ্যোতির্বিজ্ঞান

'কালাম ফিল হায়া' (Discourse on Astronomy) হলো ইবনে বাজ্জাহর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি সৌরমণ্ডলের সঠিক গঠন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন। ঐ সময় এরিস্টোটলের ধারণা অনুযায়ী বিশ্বাস করা হতো যে, পৃথিবী স্থির। তবে ধীরে ধীরে এ ধারণা বদলে যেতে থাকে। ইবনে বাজ্জাহসহ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেতে থাকেন যে, পৃথিবী স্থির নয়। বরং পৃথিবী নিজ অক্ষ রেখায় সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। শুধু পৃথিবী নয়, সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। টলেমির ধারণাও ছিল এরিস্টোটলের ধারণার অনুরূপ। ইবনে বাজ্জাহ টলেমি মডেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইবনে রুশদও এ বিদ্রোহে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইবনে বাজ্জাহ টলেমির 'এপিসাইকেল' (বৃহত্তর বৃত্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্তের ভেতর নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহগুলোর আবর্তন) ও 'একসেন্ট্রিক' (একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের আবর্তন) মডেল ব্যবহারে প্রবল আপত্তি করেন। তবে ইহুদী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মুসা ইবনে ময়মন তার 'গাইড অব দ্য পারপ্লেক্সড'-এ দাবি করেছেন, ইবনে বাজ্জাহ টলেমির এপিসাইকেলের ধারণা পরিত্যাগ করলেও একসেন্ট্রিক ধারণা মেনে নিয়েছিলেন। নিজের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, '*I have heard that Abu Bakr (Ibn Bajja) discovered a system in which no epicycles occur, but eccentric spheres are not excluded by him. I*

www.pathagar.com

have not heard it from his pupils; and even if it be correct that he discovered such a system, he has not gained much by it, for eccentricity is likewise contrary to the principles laid down by Aristotle... I have explained to you that these difficulties do not concern the astronomer, for he does not profess to tell us the existing properties of the spheres, but to suggest, whether correctly or not, a theory in which the motion of the stars and planets are uniform and circular, and in agreement with observation.'

অর্থাৎ *'আমি শুনতে পেয়েছি যে, আবু বকর (ইবনে বাজ্জাহ) এমন একটি সিস্টেম উদ্ভাবন করেছেন যেখানে কোনো এপিসাইকেল নেই। তবে তিনি একসেন্ট্রিক গোলকের সম্ভাবনা বাতিল করে দেননি। আমি এ সংবাদ তার ছাত্রদের কাছ থেকে পাইনি। এমন একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ঘটনা সত্যি হয়ে থাকলেও তিনি তেমন বেশি কিছু অর্জন করতে পারেননি। কেননা একসেন্ট্রিসিটি হলো এরিস্টোটলের প্রচারিত নীতির পরিপন্থী। আমি তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছি যে, এসব জটিলতা নিরসন করা এ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ নয়। কেননা তিনি সৌরমণ্ডলের বিদ্যমান ধর্ম সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করছেন না। তবে ভুল কিংবা নির্ভুল যা-ই হোক, তিনি এমন একটি তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছেন যেখানে তারকা ও গ্রহগুলোর গতি অভিন্ন ও বৃত্তাকার এবং পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।'*

ইবনে বাজ্জাহ এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স'-এর ওপর একটি ভাষ্য লিখেছেন। এ ভাষ্যের নাম 'শারহে কিতাব আল-সামা আল-তাবিত'। ইবনে বাজ্জাহ টলেমির মডেলে কয়েকটি সংশোধনী আনার জন্য ইবনে হাইছাম ও আল-জারকাল্লাহর সমালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাদের প্ল্যানেটারি মডেল এরিস্টোটলের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হাইছামের মারকিউরি মডেলের ব্যাপারে তার সমালোচনা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

জ্যামিতি

ইবনে বাজ্জাহ জ্যামিতি নিয়েও কাজ করেছেন। জ্যামিতি নিয়ে গবেষণায় তিনি একাদশ শতাব্দীর আন্দালুসীয় গণিতজ্ঞ ইবনে সাঈদকে অনুসরণ করেন। তিনি কোণ ছেদনের চেয়ে বক্র রেখা ছেদনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তার গবেষণা ছিল বীজগণিতের বিষয়বস্তু, জ্যামিতির নয়। জ্যামিতিতে তিনি দু'টি ক্লাসিক্যাল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। একটি ছিল কোণকে ত্রিখণ্ডিতকরণ এবং আরেকটি ছিল দু'টি মধ্যবর্তী সমানুপাতিক রাশি নির্ণয়। জ্যামিতিতে ইবনে বাজ্জাহ এ দু'টি সমস্যা ছাড়া আরো কয়েকটি সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

মিল্কিওয়ে নিয়ে গবেষণা

এরিস্টোটলের মেটাফিজিক্সের ভাষ্যে ইবনে বাজ্জাহ অন্যতম ছায়াপথ মিল্কিওয়ে সম্পর্কে তার নিজস্ব তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন, জ্বলন্ত

www.pathagar.com

তারকার বাষ্পের প্রজ্বলন থেকে মিল্কিওয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশে এ প্রজ্বলন ঘটে। অন্যদিকে এরিস্টোটলের আরব ভাষ্যকার ইবনে আল-বাতরিক মিল্কিওয়েকে আকাশমণ্ডলীর একটি একান্ত ঘটনা বলে মনে করতেন। তবে তিনি তাকে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশের কোনো ঘটনা বলে ধারণা করতেন না। তিনি আরো মনে করতেন, খুব কাছাকাছি হওয়ায় তারকাগুলোকে মিটি মিটি করে জ্বলতে দেখা যায়। ইবনে বাজ্জাহ দু'জনের কারো সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি মিল্কিওয়েকে বায়ুমণ্ডলের ওপরের এবং নিচের উভয় মণ্ডলের একটি ঘটনা বলে মনে করতেন। 'দ্য স্টানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিলসোফি'তে মিল্কিওয়ে সম্পর্কে ইবনে বাজ্জাহর তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের নিন্মোক্ত বর্ণনা দেয়া হয়:

'The Milky Way is the light of many stars which almost touch one another. Their light forms a `continuous image' (khayal muttasil) on the surface of the body which is like a `tent' (takhawwum) under the fierily element and over the air which it covers. Avampace defines the continuous image as the result of refraction (in'ikas) and supports its explanation with an observation of a conjunction of two planets, Jupiter and Mars which took place in 500/1106-7. He watched the conjunction and `saw them having an elongate figure' although their figure is circular.'

অর্থাৎ 'মিল্কিওয়ে হলো পরস্পর সংলগ্ন অসংখ্য তারকার বিচ্ছুরিত আলো। তাদের আলো নভোমণ্ডলের উপরিতলে একটি 'অবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি' (খায়াল মুত্তাসিল) গঠন করে।

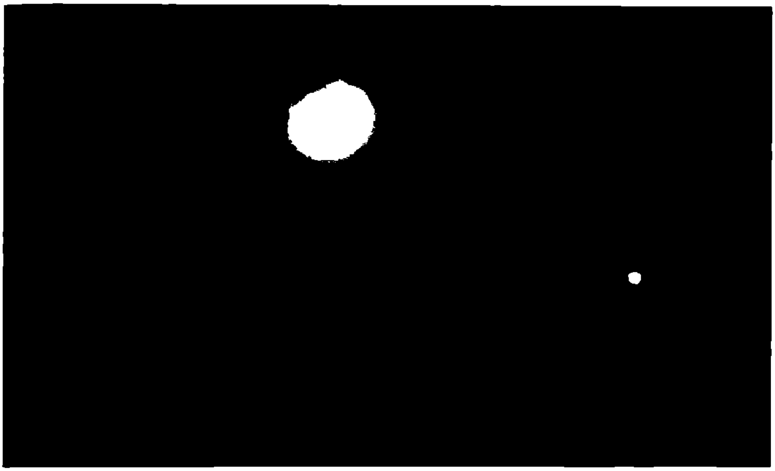

চন্দ্রগ্রহণ

এই 'অবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি' আকাশে যতটুকু জায়গায় অবস্থান করছে ততটুকু জায়গাকে প্রজ্বলিত বস্তুর নিচে একটি 'তাবু'র (তাখায়ুম) মতো দেখায়। এভামপেস অবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবিকে প্রতিসরণের (ইনিকাস) ফল হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং

www.pathagar.com

বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের একটি সংযোগ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ৫০০/১১০৬-৭-এ বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে এ সংযোগ ঘটে। তিনি এ সংযোগ প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদেরকে একটি দীর্ঘ অবয়বে দেখতে পেয়েছেন যদিও তাদের আকৃতি বৃত্তাকার।'

ইবনে বাজ্জাহ শুক্র ও বুধের পরিভ্রমণও লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের পরিভ্রমণকে সূর্যের মুখে কালো দাগ হিসাবে শনাক্ত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মারাগা মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুতুব আল-দীন শিরাজী ইবনে বাজ্জাহর পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন এবং এ পর্যবেক্ষণকে শুক্র ও বুধের পরিভ্রমণ পথ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান

ইসলামী পদার্থ বিজ্ঞানে ইবনে বাজ্জাহ হলেন ল' অব মোশন বা গতি তত্ত্বের পথপ্রদর্শক। পরবর্তীতে তার তত্ত্ব আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করে। তার ধারণা অক্সফোর্ডের মর্টন কলেজ এবং প্যারিসে যন্ত্রবিজ্ঞানের ওপর গবেষণায় নিয়োজিত কয়েক ডজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এমনকি গ্যালিলিও গ্যালিলাইয়ের মতো পদার্থ বিজ্ঞানীদের ক্লাসিক্যাল যন্ত্রবিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করে। তার রচিত ভাষ্য উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গতি এবং মুক্ত অবস্থায় বস্তুর পতিত হওয়ার সমস্যার সমাধান থেকে অনেক দূরে হলেও তা গ্যালিলিওর তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। এ ব্যাপারে 'মেডিয়ীভ্যাল সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড মেডিসিন' গ্রন্থের ২৪৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, *'It is claimed that Ibn Bajja'a influenced reached the young Galileo Galilie through the scholastics and the physicists of the Ranaissance and inspired his famous experiment in the tower of Pisa.'*

অর্থাৎ 'দাবি করা হয় যে, স্কলাশটিক ও রেনেসাঁ যুগের পদার্থবিদদের মাধ্যমে ইবনে বাজ্জাহর প্রভাব তরুণ গ্যালিলিও গ্যালিলাইয়ের কাছে পৌঁছেছিল এবং পিসার টাওয়ারে তাকে তার বিখ্যাত পর্যবেক্ষণ চালাতে অনুপ্রাণিত করেছিল।'

গতিবেগের গতিবিদ্যা সম্পর্কে ইবনে বাজ্জাহর ভাষ্যে কয়েকটি মৌলিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর আলেক্সান্দ্রিয়ার নয়া প্লেটোবাদী জোহানেস ফিলোপনাস প্রথম এ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। জোহানেস ফিলোপনাসের কোনো আরবী পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব ছিল না। মনে হয় ইবনে বাজ্জাহ অন্যান্য আরবী গ্রন্থে তার তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইবনে বাজ্জাহর তত্ত্বে বলা হয়েছে, আমরা যখন অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব থেকে কোনো বস্তুকে মুক্ত বলে চিন্তা করি তখনি কোনো উৎক্ষিপ্ত বস্তুর প্রকৃত গতি প্রকাশ পায়। তিনি অন্যান্য চিন্ত াবিদের মতো ছিলেন না। এরিস্টোটল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের চিন্তাবিদরা বিশ্বাস করতেন, কোনো বস্তুর চারদিকের বাতাসের সব প্রতিরোধ শক্তি অপসারণ করে নেয়া হলে বস্তুটি তৎক্ষণাৎ অসীম গতি লাভ করবে। ইবনে বাজ্জাহ তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করতেন, আমরা যদি কল্পনা করি যে, কোনো বস্তু থেকে সব

www.pathagar.com

প্রতিরোধ শক্তি অপসারণ করে নেয়া হয়েছে তাহলে বস্তুটির প্রকৃত অথবা প্রাকৃতিক গতি প্রকাশ পাবে। তিনি তার তত্ত্ব পুরোপুরি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও তার গবেষণায় এ আভাস পাওয়া গেছে যে, সব প্রতিরোধ থেকে মুক্ত কোনো বস্তুর গতি হবে সূচক। বস্তুটি তাৎক্ষণিকভাবে সীমাহীন গতি লাভ করবে না। ইবনে বাজ্জাহর ধারণা পরবর্তী মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে রুশদ মেনে নিয়েছিলেন।

ইবনে বাজ্জাহর গতিবেগের সংজ্ঞা ছিল গ্যালিলিওর গতিবেগের সমতুল্য:

গতিবেগ= চালিকাশক্তি- ম্যাটেরিয়াল রেজিসট্যান্স।

চলমান বস্তুর নির্দিষ্ট ভারের সাহায্যে চালিকাশক্তি পরিমাপ করা যায় এবং বস্তুর প্রতিরোধ বলতে বুঝায় প্রতিরোধকারী মাধ্যম। প্রতিরোধকারী মাধ্যমের প্রতিরোধক ক্ষমতা তার নির্দিষ্ট ভারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। ইবনে বাজ্জাহ প্রথম প্রচার করেন যে, কোনো বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করা হলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়। তার এ মতবাদ গটফ্রিড লিবনিজের শক্তির ধারণার আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে এবং তা নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ভিত্তিস্থাপন করে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত ক্রিয়া আছে।

টমাস একুইনাসের 'এনালাইসিস অব মোশন'-এর ওপরও ইবনে বাজ্জাহর প্রভাব ছিল। একুইনাসের এ তত্ত্বে তার প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক পিয়েরে ডাহাম তার 'সিস্টেমি দু মন্ডে'তে (Systeme du Monde) লিখেছেন, '*For the first time we have seen human reason distinguish two elements in a heavy body: the motive force, that is, in modern terms, the weight; and the moved thing, the corpus quantum, or as we say today, the mass. For the first time we have seen the notion of mass being introduced in mechanics, and being introduced as equivalent to what remains in a body when one has suppressed all forms in order to leave only the prime matter quantified by its determined dimensions. Saint Thomas Aquinas's analysis, completing Ibn Bajja's, came to distinguish three notions in a falling body: the weight, the mass, and the resistance of the medium, about which physics will reason during the modern era......This mass, this quantified body, resists the motor attemting to transport it from one place to another, stated Thomas Aquinas.*'

অর্থাৎ 'এই প্রথমবার আমরা কোনো ভারি বস্তুর দু'টি মৌলিক উপাদান ওজন এবং ভরের মধ্যে মানবিক যুক্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করতে দেখতে পাই। এই প্রথম আমরা ভরের ধারণাকে যন্ত্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ এবং প্রধান বাধা অতিক্রম করার পর বস্তুতে যা অবশিষ্ট থাকে তার সমতুল্য হিসাবে এ ধারণাকে প্রয়োগ করতে দেখতে পাই। ইবনে বাজ্জাহর ধারণা অনুযায়ী সেন্ট টমাস একুইনাসের বিশ্লেষণে একটি পড়ন্ত বস্তুর তিনটি উপাদানের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। এগুলো হলো: ওজন, ভর এবং মাধ্যমের প্রতিরোধ। আধুনিক যুগে পদার্থ বিজ্ঞান তার যুক্তি খুঁজে পাবে। এই ভর বা চলন্ত বস্তু

www.pathagar.com

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করে। টমাস একুইনাস এ বর্ণনা দিয়েছেন।'

'টেক্সট ৭১'

ইবনে বাজ্জাহ্ এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স'-এর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এ ভাষ্যের নাম 'টেক্সট ৭১'। ইবনে বাজ্জাহ তাতে তার গতি সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের ভবিষ্যত গতি তত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন। ইবনে বাজ্জাহ ও জোহানেস কেপলারের ধারণার ভিত্তিতে ১৬৮৭ সালে আইজাক নিউটন তার গতি সূত্র প্রকাশ করেন। এরিস্টোটল দাবি করেছিলেন, শূন্যতার মধ্যে গতি অসম্ভব। অন্যদিকে ইবনে বাজ্জাহ্ দাবি করেন, কোনো প্রতিরোধক না থাকায় শূন্যতার মধ্যে গতি চিরদিন অব্যাহত থাকবে।

এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স'-এর ভাষ্যে ইবনে বাজ্জাহ্ নিম্নোক্ত উক্তি করেছেন: *'And this resistance which is between the plenum and the body which is moved in it, is that between which, and the potency of the void, Aristotle made the proportion in his fourth book; and what is believed to be his opinion, is not so. For the proportion of water to air in density is not as the proportion of the motion of the stone in water to its motion in air; but the proportion of the cohesive power of water to that of air is as the proportion of the retardation occurring to the moved body by reason of the medium in which it is moved, namely water, to the retardation occurring to it when it is moved in air.'*

অর্থাৎ *'এবং বাতাসে পরিপূর্ণ শূন্যতা এবং বাতাসে পরিপূর্ণ শূন্যতায় অবস্থানকারী দেহের মধ্যকার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এরিস্টোটলের চতুর্থ বইয়ের একটি সমানুপাত হিসাবে ধারণা করা হয়। এটা তার মতামত বলে বিশ্বাস করা হলেও আসলে তা সত্যি নয়। কেননা ঘনত্বে বাতাসের বিপরীতে পানির সমানুপাত বাতাসে একটি পাথরের গতির বিপরীতে পানিতে তার গতি সমানুপাত এক নয়। তবে বাতাসের বিপরীতে পানির কোহেসিভ শক্তির সমানুপাত পানি অথবা বাতাসের মতো যে কোনো মাধ্যমে চলমান দেহে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকের সমান।'*

মনস্তত্ত্ব

ইবনে বাজ্জাহ পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তার বই 'রিকগনাইশন অব দ্য একটিভ ইন্টেলিজেন্স'-এ বলেছেন, একটিভ ইন্টেলিজেন্স হলো মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্য। বাজ্জাহ মানুষের স্পর্শকাতরতা ও কল্পনাশক্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি এই উপসংহারে পৌঁছান যে, একটিভ ইন্টেলিজেন্স ছাড়া ইন্দ্রিয় শক্তির সহায়তায় জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। একটিভ ইন্টেলিজেন্স হলো প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তার চালিকাশক্তি। তিনি আত্মার সংজ্ঞা

www.pathagar.com

দিতে গিয়ে বলেন, দেহ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত এবং গুণ ও বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যায়। প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সমৃদ্ধি লাভ এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন আত্মার ঐক্যকে ব্যক্তিগত পরিচিতির নীতি হিসাবে বিবেচনা করে বলেছেন, একটিভ ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে আত্মার সংযোগ ঘটলে তা হবে আল্লাহর মহিমা প্রকাশকারী একটি উজ্জ্বল আলো। স্বাধীনতার সংজ্ঞায় তিনি বলেন, যখন কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তখন তাকে স্বাধীন বলা যাবে। তিনি লিখেছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন এবং একটিভ ইন্টেলিজেন্স ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

দর্শন

দর্শনের ওপর ইবনে বাজ্জাহর লিখিত বইগুলোর নাম হলোঃ 'অন দ্য সৌল' (On the Soul), 'দ্য হারমিটস গাইড' (The Hermit's Guide), 'অন দি ইউনিয়ন অব দি ইন্টিলেক্ট উইথ ম্যান' (On the Union of the Intellect with Man) এবং 'ভেলিডিক্টরী লেটার' (Veledictory Letter)। 'দ্য হারমিটস গাইড' ল্যাটিন ভাষায় 'রেজিম ডু সলিটায়ার' (Regime Du Solitaire), ভেলিডিক্টরী 'লেটার এপিসটোলা এক্সপিডিশনিস' (Epistola Expeditionis) এবং 'এপিসটোলা ডি ডিসকাসু' (Epistola De Discessu) শিরোনামে অনুবাদ করা হয়। ইবনে বাজ্জাহর এসব গ্রন্থ ইসকোরিয়াল লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। তার অন্যান্য গ্রন্থ হয়তো হারিয়ে গেছে নয়তো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। 'কিতাবু তদবিরুল মোতাওয়াহেদ' এবং 'রিসালাতু বিদায়া' হলো দর্শনের ওপর ইবনে বাজ্জাহর দু'টি বিখ্যাত বই। এ দু'টি বই হিব্রুতে অনুবাদ করা হয়। স্পেন থেকে মিসরে যাবার পথে এক বন্ধুকে তিনি পত্র হিসাবে শেষ বইটি লিখেছিলেন। দর্শন ছাড়াও তিনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ব্যাপক অবদান রাখায় তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক সারটন 'ইন্ট্রডাকশন টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এর দ্বিতীয় ভলিউমের ১৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, '*A study of his extant scientific writings is much needed. In the mean while, it is not yet possible to appraise his scientific importance.*'

অর্থাৎ '*তার বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক লেখালেখির ওপর একটি গবেষণা চালানো জরুরি। তবে এখনো তার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।*'

চতুর্দশ শতাব্দীর ইহুদী লেখক মোসেজ অব নারবোন 'দ্য হারমিটস গাইড' অনুবাদ করে তা সংরক্ষণ করেছেন। বইটিতে মানুষ বা সন্ন্যাসী (Hermit) কিভাবে তার মানসিক শক্তির জোরে একটিভ ইন্টিলেক্টের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে বাজ্জাহ মানুষের পাশবিক এবং মানবিক কাজের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, মানুষের পাশবিক কাজের উৎস

www.pathagar.com

হলো পাশবিক আত্মা এবং মানবিক কাজের উৎস হলো মানবিক আত্মা। তিনি বলেছেন, কোনো মানুষ নিজের কষ্ট দূর করার জন্য কোনো পাথর সরালে তার সে কাজ হবে পাশবিক কাজ। অন্যদিকে অন্যের কষ্ট দূর করার জন্য সে কোনো পাথর সরালে তা হবে মানবিক কাজ। অতএব মানবিক কাজ করার জন্য হারমিটের নৈতিক শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। প্রথম ধাপে এ যোগ্যতা অর্জিত হলে নিজের কর্মকে স্বর্গীয় করে তোলার জন্য হারমিটকে উচ্চতর গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা চালাতে হবে। তাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অবশেষে একটিভ ইন্টিলেক্টে পৌঁছাতে হবে। ইবনে বাজ্জাহর মতে, পূর্ণতা অর্জনের এটাই একমাত্র পথ। একটিভ ইন্টিলেক্টের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটলে তা নিজে একটি ইন্টিলেক্টে রূপান্তরিত হবে। ইবনে বাজ্জাহর শিষ্য ইবনে রুশদের রচনাবলীর মাধ্যমে আলবার্ট দ্য গ্রেট এবং সেন্ট টমাস একুইনাসের মতো পণ্ডিতগণ তার এ নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হন। তারা তাদের লেখালেখিতে তার কথা উল্লেখ করেছেন।

রচনাবলী

(১) কিবাবুল আদবিয়াতিল মুফরাদা
(২) রিসালাতু ফিল আমালি বিল আস্তারলব
(৩) কিতাবু তাকবিমুন মনতেজুল জিহন
(৪) আররিসালাতুল মিসরী
(৫) রিসালাতু ফিল মুসিকি
(৬) কিতাবু ফিল হান্দাসা

মৃত্যু

দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে বাজ্জাহ ১১৩৮ সালে মরক্কোর ফেজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তবে কিভাবে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। আরবীয় সূত্রগুলো উল্লেখ করেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসরা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। ঐতিহাসিক আল-মাক্কারির বর্ণনাযায়ী ইবনে বাজ্জাহর শত্রু চিকিৎসক আবুল আলা ইবনে জোহরের চাকর ইবনে মায়ুবকে বেগুনে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য সন্দেহ করা হয়।

www.pathagar.com

এরিস্টোটলের দর্শন উদ্ধারকারী ইবনে রুশদ

মুসলিম স্পেনে যে ক'জন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের জন্ম হয় এরিস্টোটলের দর্শন উদ্ধারকারী ইবনে রুশদ হলেন তাদের একজন। তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও আইন শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। ইবনে রুশদ মধ্যযুগে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় ১১২৬ সালে মালিকী মাযহাবভুক্ত এক উচ্চপদস্থ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা আবু আল-ওয়ালিদ মোহাম্মদ ছিলেন আলমোরাভীয় রাজবংশের শামনামলে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি। তার পিতা আবু আল-কাসিম আহমদ ১১৪৬ সাল নাগাদ প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবনে রুশদের পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ। তবে 'ইবনে রুশদ' হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত। ইবনে রুশদের আরবী নাম হিব্রু অনুবাদে বিকৃত রূপ নেয়। ল্যাটিন অনুবাদে তার নাম হয়ে যায় 'আভিরোস' (Averroes)। ইউরোপীয় সাহিত্যে তিনি এ নামেই পরিচিত। এছাড়া তিনি ইবনে রাসদীন, ফিলিয়াস রোসাদিস, ইবনে রুশীদ, বেন রাক্সিড, ইবনে রাসচোদ, ডেন রেশেদ, আবেন রাসাদ, আবেন রইস, আবেন রাসদ, আবেন রুস্ত, আভেদরসদী, আবেনরিজ, আদভারোজ, বেনরোইস্ত, আভেনরোথ, আভেরইস্তা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। তিনি ইমাম গাজ্জালির (র.) মতো মুসলিম দার্শনিকদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে এরিস্টোটলের দর্শন সমর্থন করতেন। ইমাম গাজ্জালি (র.) আশংকা করতেন যে, তার দর্শন ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সংঘাত ডেকে আনবে। ইবনে রুশদের মৃত্যুর পর তার শিক্ষাকে কেন্দ্র করে 'রুশদবাদ' (Averroism) আন্দোলন গড়ে উঠে এবং তার চিন্তাধারা পরবর্তীতে পশ্চিম ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে দর্শন শিক্ষাদানের পদ্ধতির (Scholasticism) উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মুসলিম বিশ্বে তিনি ইমাম গাজ্জালির (র.) নেতৃত্বাধীন গোঁড়া আশারী ধর্মীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে গ্রীক দর্শনের সমর্থনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেন। জীবদ্দশায় তার দর্শন মুসলিম সমাজে বিতর্কিত হলেও পশ্চিম ইউরোপীয় দর্শনে বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমে তিনি হাদিস, ভাষা, ফিকাহ ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। সারাজীবন তিনি দর্শন, ধর্ম, আল্লাহর গুণাবলী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, অধিবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি

www.pathagar.com

করেন। তিনি তার নিজস্ব রুশদবাদ প্রচার করেছিলেন। সেভিলের আবু জাফর ইবনে হারুনের তত্ত্বাবধানে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দার্শনিক ইবনে বাজ্জাহও ছিলেন তার শিক্ষক। উত্তর আফ্রিকায় আলমোহাদীয় রাজবংশের রাজধানী মারাকাশে অবস্থানকালে 'হায় ইবনে ইয়াকধান'-এর গ্রন্থকার ইবনে তোফায়েলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়।

পাশ্চাত্যে 'আবুবাকের' (Abubacer) নামে পরিচিত দার্শনিক ইবনে তোফায়েল ছিলেন আলমোহাদীয় রাজবংশের খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফের চিকিৎসক ও উপদেষ্টা। ইবনে তোফায়েল ইবনে রুশদকে খলিফার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যুবরাজ তরুণ দার্শনিক ইবনে রুশদের অমায়িক আচরণে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি তাকে কর্ডোভার আদালতে প্রধান কাজী হিসাবে নিযুক্তি দেন। ইসলামী আইন ও ফিকাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাকে প্রধান কাজী পদে নিযুক্তি পেতে সহায়তা করে। ১১৮২ সালে তাকে খলিফার প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। যুবরাজ তাকে এরিস্টোটলের পাণ্ডুলিপির ভাষ্য রচনার জন্যও নিয়োগ করেন। একসময় বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে জোহরের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ইবনে জোহর তার শিক্ষক ও বন্ধুতে পরিণত হন। ইবনে রুশদের সমসাময়িক লেখকগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে তার গভীর আগ্রহ উল্লেখ করেছেন এবং তার স্মরণীয় গ্রন্থ 'কিতাব আল-কুল্লিয়াত ফি আল-তিব্ব'-এ তা ফুটে উঠেছে। ইবনে জোহরের 'কিতাব আল-তাসির ফি আল-মুদাওয়াত ওয়া আল-তাদবির' ইবনে রুশদকে উল্লেখিত গ্রন্থ প্রণয়নে প্রভাবিত করেছিল। ইবনে তোফায়েল ও ইবনে বাজ্জাহ মরমী দার্শনিক হলেও ইবনে রুশদ ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী। এ তিনজনই ছিলেন স্পেনের মুসলিম দার্শনিক। ১১৬৯ সালে ২৪ বছর বয়সে ইবনে রুশদ সেভিলের কাজী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে এরিস্টোটলের 'ডি এনিমা' অনুবাদ করেন। দু'বছর পর তাকে কর্ডোভায় বদলি করা হয়। এখানে তিনি বিচারক হিসাবে ১০ বছর কাটান। এসময় তিনি এরিস্টোটলের 'মেটাফিজিক্স'সহ কয়েকটি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। কাজী হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে তাকে মরক্কোর খলিফার চিকিৎসক হিসাবে মারাকাশে ডেকে পাঠানো হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আলমোহাদীয়রা স্পেনের কর্তৃত্ব কব্জা করে নিলে ইবনে রুশদের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আলমোহাদীয় রাজবংশের উদারতা সত্ত্বেও এ বংশের তৃতীয় খলিফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মনসুরের আমলে গোড়া ইসলামপন্থীরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। ১১৯৫ সালে ইবনে রুশদের যুক্তিবাদী দর্শন প্রত্যাখ্যান করা হয়। কর্ডোভার ধর্মীয় সমাজ ধর্মত্যাগী হিসাবে তাকে অভিযুক্ত করে। বিচারে তাকে কর্ডোভার বাইরে ইহুদী অধ্যুষিত গ্রাম লিউসিনায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। তার গ্রন্থাবলী নিষিদ্ধ এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়। দু'বছর পর ১১৯৮ সালে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে ইবনে রুশদকে স্বপদে বহাল করা হয়। তিনি জীবনের ত্রিশটি বছর দর্শনের ওপর লেখালেখিতে নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

দর্শন

ইবনে রুশদ ছিলেন মূলত একজন মুসলিম দার্শনিক। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের দর্শনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনুরাগ থেকে তিনি এরিস্টোটলের টিকে থাকা অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষ্য লিখেন। তবে তিনি তার মূল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে এসব ভাষ্য রচনা করেননি। তার বন্ধু ইবনে তোফায়েল তাকে এরিস্টোটলের দর্শনের অসংলগ্নতা দূর করার অনুরোধ করেন। একদিন তিনি তাকে ডেকে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। ইবনে তোফায়েল তাকে জানান যে, এরিস্টোটলের দর্শন পুনরুদ্ধারে তিনিই হলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তার ওপর তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। ইবনে তোফায়েলের অনুরোধে সেদিন থেকে ইবনে রুশদ এরিস্টোটলের দর্শন নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। ১১৫০ সালের আগে ল্যাটিন ইউরোপে এরিস্টোটলের অনূদিত গ্রন্থের যে ক'টি অবশিষ্ট ছিল সেগুলো কেউ মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেনি এবং খ্রিস্টান পণ্ডিতগণও খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। ইবনে রুশদের ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়ে কার্যত এরিস্টোটলের দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তার অক্লান্ত শ্রমে মানব জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করে। ইবনে রুশদ গ্রীক ভাষা জানতেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। মনে হয় তিনি আরবীতে এরিস্টোটলের অনূদিত বইগুলোর ভাষ্য লিখেছেন। তিনি তিন প্রকারের ভাষ্য রচনা করেন। একটি ছিল 'জামি', আরেকটি ছিল 'তালখিস' এবং আরেকটি 'তাফসির'। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন ধরনের ভাষ্য থেকে এসব শব্দ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য জামি, মধ্যম সারির শিক্ষার্থীদের জন্য তালখিস এবং উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাফসির রচনা করা হয়। তাফসির ছিল ইবনে রুশদের সবচেয়ে দীর্ঘতম ভাষ্য। এতে ছিল কোরআনের ধারণার ব্যাখ্যাসহ ব্যাপক বিশ্লেষণ। তিনি এরিস্টোটলের সব গ্রন্থের তিন ধরনের ভাষ্য রচনা করেছিলেন কিনা তা পরিষ্কার নয়। ইবনে রুশদের মাত্র কয়েকটি ভাষ্য টিকে রয়েছে। তিনি এরিস্টোটলের যেসব বইয়ের ভাষ্য লিখেন সেগুলো হলো 'মেটাফিজিক্স, 'ফিজিক্স', 'পোস্টারিয়র', 'এনালিটিক্স', 'ডি কালো' ও 'ডি এনিমা'। এরিস্টোটলের 'পলিটিক্স'-এর কোনো পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ না হওয়ায় তিনি প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তার ভাষ্যে দাবি করেন যে, প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ বর্ণিত আদর্শ রাষ্ট্র হলো খোলাফায়ে রাশেদীন এবং স্পেনে ইবনে তুমার্টের অধীনে আলমোহাদীয় রাষ্ট্রের অনুরূপ। রিপাবলিকের ওপর ইবনে রুশদের ভাষ্য পাশ্চাত্যে প্লেটোর দর্শন প্রচার এবং এ দর্শন গ্রহণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার ভাষ্য ছিল মধ্যযুগের রাজনৈতিক দর্শনে একটি প্রাথমিক সূত্র। ইবনে রুশদ আশারী মুসলিম মাযহাব থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানকে মুক্তি দানের পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করেন। এজন্য কোনো কোনো লেখক তাকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার অগ্রদূত অথবা পশ্চিম ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আখ্যায়িত করছেন।

www.pathagar.com

ইবনে রুশদ ও গ্রীক দার্শনিক পরফাইরির কাল্পনিক বিতর্ক

'তাহাফুল আল-তাহাফুল' (দি ইনকোহারেন্স অব দি ইনকোহারেন্স) হলো ইবনে রুশদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দার্শনিক কর্ম। ইমাম গাজ্জালির (র.) 'তাহাফুল আল-ফালাসিফার' (দি ইনকোহারেন্স অব দ্য ফিলসোফার্স) জবাবে তিনি বইটি লিখেছিলেন। বইটিতে তিনি আল-গাজ্জালির অভিমত উপেক্ষা করে এরিস্টোটলের দর্শনকে সমর্থন করেন। ইমাম গাজ্জালি (র.) তার 'তাহাফুল আল ফালাসিফা'য় যুক্তি দিয়ে বলেন, ইতিপূর্বে ইবনে সিনার লেখালেখিতে উপস্থাপিত এরিস্টোটলের মতবাদ স্ববিরোধী এবং ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইবনে রুশদ ইমাম গাজ্জালির অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, তার যুক্তি ভুল এবং ইবনে সিনার দর্শন এরিস্টোটলের মূল দর্শন থেকে বিচ্যুত। 'তাহাফুল আল-তাহাফুল' লিখার জন্য বহু মুসলিম পণ্ডিত ইবনে রুশদের কঠোর সমালোচনা করলেও ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বইটি গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক দর্শন এবং গবেষণামূলক বিজ্ঞানের যুগ শুরু হওয়া নাগাদ বইটির প্রভাব অব্যাহত ছিল। ভাগ্য সম্পর্কে ইবনে রুশদের অভিমত ছিল ভাগ্যের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই এবং ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত নয়। ইবনে রুশদের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'ফজল আল-মাকাল', 'কিতাব আল-কাশফ' ইত্যাদি। ইবনে রুশদ ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ফিকাহ পণ্ডিত। 'বিদায়াত আল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াত আল-মুক্তাসিদ' হলো মালিকী মাযহাবের ওপর তার লেখা একটি সুপরিচিত বই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্যাকব আনাতোলি ইবনে রুশদের কয়েকটি গ্রন্থ আরবী থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তার এসব গ্রন্থের অধিকাংশ জ্যাকব

www.pathagar.com

মান্তিনো এবং আব্রাহাম ডি বালমেস ল্যাটিন থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। বাদবাকি গ্রন্থগুলো মাইকেল স্কট আরবী থেকে সরাসরি অনুবাদ করেন। স্কট যেসব বই অনুবাদ করেন সেগুলোর ল্যাটিন শিরোনাম ছিল 'ডি জেনারেশিও ইট করাপশনি', 'ডি এনিমা', 'ডি সেনসাস ইট সেনসাটো', 'ডি সাবসটেনশিয়া অরবিস' ও 'ডেমিটাফিজিশিয়া'। উইলিয়াম দ্য লুনিসি অনুবাদ করেন 'ডি ইন্ট্রডাকশিও পরফাইরি' এবং আন্দ্রিয়াস আলপাগাস অনুবাদ করেন 'ট্র্যাক্ট ডি সেপারেশনি প্রাইম প্রিন্সিপি'।

বিস্তর অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও এরিস্টোটলের বইয়ের দীর্ঘ ভাষ্যসহ যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ওপর ইবনে রুশদের বহু গ্রন্থ স্থায়ীভাবে হারিয়ে যায়। তবে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত কয়েকটি গ্রন্থ টিকে রয়েছে। মূল আরবী ভাষায় যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ওপর তার কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। ১৫৬২-১৫৭৪ সালে ভেনিসে ইবনে রুশদের গ্রন্থগুলোর পূর্ণাঙ্গ এবং এরিস্টোটলের কয়েক খণ্ডের বিশাল সংস্করণের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। হিব্রু ভাষায় ইবনে রুশদের গ্রন্থের অনুবাদ ইহুদী দর্শনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ব্রাবান্টের সাইগার, টমাস একুইনাস এবং অন্যরা খ্রিস্টান শিক্ষিত সমাজে তার দর্শন ছড়িয়ে দেন। খ্রিস্টান সমাজ এরিস্টোটলের দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। টমাস একুইনাসের মতো খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ তাকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, তারা তার নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'মহাভাষ্যকার' (The Great Commentator) এবং এরিস্টোটলকে 'দার্শনিক' (The Philosopher) হিসাবে সম্বোধন করতেন। ইবনে রুশদ ইসলামী দর্শনকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল আন্দালুস বা স্পেনের সংস্কৃতি বদলে যায়। 'ফজল আল-মাকাল'-এ তিনি কোরআনকে ব্যাখ্যা করার পূর্বশর্ত হিসাবে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ধর্মে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারার ওপর জোর দেয়া হয় কম। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, অহীকে অবশ্যই যুক্তির পথ অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কোরআন নিয়ে গবেষণা করাই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত। আল্লাহ এবং তার সৃষ্টি সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করাই ইসলামের লক্ষ্য। এ জ্ঞান মানুষকে ইহলৌকিক শান্তি লাভ এবং পারলৌকিক দুর্ভোগ এড়িয়ে যেতে সহায়তা করে। তিনি এই অভিমত দেন যে, আধ্যাত্মিক শান্তিকে কোরআনে তাকওয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার এ ভাবধারা ছিল গোঁড়া মুসলিম ধর্মতত্ত্বের পরিপন্থী। ইমাম গাজ্জালি (র.) তার মতের বিরোধিতা করে বলেন, সবকিছু আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার ফসল। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে কার্যকারণের সম্পর্ক। অন্যদিকে ইবনে রুশদ বলেন, কার্যকারণ অস্বীকার করার অর্থ হলো জ্ঞানকে অস্বীকার করা। আর জ্ঞানকে অস্বীকার করার অর্থ হলো পৃথিবীর সব ঘটনা সম্পর্কে অন্ধকারে থাকা।

ইবনে রুশদের মতবাদের বিরোধিতা

প্রকৃত মুসলমান হলেও ইবনে রুশদের দর্শন ছিল আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম বিরোধী। শুধু মুসলমান নয়, স্পেনের খ্রিস্টান ও ইহুদীরাও তার প্রতি চটে যায়। ইবনে রুশদ ছিলেন

www.pathagar.com

মুক্তবুদ্ধির প্রতীক। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে মুক্তবুদ্ধি এবং স্বাধীন দর্শন চর্চার অবসান ঘটে। তার মৃত্যুতে মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত স্পেনের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল সে ব্যাপারে অধ্যাপক ক্যাম্পবেল 'এরাবিয়ান মেডিসিন'-এর দুই নম্বর ভলিউমের ৫২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'The year after his death, his patron Yusuf al-Mansur lost the political control of Spain and with this event we come to the end of the culture of the liberal sciences among the Arabs and there was a reversion to the meagre medicine of Moslem fanatics who rested content with the natural science of the Quran.'*

অর্থাৎ 'তার মৃত্যুর পর তার পৃষ্ঠপোষক ইউসূফ আল-মনসুর স্পেনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা আরবদের মধ্যে উদার বিজ্ঞান চর্চার সংস্কৃতির অবসান ঘটতে দেখতে পাই এবং তার মৃত্যু ছিল যতকিঞ্চিত চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা থেকে ধর্মান্ধ মুসলমানদের কোরআনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকায় প্রত্যাবর্তন।'

ইবনে রুশদের মতবাদকে কেন্দ্র করে দু'টি প্রধান গ্রুপ তৈরি হয়। একটি ছিল রুশদপন্থী। এ গ্রুপকে বলা হতো 'ল্যাটিন এভারোয়িস্ট' (Latin Averroists)। এ গ্রুপের নেতা ছিলেন ব্রাবান্টের সাইগার। ইবনে রুশদের মতবাদের বিরোধী গ্রুপটি ছিল রক্ষণশীল। এ গ্রুপের নেতা ছিলেন ডোমিনিকান ধর্মযাজক সেন্ট টমাস একুইনাস। ইবনে রুশদের সমালোচক হলেও টমাস একুইনাস তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি।

রুশদবাদ

ইবনে রুশদ ইসলামের সঙ্গে এরিস্টোটলের দর্শনের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মের সঙ্গে দর্শনের কোনো বিরোধ নেই। ধর্ম ও দর্শন দু'টি ভিন্ন উপায়ে অভিন্ন সত্যের সন্ধান করে। তবে তিনি দু'টি জগৎকে পৃথক বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তনতায় বিশ্বাস করতেন। রুশদবাদে জ্ঞানের উৎস ছিল দু'টি। প্রথম উৎস ছিল ধর্মবিশ্বাস এবং দ্বিতীয় উৎস দর্শন। ইবনে রুশদ বিশ্বাস করতেন, ধর্ম বিশ্বাস পরীক্ষাযোগ্য নয়। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর দর্শন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেন এবং যুক্তির স্বাধীন প্রয়োগের ওপর জোর দেন। ইবনে রুশদ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, আত্মা দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ ব্যক্তিগত এবং অন্যটি অপার্থিব। আত্মার অপার্থিব অংশটি অবিনশ্বর হওয়ায় সব মানুষ মৌলিকভাবে অভিন্ন। ইবনে রুশদ তৎকালীন বিপ্লবাত্মক ধারণা 'এক্সিসটেন্স প্রীসীডস এসেন্স'-এ বিশ্বাস করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুলা সাড্রা'র 'ট্রান্সসেনডেন্ট থিওসফি' এবং বিংশ শতাব্দীতে 'অস্তিত্ববাদ' (Existentialism)-এর মধ্য দিয়ে এ ধারণা আরো বিকশিত হয়।

'এক্সিসটেন্স প্রীসীডস এসেন্স' হলো একটি দার্শনিক মতবাদ। এ মতবাদ প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এরকম যে, মানুষের প্রকৃতি অথবা সারবস্তু তার অস্তিত্বের চেয়ে আরো বেশি মৌলিক ও অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে 'এক্সিসটেন্স প্রীসীডস এসেন্স' মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ আত্মসচেতনার মধ্য দিয়ে তার গুরুত্ব

www.pathagar.com

বৃদ্ধি এবং জীবনের অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। আরো বিশ্বাস করা হয় যে, জন্মগতভাবে মানুষ কোনো যোগ্যতা বা পরিচয়ের অধিকারী নয়। ইবনে রুশদের এ মতবাদ নজিরবিহীন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়ন তোলে। এ আলোড়নে মধ্যযুগের ইসলাম এবং ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের সামাজিক চিন্তা চিরদিনের জন্য পাল্টে যায়। ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইবনে রুশদের একক প্রভাব পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামী দর্শনে ইবনে সিনার পাশাপাশি তার নামও সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। শুধু মধ্যযুগ নয়, ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত তার বহুমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক জি. সারটনের ভাষায়, *'He was the greatest Muslim philosopher of the West and one of the greatest of medieval times.'* অর্থাৎ *'তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।'*

রজার ব্যাকন এরিস্টোটল ও ইবনে সিনার পরই ইবনে রুশদকে ঠাঁই দিয়েছেন। এরিস্টোটল ও ইবনে রুশদের ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত কর্ম শুধু ইতালির নেপলস নয়, প্যারিস ও বলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বলোগনা ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশদবাদ শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় রুশদবাদের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। ইতালীয় রেনেসাঁর বহু আগে স্পেনে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। ইবনে রুশদের যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে এ বীজ বপন করা হয়। অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিসে আবেগের জোয়ার বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইবনে রুশদের এরিস্টোটলীয় দর্শন খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে ব্যাপারে গুরুতর প্রশ্ন উঠে। রেভারেন্ড ফাদার আসিন পালাসিয়স ইউরোপে রুশদবাদের প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। তিনি ইবনে রুশদের দর্শনের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অ্যাংলিকান ডাক্তার সেন্ট টমাস একুইনাসের পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেন। তিনি উভয়ের চিন্তাধারায় অদ্ভুত মিল দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন। তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, সব ক্যাথলিক যাজকদের ওপর এ মুসলিম দার্শনিকের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। ইউরোপে রুশদবাদের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপক বামেট তার মুসলিম 'কন্ট্রিবিউশন টু সিভিলাইজেশন'-এ লিখেছেন, *'St. Thomas Aquinas was the first disciple of the Grand Commentator (Averroes). Albertus Magnus owes everything to Avicenna. St. Thomas owes practically everything to Averroes.'* অর্থাৎ *'সেন্ট টমাস একুইনাস ছিলেন ইবনে রুশদের প্রথম শিষ্য। আলবার্টাস ম্যাগনাস তার* সবকিছুর জন্য ইবনে সিনার কাছে ঋণী। বাস্তববিক অর্থে একইভাবে সেন্ট টমাসও তার সবকিছুর জন্য ইবনে রুশদের কাছে ঋণী।'

এখানে ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড আর. টার্নারের একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য। টার্নার তার 'সায়েন্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম' শিরোনামে গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Ibn Rushed, also known as Averroes, was the brightest light of the cultural zenith that was achieved in Muslim Spain during the eleventh and twelfth centuries. He became the most celebrated of all commentators on Aristotle. Like Aristotle and some Muslim dialectical theologians, he held God's*

www.pathagar.com

existance to be provable on rational grounds alone. Ibn Rushed came to be regarded by some as the father of free thought or even unbelief, yet his influnce was not hindered by this prejudicial label and he left a mark on both Christian and Jewish thinking.'

অর্থাৎ 'আভিরোস হিসাবে পরিচিত ইবনে রুশদ ছিলেন একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনে অর্জিত সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক উন্নতির উজ্জ্বলতম জ্যোতি। তিনি এরিস্টোটলের দর্শনের সেরা ভাষ্যকার হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। এরিস্টোটল এবং কয়েকজন যুক্তিবাদী মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যুক্তিসঙ্গতভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণযোগ্য। কেউ কেউ ইবনে রশদকে মুক্তচিন্তার জনক এমনকি ধর্মে অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এসব পক্ষপাতমূলক অপবাদ তার প্রভাবকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি এবং তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদী উভয়ের চিন্তাধারায় একটি গভীর ছাপ রেখে গেছেন।'

পদার্থবিদ্যা

ইবনে বাজ্জাহ্ এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স'-এর ওপর তার ভাষ্য 'টেক্সট ৭১'-এ গতি সূত্রের একটি ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। ইবনে রুশদ ইবনে বাজ্জাহর এ ধারণার ওপর মন্তব্য করেন এবং পদার্থবিদ্যা বিশেষ করে মেকানিক্সের ওপর তার নিজস্ব অবদান রাখেন। ইবনে রুশদই প্রথম ব্যক্তি যিনি শক্তির পরিমাণ এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তিনি শক্তিকে বস্তুগত শরীরে পরিবর্তনশীল গতিময় পরিস্থিতিতে কাজের পরিমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রথম নির্ভুলভাবে যুক্তি দেন যে, শক্তির প্রভাব ও পরিমাণ বস্তুগতভাবে প্রতিরোধক একটি ভরের গতিবিদ্যায় পরিবর্তিত হয়। তিনিই প্রথম এ ধারণা চালু করেন যে, গতিবিদ্যাকে পদার্থবিদ্যায় রূপান্তরে শরীরে সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। পরবর্তীতে ইবনে রুশদের এ ধারণাকে জোহানেস কেপলার 'জড়' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তবে তিনি তার ধারণাকে কেবলমাত্র সুপারলিউনারি ভূ-গোলক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এরিস্টোটলের সাধারণ গতি প্রয়োগের নিয়মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল যে, ভূ-গোলকে গতি হলো v a F/R। ধারণা করা হয়েছিল যে, গোলকে মুভার আছে। অতএব F >O। কিন্তু যেখানে R=O সেখানে গতির কোনো প্রতিরোধক নেই। ভূ-গোলকগুলো কেন অসীম গতিতে ঘুরছে না ইবনে রুশদ তার ব্যাখ্যা দেন।

চিকিৎসা

ইবনে রুশদ একজন ধর্মানুরাগী মুসলমান ছিলেন। তিনি তার এক লেখায় বলেছেন, '*এনাটমি নিয়ে কেউ গবেষণা করলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্বের প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় হবে।*' ইবনে রুশদ কোরআন ও হাদিসের আলোকে চিকিৎসা বিষয়ক বই লিখেছেন। বইগুলোতে তিনি তার মতের সমর্থনে কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্ ও তার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাই জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনে সুখের চাবিকাঠি। রুশদ 'কিতাব আল-কুল্লিয়াত ফি তিব্ব' শিরোনামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। অনুবাদে 'কুল্লিয়াত'-এর নাম সাধারণত 'জেনারেলিটিজ' (Generalities) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ইবনে রুশদের এ সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ক বইটি মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী বিশ্বে চিকিৎসকদের জন্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত একটি মূল পাঠ্যবই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাত খণ্ডে সমাপ্ত কুল্লিয়াতে যথাক্রমে এনাটমি, ফিজিওলজি, সাধারণ প্যাথলজি, ডায়াগনসিস, মেটেরিয়া মেডিকা, হাইজিন, থেরাপেটিক্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং গালেন ও হিপোক্রেটসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। বইটিতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোগ এবং চোখের পীড়ায় রেটিনার কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইবনে রুশদ বইটির কয়েকটি পরিচ্ছেদে নাড়ীর গতিতে স্বাস্থ্য ও রোগের লক্ষণ, প্রস্রাব, বিভিন্ন প্রকার জ্বর, সংকটকাল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সার্জারি সম্পর্কেও বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে রুশদ প্রথম ঘোষণা করেন যে, একই ব্যক্তি জীবনে দু'বার গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয় না।

তিনি ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ক কবিতা 'আরজুজা ফিত তিব্ব'-এর ভাষ্য রচনা করেন। তার ভাষ্যের শিরোনাম ছিল 'শারাহ্ উরুজাত ইবনে সিনা।' আরজুজা অত্যন্ত বিখ্যাত কবিতা। আরজুজা অর্থ হলো 'রাজা ছন্দে লিখিত কবিতা'। ১২৬০ সালে মোসেজ ইবনে তিব্বন আরজুজার ভাষ্য হিব্রু ভাষায় গদ্যে রূপ দেন। ১২৬১ সালে গ্রানাডার সলোমন বিন আইউব বিন জোসেফ বেজিয়ার্স থেকে ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১২৮৪ সালে আরমেনগুয়াদ 'ক্যান্টিকাম ডি মেডিসিনা' শিরোনামে ল্যাটিন অনুবাদ বের করেন। ১৪৮৪ সালে ভেনিসে বইটির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আন্দ্রে আলপাগো শারাহ্ উরুজাত ইবনে সিনা'র আরেকটি সংশোধিত ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইবনে রুশদের 'মাকালাতু ফিত তিরিয়াক' অনুবাদ করেছিলেন। ইবনে রুশদ গ্রীক দার্শনিক গালেনের গ্রন্থাবলী সংকলন করেন এবং ইবনে সিনার 'আল-কানুন ফি আল-তিব্ব'-এর একটি ভাষ্য লিখেন। ইবনে জোহরের দাদা আবুল আলা জোহর ইবনে আবদুল মালিকের কাছে ইবনে সিনার কানুন সমাদৃত না হওয়ায় ইবনে রুশদ চিকিৎসা বিষয়ক অনুরূপ একটি বিশ্বকোষ লিখার উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে তিনি নিজে লিখেন 'কুল্লিয়াত' এবং ইবনে জোহর লিখেন 'আল-তাইসির ফিল মুদ্দাওয়াত ওয়াল-তাদবির'।

কুল্লিয়াতের ল্যাটিন অনুবাদ

ল্যাটিন অনুবাদে ইবনে রুশদের কুল্লিয়াতের নামকরণ করা হয় 'কলিজেট' (Colliget)। কলিজেট ইউরোপে বিশ্বকোষ হিসাবে 'লাইবার ইউনিভার্সালিস ডি মেডিসিনা' নামে প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে

www.pathagar.com

আরমেনগুয়াদ বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে যে, ১২৫৫ সালে বইটি অনুবাদ করা হয় এবং অনুবাদক হলেন পাদুয়ার ইহুদী অনুবাদক বোনাকোসা। ১৪৪২ সালে ভেনিসে বইটির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। পরে আরো সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সিম্ফোরেন চ্যাম্পিয়ার 'এরিস্টোটল-আভিরোস' শিরোনামে একটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং ১০ খণ্ডের এই অনুবাদের সঙ্গে বোনাকোসার ল্যাটিন অনুবাদ জুড়ে দেন। ইবনে রুশদের 'কুল্লিয়াত' দু'বার হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। একবার অনুবাদ করেন একজন অজ্ঞাতনামা অনুবাদক এবং আরেকবার অনুবাদ করেন সলোমন বেন আব্রাহাম বেন ডেভিড। ১৪৮২ সালে বইটির ল্যাটিন অনুবাদ পুনঃ প্রকাশ করা হয়। ১৫৩১ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ থেকে আল-রাজি ও ইয়াহিয়া ইবনে সারাফিউনের গ্রন্থের সঙ্গে একবার এবং ভেনিস থেকে ইবনে জোহরের গ্রন্থের সঙ্গে আরো ৭ বার 'কুল্লিয়াত' প্রকাশিত হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ইবনে রুশদ গ্রহ ও তারকার গতিবিধির ওপর 'কিতাব ফি হারাকাত আল-ফালাক' রচনা করেন। ড্র্যাপারের মতে, সূর্যের দাগ এবং অস্পষ্ট চাঁদের গঠন আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইবনে রুশদের। ইবনে রুশদ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীভূত মডেলের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। তিনি টলেমির আলমাগেস্ট-এর সারসংক্ষেপ রচনা করেন এবং তাকে দু'টি অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে ছিল গ্রহ ও নক্ষত্রের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ভাগে ছিল তাদের গতির বর্ণনা। ১২৩১ সালে জ্যাকব আনাতোলি এ সারসংক্ষেপ আরবী থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। ইবনে রুশদ পদার্থ বিজ্ঞানে শক্তি, গতিবিদ্যা এবং ইনারশিয়া'র মতো মেকানিক্সে অবদান রাখেন। তিনি হলেন তাদের একজন যারা বিশ্বাস করতেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে একটি নয়া বিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে।

সম্মান

দান্তে তার দ্য ডিভাইন কমেডি'তে অনন্তলোকে প্রাচ্যের মহান দার্শনিকদের পাশে ইবনে রুশদকেও ঠাঁই দিয়েছিলেন। জর্জ লুই বার্জেস ইবনে রুশদকে নিয়ে 'আভিরোসেস সার্চ' শিরোনামে একটি ছোট গল্প রচনা করেছেন। গল্পে তাকে ট্রাজেডি ও কমেডি শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে। জেমস জয়সি 'ইউলিসিস' উপন্যাসে মায়মনিদেসের পাশাপাশি ইবনে রুশদের নামও উল্লেখ করেছেন। আলমগীর হাশমির কবিতা 'ইন কর্ডোভা'য় তাকে প্রাচীন কর্ডোভা নগরীর দেয়ালের বাইরে অপেক্ষমান দেখানো হয়েছে। ইউসেফ কাহিনের ছবি 'ডেস্টিনি'র মূল চরিত্র হলেন ইবনে রুশদ। তার সম্মানে একটি তারকার নামকরণ করা হয়েছে '৮৩১৮ আভিরোস'। ১৯৭৬ সালে ইবনে রুশদের নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ১১ দশমিক ৭ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ২১ দশমিক ৭ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের ব্যাস ৩২ দশমিক শূন্য ৫ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

রচনাবলী

২০ হাজার পৃষ্ঠায় ইবনে রুশদের রচনাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক ইসলামী দর্শন, ইসলামী দর্শনে যুক্তিবাদ, আরবী চিকিৎসা শাস্ত্র, আরবী গণিত, আরবী জ্যোতির্বিজ্ঞান, আরবী ব্যাকরণ, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী শরিয়াহ এবং ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেন। ইসলামী দর্শন এবং চিকিৎসা ও ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশি। ইবনে রুশদ কমপক্ষে ৬৭টি মৌলিক বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে ২৮টি দর্শন, ২০টি চিকিৎসা শাস্ত্র, ৮টি আইন, ৫টি ধর্মতত্ত্ব এবং চারটি বই ব্যাকরণের ওপর লেখা। ফরাসি দার্শনিক রেনান প্যারিসের মতে, ইবনে রুশদ ৭৮টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তবে ইবনে আবি ওসাবিয়া তার ৪৬ টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম দেয়া হলোঃ

(১) কিতাবুল মুকাদ্দামি ফিল ফিকহি
(২) কিতাবু হায়ওয়ান
(৩) কিতাবু জুরুরি ফিল মনতেক
(৪) মুলহিকুম বিহি তালখিসু কুতুবি আরাস্তুতালিস
(৫) তালখিসাল উলুহিয়াতি লিনিকুলাবিস
(৬) তালখিসু কিতাবুল বুরহানি লি আরাস্তুতালিস
(৭) শারহু কিতাবিন নাফসি লি আরাস্তুতালিস
(৮) তালখিসু কিতাবিল এসতিকসাতি লেজালিনুস
(৯) তালখিসু কিতাবি হিমিয়াতি লিজালিনুস
(১০) কিতাবু মিনহাজিল আদিল্লাতি ফি এলমেল উসুল
(১১) মাকালাতু ফিল আকলি
(১২) মাকালাতু ফিল কিয়াসি

মৃত্যু

মহান মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ ১১৯৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মরক্কোর মারাকাশে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তার দর্শন খ্রিস্টান ও ইহুদী বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

www.pathagar.com

ঘড়ির পেন্ডুলাম আবিষ্কারক ইবনে ইউনূস

ঘড়ির পেন্ডুলাম আবিষ্কারক হলেন মিসরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে ইউনূস। ইবনে ইউনূসের কর্মগুলোকে তার সময়ের তুলনায় বেশি অগ্রসর হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। তিনি ছিলেন কায়রোর দারুল হিকমাহর নেতৃস্থানীয় গণিতজ্ঞ। দারুল হিকমাহর লাইব্রেরিতে ছিল ১৮টি হল। ১০০৫ থেকে ১১৭১ সাল পর্যন্ত দারুল হিকমাহর অস্তিত্ব ছিল। ইবনে ইউনূসের পূর্ণ নাম আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনূস আবুল আলা আল-সাদাফি আল-মিসরি। ব্যক্তিগত জীবনে ইবনে ইউনূস ছিলেন উদাসীন ও অন্যমনস্ক। জীর্ণ শীর্ণ পোশাক পরতেন। তার চেহারা ছিল হাস্যকর। তিনি ৯৫০ থেকে ৯৫২ সালের মধ্যে বর্তমান কায়রোতে বৈজ্ঞানিক পটভূমিসম্পন্ন এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুল রহমান ইবনে ইউনূস ছিলেন মিসরের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বাগ্মী। তার দাদা ইউনূস আবদুল আলী ছিলেন শায়েফী মাযহাবের ইমাম শায়েফীর বন্ধু এবং হাদিসের একজন পণ্ডিত। আবদুল রহমান দু'খণ্ডে মিসরের একটি ইতিহাস রচনা করেন। একটি খণ্ডে তিনি মিসরীয়দের নিয়ে আলোচনা করেন এবং আরেকটি খণ্ডে ভ্রমণকারীদের জন্য ভাষ্য লিখেন।

ইবনে ইউনূসের প্রাথমিক জীবনে ফাতেমীয় রাজবংশ মিসরের ক্ষমতায় আসে। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদের (স:) প্রিয় কন্যা ফাতেমার নামানুসারে এ বংশ তাদের নাম গ্রহণ করে। ফাতেমীয় রাজবংশ একটি ইসলামী ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকায় ফাতেমীয়রা আব্বাসীয় খলিফাদের স্বীকৃতি দানে অস্বীকৃতি জানায়। ফাতেমীয় খলিফারা দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি শাসন করেন। মিসর জয়ে বেশ কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ৯৬৯ সালে ফাতেমীয়রা দেশটির বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে নীল উপত্যকা দখল করে নেয়। বিজিত সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে তারা কায়রো নামে একটি নয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন। কায়রোর পূর্ব নাম ছিল ফুসতাত।

মিসরে ক্ষমতার পালাবদলে ইবনে ইউনূসের ভাগ্য আবর্তিত হয়। ৯৭৫ সালে পিতা আল-মুয়িজের মৃত্যুর পর আল-আজিজ খলিফা হন। আজিজ খলিফা হওয়ার দু'বছর পর ইবনে ইউনূস জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা শুরু করেন। তিনি কী সব যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এতটুকু জানা গেছে যে,

www.pathagar.com

খলিফা আল-আজিজ তাকে কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। ইবনে ইউনূস শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন, তিনি জ্যোতিষীও ছিলেন। তিনি ত্রিকোণমিত্রিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা তৈরির জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান হওয়ায় ইবনে ইউনূস জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা ও বছরে দু'টি ঈদের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে চন্দ্র ও সূর্য সম্পর্কে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে হয়। মুসলমানরা চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসরণ করলেও চাঁদ দেখা ছাড়া তারা নয়া চান্দ্র মাস নির্ধারণ করতে পারে না। নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব এবং কখন চাঁদ দেখা যাবে ইত্যাদি তথ্য জানা একান্ত প্রয়োজন। উত্তরাঞ্চলীয় সিরিয়ায় ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণে সামরিক অভিযানে ব্যস্ত হয়ে না পড়লে আল-আজিজ ইবনে ইউনূসকে আরো বেশি সহায়তা দিতে পারতেন। কিন্তু তার পক্ষে অধিক সহায়তা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় ইবনে ইউনূসের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ২০ বছর রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় আল-আজিজ ফাতেমীয় সাম্রাজ্য বিস্তারে কাজ করেছেন। বাইজান্টাইনীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করার সময় ৯৯৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। এসময় তার ১১ বছর বয়স্ক ছোট ভাই আল-হাকিম আমিরিল্লাহ খলিফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আল-হাকিমও ইবনে ইউনূসকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেন। খলিফা আল-হাকিম ছেলেমানুষের মতো কাজ করলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ ছিল গভীর। তিনি একবার শহরের সব কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শাক সব্জি ও ঝিনুক বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে তিনি তার বাসভবনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে ভুল করেননি। কায়রোর মুকাতান পাহাড়ে তার বাড়ি থেকে ইবনে ইউনূস শুক্র গ্রহ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ চালাতে তার প্রপিতামহ ও কারাফায় ইবনে নাসেরের মসজিদ ব্যবহার করতেন। ৯৮১ সালের ২২ এপ্রিল এ মসজিদ থেকে তিনি চন্দ্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন।

জ্যোতিষ

ইবনে ইউনূস বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর 'কিতাব বুলাগ আল-ইউমনিয়া' (On the Attainment of Desire) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে ভোরের আলো ফোটার পূর্বাহ্নে লুব্ধকের উদয় এবং কপটিক বর্ষে সপ্তাহ শুরুর দিন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

পেন্ডুলাম আবিষ্কার

স্বর্ণযুগের শুরুতেই মুসলমানরা ঘড়ি ব্যবহার করছিল। তবে তখন ঘড়িতে পেন্ডুলাম ছিল না। ঘড়ি আবিষ্কারের কৃতিত্ব মুসলমানদের। অন্যদিকে পেন্ডুলাম আবিষ্কার

www.pathagar.com

করেছেন ইবনে ইউনূস। পেন্ডুলাম আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করা হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনায় উপর্যুপরি উল্লেখ করা হচ্ছে যে, দশম শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে ইউনূস ঘড়ির পেন্ডুলাম আবিষ্কার করেন এবং সময় নির্ধারণে তা ব্যবহার করেছেন। তবে পাশাপাশি ঘড়ির অত্যাবশকীয় এ যন্ত্র আবিষ্কারে তার অবদান অস্বীকার করার একটি প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

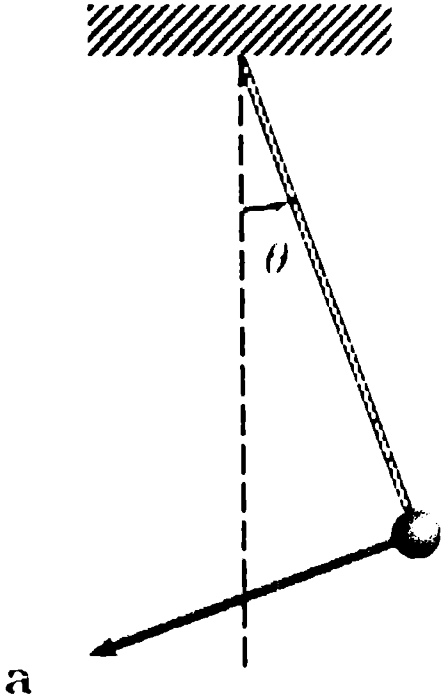

ইবনে ইউনূস আবিষ্কৃত ঘড়ির পেন্ডুলাম

বলা হচ্ছে যে, ১৬৮৪ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড বারনার্ডের একটি ভুল থেকে পেন্ডুলাম আবিষ্কারে ইবনে ইউনূসের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু সত্য গোপনকারীদের মুখে ছাই দিয়ে ঐতিহাসিক রজার জি. নিউটন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইবনে ইউনূসই হলেন ঘড়ির পেন্ডুলামের আবিষ্কারক। তবে তিনি ইউনূসের নামে একটু হেরফের করে তার 'গ্যালিলিওস পেন্ডুলাম: ফ্রম দ্য রিদম অব টাইম টু দ্য মেকিং অব ম্যাটার' শিরোনামে বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*The Arab astronomer Ibn Yunis the younger was reported to have employed it as early as the tenth century.*' অর্থাৎ '*আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে ইউনিস দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে।*'

www.pathagar.com

ইবনে ইউনূস দীর্ঘ ২৬ বছর ফাতেমীয় রাজবংশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন। প্রথমে কাজ করেন খলিফা আল-আজিজের অধীনে এবং পরে আল-হাকিমের অধীনে। 'আল-জিজ আল-কবির আল-হাকিমী' হলো ইবনে ইউনূসের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ। বইটি তিনি খলিফা আল-হাকিমের নামে উৎসর্গ করেন। ১০৭৯ সালে পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম বইটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এন. এম. সোয়ার্ডলোর মতে, *'জিজ আল-কবির আল-হাকিমী' হলো এমন একটি অসাধারণ মৌলিক গ্রন্থ যার মাত্র অর্ধেকের বেশি টিকে রয়েছে।'* আল-কবির মানে হলো 'বিশাল'। সত্যি ইবনে ইউনূসের বইটি বিশাল। এতে রয়েছে ৮১ টি অধ্যায়। গ্রন্থটিতে ইবনে ইউনূস তার নিজের এবং তার পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণের তালিকা সন্নিবেশিত করেন। হাকিমী জিজের প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম, কপটিক, সিরীয় ও পার্সী পঞ্জিকার তালিকা দেয়া হয়। পঞ্জিকাগুলোর তারিখ পরিবর্তন এবং ইস্টারের তারিখ গণনার তালিকাও দেয়া হয়। এ গ্রন্থে গোলাকার ত্রিকোণমিতি উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে। ইবনে ইউনূস নির্ভুলভাবে ৪০টি গ্রহ সংযোগ এবং ৩০টি চন্দ্র গ্রহণের বর্ণনা দিয়েছেন। 'কিতাব গায়াত আল-ইনতিফা' হলো ইবনে ইউনূসের জ্যোর্তিমণ্ডল বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ। তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে ছিল ১ দশমিক ৪ মিটার ব্যাসার্ধের একটি বিশাল এস্ট্রোল্যাব। তার বইয়ের ফরাসি সংস্করণ লাপ্লাসকে ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা এবং বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের অসমতা নির্ধারণে অনুপ্রাণিত করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কানাডীয় আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম গ্রহের সংযোগ এবং চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে ইউনূসের পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হিসাবে দেখতে পান এবং চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ধারণে এসব পর্যবেক্ষণ তার 'লিউনার থিওরি'তে ব্যবহার করেন। 'হাকিমী জিজ'-এ ১০০০ সালে সংঘটিত দু'টি গ্রহের সংযোগের নির্ভুল বর্ণনা দিয়ে ইবনে ইউনূস লিখেছেন, `A *conjunction of Venus and Mercury in Gemini, observed in the western sky: The two planets were in conjunction after sunset on the night of Sunday* 19 *May* 1000. *The time was approximately eight equinoctial hours after midday on Sunday ... . Mercury was north of Venus and their latitude difference was a third of a degree.'*

অর্থাৎ *'পশ্চিমাকাশে মিথুনে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের সংযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১০০০ সালের ১৯ মে রোববার সূর্যাস্তের পর রাতে এ দু'টি গ্রহের সংযোগ ঘটে। সময়টি ছিল আনুমানিক রোববার মধ্যরাতের পর বিষুবীয় ৮টা। মঙ্গল গ্রহের অবস্থান ছিল শুক্র গ্রহের উত্তরে এবং তাদের অক্ষাংশের দূরত্ব ছিল এক ডিগ্রির এক-তৃতীয়াংশ।' আধুনিক পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের* সংযোগকালে অক্ষাংশের দূরত্ব এক ডিগ্রির এক-তৃতীয়াংশ এবং ইবনে ইউনূসের গণনা

www.pathagar.com

নির্ভুল। ইবনে ইউনূস ১ দশমিক ৪ মিটার ব্যাসের একটি বিশাল এস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে ১০ হাজার বারের বেশি সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন।

ত্রিকোণমিতি

'কিতাব আল-জাইব' বা 'সাইন টেবলেট' হলো ত্রিকোণমিতির ওপর লেখা ইবনে ইউনূসের একটি বই। বইটিতে ত্রিকোণমিতির কার্যক্রমগুলো কোণের পরিবর্তে বৃত্তচাপে প্রকাশ করা হয়। তার লেখালেখিতে বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতি উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে। ইবনে ইউনূস বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির বেশকিছু জটিল সমস্যা সমাধান করেন। তিনি একটি ফর্মুলা নিচে উল্লেখ করা হলো।

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

লগারিদম উদ্ভাবনের আগে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ যে চারটি ফর্মুলা ব্যবহার করতো সেগুলোর মধ্যে ইবনে ইউনূসের এ ফর্মুলাটি ছিল অন্যতম। বার্লিনের আহলওয়ারডাট লাইব্রেরিতে 'কিতাব আল-জাইব' শিরোনামে ইউনূসের বইটি সংরক্ষিত।

রচনাবলী

'হাকিমী জিজ' ছাড়াও ইবনে ইউনূস 'প্রপরশন' বা অনুপাত (Proportion) এবং 'সিমিলার আর্ক' বা সমরূপী বৃত্তচাপের (Similar arcs) ওপর দু'টি বই লিখেছেন। ল্যাটিন অনুবাদে তার প্রপরশন বিষয়ক বইটির নামকরণ করা হয় 'ডি প্রপরশনি ইট প্রপরশনালিয়েট' (De Proportione et Proportionaliate) এবং সিমিলার আর্ক বিষয়ক বইটির নামকরণ করা হয় 'ডি সিমিলিবাস আরকিউবাস' (De Similibus arcubus)। ইবনে ইউনূসের প্রপরশন বিষয়ক বইটি ইউরোপীয় রেনেসাঁয় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লিওনার্ডো এবং জর্ডনাস নিমরেরিয়াস বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ইবনে ইউনূস গ্রীক বিজ্ঞানী মেনিলাসের ত্রিভুজ খণ্ডন সম্পর্কীয় উপপাদ্য, আলকুয়াট্টা (Alquatta), সেক্টর (Sector) প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করেন এবং টলেমির 'সেন্টিলকিয়াম'-এর (Centiloquium) ওপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। লাইডেন ও অক্সফোর্ডে ইবনে ইউনূসের 'হাকিমী জিজ' সংরক্ষিত। ১৮০৪ সালে ডি পারসিভাল ফরাসি অনুবাদসহ বইটি প্রকাশ করেন। কার্ল স্কয়-ও বইটি অনুবাদ করেন এবং বইটির সূর্যঘড়ি ও বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত কয়েকটি অধ্যায় বিশ্লেষণ করেন।

সম্মান

১৯৭৬ সালে ইবনে ইউনূসের নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ১৪ দশমিক ১ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৯১ দশমিক ১ ই অক্ষাংশে এই গহ্বরের দৈর্ঘ্য ৫৮ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নিজের মৃত্যু

ইবনে ইউনূস তার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, সুস্থ অবস্থায় ৭ দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ব্যবসায়িক কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলেন এবং বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন। কলমের কালি মুছে ফেলেন। যেদিন তার মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেদিন পর্যন্ত তিনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়। ১০০৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়কারী আল-ফরগানি

পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়কারী আল-ফরগানির পূর্ণ নাম আবুল আব্বাস আহমদ মোহাম্মদ ইবনে কাছির আল-ফরগানি। জাতিতে তিনি ছিলেন পার্সী। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আলফ্রাগানাস' (Alfraganus) হিসাবে পরিচিত। বর্তমান উজবেকিস্তানের ফরগনা উপত্যকায় তার জন্ম। এজন্য তিনি সংক্ষেপে ফরগানি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। আল-ফরগানি ছিলেন নবম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও ভূগোলবিদ। তবে প্রাচ্যে তিনি 'খাসিব' নামে পরিচিত। খাসিব শব্দের আভিধানিক অর্থ 'গণিতজ্ঞ'। বৈজ্ঞানিক কর্ম ফরগানিকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে এবং মানব জাতির অন্তরে স্থায়ী আসন গেড়ে বসার সুযোগ দিয়েছে। আরবীয় সূত্রগুলোতে কখনো কখনো তার নাম মোহাম্মদ ইবনে কাছির ও আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সম্ভবত এ ভিন্নতার জন্য ঐতিহাসিক ইবনে আল-কিফ্‌তু ধারণা করছেন যে, দু'জন ফরগানির অস্তিত্ব ছিল। তাদের একজন হলেন পিতা এবং আরেকজন পুত্র। তবে পরবর্তীতে এ ধারণা বাতিল হয়ে যায়। প্রমাণিত হয় যে, আল-ফরগানি দু'জন নন, একজন।

নাইলোমিটার নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান

আল-ফরগানি একজন প্রকৌশলী হিসাবে বর্তমানে মিসরের রাজধানী কায়রোতে 'নিউ নাইলোমিটার' (আল-মিকাস আল-কবির) নামে একটি বাঁধের নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেন। নাইলোমিটার ছিল নীল নদের ওপর একটি বাঁধ। প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর নাগাদ বন্যায় নীল নদ উপত্যকার সমতল ভূমি প্লাবিত হতো। বন্যায় বিপুল পরিমাণ ফসলহানি ঘটতো। উঠতি ফসল রক্ষায় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল নীল নদে একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী মুসা ইবনে শাকিরের দু'পুত্র জাফর মোহাম্মদ ও আহমদকে নাইলোমিটার নির্মাণে প্রকৌশলী নিয়োগের দায়িত্ব দেন। নাইলোমিটার নির্মাণের পাশাপাশি আল-জাফারি নামে একটি খাল কাটারও নির্দেশ জারি করা হয়। জাফর মোহাম্মদ ও আহমদ প্রকৌশলী হিসাবে আহমদ ইবনে কাছির আল-ফরগানিকে নিয়োগ দেন। তবে প্রকৌশলী হিসাবে যোগ্য ছিলেন সনদ ইবনে আলী। ঈর্ষাকাতরতা থেকে বানু মুসা প্রকৌশলী আলীকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। কেননা তখন বাগদাদের কোনো গুরুত্ব ছিল না। ৮৩৬ সালে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদ থেকে রাজধানী ইরাকের সামারায় স্থানান্তর করেছিলেন।

www.pathagar.com

আল-ফরগানির ভাস্কর্য

www.pathagar.com

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের রাজদরবার ছিল এই সামারায়। তবে ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান তার 'ওয়াফাত আলা ইয়ান'-এ দাবি করেছেন, নাইলোমিটার নির্মাণে প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল-কারাসানিকে। আসলে ইবনে খাল্লিকান 'ফরগানি' শব্দটিকে 'কারাসানি' হিসাবে উল্লেখ করায় এ বিভ্রান্তির জন্ম নেয়। খাল কাটার কথা ছিল নয়া শহর আল-জাফারিয়ার মধ্য দিয়ে। খলিফা মুতাওয়াক্কিল টাইগ্রিস নদীর তীরে এ শহর নির্মাণ করেন এবং নিজের নামে নামকরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফরগানি একটি বিরাট ভুল করে বসেন। ভুল ডিজাইনের ওপর তিনি খাল খনন করেন। শুরুতে খালের গভীরতা বেশি হওয়ায় টাইগ্রিস নদী ফুলে ফেপে উঠা নাগাদ পানি প্রবাহিত হতে পারতো না। এ সংবাদে খলিফা অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তবে প্রকৌশলী সনদ ইবনে আলীর মহানুভবতায় ফরগানির নিয়োগদাতা বানু মুসা ভ্রাতৃদ্বয় কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পান। প্রকৌশলী আলী আল-ফরগানির ভুল সমর্থন করার মধ্য দিয়ে এক বিরাট উপকার করেন। তবে অন্যের উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলেন। ৮৬১ সালে বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভুল ধরা পড়ার সামান্য আগে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হন। ফরগানির ভুলের পক্ষে যুক্তি দেয়া হয় যে, তিনি কোনো বাস্ত ববাদী প্রকৌশলী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন তাত্ত্বিক। তিনি কখনো কোনো নির্মাণ কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারেননি। ঐতিহাসিক আল-ইয়াকুবী তার 'কিতাব আল-বুলদান'-এর ২৬৭ পৃষ্ঠায় ফরগানির ভুলের আরো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। তার প্রথম যুক্তি ছিল: খান খননের জন্য বাছাইকৃত জায়গাটি ছিল কন্টকময়। আল-মাহুজা নামে পরিচিত আল-জাফারিয়ায় শক্ত পাথর থাকায় খনন করা ছিল কঠিন। আল-ইয়াকুবী ফরগানির নাম উল্লেখ না করে বলেন, খাল খননের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-মুনাজ্জিম এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্যামিতিবিদদের ওপর।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ফরগানি ছিলেন বাগদাদের বায়তুল হিকমাহর অন্যতম সদস্য। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় মাধ্যাহ্নিক বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাধ্যমে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন। ৮৩৩ সালে লিখিত তার 'এলিমেন্টস অব এস্ট্রোনমি অন দ্য সিলেসশিয়াল মোশন্স' (Elements of astronomy on the celestial motions) হলো টলেমির আলমাগেস্টের একটি যথার্থ বর্ণনামূলক ভাষ্য।

ফরগানির রচনাবলী

ঐতিহাসিক ইবনে নাদিম ৯৮৭ সালে তার ফিরিস্তি'তে আল-ফরগানির দু'টি বইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। নাদিমের বর্ণানুযায়ী একটি বই হলো 'কিতাব আল-ফুসুল ইখতিয়ার আল-মাজিসু' (The Book of [the thirty] Chapters)। এ বইটি টলেমির

www.pathagar.com

আলমাগেস্টের একটি ভাষ্য। ইবনে নাদিমের বর্ণানুযায়ী দ্বিতীয় বইটির নাম 'কিতাব আমল আল-রুখামাত' (Book on the Construction of Sundials)। ঐতিহাসিক ইবনে আল-কিফতিও একই তালিকা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি লেখকের নাম মোহাম্মদ ইবনে কাছির হিসাবে উল্লেখ করেন। আল-কিফতি ঐতিহাসিক নাদিমের বর্ণিত প্রথম বইটির শিরোনাম দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। একটির শিরোনাম 'কিতাব আল-ফুসুল' হিসাবে উল্লেখ করেন এবং আরেকটির শিরোনাম উল্লেখ করেন 'কিতাব ইখতিয়ার আল-মাজিসৃ' হিসাবে। তিনি 'আল-মাদখালিলা ইলম হাই আল-আফলাক ওয়া হারাকাত আল-নুজুম' (Introduction to the Science of the Structure of the Spheres and of the Movements of the Stars) শিরোনামে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছিরের অন্য একটি গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেন। 'জাওয়ামি' নামে পরিচিত টলেমির একটি বইয়ের ভাষ্য সম্বলিত বইটিতে ত্রিশটি অধ্যায় ছিল বলে তিনি বর্ণনা দেন। ১২৪৪ সালে ইবনে সাঈদ এবং ১২৮৬ সালে বার হাব্রিয়াসও ফরগানির এ বিভ্রান্তিকর নাম ব্যবহার করেন। উল্লেখিত মোহাম্মদ ইবনে কাছির এবং আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির মূলত একই ব্যক্তি। তিনি হলেন আল-ফরগানি। ইবনে কিফতি যে বইটিকে দু'টি বই মনে করে ভুল করেছিলেন সে বইটি 'জাওয়ামি ইলম আল-নুজুম ওয়াল হারকাত আল-সামাবিয়া', 'উসুল ইলম আল-নুজুম', 'কিতাব আল-ছালাছিন', 'ইলাল আল-আফলাক' ইত্যাদি শিরোনামে পরিচিত ছিল।

'জাওয়ামি' (Elements of astronomy on the celestial motions) ছিল আল-ফরগানির সবচেয়ে সুপরিচিত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। ৮৩৩ সালে খলিফা আল-মামুনের মৃত্যুর পর তিনি বইটি রচনা করেন। তবে কখন তা স্পষ্ট নয়। ৯৬৭ সালে আবুল সকর আল-কাবিসি বইটির ওপর একটি ভাষ্য লিখেন। ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপিতে 'আয়া সোফিয়া' শিরোনামে বইটি সংরক্ষিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে দু'বার 'জাওয়ামি'র ল্যাটিন অনুবাদ করা হয়। প্রথম দফা অনুবাদ করেছিলেন ১১৩৫ সালে সেভিলের জন এবং ১১৭৫ সালে দ্বিতীয় দফা অনুবাদ করেন ক্রিমোনার গেরার্ড। ১৪৯৩, ১৫৩৭ ও ১৫৪৬ সালে প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৯১০ সাল নাগাদ ক্রিমোনার গেরার্ডের অনুবাদ মুদ্রিত হয়নি। জ্যাকব আনাতোলি হিব্রু ভাষায় বইটি অনুবাদ করেন। হিব্রু অনুবাদ 'জাওয়ামি'র তৃতীয় ল্যাটিন অনুবাদের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। ১৫৯০ সালে তৃতীয় ল্যাটিন অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৬৬৯ সালে জ্যাকব গোলিয়াস বইটির মূল আরবীসহ একটি নয়া ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। নিকট প্রাচ্যে তিনি ফরগানির বইয়ের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন। ইউরোপের লাইব্রেরিগুলোতে অসংখ্য ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব মধ্যযুগের ইউরোপে 'জাওয়ামি'র প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে। মধ্যযুগের বহু লেখক বইটির উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আল-ফরগানির 'জাওয়ামি' বা এলিমেন্টস টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছে। সাক্রোবসকোর 'স্ফিয়ার' (ঝঢ়যবৎব) প্রকাশিত হওয়া নাগাদ 'জাওয়ামি'র প্রভাব

www.pathagar.com

বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারপরও বইটি অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং সাক্রোবসকোর 'স্ফিয়ার' বইটির কাছে বহুলাংশে ঋণী। 'জাওয়ামি'র ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করে দান্তে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি 'ডিভাইন কমেডি', 'ভিটা নিউবা' এবং 'কনভিভিও' নামে তিনটি কালজয়ী গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হন। আল-ফরগানির লেখালেখির ওপর নির্ভর করে দান্তে পৃথিবী থেকে শুক্র গ্রহ, মেরুদেশ, বিষুবরেখা ও স্থির তারকার দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। 'জাওয়ামি'র ত্রিশটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু নিচে দেয়া হলো:

প্রথম অধ্যায়ে আরবীয়, সিরীয়, রোমান, পার্সী ও মিসরীয়দের বছরের বর্ণনা দেয়া হয়। পরে তাদের মাস ও দিন এবং তাদের পঞ্জিকার পার্থক্য দেখানো হয়। ২-৫ অধ্যায়ে টলেমির আলমাগেস্টের ১,২-৮ নম্বর অধ্যায়ের মূল ধারণা, আকাশ ও পৃথিবীর গোলকত্ব, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং আকাশমণ্ডলীর দু'টি প্রাথমিক পরিক্রমণ ব্যাখ্যা করা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে আল-ফরগানি ক্রান্তিবৃত্তের আনতির (Inclination of the ecliptic) মান ২৩° ৫২′ নির্ধারণ করেন এবং আল-মামুনের সময় নির্ধারিত মান ২৩°৩৫′ হিসাবে বর্ণনা করেন। ৬-৯ অধ্যায়ে মনুষ্য অধ্যুষিত আবাসস্থল, ৭টি অঞ্চলের তালিকা এবং পরিচিত ভূখণ্ড ও শহরগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়। অষ্টম অধ্যায়ে আল-ফরগানি খলিফা মামুনের আমলে নির্ণীত পৃথিবীর পরিধি ২০ হাজার ৪ শ' মাইল এবং ব্যাসার্ধ আনুমানিক সাড়ে ৬ হাজার মাইলের একটি পরিমাপ উল্লেখ করেন। ১০-১১ অধ্যায়ে ভোরের আকাশে ধ্রুব তারার আবির্ভাব, অস্পষ্ট গোলক এবং সমান ও অসমান ঘন্টা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রতিটি গ্রহের গোলক, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দ্রাঘিমাংশে চন্দ্র ও সূর্য এবং স্থির নক্ষত্রগুলোর গতি, চতুর্দশ অধ্যায়ে দ্রাঘিমাংশে পাঁচটি গ্রহের গতি, পঞ্চদশ অধ্যায়ে পরিভ্রমণশীল গ্রহগুলোর অবস্থান পরিবর্তন, ষোড়শ অধ্যায়ে বহুকেন্দ্রিকতা এবং এপিসাইকেলের আয়তন এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে গ্রহগুলোর বৃত্তে তাদের আবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ষোড়শ অধ্যায়ে অক্ষাংশে চন্দ্র ও গ্রহগুলোর গতি, উনিশতম অধ্যায়ে আয়তন অনুসারে স্থির নক্ষত্রগুলোর ক্রম এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলোর অবস্থান (আল-ফরগানি এমন ১৫টি নক্ষত্র খুঁজে বের করেন) নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশতম অধ্যায়ে চাঁদের অবস্থান, একুশতম অধ্যায়ে পৃথিবী থেকে গ্রহগুলোর দূরত্ব (টলেমি কেবলমাত্র সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব বর্ণনা করেছিলেন), বাইশতম অধ্যায়ে পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় গ্রহগুলোর আয়তন (টলেমি শুধুমাত্র সূর্য ও চাঁদের আয়তন বের করেছিলেন, অন্য গ্রহগুলোর নয়), তেইশতম অধ্যায়ে উদয় ও অস্ত, চব্বিশতম অধ্যায়ে আবির্ভাব, তিরোধান ও অস্পষ্টতা, পঁচিশতম অধ্যায়ে চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি, ছাব্বিশতম অধ্যায়ে পাঁচটি গ্রহের উদয়, সাতাশতম অধ্যায়ে লম্বন, ২৮-৩০ অধ্যায়ে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ এবং তাদের বিরতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এভাবে আল-ফরগানির 'জাওয়ামি'তে টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি ব্যাপক ধারণা দেয়া হয়। তার বর্ণনা পুরোপুরি অগাণিতিক। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য ৮৫৬ সালে

www.pathagar.com

লিখিত বইটি ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'জাওয়ামি'র প্রাথমিক সংস্করণগুলোতে সংখ্যাগত মান সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মান ১/২৮, ১/২০, ১/১০ ও ১/২৮ দেয়া হয়। কেবলমাত্র ১৫৯০ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি সংস্করণে প্রথম সঠিক মান দেয়া হয়। ১৬৬৯ সালে জ্যাকব গোলিয়াসের আরবী-ল্যাটিন সংস্করণে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান উল্লেখ করা হয় ১/২৮। বইটির ল্যাটিন অনুবাদেও উল্লেখ করা হয় ১/২৮।

এস্ট্রোল্যাবের ওপর ফরগানির গ্রন্থগুলো 'ফিসান আল-আসতারলাব', 'আল-কামিল ফিল আসতারলাব', 'কিতাব আমল আল-আসতারলাব' প্রভৃতি শিরোনামে টিকে রয়েছে। ব্রিটিশ জাদুঘরে ৪৮ খণ্ডের একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এ পাণ্ডুলিপিতে এস্ট্রোল্যাবের গাণিতিক তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ যন্ত্র নির্মাণে সমসাময়িক ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে আল-ফরগানি ক্রান্তিবৃত্তের আনতির মান নির্ধারণ করেন ২৩°৩৫'। এটাই আধুনিককালে ক্রান্তিবৃত্তের আনতির মান।

আল-বেরুনি তার 'অন দ্য ক্যালকিউলেশন অব দ্য কর্ডস ইন সার্কেলস' (On the Calculation of Chords in Circles) নামে গ্রন্থে আল-ফরগানির 'ইলাল জিজ আল-খাওয়ারিজমি' শিরোনামে বইটির কথা উল্লেখ করেন। ফরগানি 'ইলাল জিজ আল-খাওয়ারিজমি'তে গণিতজ্ঞ আল-খাওয়ারিজমির সংখ্যা গণনা পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার বইটি হারিয়ে গেলেও একাদশ শতাব্দীতে আল-বেরুনি তা ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া দশম শতাব্দীতে আহমদ ইবনে আল-মুসান্না ইবনে আবদ আল-করিম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বইটি অধ্যয়ন করেন। খাওয়ারিজমির তালিকার ওপর ইবনে মুসান্নার হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষ্য টিকে রয়েছে। মুসান্না বইটিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি ও দুর্বলতা খুঁজে পান। তা সত্ত্বেও তার বইয়ের ভিত্তি ছিল ফরগানির গ্রন্থ। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সান্টালার হুগো ফরগানির বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ করেন। কিন্তু সুটারকে অনুসরণ করে সি. এইচ হাসকিন্স বইটিকে ভুলক্রমে আল-ফরগানির ওপর আল-বেরুনির একটি ভাষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইবনে মুসান্নার দু'টি হিব্রু সংস্করণের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়।

আমেরিকা আবিষ্কারে ফরগানির পরিমাপ ব্যবহার

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কারে দ্রাঘিমাংশে এক ডিগ্রির দূরত্ব পরিমাপে আল-ফরগানির হিসাব ব্যবহার করেছিলেন। ফরগানি দ্রাঘিমাংশে এক ডিগ্রির দূরত্ব পরিমাপ করেছিলেন ৫৬ মাইল। আরবী এক মাইল সমান চার হাজার হাত। আধুনিক হিসাব অনুযায়ী দ্রাঘিমাংশে এক ডিগ্রির দূরত্ব ৬৯ মাইল। কিন্তু ফরগানি হাতের জন্য একটি ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করেছিলেন। তার পরিমাপ ছিল দ্রাঘিমাংশ থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে। কিন্তু কলম্বাস ফরগানির পরিমাপকে তার সময় ও স্থানে ব্যবহৃত একটি সঠিক মানদণ্ড হিসাবে ধারণা করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ

www.pathagar.com

ভুল ধারণা খুঁজে বের করেছেন। তবে ঐ সময় কলম্বাসের এ ভুল ধারণা ছিল ইতিহাসের একটি বিখ্যাত ভুল। আল-আন্দালুসের সেভিল লাইব্রেরিতে একটি মানচিত্র সংরক্ষিত। এ মানচিত্রের প্রান্তসীমায় কলম্বাসের নিজের হাতে লেখা কয়েকটি নোট বিদ্যমান। এসব নোটের মধ্যে 'ইমাগো মুন্ডি' নামে একটিতে ফরগানির পরিমাপ উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্মান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল-ফরগানির অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৫ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয় তার নামে। ৫৪ দশমিক ৪ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ১৯ দশমিক শূন্য ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রথম নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনকারী আল-ইদ্রিসী

আল-ইদ্রিসী হলেন মরক্কো বংশোদ্ভূত পৃথিবীর প্রথম নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনকারী। তিনি হলেন দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভূগোলবিদ। আল-ইদ্রিসী ১০১৬ সালে সিসিলির কিউটাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস আল-শরীফ আল-ইদ্রিসী। সংক্ষেপে তিনি 'আল-ইদ্রিসী' এবং ল্যাটিন ভাষায় 'দ্রেসেস' (Dreses) নামে পরিচিত। আল-ইদ্রিসী হলেন ইদ্রিসীয় বংশের উত্তরপুরুষ। তার পূর্বপুরুষ ছিল হামুদীয়। ইদ্রিসীয় বংশ বিশ্বনবীর (সা.) জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা.) বংশধর। আল-ইদ্রিসী ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন ও তুর্কি ভূগোলবিদ হাজী আহমদ মহিউদ্দিন পিরি রইসের মতো ইসলামী ভূগোলবিদকে উৎসাহিত করেছেন। তার তৈরি করা মানচিত্র আমেরিকা আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌঁছার রুট আবিষ্কারক ভাস্কো দ্য গামা ব্যবহার করেছেন। আল-ইদ্রিসী ১১৬৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

কর্ডোভায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

হামুদীয় বংশ মালাগা, দক্ষিণ স্পেনের আলজিসিরাস, কিউটা এবং উত্তর আফ্রিকার তাঞ্জিয়ার শাসন করতো। এ বংশের আলী ইবনে হামুদ ১০১৬ সালে কর্ডোভা অধিকার করেন এবং নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। হামুদ এবং তার অধঃস্তন পুরুষদের নিয়ে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির মতে, অর্ধ আফ্রিকান বা বারবার (Berber) আলী ইবনে হামুদ কর্ডোভা অধিকার করার আগে কিউটা এবং তাঞ্জিয়ার গভর্নর ছিলেন। তিনি মালাগা-ও অধিকার করেন। সেখানে তার অষ্টম অধঃস্তন পুরুষরা ১০২৫-১০৫৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আলী ইবনে হামুদের পর এ বংশের আরো দু'জন মিথ্যা হামুদ ১০২৭ সাল পর্যন্ত কর্ডোভা শাসন করেন এবং তাদের পরই বংশটি সেখান থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এর লেখক স্যার সৈয়দ আমীর আলীর মতে, সোলায়মানের পতনের পর ইদ্রিসীয় বংশের আলী ইবনে হামুদ সিংহাসন লাভ করেন। কিছুদিন পর তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হলে তার ভাই কাসিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ডোভা থেকে বিতাড়িত হন। কর্ডোভাবাসীগণ কিছুকালের

www.pathagar.com

জন্য আলী ইবনে হামুদের পুত্র ইয়াহিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে। ১০৩৫ সালে তিনি নিহত হলে এখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪০ বছর পর সেভিলের রাজা সেভিল দখল করে নেন। হামুদীয় বংশ চিরকালের জন্য সেভিল থেকে বিতাড়িত হয়। ইতিমধ্যে ১০৮৩ সালে মরক্কোর আলমোরাভীয় বংশ উত্তর আফ্রিকাতে হামুদীয় বংশের সব রাজ্য অধিকার করে নিলে তারা কিউটাতে পালিয়ে যায়। পলায়নকারীদের মধ্যে আল-ইদ্রিসীর প্রপিতামহও ছিলেন। ইদ্রিসী কর্ডোভায় শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, হাঙ্গেরী, পর্তুগাল, ফ্রান্সের আটলান্টিক উপকূলের পিরেনিস, ইংল্যান্ডের ইয়র্ক এবং তুরস্কের আনাতোলিয়া সফর করেন। বিদেশ সফরকালে তার বয়স ছিল বড়জোর ১৬ বছর। স্পেনের আন্দালুসিয়ায় সংঘর্ষ ও অস্থিতিশীলতা চলতে থাকায় তিনি সিসিলিতে আবু আল-সালতের মতো সমসাময়িকদের সঙ্গে যোগদান করেন।

সিসিলিতে নরম্যানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে নরম্যানরা ফাতেমীয়দের প্রতি অনুগত আরবদের বিতাড়িত করে এবং সিসিলির ক্ষমতা দখল করে। মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও আরবীয় সংস্কৃতি আইবেরীয় উপদ্বীপ ও সিসিলিতে প্রাধান্য বজায় রাখে। একাদশ শতাব্দীতে নরম্যানরা অগ্রযাত্রা করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে যায় এবং ১০৬৬ থেকে ১০৭১ সালের মধ্যে তারা দক্ষিণ ইতালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। নয়া নরম্যান শাসকগণ আরবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট অংশটুকু সংরক্ষণ করেন এবং মুসলিম পণ্ডিতগণ সিসিলির রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় গিসকার্ড রজার জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎসাহ দানে সক্রিয় থাকলেও তিনি ছিলেন ভূগোলের প্রতি অনুরক্ত। অবসর সময়ে তিনি ভূগোল বিষয়ক আরবী গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন এবং ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় সিসিলির পালারমো রাজদরবার নাবিক, বণিক, তীর্থযাত্রী, ক্রুসেডার এবং সব জাতির পণ্ডিতদের একটি মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

খ্রিস্টান রাজদরবারে ইদ্রিসীর অবস্থান

খ্রিস্টান নরম্যানরা জ্ঞানের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় আরবকে স্বাগত জানায়। এসব আরবের মধ্যে আল-ইদ্রিসী ছিলেন অন্যতম। তিনি সিসিলির নরম্যান রাজদরবারে আতিথ্য লাভ করেন। রাজা দ্বিতীয় রজার তাকে রাজদরবারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সম্মত হন। এখানেই তিনি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলো সম্পন্ন করেন। রাজা রজারের দরবারে অবস্থানের জন্য ইদ্রিসী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। মুসলিম পণ্ডিত জগতে তিনি একজন দলত্যাগী হিসাবে বিবেচিত হন। খ্রিস্টান রাজার দরবারে বসবাস করায় এবং গ্রন্থাবলীতে তার গুণগান গাওয়ায় মুসলিম বিশ্ব তাকে কখনো সুনজরে দেখেনি। মুসলিম বিশ্বে তিনি যেমন আদৃত হননি তেমনি খ্রিস্টান

www.pathagar.com

জগতেও নয়। তবে মুসলিম ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির সমন্বয়কারী হিসাবে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন। খ্রিস্টান রাজার দরবারে বাস করে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করায় তিনি পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপের সম্মিলিত খ্রিস্টান শক্তির সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ ইউরোপীয় রেনেসাঁ তথা সাংস্কৃতিক জগতে নব অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়ক হয়। ক্রুসেডের ডামাডোলের ভেতর মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টান জগতের সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণ মানসিক দিক থেকে একে অন্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। ক্রুসেডের শেষপ্রান্তে ইউরোপের খ্রিস্টান জগৎ প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করে। আল-ইদ্রিসী এ দু'সভ্যতার সেতুবন্ধ হিসাবে আবির্ভূত হন।

দ্বিতীয় রজার মুসলমানদের মতো পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন। তার পোশাকে থাকতো আরবী আলঙ্কারিক লেখা। এজন্য খ্রিস্টানরা তাকে উপহাস করতো। মুসলিম সংস্কৃতির অনুরাগী এ রাজা মুসলিম শাসকদের মতো এবং তাদের অনুকরণে ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহে আকৃষ্ট হন। এজন্য তিনি ইদ্রিসীকে তার দরবারে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তবে অধ্যাপক লিউকির মতে, দ্বিতীয় রজার ইদ্রিসীকে ভূগোলবিদ হিসাবে কাজ করার জন্য দরবারে নিযুক্ত করেননি। বরং তাকে স্পেনের মুসলিম রাজ্যের সিংহাসনের মিথ্যা দাবিদার সাজিয়ে এবং পরে আশ্রিত হিসাবে রাখার জন্য দরবারে আমন্ত্রণ করে আনেন। সত্যি হামুদীয় বংশের লোক হিসাবে তিনি রজারের মুসলিম স্পেন অধিকারে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে এবং তাকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের আশপাশের রাজ্যে আধিপত্য স্থাপনে সাহায্য করতে পারতেন। ভূগোলবিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করার আগেই রাজা রজার তাকে নিয়োগ দেয়ায় এ ধরনের অনুমান মিথ্যা ছিল না। তাছাড়া পর্যটক হিসাবেও ইদ্রিসী বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। এসব বিবেচনা করলে মনে হয় রজারের দরবারে তাকে আমন্ত্রণ এবং দরবারে নিয়োগ দানের পেছনে তার ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। বরং রাজনীতির পুতুল হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই রজার তাকে আশ্রয় দেন। ভারতীয় অধ্যাপক মকবুল আহমদের মতে, রাজা রজার ভৌগোলিক জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ইদ্রিসীকে দিয়ে বিশ্বের মানচিত্র তৈরি করিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি মুসলিম স্পেন অধিকার করার জন্য সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চেয়েছিলেন। রাজা রজারের দরবারে অবস্থানকালে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইদ্রিসীর ভৌগোলিক জ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটে। তিনি মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। রজারের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ইদ্রিসী ছিলেন ভূগোল বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য।

তাবুলা রোজারিয়ানা

সিসিলির রাজা রজার দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে একটি গ্রন্থ সংকলনে ১০৪৫ সালে ইদ্রিসীকে তার দরবারে ডেকে পাঠান। রাজদরবারে ১৫ বছর

www.pathagar.com

অবস্থানের পর আল-ইদ্রিসী রাজা রজারের জন্য ১১৫৪ সালে 'তাবুলা রোজারিয়ানা' নামে পৃথিবীর প্রথম নির্ভুল মানচিত্র সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা রজার বইটির নাম দিয়েছিলেন 'কিতাব নুজহাত আল-মুশতাক ফিকতিরাক আল-আফাক' এবং ইদ্রিসী বইটির নামকরণ করেন 'কিতাবুল রজার' (The book of Roger) এবং মানচিত্রের নাম দেন 'তাবুলা রোজারিয়ানা' (Tabula Rogeriana)। সংক্ষেপে গ্রন্থটি 'কিতাবুল রজার' নামে পরিচিত। ইদ্রিসীর এ মানচিত্রের পরিমাপ ছিল ৩ দশমিক ৫×১ দশমিক ৫ মিটার (১২×৫)। পরবর্তীতে ১১৬০ সালে মানচিত্রটি উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে পড়লে তারা তা তছনছ করে।

আল-ইদ্রিসী প্রণীত তাবুলা রোজারিয়ানা

ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ

কিতাবুল রজারের ইংরেজি অনুবাদ করা হয় 'দ্য বুক অব প্লিজেন্ট জার্নিস ইনটু ফার অ্যাওয়ে ল্যান্ডস' (The book of pleasant journeys into far away lands) এবং 'দ্য প্লেজার অব হিম হো লংগস টু ক্রস দ্য হোরাইজন' (The pleasure of him who longs to cross the horizons) শিরোনামে এবং ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় 'অপাস জিওগ্রাফিকাম' (Opus Geographicum) শিরোনামে। গ্রন্থটি 'দি এমিউজমেন্টস অব হিম হো ডিজার্ভস ট্র্যাভার্স দ্য আর্থ' (The amusements of him who deserves to traverse the Earth) শিরোনামেও কোনো কোনো সময় প্রকাশিত হয়েছে। ১৫৯২ সালে রোমে 'দ্য জিওগ্রাফিয়া' (De geographia) শিরোনামে গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত আরবী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল প্রথম আরবী সংস্করণ। ম্যারোনাইট গাব্রিয়েল সিয়োনিটা এবং জোহানেস হেসরোনিটা মূল আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদ করেন। ১৯১৯ সালে ল্যাটিন অনুবাদ প্যারিস থেকে 'জিওগ্রাফিয়া নিউবিয়েনসিস' (Geographia nubiensis) নামে একটি বিভ্রান্তিকর

www.pathagar.com

শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। অনুবাদ করলেও অনুবাদকরা গ্রন্থকারের নাম জানতেন না। কিতাবুল রজারের দু'টি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় 'জামিয়িল আযহার মিনার রাওদিল মিতার' নামে। ১৮৯৩ সালে মি. ভল্লার কায়রোতে এ গ্রন্থটির সন্ধান পান। হাফিজ শিহাবুদ্দিন আহমদ আল-মাকরিযী গ্রন্থটি সংকলন করেন। ঐতিহাসিক আল-মাকরিযীর নামের সঙ্গে লেখকের নামের মিল থাকায় গ্রন্থটি আল-মাকরিযীর প্রণীত বলে ধারণা করা হয়। বহুদিন পর্যন্ত গ্রন্থটিকে ইবনে আবদুল মোনায়েম আল-হিময়ারি সংকলিত 'রাওদুল মিতার ফি খাবারিল আকতার' নামে ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয় গ্রন্থটি একজন আরবীভাষী আর্মেনীয় সংকলন করেন। বইটির নাম 'কিতাবুল জুগরাফিয়া আল-কুল্লিয়া আয় সুরাতুল আরদ'। মি. গ্রিফিন বিংশ শতাব্দীতে তিউনিসে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থটির সন্ধান পান।

রাজা রজারের মৃত্যুর পর ইদ্রিসী তার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় উইলিয়ামের জন্য 'রাওয়াদুল ফুরাজ ওয়া নুযহাতুল নাফস' বা 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মাসালিক' (The Gardens of Humanity and the Amusements of the Soul) শিরোনামে আরেকটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি কিতাবুল রজারের চেয়েও বড়। এতে মানচিত্র ছিল ৭৩টি। মূল বইটি হারিয়ে গেলেও ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ টিকে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের শিরোনাম দেয়া হয় 'গার্ডেন অব জয়স' (Garden of Joys)। ১১৯২ সালে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার প্রণীত এ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হাকিম ওগলু আল পাশার ইস্তাম্বুল লাইব্রেরিতে 'রাওয়াদুল ফুরাজ ওয়া নুযহাতুল নাফস'-এর একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান। তবে গ্রন্থটি ছিল ভিন্ন। নামটি হলো 'উনসুল মাহাজ ওয়া রাওয়াদুল ফুবাজ'। অধ্যাপক সি. এফ. সেবোল্ডের মতে, বইটি উইলিয়ামের জন্য লিখিত ইদ্রিসীর দ্বিতীয় গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। অধ্যাপক এইচ. রিটার ১৯২৮ সালে ইস্তাম্বুলের ফাতিহ লাইব্রেরিতে ইদ্রিসীর একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান। পাণ্ডুলিপিতে দু'টি নাম দেখা যায়। একটি হলো 'কিতাবুল জামি লিআশতাতিন নাবাত' বা 'কিতাবুল মুফরাদাত' বা 'কিতাবুল আদবিয়া আল-মুফরাদা'। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ এবং এতে কিছু কিছু ভুলও রয়েছে। গ্রন্থটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং মেটেরিয়া মেডিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বোটানি নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা ছাড়াও ৩৯০ রকমের ওষুধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইদ্রিসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী না হওয়ায় দ্বিতীয় বইটি তার কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে প্রথম বইটি নিঃসন্দেহে তার। ইদ্রিসী প্রতিটি ওষুধের জন্য বহু ভাষায় সমার্থক প্রতিশব্দ উল্লেখ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১২টি ভাষায় সমার্থক দিয়েছেন। ভারতীয় অধ্যাপক এম. মকবুল আহমদ ১৯৬০ সালে ইদ্রিসীর 'কিতাব নুজহাত আল-মুশতাক ফিকতিরাক আল-আফাক' গ্রন্থটি 'ভারত এবং পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড' (India and the neighbouring territories) নাম দিয়ে অনুবাদ প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

তাবুলা রোজারিয়ানার অভিনবত্ব

ইদ্রিসীর 'কিতাবুল রজার' হলো মধ্যযুগের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ভূগোল গ্রন্থ। মধ্যযুগে একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে এত অধিক তথ্য সংগ্রহের রেকর্ড আর কোথাও দেখা যায়নি। সিসিলিতে অবস্থানের জন্য ইদ্রিসী অন্যান্য ভূগোল বিজ্ঞানীর তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। সিসিলি ভূমধ্যসাগরের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তৎকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য জাহাজ এখানে এসে ভিড় করতো। তাই ইদ্রিসী পৃথিবীর প্রায় সব জায়গার খবরাখবর অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারতেন। তার গ্রন্থে বিভিন্ন খ্রিস্টান দেশের অনেক বিবরণী স্থান পেয়েছে। যা ছিল সে সময় অন্য মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। খ্রিস্টান রাজার দরবারে থাকার জন্য তার পক্ষে খ্রিস্টান জগতের সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ হয়। তিনি তার গ্রন্থে আবহাওয়ার যে মানচিত্র অঙ্কন করেছেন তা শুধু প্রথম শ্রেণীর নয়, যে কোনো বিচারে ছিল বিস্ময়কর। এ মানচিত্র তার গ্রন্থের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়। গ্রন্থটিতে তৎকালীন ধারণা অনুযায়ী দু'টি বৃহৎ সমুদ্র নির্দেশ করার পাশাপাশি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী স্থানগুলোও নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে। 'তাবুলা রোজারিয়ানা' ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে এসব স্থান এমন সঠিকভাবে দেখানো হয়নি। ১৯০৪ সালে এস. পি. স্কট তার 'হিস্টরি অব দ্য মুরস এম্পায়ার ইন ইউরোপ'-এ আল-ইদ্রিসীর ভূগোল বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, *'The compilation of Edrisi marks an era in the history of science. Not only is its historical information most interesting and valuable, but its descriptions of many parts of the earth are still authoritative. For three centuries geographers copied his maps without alteration. The relative position of the lakes which form the Nile, as delineated in his work, does not differ greatly from that established by Baker and Stanley more than seven hundred years afterwards, and their number is the same. The mechanical genius of the author was not inferior to his erudition. The celestial and terrestrial planisphere of silver which he constructed for his royal patron was nearly six feet in diameter, and weighed four hundred and fifty pounds; upon the one side the zodiac and the constellations, upon the other-divided for convenience into segments- the bodies of land and water, with the respective situations of the various countries, were engraved.'*

অর্থাৎ *'ইদ্রিসীর এ সংকলন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি যুগের সূচনা ঘটিয়েছে। এ সংকলনের ঐতিহাসিক তথ্য শুধু সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও মূল্যবান নয়, এতে বর্ণিত পৃথিবীর বহু অংশের বিবরণ এখন প্রামাণ্য। তিন শতাব্দী পর্যন্ত ভূগোলবিদগণ কোনো পরিবর্তন ছাড়া তার মানচিত্র নকল করেছেন। তার গ্রন্থে নীল নদের উৎসের মতো হ্রদগুলোর তুলনামূলক অবস্থানের সঙ্গে সাত শতাধিক বছর পর ব্যাকার (ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্যার স্যামুয়েল ব্যাকার) ও স্ট্যানলির (ওয়েলসের অভিযাত্রী স্যার হেনরি*

www.pathagar.com

মরট স্ট্যানলি) বর্ণনায় বড় ধরনের কোনো অমিল নেই এবং তাদের সংখ্যা অভিন্ন। গ্রন্থকারের কারিগরি দক্ষতা তার পাণ্ডিত্যের চেয়ে নিন্মতর নয়। তার পৃষ্ঠপোষকের জন্য তৈরি প্রায় ৬ ফুট দীর্ঘ ব্যাসার্ধের এবং সাড়ে চার শ' পাউন্ড ওজনের রূপার ওপর অঙ্কিত আকাশ ও পৃথিবীর মানচিত্রের একদিকে রয়েছে রাশি ও নক্ষত্রপুঞ্জ এবং অন্যদিকে রয়েছে সুবিধাজনক খণ্ড খণ্ড বিভক্ত অংশে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট আবহাওয়াসহ স্থলভাগ ও সমুদ্র ।'

মানচিত্রে পৃথিবীর বর্ণনা

আল-ইদ্রিসী তদানীন্তন পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনে আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর ও দূরপ্রাচ্য থেকে মুসলিম বণিকদের আহরিত জ্ঞান এবং নরম্যান পর্যটকদের সংগৃহীত তথ্যগুলো সমন্বয় করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। যেসব তথ্য তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো সেগুলো গ্রহণ করতেন এবং যেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতো সেগুলো বাদ দিতেন। আল-ইদ্রিসী গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন, *'রাজা রজার ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য চারদিকে লোক পাঠিয়ে দেন। আর খলিফা আল-মামুনের মতো পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করার জন্য আদেশ দেন।'* 'পেরিপ্লোই' (Periploi) নামে পরিচিত গ্রীক চার্টের সহায়তাও তিনি গ্রহণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে স্কাইলাক্স নামে একজন গ্রীক নাবিক ভূমধ্যসাগরে সমুদ্র যাত্রার রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। তার রেকর্ড 'পেরিপ্লাস' (Periplus) নামে পরিচিত। পেরিপ্লাস থেকে পেরিপ্লোই শব্দটির উৎপত্তি। রাজা রজারের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে আয়তাকার মানচিত্রসহ ল্যাটিন ও আরবী পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন হয়। দু'মিটার ব্যাসার্ধের একটি প্রশস্ত শক্ত রূপার ৭০টি পাতের ওপর মানচিত্রটি অঙ্কন করা হয়। তাবুলা রোজারিয়ানা ছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে রচিত সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গোলার্ধ, জলবায়ু, সাগর, উপসাগর ও হ্রদের বর্ণনা দেয়া হয়। আল-ইদ্রিসীর মতে, পৃথিবীর পরিধি ২২ হাজার ৯ শ' মাইল এবং পৃথিবী মহাশূন্যে স্থির হয়ে অবস্থান করছে। এ গ্রহ একটি ডিমের কুসুমের মতো গোলাকার। তিনি পূর্বেকার ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতো সারা পৃথিবীকে ৭টি আকলিম বা জলবায়ু মণ্ডলে ভাগ করেন। জলবায়ুভিত্তিক ৭টি অঞ্চলের প্রত্যেকটিকে তিনি আবার ১০ ভাগে বিভক্ত করেন। ইদ্রিসী মানচিত্রের সাহায্যে ৭০টি উপবিভাগের প্রত্যেকটি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক বিভাগের আলোচনায় পৃথক মানচিত্র দেয়া হয়। একসঙ্গে সবগুলো মানচিত্র টলেমির মডেলে আয়তাকার রূপ নেয়। আরবীতে বর্ণিত মানচিত্রটিতে পুরো এশিয়া এবং ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হয়। তবে তাতে আফ্রিকার শৃঙ্গ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান স্পষ্টভাবে দেখানো হয়নি।

www.pathagar.com

তার প্রথম আকলিমের প্রথম ভাগটি পশ্চিম সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। এ সাগরের নামকরণ করা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগর। অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগর হিসাবে চিহ্নিত জলাশয় ছিল আসলে আটলান্টিক মহাসাগর। অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগরের মধ্যে একটি কল্পিত দ্বীপ থেকে টলেমি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ গণনা শুরু করেছিলেন। এ কল্পিত দ্বীপকে তখনকার দিনের গ্রীনউইচ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদগণ টলেমির এ কল্পিত রেখাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেন এবং তার নাম দেন 'আল-খালিবাত' বা 'ফরচুন্যাট আইল্যান্ডস' (Fortunate Islands)। ধারণা করা হতো, এ দ্বীপের পর আর কোনো মনুষ্য বসতি নেই। আল-ইদ্রিসী এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের বর্ণনা করেছেন। তিনি উপকূলের অনতিদূরে আউলিল (কেপ টামিরিস) শহর অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায় এ দ্বীপে প্রচুর লবণ উৎপাদিত হয় এবং এ লবণ জাহাজ যোগে সুদানে পাঠানো হয়। প্রথম আকলিমের দ্বিতীয় দশমাংশে ঘানা নামে একটি নগরী আছে বলে তিনি বর্ণনা করেন। হারিয়ে যাওয়া শহর ঘানাকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঘনবসতিপূর্ণ নগরী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। নিগ্রো দেশগুলোর মধ্যে ঘানা ছিল সবচেয়ে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান থেকে ওয়াংগারার সীমান্ত মাত্র ৮ দিনের পথ। ইদ্রিসী জানান, ওয়াংগারায় প্রচুর সোনা পাওয়া যায়। তার দৈর্ঘ্য ৩০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০ মাইল। সব ঋতুতে এখানে নীল নদের পানি প্রবাহিত হয় এবং নীল নদ তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। নীল থেকে একদিনের পথ দূরে নাইজার নদী এবং এ নদীর তীরে সুদানের সিল্লা, টাক্রাউর, বারিসা, ঘানা প্রভৃতি নগরী। ইদ্রিসী দু'টি নীল নদের অস্তিত্ব দেখিয়েছেন। একটি প্রবাহিত হচ্ছে মিসরের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে এবং আরেকটি শাখা প্রবাহিত হচ্ছে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে। অন্যদিকে টলেমি মনে করতেন, নীল নদ একটি এবং তার উৎস মুখ বিষুব রেখার দক্ষিণে। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণের একটি অংশের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল টলেমির সময় থেকে অমীমাংসিত। আরবীয় বণিকগণ ইদ্রিসীকে জানান যে, এ মহাদেশের দক্ষিণে সাগর উন্মুক্ত। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে তিনি লিখেছেন, *'The Sea of Sin (China) is an arm of the ocean which is called the Dark Sea (the Atlantic).'* অর্থাৎ *'সীন সাগর (চীন) হলো এ মহাসাগরের একটি বাহু যে মহাসাগর অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগর (আটলান্টিক) হিসাবে পরিচিত।'* মানচিত্রে দু'টি নীল নদের অস্তিত্ব প্রদর্শন এবং চীন সাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বাহু হিসাবে বর্ণনা করায় একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইদ্রিসী টলেমির দিকনির্দেশনার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেননি। পশ্চিম নীল নদ ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ ছিল অনুদ্ঘাটিত। অথচ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিসী তার মানচিত্রে নীল নদের দু'টি ধারা প্রদর্শন করেছেন। তবে তিনি বাল্টিক সাগরের আশপাশের দেশগুলোর সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেননি। অবশ্য তার নোট থেকে মনে হয়, বাল্টিক অঞ্চলের বড় বড় শহর এবং বাদবাকি ইউরোপের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। এতে কোনো

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই যে, রাজা রজারের দরবারে অবস্থানকালে তার সঙ্গে স্ক্যান্ডেনেভীয় বণিক ও পর্যটকদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। বাল্টিক অঞ্চলের লোকজন এবং রুশদের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল। ইদ্রিসী দানু (দানিয়ুব), আরিন, (রাইন) এবং এলবি নদীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ডেনমার্ক ও স্লিসলুয়ার (শ্লেষউইগ) কথা উল্লেখ করেছেন এবং নরওয়েকে একটি দ্বীপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্টিক অঞ্চলে আমাজান দ্বীপ নামে একটি দ্বীপের কথাও উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবী সম্পর্কে ইদ্রিসীর ধারণা

ইদ্রিসী নবম শতাব্দীর পার্সী ভূগোলবিদ ইবনে খুরাদাদবিহ্‌র পৃথিবীর গোলাকারত্ব এবং খ গোলকের কেন্দ্রস্থলে নির্দিষ্ট স্থানে পৃথিবীর অবস্থান সংক্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেন। খুরাদাদবিহ্‌র গণনা অনুসারে পৃথিবীর আয়তন ৯ হাজার ফারসাখ। পক্ষান্তরে ইদ্রিসীর মতে, এ পরিমাপ ১১ হাজার ফারসাখ বা ১৩,২০০,০০০০ হাত। এছাড়া তিনি হারমেসের নাম করে একটি বিরাট অঙ্কের উল্লেখ করেছেন। তার মতে, মিসরীয় বিজ্ঞানী হারমেসের গণনাকৃত পরিমাপ হলো ৩৬ হাজার আরবীয় মাইল। তিনি খুরাদাদবিহ্‌কে অনুসরণ করে বলেছেন, পৃথিবীর উত্তর দিকের সামান্যতম অংশই মানুষের বাসোপযোগী। এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন, অত্যন্ত শীত বা অতি গরমের জন্য পৃথিবীর কিছুটা অংশ ছাড়া উত্তর বা দক্ষিণ মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী নয়। ইদ্রিসী টলেমিকে অনুসরণ করে প্রচার করেন যে, বিষুব রেখার দক্ষিণে অজ্ঞাত স্থলভূমি রয়েছে। এ স্থলভূমি আল-বহরুল মুহিত্ত (প্রশান্ত মহাসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূগোলবিদ আল-মাসুদি বিষুব রেখার দক্ষিণে কোনো স্থলভূমি আছে বলে বিশ্বাস করতেন না। এ মতটি টলেমির হলেও এতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল-বহর-আল-হাবাশির (ভারত মহাসাগর) নাবিকগণ দক্ষিণে সমুদ্রের কোনো সীমাই দেখতে পাননি। তার মানে, বিষুব রেখার দক্ষিণে কোনো স্থলভূমি নেই। ইবন হাওকাল অবশ্য মনে করতেন যে, বিষুব রেখার দক্ষিণে স্থলভূমি আছে। ইদ্রিসী গ্রীকদের মতো পৃথিবীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে নেন। তিনি ইবনে হাওকালের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও পৃথিবীর বিভাগ বিন্যাসে তাকে অনুসরণ করেননি। ইদ্রিসী পৃথিবীর গোলকত্বে বিশ্বাস করতেন না। তার মতে, পৃথিবীর একাংশ বেশ উঁচু এবং আরেকাংশ বেশ নিচু। পৃথিবীর উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় পানি নেমে আসে। এছাড়া পৃথিবীর অর্ধাংশ আল-বহরুল মুহিত বা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ডুবে রয়েছে। এ মহাসমুদ্র অর্ধেক পৃথিবী ঘিরে রয়েছে এবং সেই অর্ধেকটাই চোখে দেখা যায়।

আল-ইদ্রিসীর অঙ্কিত মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো: (১) চন্দ্র, পর্বত ও নীল নদের উৎস স্থল, (২) আল-নুবা (নুবিয়া), (৩) আল-হাবস (আবিসিনিয়া), (৪) নীল নদ, (৫) আল-যাঞ্জ, (৬) সুফালাহ, (৭) সিন্ধু, (৮) সরন্দীপ (সিংহল), (৯)

www.pathagar.com

কুমার (মালাগাছি), (১০) আল-হিন্দ (ভারত), (১১) আল-সিন (চীন), (১২) আল-তিবাত (তিব্বত), (১৩) খোরাসান, (১৪) খাওয়ারিজম, (১৫) আল-কুস, (১৬) তুর্ক, (১৭) মাজুজ, (১৮) ইয়াজুজ, (১৯) বুলগার, (২০) জানুরিয়া (সুইডেন), (২১) বাল্টিক সাগর, (২২) জারমানিয়া, (জার্মানি) (২৩) ডেনমার্ক, (২৪) ফেলুইয়া (নরওয়ে), (২৫) ছুলি (ব্রিটেন), (২৬) আফরানসিয়াহ (ফ্রান্স), (২৭) ইটালি, (২৮) কারজকাহ, (২৯) সার্দিনিয়া, (৩০) বিলাদ আল-লাম লাম, (৩১) বিলাদ আল-মুফরাদাহ।

আল-ইদ্রিসীর ভৌগোলিক ধ্যান ধারণা গ্রীক ও তার পূর্বসূরি মুসলিম ভূগোলবিদদের কার্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম ভূগোলবিদের কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। যেমনঃ আল-মাসুদির ভূগোল গ্রন্থ তিনি দেখেছিলেন কিনা তার বর্ণনা থেকে তা বুঝা যায় না। ইদ্রিসীর গ্রন্থে বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যায়। তাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। অতীতের গতানুগতিক ভৌগোলিক আলোচনার সঙ্গে বর্তমানের ভূগোল বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক আলোচনাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হলেও খ্রিস্টান ইউরোপ ইদ্রিসীর কর্মকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি। ক্রিমোনার গেরার্ড সব আরবী বিজ্ঞানীদের আরবী পান্ডুলিপি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করলেও ইদ্রিসীর বিখ্যাত গ্রন্থটি অনুবাদ করেননি। এ খেদ প্রকাশ করতে গিয়ে অধ্যাপক কিম্বল তার 'দ্য জিওগ্রাফি অব দ্য মিডল এজেস'-এ লিখেছেন, '*In view of its modernity and high intrinsic worth, it is difficult to understand why Idrisis work, composed as it was of the Cronological and Geographical point of contact between the Islamic and Christian civilization remained so long unutilized by Christian scholars in Sicily, Italy or other Christian countries until we remember that primary, we might almost say, the sole interest of the Latin West in Arabic literature centred in the preparation of calendars, star tables and horoscopes, and the recovery of ancient lore. It was not much concerned in the twelfth century with the descriptive geography of Africa or Asia.*'

অর্থাৎ '*যতদিন নাগাদ আমরা জানতে পেরেছি যে, আরবী সাহিত্যে ল্যাটিন ভাষী পাশ্চাত্যের একমাত্র আগ্রহ ছিল দিনপঞ্জি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ও রাশির তালিকা তৈরি এবং প্রাচীন জ্ঞান পুনরুদ্ধারে কেন্দ্রীভূত ততদিন কেন আধুনিক ও উঁচু মানের বস্তুগত মূল্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ও খ্রিস্টান সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের একটি সময়ানুক্রমিক ও ভৌগোলিক সেতুবন্ধ হিসাবে রচিত ইদ্রিসীর গ্রন্থটির প্রতি সিসিলি, ইতালি ও অন্য খ্রিস্টান দেশের পণ্ডিতগণ দীর্ঘদিন ব্যবহার করেননি তার কারণ অনুধাবন করা কঠিন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আফ্রিকা অথবা এশিয়ার বিস্তারিত ভূগোল নিয়ে মোটেও উৎসাহী ছিল না।*'

www.pathagar.com

সাগর সম্পর্কে ইদ্রিসীর ধারণা

ইদ্রিসী এ দৃশ্যমান পৃথিবীকে উত্তরাংশে ৭টি সমুদ্রের (উপসাগর হিসাবে অভিহিত) ভিত্তিতে ৭টি অংশে বিভক্ত করেছেন। এসব সমুদ্রের একটি হলো ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগর থেকে দু'টি উপসাগর বের হয়েছে। উপসাগর দু'টি হলো ফারস উপসাগর (পারস্য উপসাগর) এবং কুলজুম উপসাগর (লোহিত সাগর)। আলশাম সাগরের (ভূমধ্যসাগর) দু'টি উপসাগর আছে। তার একটি হলো বানাদিকিইন উপসাগর (আড্রিয়াটিক উপসাগর) এবং আরেকটি হলো নিটাস উপসাগর (কৃষ্ণ সাগর)। আর দু'টি সাগর হলো জুরজান সাগর এবং আল-দায়লাম (কাস্পিয়ান সাগর)। তবে এসব উপসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের কোনো সম্পর্ক নেই। আল-ইদ্রিসীর মতে, ভারত মহাসাগর বিষুব রেখার ১৩° অক্ষরেখা দক্ষিণে শুরু হয়ে চীন ও বাবেল মণ্ডবের (লোহিত সাগরের মুখের প্রণালী) মধ্যে বিস্তৃত। এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান হলো সাড়ে ৪ হাজার ফারসাখ। এ সাগর আল-বহরুল মুজলিমের সঙ্গে ১৬৪° ০ দ্রাঘিমা এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ১৮°৩০ অক্ষরেখায় মিলিত হয়েছে। টলেমির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি এ সাগরকে একটি বৃহৎ উপসাগর বলে মনে করতেন। তার মতে, চীনের কাছাকাছি ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি খুব সম্ভবত এ ব্যাপারে আল-মাসুদির সমুদ্র সীমা পর্যবেক্ষণের কথা জানতেন না। তিনি আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন বলে মনে হয়। আল-মাসুদি দাবি করেন যে, ভুল করে এ সাগরের দৈর্ঘ্য সাড়ে ৪ হাজার ফারসাখ বলে মনে করা হচ্ছে। টলেমি, আল-কিন্দি ও আল-সারাখসির মতে, এ সাগরের দৈর্ঘ্য ৮ হাজার মাইল।

ফারস উপসাগর, কুলজুম উপসাগর, আলশাম সাগর, আল-বানাদিকিইন উপসাগর এবং বান্তাস সাগরের পরিমাপ সম্পর্কে ইদ্রিসীর সংখ্যা ইবনে খুরাদাদবিহ্, আল-মাসুদি ও ইবনে রুসতাবের সঙ্গে মিলে যায়। তবে এগুলোর মধ্যে বেশি পার্থক্য দেখা যায় আলশাম সাগরের পরিমাপ নিয়ে। ইদ্রিসীর মতে, এ সাগরের পরিমাপ হলো ১ হাজার ১৩৬ ফারসাখ বা ৩ হাজার ৪০৮ মাইল। তবে সাধারণত এ সাগরের পরিমাপ দেয়া হয়ে থাকে ৫ হাজার মাইল এমনকি ৬ হাজার মাইল পর্যন্ত। ইদ্রিসীর মতে, আল-বানাদিকিইন উপসাগরের পরিমাপ হলো ১ হাজার ১০০ মাইল। কিন্তু কুদামা, মাসুদি ও ইবনে রুসতাবের মতে, এ সাগরের পরিমাপ ৫০০ মাইল।

আল-ইদ্রিসীর মতে, আল-দায়লাম (কাস্পিয়ান) সাগরের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ১০০ মাইল এবং প্রস্থ ৬৫০ মাইল। মাসুদির মতে, দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল এবং প্রস্থ ৬০০ মাইল বা তার কিছু বেশি। ইবনে খুরাদাদবিহ্ এবং অন্য আরব ভূগোলবিদগণ মনে করতেন, এ সাগরের সঙ্গে কৃষ্ণ সাগরের সংযোগ রয়েছে। ইদ্রিসীর মতে, কোনো প্রণালী দিয়ে এ সাগরের সঙ্গে অন্য কোনো সাগরের সংযোগ নেই। টলেমির মতে, কাস্পিয়ান সাগর ও

www.pathagar.com

কৃষ্ণ সাগর সম্পূর্ণ পৃথক। দু'য়ের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু টলেমির গ্রন্থের আরবী অনুবাদে দেখা যায়, দু'টি সাগরের মধ্যে সংযোগ রয়েছে। অনুবাদক বা অন্য কেউ হয়তো টলেমির গ্রন্থে এ বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ইবনে হাওকাল 'জিওগ্রাফিয়া'র একটি পাণ্ডুলিপিতে এ সংযোগের কথা দেখতে পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ পাণ্ডুলিপি অনুসারে কাস্পিয়ান সাগর ভূমধ্যসাগর থেকে প্রবাহিত। ইবনে হাওকাল বলেছেন, আল্লাহ জানেন কি করে মাসুদির মতো লোক এমন অসম্ভব এবং বাস্তবতাবর্জিত কথা বলতে পারেন। আল-মাসুদির মতে, প্রণালী বা বড় নদীর মাধ্যমে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে কোনো সংযোগ থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সংযোগ থাকলেও তা ডন বা ভলগা নদীর মাধ্যমে। যদিও এ দু'টি নদী একে অন্য থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। অনেক ভূগোলবিদ মনে করতেন যে, কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগর একই। ইদ্রিসী বঙ্গোপসাগরকে লবণ সাগর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের সব শহরকে এ লবণ সাগরের উল্টো দিকে দেখিয়েছেন। টলেমিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি দেখান, ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিক বিস্তৃত হয়ে বিষুব রেখার সমান্তরালে বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে গেছে। টলেমি ও ইদ্রিসীর মানচিত্রে ভারত মহাসাগরকে একটি হ্রদের মতো দেখানো হয়েছে।

ইদ্রিসীর দুর্বলতা

ইদ্রিসীর ভূগোলে বহু গরমিল দেখা যায়। এসব গরমিল তার ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করেছে। তার বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দেখা যায়, তিনি সপ্তম আকলিম ছাড়াও বিষুব রেখার দক্ষিণে অষ্টম আকলিমেরও কল্পনা করেছেন। এ সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির নাম হলো 'নুযহাত আল-মুশতাক ফিকতিরাত আল-আমসার ওয়াল আকতার ওয়াল বুলদান ওয়াল জাযায়ের ওয়াল মাদায়েন আল আফাক'। রোমে ১৫৯২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ১৬১৯ সালে প্যারিস থেকে তার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তবে ফরাসি ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে আল-মাসুদির সুস্পষ্ট মতবাদের সঙ্গে ইদ্রিসীর মতের কোনো মিল নেই। তার গ্রন্থ থেকে মনে হয়, পর্যটক, নাবিক বা জাহাজের ক্যাপ্টেনদের লিখিত বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না। কিংবা তিনি সেগুলো একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন। তিনি গ্রীক বা পূর্বেকার আরব ভূগোলবিদদের ধ্যান ধারণাগুলো সমালোচকের চোখ দিয়ে যাচাই করে দেখেননি। তিনি সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো চেষ্টা না করে সবকিছু নির্বিবাদে গ্রহণ করেছেন এবং পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন।

সুদূর প্রাচ্য দেশের মানচিত্র অঙ্কনে আল-ইদ্রিসীর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মানচিত্র বেশ উন্নত এবং অনেকটা ত্রুটিবিহীন। তিনি

www.pathagar.com

প্রাচ্যের মানচিত্র এঁকেছেন টলেমির মানচিত্র অনুসরণ করে। টলেমির মানচিত্র ক্রটিপূর্ণ এবং দূর অতীতকালের। টলেমির সময় থেকে তার সময় পর্যন্ত যে রদবদল হয়েছিল সে সম্পর্কে ইদ্রিসী অবহিত ছিলেন না। তিনি আরব ও পার্সী ভূগোলবিদদের গ্রন্থ থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর সঙ্গে টলেমির প্রচারিত তথ্যের কোনো সামঞ্জস্য বিধান না করে মানচিত্রে স্থান দিয়েছেন। তাতে জগাখিচুড়ি হয়েছে। মানচিত্রও তাই হয়েছে অসম্পূর্ণ। মানচিত্রে শহর, বন্দর ইত্যাদি যেসব স্থান দেখানো হয়েছে বাস্ত বের সঙ্গে তার মিল খুব সামান্য। যেমনঃ সিন্দান, সুবারা প্রভৃতি উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলের শহরগুলোকে মানচিত্রে উপদ্বীপের পশ্চিমে দক্ষিণ উপকূলে দেখানো হয়েছে। নদীর গতিপথও সঠিকভাবে নির্দেশ করা হয়নি। গঙ্গার যে গতিপথ দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবের খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মানচিত্রে দেখানো হয়েছে যে, বাহির কাশ্মিরের নিকট থেকে উত্তর দিকে বহির্গত হয়ে প্রথমে দক্ষিণ দিকে গিয়ে পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। তারপর নাহরওয়ারার (গুজরাটের পাটান) নিকট থেকে আবার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলের কাছ দিয়ে বয়ে গিয়ে মালাবারের ফানদারানায় আরব সাগরে পতিত হয়েছে। কয়েকটি শহরকে গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলে দেখানো হয়েছে। যেমনঃ আত্রাসা, নাহরওয়ারা, ফানদারানা প্রভৃতি। মানচিত্রে যমুনা নদীর কোনো উল্লেখ নেই। সিংহল বা শ্রীলঙ্কাকে একটি বৃহৎ দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করায় ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর অবস্থান নির্ণয়ে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। আফ্রিকার উপকূলীয় দ্বীপগুলোকে ভারত উপকূলের উল্টো দিকে দেখানো হয়েছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে দেখানো হয়েছে সুমাত্রার পূর্বদিকে এবং সুমাত্রার মাথা ঢুকে গেছে বঙ্গোপসাগরে। আবার কয়েকটি উপদ্বীপ এমনকি উপকূলবর্তী শহরকেও দ্বীপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। যেমনঃ ওয়িকম্যান, সিন্দান, কুইলন, উরিসিন প্রভৃতি। এ বিভ্রাট দ্বীপ উপদ্বীপ সবক্ষেত্রে। আরবী আল-জাজিরা শব্দ ব্যবহার করার জন্যও এমন হয়ে থাকতে পারে। তবে ইদ্রিসী যে তার গ্রন্থ রচনায় প্রাচ্যের এ ভূখণ্ড সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই করে দেখেননি বা সঠিক সংবাদ পাননি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিমাপ নির্দেশে ইদ্রিসীর মানচিত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সংজ্ঞা ব্যবহার না করায় স্থানের নাম নির্দেশনায় আরো অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তিনি দূরত্ব দেখাতে গিয়ে অনেক সময় এক পরিমাপ থেকে আরেক পরিমাপে চলে গেছেন। যেমনঃ কোথাও তিনি ব্যবহার করেছেন মারহালা, কোথাও ফারসাখ কোথাও বা মাইল। আবার কোথাও বা কতদিনের পথ। তার নির্দিষ্ট দূরত্বের সঙ্গে ইবনে হাওকাল ও খুররাদাযবিহের প্রদত্ত দূরত্বের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময় ভুল গণনাও দেয়া হয়েছে।

ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনায় ক্রটি

ভারত সম্পর্কে পরিবেশিত আল-ইদ্রিসীর তথ্যাদির কিছু অংশ টলেমির গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হলেও অন্যান্য তথ্য ৮ শ' থেকে ১১৫০ সালের ভারতের রাজনীতি, ধর্ম,

www.pathagar.com

আচার ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত। প্রায় সাড়ে ৩শ' বছরের তথ্যাদি একত্রে পরিবেশন করলেও তিনি কোন তথ্যটি কোন সময়ের সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এছাড়া তিনি সংগৃহীত তথ্যগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করে দেখেননি এবং এসবের সত্যাসত্য বাছ বিচার করেননি। ফলে তার এসব তথ্যের কোনটি কোন সময়ের তা বুঝা মুস্কিল এবং এ থেকে ভারতের কোনো বিশেষ সময়ের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। ইদ্রিসী পরিবেশিত ভারতীয় চিত্র তার সময়ের নয়। তিনি যেসব ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলো প্রধানত নবম ও দশম শতাব্দীর গুর্জর প্রতিহার, পাল এবং রাষ্ট্রকুট বংশের আমলের। উল্লেখিত নরপতি ও তাদের রাজ্যের তথ্য ইদ্রিসী নিয়েছেন মূলত ইবনে খুরাদাদবিহ্‌র গ্রন্থ থেকে। তিনি ভারতীয় নরপতিদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে রয়েছেন বল্লাহারা (দক্ষিণে রাষ্ট্রকুট বংশের বল্লভরাজ), আল-জুরজ (উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার বংশের গুর্জর) এবং দহমি (বাংলার পাল বংশের ধর্মপাল)। ভারতে তখন এ তিনটি ছিল প্রধান রাজবংশ। তারা এসময় ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন। নবম শতাব্দীর প্রথম দশকে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকুট বংশের রাজা ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন বলে মনে হয়। ইবনে খুরাদাদবিহ্ বল্লাহারাকে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই বল্লাহারা সম্ভবত তৃতীয় গোবিন্দ ছাড়া অন্য কেউ নন। আল-জুরজ হলেন প্রতিহার বংশের দ্বিতীয় নাগভট্ট। তিনি তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক। দাহমি শব্দটি ধর্মপালের আরবী অপভ্রংশ। ধর্মপাল বাংলাদেশের পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র। ৭৭০-৮১০ সালে ধর্মপালের রাজত্বকালে এ তিনটি রাজবংশ আধিপত্য স্থাপনে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত ছিল।

আল-ইদ্রিসী যেসব শহর ও স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রায় অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত। অন্যগুলো দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের এবং অন্যান্য স্থানের। ইদ্রিসী যেসব গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন সেগুলোতে শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারতের তথ্যই বেশি ছিল। এজন্য তিনি ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে পারেননি। সিংহল সম্পর্কে আল-ইদ্রিসী যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলো টলেমির গ্রন্থ থেকে নেয়া। আল-বেরুনির আগ পর্যন্ত আরব ভূগোলবিদ বা পণ্ডিতদের গোটা ভারত সম্পর্কে জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। ইদ্রিসী আল-বেরুনির গ্রন্থগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাই তার পরিবেশিত তথ্য অসম্পূর্ণ। আল-মাসুদি ৯১৫ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং দু'বছর এখানে অতিবাহিত করেন। তার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বলিত গ্রন্থটিতে ভারত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য স্থান পেয়েছে। ইদ্রিসী এ গ্রন্থটি ব্যবহার করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ইদ্রিসীর গ্রন্থে অসঙ্গতির আরো কারণ আছে। সিন্ধুর আরব শাসকদের সঙ্গে প্রতিবেশি গুর্জর প্রতিহার বংশের কোনো সদ্ভাব ছিল না। তারা প্রায় সময় যুদ্ধ বিগ্রহে

www.pathagar.com

লিপ্ত ছিলেন। তাই সিন্ধুর মুসলমানরা উত্তর ভারত বা মধ্য ভারতের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ পায়নি। তবে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে একথা খাটে না। বাণিজ্য সূত্রে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলের অনেক স্থানের সঙ্গে আরবীয় বণিকগণ প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত ছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের বল্লভরাজ (বল্লাহারা) আরব বণিক ও পর্যটকদের স্বাগত জানিয়ে বাণিজ্য ও পর্যটনের সুবন্দোবস্ত করে দেন। তিনি তাদের ধর্ম ও আচার ব্যবহারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। দক্ষিণের এ রাজবংশ ভারতের উত্তরাংশের নরপতিদের সঙ্গে প্রায় সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। আবার সিন্ধুর আরব শাসকদের সঙ্গে উত্তরাংশের এ নরপতিদের সদ্ভাব বলে কিছু ছিল না। ফলে দক্ষিণের নরপতিগণ রাজনৈতিক সুবিধার জন্য আরবদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এ জন্য আরবরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বেশি পরিচিত ছিল। তাই তাদের গ্রন্থাদিতে দক্ষিণ ভারতের কথা বেশি উচ্চারিত হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর ভারত সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে তেমন কোনো কথা থাকতো না। ইদ্রিসী এ ধারাবাহিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি নিজে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেননি। তাই তিনি তার সংগৃহীত তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারেননি। তিনি যেসব লিখিত উপাদান থেকে তার তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো হলো:

(১) ইবনে হাওকালের 'কিতাবুল মাসাকিল ওয়াল মামালিক'

(২) আবুল কাসেম ওবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন খুরাদাদবিহ্র 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক'

(৩) আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-জায়ানির 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক'

(৪) আবু উসমান আমর ইবনে বহর আল-জাহিজের 'কিতাবুল হাইওয়ান'

(৫) টলেমির 'জিওগ্রাফিয়া' (Geographia)

এছাড়া তিনি অনেক স্থানে হাসান ইবনুল মুনজিরের 'কিতাবুল আজায়েব'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব গ্রন্থটি ছিল হিশাম আবুল মুনজিরের 'কিতাবুল আজায়েব আল-আরারিয়া'। হিশামই বোধ হয় সর্বপ্রথম মুসলিম ভূগোলবিদ যিনি ভূগোল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইদ্রিসী তার বইয়ে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য স্থানের তথ্য ইবনে হাওকালের গ্রন্থ থেকে প্রায় হুবহু সন্নিবেশ করেছেন। ইবনে খুরাদাদবিহ্র গ্রন্থ থেকে সিন্ধু, গুজরাট, কাথিওয়ারের উপকূলীয় শহর, দক্ষিণ উপদ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের শহর, সিংহল, সুমাত্রা ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি ভারতের ধর্ম, জাতি এবং রাজাদের সম্পর্কিত তথ্য খুরাদাদবিহ্র গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইদ্রিসী তার গ্রন্থের দোহাই দিয়ে এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন যেগুলো তার প্রাপ্ত গ্রন্থে দেখা যায়নি। তবে সম্ভবত তার সম্পূর্ণ গ্রন্থটি

www.pathagar.com

ইদ্রিসীর হস্তগত হয়েছিল। আল-জায়ানির গ্রন্থ থেকে ভারতের জাতিভেদ প্রথা, গণ্ডারের শিং দিয়ে খাবার টেবিলে ব্যবহারের জন্য ছুরি বানানো প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গণ্ডার ৭ বছর নিজের বৎসকে পেটে রেখে দেয়, এই কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছেন আল-জাহিজের 'কিতাবুল হাইওয়ান' থেকে। ইদ্রিসী এ কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এ সম্পর্কে আল-মাসুদির মন্তব্য অবগত ছিলেন না। আল-মাসুদি সিরাফ ও ওমানের পর্যটক ও ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারেন যে, এ কাহিনী একেবারে মিথ্যা।

মানচিত্র অঙ্কনে ইদ্রিসীর অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল ঠিকই। তবে ভুল ভ্রান্তির জন্য তার অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তিনি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বের কোনো ভালো মানচিত্র পাননি। পৃথিবীর বিভক্ত আবহাওয়া অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শহর, বন্দর ও নগরের দূরত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। তবে এসব ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি মধ্যযুগে মানচিত্র অঙ্কনে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। ইদ্রিসীর মানচিত্র অবলম্বনে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে তিউনিসিয়ার সাফাক্সের শরীফ পরিবারের এক সদস্য বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন করেন। পরবর্তীতে এ পরিবার ইউরোপীদের সমুদ্র যাত্রার মানচিত্রকে পথ দেখিয়েছে। ১৫৫১ সালে শরীফ পরিবারের এক মানচিত্রবিদ সমুদ্রের একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। সমুদ্রের মানচিত্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র গোলাকার একটি মানচিত্রও ছিল। ক্ষুদ্র মানচিত্রটি ছিল ইদ্রিসীর অনুরূপ।

আন্দালুসিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ

কলম্বাস পূর্ব যুগে স্পেনের আন্দালুসিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগের তত্ত্বে বিশ্বাসীরা প্রায়ই আল-ইদ্রিসীর ভৌগোলিক গ্রন্থ 'নুজহাত আল-মুশতাক'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ভারতীয় অধ্যাপক মকবুল আহমেদের ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থে বলা হয়, '*The Commander of the Muslims Ali Ibn Yusuf Ibn Tashfin sent his admiral Ahmad Ibn Umar, better known under the name of Raqsh al-Auzz to attack a certain island in the Atlantic, but he died before doing that. Beyond this ocean of fogs it is not known what exists there. Nobody has the sure knowledge of it, because it is very difficult to traverse it. Its atmosphere is foggy, its waves are very strong, its dangers are perilous, its beasts are terrible, and its winds are full of tempests. There are many islands, some of which are inhabited, others are submerged. No navigator traverse them but bypass them remaining near their coast. And it was from the town of Lisbon that the adventurers set out known under the name of Mughamarin, penetrated the ocean of foggs and wanted to know what it contained and where it ended. After sailing for twelve more days they perceived an island that seemed to be inhabited, and there were cultivated fields.They sailed that way to see what it contained. But soon barques*

www.pathagar.com

encircled them and made them prisioners, and transported them to a miserable hamlet situated on the coast. There they landed. The navigators saw there people with red skin; there was not much hair on their body, the hair of their head was straight, and they were of high stature. Their women were of an extraordinary beauty.'

অর্থাৎ *'মুসলিম সর্বাধিনায়ক আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে তাশুফিন আটলান্টিক মহাসাগরের কোনো একটি দ্বীপে আক্রমণ চালাতে রাকশ আল-আজ্জ নামে পরিচিত তার নৌ অধ্যক্ষ আহমদ ইবনে ওমরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আক্রমণ চালানোর আগেই তিনি মারা যান। কুয়াশায় আচ্ছাদিত এ মহাসাগরের ওপারে কী আছে তা জানা ছিল না। পাড়ি দেয়া দুঃসাধ্য হওয়ায় সেখানে কী আছে সে ব্যাপারে কারো নিশ্চিত ধারণা ছিল না। এ মহাসাগরের আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন, ঢেউ অত্যন্ত শক্তিশালী, বিপদগুলো ভয়াবহ, প্রাণীগুলো ভয়ানক এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিপূর্ণ। সেখানে বহু দ্বীপ আছে। কোনো কোনো দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। আবার কোনো কোনোটি নিমজ্জিত। কোনো নাবিক এসব বিপদ অতিক্রম করেনি। নাবিকরা এসব বিপদ এড়িয়ে নিকটবর্তী উপকূলে অবস্থান করে। মুঘামারিন নামে পরিচিত দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা লিসবন শহর থেকে যাত্রা করে। তারা কুয়াশাচ্ছন্ন মহাসাগর ভেদ করে এবং এ মহাসাগরের ওপারে কী আছে এবং তার শেষ কোথায় তা জানতে চায়। ১২ দিন একটানা চলার পর তারা একটি দ্বীপের সন্ধান পায়। দ্বীপটিতে মানুষ বসবাস করে বলে তাদের কাছে মনে হলো। সেখানে চাষযোগ্য জমিও ছিল। সেখানে কী আছে তা দেখার জন্য তারা এগিয়ে যায়। কিন্তু শিগগির কতগুলো নৌকা তাদের ঘেরাও বন্দি করে ফেলে। বন্দিদেরকে উপকূলের কাছাকাছি একটি দরিদ্র গ্রামে স্থানান্তর করা হয়। সেই গ্রামে তারা অবতরণ করে। নাবিকরা লাল ত্বক বিশিষ্ট লোকজন দেখতে পায়। এসব লোকের শরীরে তেমন লোম ছিল না। তাদের মাথার চুল ছিল খাড়া। তারা ছিল উঁচু স্তরের লোক। মহিলারা ছিল অপরূপ সুন্দরী।'*

ভারতীয় পণ্ডিত ও তিনটি বিদেশী ভাষায় কোরআনের অনুবাদক অধ্যাপক মকবুল আহমদের এ বর্ণনা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা এতে বলা হয়েছে, মহাসাগরের প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটি অঞ্চলে পৌঁছার পর মুঘামারিন (এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে অভিযাত্রী হিসাবে) পেছনে ফিরে এসে প্রথমে একটি জনমানবহীন দ্বীপে এসে উঠে। এ দ্বীপে তারা ভেড়ার বিপুল পরিমাণ মাংস দেখতে পায়। এসব মাংস ছিল তিক্ত ও খাবার অযোগ্য। তারপর নাবিকরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে ওপরে উল্লেখিত দ্বীপে পৌঁছায়। সেখানে তাদেরকে ছোট ছোট নৌকা ঘিরে ফেলে এবং একটি গ্রামে নিয়ে যায়। এ গ্রামের পুরুষদের চুল ছিল লম্বা ও কোঁকড়ানো এবং মহিলারা ছিল অপরূপা। গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন আরবীতে তাদের সঙ্গে কথা বলে। লোকটি তাদের কাছে জানতে চায় তারা কোথা থেকে এসেছে। তারপর গ্রামের রাজা তাদেরকে পুনরায় উপকূলে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। উপকূলে তাদেরকে অর্ধ আফ্রিকান বা বারবাররা অভ্যর্থনা জানায়।

www.pathagar.com

এ ঐতিহাসিক ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, মুঘামারিন আটলান্টিক মহাসাগরে সামুদ্রিক উদ্ভিদে আচ্ছাদিত সারগোজা সাগরে পৌঁছেছিল। বারমুডার অদূরে এ সাগর থেকে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড এক হাজার মাইল দূরে। মেষ থাকার কথা বলায় মনে হচ্ছে, সারগোজা সাগর থেকে ফিরে আসার পথে তারা হয়তো অ্যাজোর্স অথবা মাদাইরা কিংবা ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের সর্বপশ্চিমে অবতরণ করে। অভিযাত্রায় মানুষের বসবাস আছে এমন একটি দ্বীপের কথা বলা হয়েছে। তাতে মনে হয় সেই দ্বীপটি টানানারিফ অথবা গ্রান ক্যানারিয়া। এ দ্বীপে মুঘামারিনের সঙ্গে গুয়ানচি উপজাতীয় লোকজনের দেখা হয়ে থাকতে পারে। আরবীতে কথা বলা এবং মুঘাররিনদের দ্রুত মরক্কো ফিরে যাবার ব্যাখ্যা হিসাবে এ দ্বীপের উল্লেখ করা হয়। কেননা ক্যানারি দ্বীপের সঙ্গে মরক্কোর বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইদ্রিসী তার গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করায় বুঝা যাচ্ছে, আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে আরব, আন্দালুসীয় অথবা মরক্কোর বণিকদের নিশ্চিত ধারণা ছিল।

ইতিহাসে ঠাঁই

মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানী আল-ইদ্রিসী ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি হলেন পাকিস্তানি লেখক তারিক আলীর 'অ্যা সুলতান ইন পালারমো' শিরোনামে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়া তিনি ম্যারিনো সানুটো দ্য এল্ডার, এন্টোনিও ম্যালফান্টি, জিওম ফারার ও ফার্নান্দেজ দ্য লুগোর মতো ইউরোপীয় লেখকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছেন।

রচনাবলী

আল-ইদ্রিসী কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ পর্যন্ত তার যে সমস্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো:

(১) কিতাব নুজহাত আল-মুশতাক ফিকতিরাক আল-আফাক
(২) রাওদুল উনস ওয়া নুযহাতুন নাফস
(৩) কিতাব ফিল মামালিক ওয়াল মাসালিক
(৪) উনসুল মাহাজ ওয়া রাওয়াদুল ফুরাজ
(৫) কিতাবুল জামি লি আশতাতিন নাবাত

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারক আল-জাজারি

আল-জাজারি হলেন স্বর্ণযুগের অনন্য সাধারণ মুসলিম বিজ্ঞানী। তিনি হলেন বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারক। ফ্রান্সিসকো গিয়রগিও এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো ইউরোপীয় প্রকৌশলীদের ৩ শত বছর আগে তিনি ১২০৬ সালে রোবটিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের জন্য তাকে রোবট প্রযুক্তির জনক বলা হয়। তার পূর্ণ নাম আল-শায়খ রইস আল-আমল বদি উল জামান আবুল ইজ ইবনে ইসমাইল ইবনে আল-রাজাস আল-জাজারি। তার নামের প্রথম অংশ (আল-শায়খ) সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার নামের দ্বিতীয় অংশ (রইস আল-আমল) নির্দেশ করছে, তিনি ছিলেন একজন প্রধান প্রকৌশলী এবং দ্বিতীয় অংশ (বদি উল জামান) নির্দেশ করছে, তিনি ছিলেন বিস্ময়কর মেধাবী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নামের শেষাংশ (আল-জাজারি) প্রমাণ করছে যে, তিনি তুরস্কের দিয়ার বাকিরের জাজিরাত অঞ্চলের সন্তান। এই আল-জাজিরাতে ১১৩৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল-জাজারি ছিলেন আবিষ্কারক, গণিতজ্ঞ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কারুশিল্পী, শিল্পী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি এমন একসময় জীবন ঘনিষ্ঠ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন যখন পৃথিবীতে শক্তির অন্যতম উৎস ছিল পানি ও বাতাস। তাই জাজারির উদ্ভাবিত অধিকাংশ যন্ত্র ছিল পানি বা হাইড্রোপাওয়ার চালিত।

জাজারির কর্মজীবন

রাতারাতি আল-জাজারি বিজ্ঞানী হতে পারেননি। ২৫ বছর তাকে সাধনা করতে হয়েছে। পিতার মতো তিনি ছিলেন আর্তুকলু প্রাসাদের প্রধান প্রকৌশলী। আর্তুকলু প্রাসাদ ছিল তুর্কি আর্তুকিদ বংশের প্রাসাদ। এ প্রাসাদের অপরূপ কারুকাজ তাকে নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে। আল-জাজারি তিনজন আর্তুকিদ শাসকের অধীনে চাকরি করেছেন। তারা হলেন নাসিরুদ্দিন ইবনে আরসালান, কুতুব আল-দীন সুকমান ইবনে মোহাম্মদ ও নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ইবনে মোহাম্মদ। ১১৭৪ সালে তিনি প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিন আরসালানের অজু করার জন্য তিনি প্রথমে একটি যন্ত্র তৈরি করেন। সুলতান তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন। তার অনুরোধে তিনি ১১৯৮ সাল থেকে 'আল-হিয়াল' লিখতে শুরু করেন। নাসিরুদ্দিন সুলতান হন জাজারি বই লিখতে শুরু করার দু'বছর পর। ১২০৬ সালের ১৬ জানুয়ারি তার বই লিখা শেষ হয়। বইটি লেখা শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

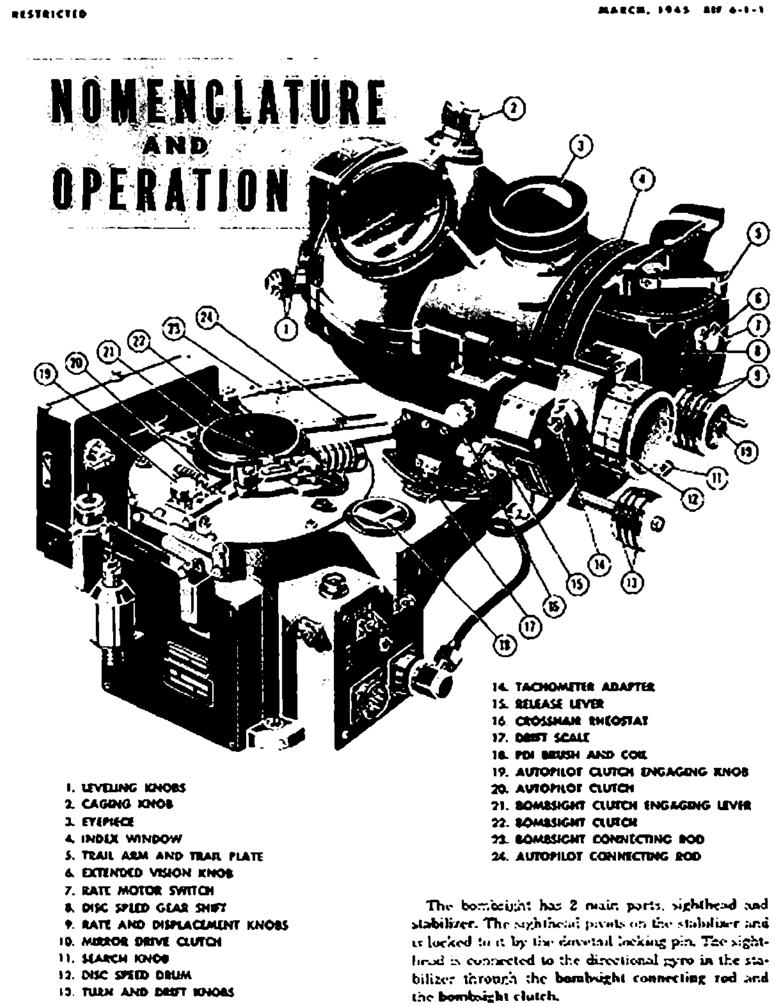

আল-জাজারির আবিষ্কৃত পানির পাম্প

অমর গ্রন্থ আল-হিয়াল

ওপরে উল্লেখিত জাজারির বইটির মূল শিরোনাম ছিল 'আল-জামি বায়ান আল-ইলম ওয়া-আমল আল-নাফি ফি সিনাতাত আল-হিয়াল'। আল-হাসান আরবী অনুবাদে বইটির নামকরণ করেন 'কিতাব ফি মারিফাত আল-হিয়াল আল-হান্দাসিয়া'। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডোনাল্ড রাউটলেজ হিল ইংরেজি অনুবাদে বইটির নাম দেন 'বুক অব নলেজ অব ইনজেনিউয়াস মেকানিক্যাল ডিভাইসেস' (Book of Knowledge of

www.pathagar.com

Ingenious Mechanical Devices)। গ্রন্থটি সংক্ষেপে 'আল-হিয়াল' নামে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরিতে জাজারির আরবীতে অনূদিত গ্রন্থের ১৫টি পাণ্ডুলিপির বর্ণনা পাওয়া যায়। মূল পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত রয়েছে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের তুপকাপি সারায়ি লাইব্রেরিতে। আল-জাজারি ৫০টি মেকানিক্যাল ডিভাইস উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ 'আল-হিয়াল'-এ ৬টি ক্যাটাগরিতে এসব ডিভাইস তৈরির বিবরণ দিয়েছেন। আরবীতে প্রতিটি মেকানিক্যাল ডিভাইসকে বলা হতো 'শাকল'। শাকল সম্পর্কে জাজারির বর্ণনা অত্যন্ত সহজ। বুঝার সুবিধার জন্য প্রতিটি সরল যন্ত্রের পাশে তিনি চিত্র এঁকে দিয়েছেন। বইটিতে ৫০টি সাধারণ যন্ত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যন্ত্রগুলোর ক্রমিক নম্বর হিসাবে আরবী বর্ণমালার ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। জটিল যন্ত্রের কার্যক্রম বুঝাতে তিনি প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য পৃথক পৃথক চিত্র অঙ্কন করেছেন। বইটিতে মোট ১৭৪ টি চিত্র স্থান পেয়েছে।

আবিষ্কারে মৌলিকত্বের পরিচয়

বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সঙ্গে আল-জাজারির নাম জড়িত। তিনি অটোমেটিক কন্ট্রোল মেকানিজম, ঝর্ণা, পাইপ, ভাল্ব ও বক্রনল তৈরি করেন। ইতিহাসে তিনিই প্রথম অটোমেটিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জাজারি তার ডিভাইস নির্মাণে গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কাছে কিছুটা ঋণী। তিনি নিজেও অকপটে তা স্বীকার করেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলীরা এখনো তার গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করছেন। অধ্যাপক লিন হোয়াইট জুনিয়র আল-জাজারি সম্পর্কে লিখেছেন, *'Segmental gears first clearly appear in Al-Jazari, in the West they emerge in Giovanni de Dond's astronomical clock finished in 1364, and only with the great Sienese engineer Francesco di Giorgio (1501) did they enter the general vocabulary of European machine design.'*

অর্থাৎ *'বিভাজিত গীয়ার স্পষ্টত প্রথম আল-জাজারির গ্রন্থে দৃশ্যমান। ১৩৬৪ সালে গিয়ভান্নি দ্য দোন্দির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ঘড়ি নির্মাণের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে তা আবির্ভূত হয় এবং ১৫০১ সালে একমাত্র সাইনিজ প্রকৌশলী ফ্রান্সিসকো দ্য গিয়রগিও'র কল্যাণে ইউরোপীয় মেশিনের নকশায় বিভাজিত গীয়ার সাধারণ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।'* আল-জাজারির সব আবিষ্কার সমান নয়। আধুনিক বিচারে কোনো কোনোটি ক্ষুদ্র আবার কোনো কোনোটি বেশ বড়। মেকানিজম, যন্ত্রাংশ, ধারণা, পদ্ধতি ও ডিজাইনে তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শক্তির একটি উৎস খুঁজে বের করার মধ্যে জাজারির সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পানি সরবরাহে তার সেচ যন্ত্র পরিচালনা করতে পানিকে শক্তির একটি উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। জাজারি প্রবহমান পানিকে কার্যকর জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগান। এ জ্বালানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সেচ যন্ত্র চালাতে সক্ষম হয়। সেচ যন্ত্র উৎস থেকে পাইপের মধ্য দিয়ে পানি গন্তব্যে পৌঁছে দিতো। প্রবাহিত পানিতে ওয়াটার হুইল চালু থাকা পর্যন্ত যন্ত্র বন্ধ বা চালু করার জন্য মানুষের প্রয়োজন হতো না। জাজারি সাফল্যের

www.pathagar.com

সঙ্গে একটি গীয়ার উদ্ভাবন করেন। এ গীয়ার অন্যান্য যন্ত্রকে সক্রিয় করতে পানি শক্তিকে একটি ওয়াটার হুইল থেকে প্রবাহিত করতো। গীয়ারের একটি অদ্ভূত সমন্বয় কাজে লাগিয়ে তিনি গতিকে খাড়া থেকে অনুভূমিতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

গুটানো হাতল

১২০৬ সালে আল-জাজারি প্রথম গুটানো হাতল তৈরি করেন। গুটানো হাতল হলো এমন একটি দণ্ড যেখানে হাতলগুলো সংযুক্ত থাকে। তিনি এ পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলঘড়ি ও পানি উত্তোলনের যন্ত্রে ব্যবহার করেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় মেকানিজমে হাতল এবং গুটানো হাতলের প্রচলন শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনে ঘূর্ণায়মান হ্যান্ডমিলে স্থাপিত হ্যান্ডেল রোমান সাম্রাজ্যসহ সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রোমানরা হ্যান্ডেলের অনুকরণে ক্রাঙ্ক বা হাতল তৈরি করে। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া মাইনরের হায়ারপোলিস নামে একটি শহরে করাত কলে হাতল ও সংযুক্ত রড ব্যবহারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে বানু মুসার 'বুক অব ইনজেনিউয়াস ডিভাইসেস'-এ হাইড্রোলিক ডিভাইস ব্যবহারের কথা বলা হয়।

ঘূর্ণায়মান হাতল

১২০৬ সালে আল-জাজারি প্রথম ঘূর্ণায়মান হাতল উদ্ভাবন করেন। তিনি তার দু'সিলিন্ডারের পাম্পে একটি হাতল সংযোগকারী রডের সঙ্গে তা জুড়ে দেন। আধুনিক ঘূর্ণায়মান হাতলের মতো আল-জাজারির যন্ত্রটি কয়েকটি হাতল পিনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হতো এবং একটি চাকা লাগিয়ে তা চালানো হতো। চাকাটি চক্রাকারে ঘুরতে থাকায় পিনগুলো সামনে পেছনে সরল রেখায় ছুটোছুটি করতো। আল-জাজারির বর্ণিত ঘূর্ণায়মান হাতল অবিরত রোটারি মেশিনকে একটি পিস্টন ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করতো এবং তার এ আবিষ্কার হলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ইন্টারন্যাল কম্বাশন ইঞ্জিন ও স্বয়ংক্রিয় কন্ট্রোলের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতির পথপ্রদর্শক। আল-জাজারি তার দু'টি পানি উত্তোলন যন্ত্রে একটি কানেকটিং রডের সহায়তায় ঘূর্ণায়মান হাতল ব্যবহার করতেন। পানি উত্তোলনে তার একটি যন্ত্র ছিল হাতলচালিত সাকিয়া চেইন পাম্প এবং আরেকটি ছিল ডাবল একশন রেসিপরোকেটিং পিস্টন সাকশন পাম্প। তার পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রে প্রথম জ্ঞাত হাতল স্লাইডার মেকানিজম ব্যবহার করা হয়। আল-জাজারির আবিষ্কার সম্পর্কে ইংরেজ প্রযুক্তি বিষয়ক ঐতিহাসিক ডোনাল্ড রাউটলেজ হিল তার 'মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন দ্য মেডিয়ীভ্যাল নিয়ার ইস্ট'-এ লিখেছেন, '*We see for the first time in al-Jazari's work several concepts important for both design and construction: the lamination of timber to minimise warping, the static balancing of wheels, the use of wooden templates (a kind of pattern), the use of paper models to establish design, the calibration of orifices, the grinding of the seats and plugs of valves*

www.pathagar.com

together with emery powder to obtain a watertight fit, and the casting of metals in closed mold boxes with sand.'

অর্থাৎ *'আল-জাজারির গ্রন্থে আমরা প্রথমবার ডিজাইন ও নির্মাণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো হলো: দোমড়ানো মুচড়ানো বন্ধে কাঠ মুড়িয়ে দেয়া, চাকার স্থায়ী ভারসাম্য, কাঠের তৈরি টেমপ্লেটের (এক ধরনের প্যাটার্ন) ব্যবহার, ডিজাইন প্রতিষ্ঠায় পেপার মডেলের ব্যবহার, ফাটলের আয়তন নির্ধারণ, পরিপূর্ণভাবে পানি প্রবেশ বন্ধে গুঁড়ো পাউডারসহ ভাল্বের ছিপি ও সিট চূর্ণ করা এবং মোল্ড বাক্সের ছাঁচে বালুসহ ধাতু ঢালাই করা।'*

পানি উত্তোলনকারী যন্ত্র

আল-জাজারি ইসকেপমেন্ট কৌশল ব্যবহার করে একটি চাকার ঘূর্ণনের গতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি পানি উত্তোলনে পাঁচটি যন্ত্র, ওয়াটারমিল ও ওয়াটার হুইল আবিষ্কার করেন। পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রে তিনি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার করেন। অন্যদিকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রের নকশা অঙ্কন করেছিলেন মাত্র। আল-জাজারির সাকিয়া যন্ত্র হলো এমন একটি চেইন পাম্প যাতে প্রথম ঘূর্ণায়মান হাতল ব্যবহার করা হয়। তার সাকিয়া চেইন পাম্পে প্রথম ইন্টারমিট্যান্ট ওয়ার্কিং হ্রাসের ধারণা কাজে লাগানো হয়। সাকিয়া চেইন পাম্পের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তা করা হতো। আল-জাজারি একটি পানি উত্তোলনকারী সাকিয়া চেইন পাম্পও উদ্ভাবন করেছিলেন। এ পাম্প কায়িক শ্রমের পরিবর্তে হাইড্রোপাওয়ার চালিত ছিল। জাজারির বর্ণিত সাকিয়া পাম্প মেশিন ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত দামেস্কে পানি সরবরাহ করতো। মধ্যযুগে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র এ পাম্প দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হতো। আল-জাজারি প্রথম সাকশন পাইপ, সাকশন পাম্প ও ডাবল একশন পাম্পের বর্ণনা দেন এবং ভাল্ব ও ঘূর্ণায়মান হাতল কানেংটিং রড মেকানিজম প্রয়োগ করেন। এছাড়া তিনি দু'সিলিন্ডারের রেসিপরোকেটিং পিস্টন সাকশন পাম্পও উদ্ভাবন করেন। এ পাম্প ছিল ওয়াটার হুইলচালিত। ওয়াটার হুইল গীয়ার সিস্টেমের মধ্য দিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান স্লট রডকে চালনা করতো। দু'টি পিস্টনের রড স্লট রডের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। পিস্টন আনুভূমিক বিপরীত সিলিন্ডারে কাজ করতো। সেচ কাজে একটি একক বহির্গমন পথ তৈরিতে যন্ত্রের মধ্যভাগের ওপরে ডেলিভারি পাইপগুলো সংযুক্ত থাকতো। আধুনিক প্রকৌশলের উন্নয়নে এই পানি উত্তোলনকারী যন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে। তিনটি যুক্তিতে এ পাম্প অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

*একটি পাম্পে প্রথম জ্ঞাত সত্যিকার সাকশন পাইপের ব্যবহার (সাকশন পাইপ একটি আংশিক শূন্য জায়গায় তরল পানীয় শুষে নিতো)।

*দ্বৈত কার্যক্রম নীতির প্রথম প্রয়োগ।

* হাতল সংযোজক রডের মধ্য দিয়ে রোটারি যন্ত্রের পিস্টন যন্ত্রে রূপান্তর।

www.pathagar.com

আল-জাজারির সাকশন পিস্টন পাম্প ডেলিভারি পাইপের সহায়তায় ১৩ দশমিক ৬ মিটার পানি উত্তোলন করতে পারতো। এ যন্ত্র ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে দৃশ্যমান সাকশন পাম্পের চেয়ে আরো বেশি আধুনিক। ইউরোপে ব্যবহৃত সাকশন পাম্পে ডেলিভারি পাইপ ছিল না। এ যন্ত্র ঐ সময় মুসলিম বিশ্বে সাধারণভাবে ব্যবহৃত নোরিয়ার চেয়ে বেশি কার্যকর ছিল।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্ভাবন

আল-জাজারি প্রথম ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। এ ব্যবস্থা ছিল গীয়ার ও হাইড্রোপাওয়ার চালিত। মাত্র চারটি যন্ত্র দিয়ে জাজারি নির্ভুলভাবে পানি সেচের ডিভাইস তৈরিতে সক্ষম হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দামেস্কের মসজিদ ও বামারিস্তানের হাসপাতালে পানি সরবরাহে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়। পাহাড়ের পাদদেশে নিকটবর্তী একটি হ্রদ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়ায় পানি পৌঁছে দেয়া হতো। হুইল ও গীয়ারের সাহায্যে চালিত এ যন্ত্র একটি জলাশয়ে পানির পাত্রগুলো সরবরাহ করতো। তারপর সেখান থেকে এসব পানির পাত্র শহরের মসজিদ ও হাসপাতালে পাঠানো হতো। জাজারি হাইড্রোপাওয়ার চালিত ভ্রাম্যমাণ স্বয়ংক্রিয় ময়ুর তৈরি করেছিলেন। তিনি প্রথম স্বয়ংক্রিয় প্রবেশদ্বার তৈরি করেন। এ স্বয়ংক্রিয় প্রবেশদ্বার ছিল হাইড্রোপাওয়ার চালিত। তিনি পূর্ণাঙ্গ জলঘড়ির অংশ হিসাবে স্বয়ংক্রিয় দরজাও বানিয়েছিলেন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ঘরোয়া কাজে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি এবং পানি চালিত স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্রসহ আরো কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ডিজাইন তৈরি এবং নির্মাণ করেন। তিনি গোঁজসহ ওয়াটার হুইলও উদ্ভাবন করেন।

রোবট তৈরি

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র মতে, ইতালীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আল-জাজারির ক্লাসিক স্বয়ংক্রিয় রোবটিক যন্ত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্ক ই. রোশেম রোবটের অগ্রগতিতে আরব প্রকৌশলী বিশেষ করে আল-জাজারির অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে তার 'রোবট ইভলিউশন: ডেভেলপমেন্ট অব এনথ্রোবটিক্স'-এর ২০পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Unlike the Greek designs, these Arab examples reveal an interest, not only in dramatic illusion, but in manipulating the environment for human comfort. Thus, the greatest contribution the Arabs made, besides preserving, disseminating and building on the work of the Greeks, was the concept of practical application. This was the key element that was missing in Greek robotic science. The Arabs, on the other hand, displayed an interest in creating human-like machines for practical purposes but lacked, like other preindustrial societies, any real impetus to pursue their robotic science.'*

অর্থাৎ *'গ্রীক ডিজাইনের বিপরীতে আরবীয় ডিজাইনগুলোতে শুধু নাটকীয়* মায়াজালের প্রতি আরবদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের

www.pathagar.com

জন্য প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ ঘটেছে। গ্রীক ডিজাইন সংরক্ষণ, প্রচার ও তার ভিত্তিতে নয়া ডিজাইন নির্মাণ করা ছাড়াও এসব ডিজাইনের বাস্তব প্রয়োগে আরবরা বৃহত্তম অবদান রেখেছে। গ্রীক রোবট বিজ্ঞানে এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ঘাটতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাস্তব প্রয়োজনে আরবরা মনুষ্য আকৃতির মতো যন্ত্রপাতি তৈরিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে শিল্প বিপ্লবপূর্ব অন্যান্য সমাজের মতো রোবট বিজ্ঞানে সত্যিকার গতি সঞ্চারে তাদের ঘাটতি ছিল।'

আল-জাজারি মানুষের আকৃতিতে একজন মহিলা ওয়েট্রেস তৈরি করেন। এই ওয়েট্রেস পানি, চা অথবা উষ্ণ পানীয় পরিবেশন করতে পারতো। চৌবাচ্চাসহ একটি আধারে পানীয় মজুদ করে রাখা হতো। সেখান থেকে পানীয় একটি বাকেটে ফোটা ফোটা করে পতিত হতো। ৭ মিনিট পর একটি স্বয়ংক্রিয় দরজা গলিয়ে একজন ওয়েট্রেস বের হয়ে এসে পানীয় পরিবেশন করতো।

মহিলা রোবট পরিচারিকা

আল-জাজারি হাত ধৌতকারী একটি স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন উদ্ভাবন করেছিলেন। তার উদ্ভাবিত ওয়াশিং মেশিন ছিল আধুনিককালের ফ্লাশ টয়লেটের মতো। মনুষ্য আকৃতির একজন মহিলা পানি ভর্তি একটি বেসিনের পাশে দাঁড়ানো থাকতো। ব্যবহারকারী লিভার টানলে পানি বেরিয়ে আসতো এবং মনুষ্য আকৃতির স্বয়ংক্রিয় মহিলা পানি দিয়ে পুনরায় বেসিন পূর্ণ করতো। আল-জাজারি ময়ুর আকৃতির একটি ঝর্ণা উদ্ভাবন করেছিলেন। তার এ ঝর্ণা ছিল আরো বেশি আধুনিক। হস্তচালিত এ ডিভাইসে চাকর হিসাবে মনুষ্য আকৃতির একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছিল। এ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাবান ও তোয়ালে এগিয়ে দিতো। মার্ক ই. রোশেম 'রোবট ইভলূশন: ডেভেলপমেন্ট অব এনথ্রোবটিক্স'-এর ৯ পৃষ্ঠায় এভাবে যন্ত্রটির বর্ণনা দিয়েছেন। *`Pulling a plug on the peacock's tail releases water out of the beak; as the dirty water from the basin fills the hollow base a float rises and actuates a linkage which makes a servant figure appear from behind a door under the peacock and offer soap. When more water is used, a second float at a higher level trips and causes the appearance of a second servant figure — with a towel.'*

অর্থাৎ *'ময়ুরের লেজে একটি প্লাগে টান দিলে তার চঞ্চু থেকে পানি বের হয়ে আসবে। বেসিনের ময়লা পানিতে ফাঁপা ভিত পূর্ণ হয়ে গেলে একটি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হবে এবং একটি সংযোগ উন্মুক্ত হয়ে গেলে ময়ুরের নিচে একটি দরজার পেছন থেকে একজন চাকর এগিয়ে এসে সাবান বাড়িয়ে দেবে। আরো বেশি পানির প্রয়োজন হলে উচ্চ স্তরে স্থাপিত দ্বিতীয় ফোয়ারা প্রবাহিত হবে এবং দ্বিতীয় চাকর তোয়ালে নিয়ে হাজির হবে।'*

মিউজিক্যাল রোবট

আল-জাজারি তার গ্রন্থে স্বয়ংক্রিয় ঝর্ণা ও মিউজিক্যাল রোবটের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বয়ংক্রিয় ঝর্ণায় প্রতি আধা অথবা এক ঘণ্টা বিরতিতে পানি একটি বৃহৎ জলাধার

www.pathagar.com

থেকে আরেকটি ছোট আধারে প্রবাহিত হতো। তিনি তার এ যন্ত্রে হাইড্রোলিক সুইচ ব্যবহার করেছিলেন। জাজারির মিউজিক্যাল রোবটটি ছিল চারজন বাদ্যযন্ত্রীসহ একটি ভাসমান নৌকা। বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে দু'জন ছিল ঢুলী, একজন বীণা বাদক এবং অন্যজন বংশীবাদক। রোবটটি একটি নির্দিষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠানে ৫০টির বেশি মৌখিক ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারতো। রাজকীয় অতিথিদের মদ পরিবেশনে নৌকাটি একটি হ্রদে ভাসানো হয়েছিল। ২০০৬ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের হিস্টরি চ্যানেলের একটি টিম আল-জাজারির তৈরি কয়েকটি অতি প্রাচীন নৌকা দেখতে মালয়েশিয়ার কেবাংসান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা জাজারির তৈরি নৌকার রেপ্লিকার ছবি গ্রহণ করেন। টিমের সদস্য ও কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক নোয়েল শার্কি নৌকাটির মূল অংশ নির্মাণে সক্ষম হন। জাজারির রোবটিক নৌকায় ছিল ঢোলসহ একজন ঢুলী ও করতাল। অধ্যাপক নোয়েল বংশীবাদকের স্থলে একটি আইরিশ ক্ষুদ্র হুইসেল স্থাপন করেন। তবে তিনি তার জোড়াতালি দেয়া রোবটটিকে মদ পরিবেশনে ব্যবহারের ঝুঁকি নিতে চাননি। ২০০৭ সালে হিস্টরি চ্যানেলে 'দ্য এনশিয়েন্ট রোবটস' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানে আল-জাজারির তৈরি রোবটিক নৌকা দেখানো হয়।

জলঘড়ি

আল-জাজারি পানি এবং ওজন চালিত কয়েক ধরনের জলঘড়ি নির্মাণ করেন। এসব ঘড়ির মধ্যে পানি চালিত স্ক্রাইব ঘড়ি এবং গীয়ার চালিত ঘড়ি ছিল। বহনযোগ্য স্ক্রাইব বা লেখক ঘড়িটি ছিল এক মিটার উঁচু এবং অর্ধ মিটার প্রশস্ত। স্ক্রাইব ঘড়ির কলম ছিল সময় নির্দেশকারী কাঁটা। ১৯৭৬ সালে লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে ঘড়িটি সফলভাবে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। আল-জাজারির মোমবাতির ঘড়ি ছিল জ্ঞাত সব মোমবাতির ঘড়ির চেয়ে উন্নত। এ ঘড়িতে ব্যবহৃত মোমের প্রজ্বলনের হার জানা থাকতো। মোমবাতিটি বসানো থাকতো নিচে একটি ঢাকনার বিপরীতে। মোমবাতির পলিতা ঢাকনার গর্তের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো হতো। একটি অগভীর পাত্রে মোমবাতির শেষপ্রান্ত স্থাপন করা হতো। পাত্রের এক পাশে থাকতো একটি রিং। একটি বিপরীত ভরের কপিকলের সঙ্গে রিং যুক্ত করে দেয়া হতো। মোম জ্বলতে শুরু করলে ওজন তাকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে ওপরে তুলে ধরতো। মোমবাতির তলদেশে স্থাপিত পাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতো। মোমবাতির ঘড়িতে সময় প্রদর্শন করার জন্য একটি ডায়াল থাকতো। প্রথমবার এ ঘড়িতে একটি সঙ্গীন স্থাপন করা হয়।

১২০৬ সালে আল-জাজারি হাতি ঘড়ির বর্ণনা দেন। এটি ছিল এমন একটি ঘড়ি যার স্বয়ংক্রিয় রোবট নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজ করতো। হাতি ঘড়িতে মনুষ্য আকৃতির একটি রোবট করতালে আঘাত করলে যান্ত্রিক রোবটিক পাখিটি গান গেয়ে উঠতো। এভাবে সময় গণনা করা হতো।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ঘড়ি

আল-জাজারি পানি চালিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিশাল ঘড়ি নির্মাণ করেন। তাকে বলা হতো ক্যাসল ক্লক বা দুর্গ ঘড়ি। এ জটিল ঘড়িটি ছিল ১১ ফুট উঁচু। সময় নিরূপণ করা ছাড়াও এ ঘড়ি বহুবিধ কাজ করতে পারতো। তাতে ছিল রাশি এবং সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ প্রদর্শনকারী একটি পাত। এ ঘড়িতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির সময় নির্দেশককে গোপনে স্থাপিত একটি ঘোড়ার গাড়ি সামনে টেনে নিয়ে যেতো। অর্ধচন্দ্রটি একটি প্রবেশদ্বারের শীর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ করতো। তাতে প্রত্যেক ঘন্টায় দরজাগুলো খুলে যেতো। এ ঘড়িতে প্রতিদিন দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা ছিল। পাঁচজন রোবটিক সঙ্গীতজ্ঞ ছিল যন্ত্রটির আরেকটি উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য। লিভার চালনা করা হলে রোবটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে গান গাইতো। এ ঘড়িতে অন্য যেসব যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল ভেলাসহ একটি প্রধান চৌবাচ্চা, একটি ভাসমান চেম্বার এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রক, প্লেট, একটি সরু ভাল্ব, দু'টি কপিকল, জোডিয়াক প্রদর্শনকারী একটি অর্ধচন্দ্রাকার পাত এবং কারুকাজ করা কয়েকটি পাত্রে বল নিক্ষেপক ঈগল আকৃতির দু'টি রোবট।

শিল্প

প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক ছাড়াও আল-জাজারি ছিলেন একজন উঁচু মানের শিল্পী। তিনি মধ্যযুগের ইসলামী শিল্পকলায় বিরাট অবদান রাখেন। জাজারি তার বিখ্যাত বই আল-হিয়ালে তার আবিষ্কারের দিকনির্দেশনা দেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেইন্টিং অঙ্কনের মাধ্যমে আবিষ্কারগুলো ব্যাখ্যা করেন। তার এসব পেইন্টিংয়ে মধ্যযুগের ইসলামী স্থাপত্যকলার প্রকাশ ঘটেছে।

আল-জাজারির প্রতি ইতিহাসের অবিচার

মুসলিম বিজ্ঞানী আল-জাজারির প্রতি মানবজাতি চরম অবিচার করেছে। তিনি প্রথম হাইড্রোলিক ও মেকানিক্যাল গীয়ার নির্ভুলভাবে তৈরি এবং ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে মোনালিসার চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে। বলা হচ্ছে, দ্য ভিঞ্চি প্রথম হাইড্রোলিক ও মেকানিক্যাল গীয়ার উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেছেন। ভিঞ্চির দুই শ' বছর আগে আল-জাজারি এসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলেও তার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'আল-হিয়াল' ছিল আরবী ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষা পাশ্চাত্যের কাছে অপরিচিত হওয়ায় জাজারি উপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। গবেষকরা উপলদ্ধি করতে পারছেন যে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সম্ভবত আল-জাজারির লেখালেখিতে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। ভিঞ্চির সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৫০২ সালে দ্য ভিঞ্চি অটোমান সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের একটি প্রকল্পের অংশ হিসাবে ৭২০ ফুট প্রশস্ত সেতুর একটি একক স্প্যানের ডিজাইন প্রণয়ন করেছিলেন। এই একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, অটোমান আমলে লিওনার্দো ও জাজারির নিয়োগদাতা আর্তুকিদ সুলতানের পরবর্তী বংশদরদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বলে বিবেচিত হওয়ায় ভিঞ্চির নকশা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

www.pathagar.com

২০০৬ সালের জুনে মালয়েশিয়ার কেবাংসান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নূরুদ্দিন জামালউদ্দিন 'ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস অব ইসমাইল আল-জাজারি ওয়াটার রেইজিং সিস্টেম' শিরোনামে এক রিপোর্টে জাজারির কৃতিত্ব উদ্ঘাটন করেন। তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন মালয়েশিয়ার হিস্টরি অব পলিটিক্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান এবং আরবী ও ইসলামী সিভিলাইজেশন স্টাডিজ বিভাগের আরবী বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ড. ওয়ান কামাল মুজানির। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দু'টি পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে এসব বিশেষজ্ঞ আল-জাজারির আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেন। রিপোর্টে হাইড্রোলিক ও গীয়ার সিস্টেমের আবিষ্কারক হিসাবে জাজারিকে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব করা হয়। তাতে বলা হয়, পানি ও গীয়ার চালিত জাজারির আবিস্কৃত সেচ যন্ত্র হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং এ কৃতিত্ব একান্তভাবে তার। ভিঞ্চিকে ভুল করে উন্নতমানের প্রথম সেচ যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মালয়েশিয়ার তিনজন বিশেষজ্ঞ জাজারির যে দু'টি পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা চালান সেগুলো হলো 'ফি মারিফাত আল-হিয়াল আল-হান্দাসিয়া' (Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices) এবং 'আল-জামি বাইন আল-ইলম ওয়াল-আমল আল-নাফি সিনায়াত আল-হিয়াল' (A Compendium on the Theory and Useful Practice of the Mechanical Arts)। সিরিয়ার আলেপ্পো ইন্সটিটিউট অব অ্যারাবিক সায়েন্সেস এন্ড সিভিলাইজেশন এবং ফাউন্ডেশন অব সায়েন্স টেকনোলজি এন্ড সিভিলাইজেশনের সহযোগিতায় মালয়েশিয়ার বিশেষজ্ঞগণ জাজারির পাণ্ডুলিপি দু'টির সন্ধান পান।

www.pathagar.com

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতার গতি প্রমাণকারী আল-জারকালি

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা বা অপভূর গতি প্রমাণকারী আল-জারকালি হলেন স্পেনের একজন মুসলিম বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার পূর্ণ নাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহিয়া আল-নাকাশ আল-জারকালি। সংক্ষেপে তিনি 'আল-জারকালি' হিসাবে পরিচিত। আল-জহুরির 'কিতাব আল-জুগরাফিয়া'য় আল-জারকালির নাম আবু আল-কাসিম বিন আবদুর রহমান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলছেন, আবদুর রহমান আল-জারকালি নন, ভিন্ন ব্যক্তি। ঐতিহাসিকরা ধারণা করছেন, তার নামের শেষাংশের সঠিক উচ্চারণ হওয়া উচিত 'আল-জারকাল্লা'। ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'আরজাচেল' (Arzachel) নামে পরিচিত। জারকালি মুসলিম স্পেনের টলেডোর অদূরে একটি গ্রামে ১০২৯ সালে এক খ্রিস্টান ভিসিগথ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। জারকালি স্পেনের কাস্টিলের টলেডোতে বসবাস করতেন। শেষ জীবনে তিনি কর্ডোভাতে অবস্থান করছিলেন। তার লেখালেখিতে আন্দালুসিয়ার মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

স্পেনের দুর্দশার সাক্ষী

জারকালি ছিলেন মুসলিম স্পেনের দুর্দশার সাক্ষী। তিনি তার জীবনে এখানকার রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করেন। তার কর্মজীবন শুরু হওয়ার আগে স্পেন ছিল ইউরোপের একটি আলোকবর্তিকা। ইউরোপের রত্ন হিসাবে বিবেচিত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় অসংখ্য গুণী লোকের সমাবেশ ঘটে। কর্ডোভা ছিল ইউরোপের সবচেয়ে সভ্য নগরী। বিশ্বের বিস্ময় হিসাবে এ নগরী সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল। নগরীর রাস্তাগুলো ছিল প্রশস্ত ও আলোকিত। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় যে কোনো ভ্রমণকারী সারি সারি ভবন শ্রেণীর পাশ দিয়ে অন্তত ১০ মাইল ভ্রমণ করতে পারতো। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের সময় কর্ডোভায় প্রায় ৭০টি সরকারি লাইব্রেরি এবং ৯ শ' সরকারি শৌচাগার ছিল। কর্ডোভার আল-হামরা লাইব্রেরি রাত দিন খোলা থাকতো। খ্রিস্টান লিও, নাভারি অথবা বার্সেলোনার শাসকদের শৈল্য চিকিৎসক, স্থপতি অথবা পোশাক প্রস্তুতকারীর প্রয়োজন হলে তারা কর্ডোভার দ্বারস্থ হতেন। ইবনে আবি আমির নামে পরিচিত আল-মনসুরের আমলে কর্ডোভার এ সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। আল-মনসুর তরুণ যুবরাজ হিশামের পক্ষে ৯৭৬ থেকে ১০০২ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা

www.pathagar.com

করেন। তিনি উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান হামলা দমন করেন এবং প্রতি বছর তাদের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযান পরিচালনা করতেন। আল-মনসুর কর্ডোভার ঐতিহাসিক মসজিদ এবং বিখ্যাত আল-জাহরা নগরী নির্মাণ করেন। তার আমলে স্পেন সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে যায়। আল-মনসুরের মৃত্যুর পর মুসলিম স্পেনে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয়। ১০০৯ থেকে ১০৯১ সাল পর্যন্ত দেশটি রইস দ্য তাইফাস এবং মামুলক আল-তাবিল-এর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসময় স্পেনীয় উপদ্বীপে কমপক্ষে ৩০ জন স্বাধীন মুসলিম শাসকের আবির্ভাব ঘটে। এসব শাসক পরস্পর লড়াই করতেন। মুসলিম শাসকদের অন্তর্কলহে উৎসাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম স্পেনের খ্রিস্টানরা দক্ষিণ স্পেনে অভিযান চালায়। খ্রিস্টানদের অভিযানে একটির পর একটি মুসলিম রাজ্যের পতন ঘটতে থাকে। খ্রিস্টানরা তাদের অভিযানকালে এক মুসলিম শাসককে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। ১০৬৩ সালে মুসলমানদের কাছ থেকে বারবাস্ট্রো কেড়ে নেয়া হয়। ১০৮৫ সালে কাস্টিলের ষষ্ঠ আলফনসোর কাছে পুরনো ভিসিগথ রাজধানী টলেডোর পতন ঘটে। সেভিলের মুসলিম শাসক আল-মুতামিদ টলেডো দখলে ষষ্ঠ আলফনসোকে সহায়তা করলেও শিগগির তার ভাগ্য বিপন্ন হয়ে উঠে। স্পেনের অন্য মুসলিম শাসকদের মতো আতঙ্কে তিনিও খ্রিস্টান কাস্টিলিয়ান সৈন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে মোরাভীয়দের নেতা ইউসূফ ইবনে তাশুফিনের সহায়তা কামনা করেন। ইবনে তাশুফিন মরক্কো থেকে তিনবার স্পেনে অভিযান চালিয়ে খ্রিস্টান সৈন্যদের বিধ্বস্ত করেন। তবে প্রতিবারই তাকে স্পেন ত্যাগের অনুরোধ জানানো হতো। তৃতীয়বার ১০৯০ সালে তাকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবার তিনি জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করেন এবং নামসর্বস্ব মুসলিম শাসক রইস দ্য তাইফাসকে বিধ্বস্ত করে স্পেনে আলমোরাভীয় শাসন কায়েম করেন। আলমোরাভীয়দের অনুসরণ করে আলমোহাদীয়রা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনকে মুসলিম শাসনাধীনে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও অভ্যন্তরীণ কলহ স্পেনে মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ডেকে আনে। ১২৩৬ সালে কর্ডোভা এবং ১২৪৮ সালে সেভিলের পতন ঘটে। তারপর একে একে অন্য শহর ও নগরগুলোর পতন ঘটতে থাকে। স্পেনে মুসলিম শাসনের সাক্ষী হিসাবে একমাত্র গ্রানাডা দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের যবনিকাপাত ঘটে।

স্পেনের এ দুর্ভাগ্য আল-জারকালির জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। কাস্টিলের খ্রিস্টানরা বিশৃঙ্খল রইস দ্য তাইফাসের ওপর আক্রমণ চালালে মুসলমানদের মধ্যে অনিশ্চয়তার প্রথম পর্ব শুরু হয়। আলমোরাভীয়দের হস্তক্ষেপে কাস্টিলিয়ানদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। এসময় জারকালি স্পেনেই অবস্থান করছিলেন। খ্রিস্টানদের অগ্রযাত্রার সময় মুসলিম পণ্ডিতরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। ১০৮৫ সালে কাস্টিলের খ্রিস্টানদের নেতা ষষ্ঠ আলফনসো টলেডো দখল করে নিলে জারকালি জীবন নিয়ে পালিয়ে যান। মুসলিম বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের জীবনে

www.pathagar.com

নেমে আসে অভিশাপ। ইবনে বাসাম রিক্ত হাতে পর্তুগালের সান্টারাম থেকে পালাতে বাধ্য হন। দানিয়ার আবু সালত এবং টারটোসার আবু বেহার আল-তোরতুচির মতো পণ্ডিতগণ স্পেন থেকে মিসরে পালিয়ে যান। কবি ইবনে ওয়াহবুনের মতো বহু হতভাগ্য মুসলিম তখনো স্পেনে অবস্থান করছিলেন। ১০৮৭ সালে ইবনে ওয়াহবুনকে কাস্টিলের খ্রিস্টানরা লরকা থেকে মুরসিয়ার মধ্যবর্তী রাস্তায় হত্যা করে। টলেডো থেকে পলায়নকারী মুসলমানদের জন্য মুর মুসলমানরা শরণার্থী শিবির খোলে। ১০৮৭ সালে এমন একটি শরণার্থী শিবিরে জারকালি ইন্তেকাল করেন।

নিরক্ষর থেকে পণ্ডিত

জারকালি নিরক্ষর থেকে পন্ডিত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। টলেডো ছিল তখনকার টাইফার রাজধানী। মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মিলেমিশে বাস করার জন্য টলেডোর খ্যাতি ছিল। আল-জারকালি একজন ধাতু শিল্পী হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ কাজে বিশেষ যোগ্যতার জন্য তার উপনাম ছিল 'আল-নাকাশ'। আরবীতে আল-নাকাশ শব্দের মানে হলো 'ধাতু খোদাইকারী'। ধাতু শিল্পী হিসাবে তিনি কাজী সৈয়দ আল-আন্দালুসির অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হন। ১০৬০ সালে স্পেনে ইয়াহিয়া আবি ইবনে মনসুরের নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়। জারকালি তার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। দ্রুত তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মর্যাদাপূর্ণ একটি গ্রুপের জন্যও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে থাকেন। এসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার অসাধারণ মেধা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং তার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তিনি তখন এসব পন্ডিতকে জানান যে, তার বিদ্যা বুদ্ধি অত্যন্ত সামান্য। তিনি কখনো বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেননি। এমনকি কখনো বই স্পর্শ করেননি। তার এ জবাব শুনে পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং অধ্যয়ন করতে বাধ্য করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের গ্রুপ তাকে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দেন। টলেডোর বিভিন্ন মক্তব্যে দু'বছর শিক্ষা লাভ শেষে ১০৬২ সালে জারকালি পণ্ডিতদের সেই গ্রুপের সদস্য মনোনীত হন। শিগগির তিনি এ গ্রুপের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তী বছরগুলোয় তিনি তার নিজস্ব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে শুরু করেন। অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুরোধ করলে তিনি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে দিতেন। জারকালি এত অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন যে, তিনি তার শিক্ষকদের শিক্ষা দিতে থাকেন। এসব বিদ্বান ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছিলেন। গ্রহ, নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব সম্পর্কে জারকালির গণনা তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করতেন।

টলেডো জলঘড়ি নির্মাণ

আল-জারকালি দিন ও রাতের সময় এবং চান্দ্র মাসের দিন নির্ধারণে সক্ষম একটি জলঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি 'টলেডো ঘড়ি' নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত জলঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। কবি মুসা ইবনে এজরা ঘড়িটির উদ্দেশ্যে তার একটি

www.pathagar.com

কবিতা উৎসর্গ করেন। কবিতার প্রথম পংক্তিতে তিনি টলেডোর ঘড়িকে 'জারকালির বিস্ময়কর আবিষ্কার' হিসাবে মন্তব্য করেছিলেন। কাস্টিলিয়ান অনুবাদে আল-জহুরি ঘড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন। ১১৩৫ সাল পর্যন্ত ঘড়িটি চালু ছিল। খ্রিস্টান রাজা ষষ্ঠ আলফনসো ঘড়িটি দেখতে পান এবং কিভাবে তা কাজ করে তা জানার চেষ্টা করেন। তারপর তিনি হামিস ইবনে জাবারাকে ঘড়িটি খুলে নেয়ার নির্দেশ দেন। ঘড়িটি খুলে ফেলার পর আর কেউ তা জোড়া লাগাতে পারেনি। ঘড়িটিতে চান্দ্র মাসের নির্ভুল বর্ণনা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে টলেডোর জলঘড়ির আদলে ইউরোপে ঘড়ি নির্মাণ করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। জারকালির ঘড়িতে পানির দু'টি উন্মুক্ত পাত্র ছিল। চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে পানির এ দু'টি পাত্র খালি অথবা পূর্ণ হতো। দিগন্তে যে মুহূর্তে নয়া চাঁদ উদিত হতো ঠিক তখন ভূমির নিচে প্রোথিত পাইপের সাহায্যে পানির পাত্র দু'টিতে প্রবাহ শুরু হতো। প্রথম সাত দিন ও সাত রাতে পানির পাত্র দু'টি অর্ধেক পূর্ণ হতো এবং পরবর্তী সাত দিন ও সাত রাতে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হতো। এসময় পূর্ণিমা শুরু হতো। চান্দ্র মাসের পনের দিনের মাথায় দিবাগত রাত থেকে পাত্র দু'টি খালি হতে শুরু করতো। কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের ঊনত্রিশতম রাতে পাত্রে এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকতো না।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

১০৬০ সালে জারকালি জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিভাবে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় তার বর্ণনা দিয়ে 'আল-সাফিহা আল-জারকালিয়া' শিরোনামে ২৯টি গ্রহের তালিকা সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সূর্যের গতি নিরীক্ষণে উন্নতমানের এস্ট্রোল্যাব তৈরি করেন। তার তৈরি এস্ট্রোল্যাবের নাম ছিল 'বোর্ড জারকালি'। জারকালি উদ্ভাবিত এস্ট্রোল্যাবের প্রতি ইউরোপের গভীর আগ্রহ জন্ম নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যন্ত্রটি 'এস্ট্রোল্যাব জারকালি' নামে চালু করা হয়। ১০৮০ সালে জারকালি কালবালাযাদার (রেগুলাস) দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন। ১০৮৭ সালে তিনি তার জীবনে শেষবার পর্যবেক্ষণ চালান। জারকালি ছিলেন মূলত জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী। কর্ডোভায় তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাকে তার সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হতে সহায়তা করে।

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারণ

জারকালি গ্রীক বিজ্ঞানীদের গণনাগুলো সংশোধন করে প্রমাণ করেন, মুসলিম বিজ্ঞান গ্রীক বিজ্ঞানের অনুলিপি নয়। তিনি ভৌগোলিক উপাত্ত বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে টলেমির গণনা সংশোধন করেন। টলেমির মতে, ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য ৬৩ ডিগ্রি এবং আল-খাওয়ারিজমির মতে, ৫০ ডিগ্রি। জারকালি তার সৌর বর্ষ বিষয়ক গ্রন্থ ট্রাটাডো রেলেটিভো আল-মোভাইমেন্টো ডি লাস ইট্রেলাস ফিজাস' (Tratado relativo al-moviemento de las etrellas fijas)-এ হিসাব করে বের করেন যে, এ সাগরের দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য বা মান ৪২ ডিগ্রি। একই গ্রন্থে তিনি স্থির গ্রহের ভিত্তিতে প্রথম

www.pathagar.com

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা বা অপভূর (Solar Apogee) গতি প্রমাণ করেন। তিনি অপভূর গতির হার প্রতি বছর ১২ দশমিক ৪ সেকেন্ড পরিমাপ করেন। আধুনিক পরিমাপ হলো ১১ দশমিক ৮ সেকেন্ড। তার পরিমাপ আধুনিক পরিমাপের অত্যন্ত কাছাকাছি। জারকালি সূর্যের অপভূর দ্রাঘিমাংশের মান ৭৭ ডিগ্রি ৫৫´ নির্ধারণ করেন। তিনি এ উপসংহারে পৌঁছান যে, ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা ২৩ ডিগ্রি ৩৩´ এবং ২৩ ডিগ্রি ৫৩´-এর মধ্যে ঘুরছে।

জারকালি বুধ গ্রহ সম্পর্কে টলেমির আরেকটি ভুল সংশোধন করেন। টলেমির জটিল মডেলে বলা হয়েছিল, বুধের ডিফারেন্টের কেন্দ্র একটি দ্বিতীয় এপিসাইকেল বা ক্ষুদ্রতর বৃত্তের ভেতর ঘুরছে। কিন্তু জারকালি বলেন, দ্বিতীয় এপিসাইকেল কোনো বৃত্ত নয়। বরং তা প্রায় গোলাকার এবং একটি ফলের বীচির মতো। সৌরজগৎ সংক্রান্ত জারকালির মডেলে বলা হয়, সূর্যের ডিফারেন্টের কেন্দ্র একটি ক্ষুদ্র ও ধীর গতিতে আবর্তনশীল বৃত্তের ভেতর ঘুরছে। তার এ মডেল নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভার্দুনের বার্নার্ড এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মান গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিগিওমন্টানাস এবং অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ ভন পিয়ুরবাচ আলোচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস তার 'ডি রেভলিউশনিবাস অরবিয়াম কোয়েলেস্টিয়াম' (De Revolutionibus Orbium coelestium)-এ জারকালির মডেল ব্যবহার করেন এবং এস্ট্রোল্যাব সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপকভাবে তার সহায়তা গ্রহণ করেন।

আবিষ্কার

আল-জারকালি শুধু তত্ত্বগতভাবে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন আবিষ্কারক। তার আবিষ্কার ও কর্ম টলেডোকে আল-আন্দালুসের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত করে। জারকালি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এস্ট্রোল্যাব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তার এ যন্ত্র ছিল সবচেয়ে আধুনিক ও নির্ভুল। এ এস্ট্রোল্যাব যন্ত্রটি বেশ কয়েকটি কাজে ব্যবহার করা যেতো। সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অক্ষাংশ নির্ধারণে বিষুব রেখা, অয়নান্ত বৃত্ত ও দিগন্তের নকশাসহ প্ল্যানিসফেয়ার এস্ট্রোল্যাবের সন্মুখভাগে রাশিচক্রের একটি বৃত্ত ও পাত (সাফিয়া অথবা আজাফা) ছিল। এ যন্ত্রের সাহায্যে বৃত্তাকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব হয় এবং দিনের সময় নির্ধারণ করা হয়। তিনি আরেক ধরনের এস্ট্রোল্যাব যন্ত্রও তৈরি করেন। তার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি ইউরোপে সাফিয়া নামে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। তার সংশোধিত এস্ট্রোল্যাব সূর্যের গতি পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হতো। জারকালির যন্ত্রপাতিগুলো ছিল খুবই পরিচিত। ১৫৩৪ সালে নুরেমবার্গের জোহান স্কোনার এসব যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্বলিত জারকালির একটি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

রচনাবলী

জারকালির ৭টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার প্রথম গ্রন্থটির নাম 'টেবলস অব টলেডো' (Tables of Toledo) বা টলেডোর তালিকা। বইটির মূল আরবী সংস্করণ

www.pathagar.com

হারিয়ে গেলেও দু'টি ল্যাটিন অনুবাদ টিকে রয়েছে। প্রথম অনুবাদ কর্মটি হলো ক্রিমোনার গেরার্ডের এবং দ্বিতীয় অনুবাদ কর্মটি সেভিলের জনের। জনের অনুবাদ গেরার্ডের চেয়ে ছোট। 'টলেডো টেবলস' ল্যাটিন বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১১৪০ সালে 'টলেডো টেবলস' অবলম্বনে 'মার্সেলিস টেবলস' রচনা করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ গ্রন্থটি গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। জারকালি একটি আলমানাক প্রণয়ন করেছিলেন। এ আলমানাকে বহু তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব তালিকা দেখে যে কেউ কপটিক, রোমান, চান্দ্র ও পার্সী মাসের দিন তারিখ খুঁজে বের করতে পারতো। অন্যান্য তালিকায় গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান প্রদর্শন করা হয়। জারকালির আলমানাকে ১০৮৮ থেকে ১০৯২ সাল পর্যন্ত চারটি সৌর বর্ষে সূর্যের সত্যিকার দৈনিক অবস্থান এবং ৮ বছর সময়ে প্রতি পাঁচ বা দশ দিনে পাঁচটি গ্রহের সত্যিকার অবস্থান নির্দেশ করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রিমোনার গেরার্ড জারকালির গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন এবং এ গ্রন্থ খ্রিস্টান ইউরোপে গণিতভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম দেয়। আল-জারকালি প্রণীত 'আল-সাফিহা আল-জারকালিয়া' (Azafea) একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা।

জারকালির 'ট্রাটাডো রিলেটিভো আল-মোভাইমেন্টো ডি লাস ইট্রেলাস ফিজাস' গ্রন্থটি কেবলমাত্র স্যামুয়েল বেন ইয়াহুদার একটি হিব্রু অনুবাদের মধ্য দিয়ে টিকে রয়েছে। ২৫ বছরের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বইটি লিখা হয়। ১০৭৮ সালের আগে ট্রাটাডো'র একটি খসড়া টলেডোর শাসক আল-মামুনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। খসড়াটির নাম ছিল 'আজাফিয়া মামুনিয়া'। এ বইটি দশম আলফনসোর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। তবে আল-মুতামিদ ইবনে আব্বাদের নামে উৎসর্গীকৃত 'আজাফিয়া আব্বাদিয়া' পরবর্তীকালে দু'টি সংস্করণে প্রকাশিত হয়। বৃহৎ সংস্করণে ছিল এক শ' অধ্যায়। দশম আলফনসোর দরবারে কাস্টিলিয়ান ভাষায় বইটির অনুবাদ করা হয়। ল্যাটিন বিশ্বে বইটি সামান্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। ৬০ অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি জ্যাকব ইবনে তিব্বনের মাধ্যমে অন্য চিন্তাবিদের কাছে পৌঁছে। জারকালি তার গ্রন্থ ট্রাটাডো'র মাধ্যমে গাণিতিকভাবে ট্রেপিডেশন থিওরি (Trepidation theory) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ট্রেপিডেশন থিওরি অনুসারে স্থির গ্রহগুলোর গোলকের গতি একটি সরল রেখার গতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। জারকালি তিনটি মডেল অনুসারে এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির একটি অনুচ্ছেদে ত্রিকোণমতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সাইন, কোসাইন, সিকান্ট ও টানজেন্টের কয়েকটি তালিকা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ১১৫৪ সালে পাভিয়ার ইতালীয় জন, ১২৯৬ সালে উইলিয়াম ডি সেন্ট ক্লাউড ল্যাটিন এবং ১৩০১ সালে জ্যাকব ইবনে তিব্বন হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া পর্তুগীজ, কাটালান ও কাস্টিলিয়ান ভাষায়ও গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়। ফ্রান্সের মাউন্টপিলারের একজন ইহুদী জারকালির রচিত 'আল-সাফিহা আল-জারকালিয়া' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। জারকালি টলেমির মডেলের এপিসাইকেল ব্যবহার করে গ্রহগুলোর অবস্থান পরিমাপে 'ইক্যুয়াটরিয়াম' (Equatorium) নামে একটি যন্ত্র

www.pathagar.com

নির্মাণে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা দশম আলফন্সোর নির্দেশে এ দু'টি গ্রন্থ 'লাইব্রোস ডি লাস লামিনাস ডি লস ভি প্লানেটাস' (Libros de las laminas de los vii planetas) শিরোনামে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রিগিওমন্টানাস জারকালির এস্ট্রোল্যাবের কার্যকারিতার বিবরণ প্রকাশ করার জন্য তার একটি বই অনুবাদ করেন।

প্রভাব

আল-জারকালি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী বিজ্ঞানী। তার 'টলেডো টেবলস' খ্রিস্টান ইউরোপে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। টলেডো টেবলসে রাইট এসেনশন্স, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহের ইক্যুয়েশন, লম্বন, গ্রহণ, গ্রহের অস্ত, থিওরি অব ট্রেপিডেশন, একশেসন ও রেসিশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জারকালির পরিমাপের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের তালিকা করা হয়। তার তালিকার ভিত্তিতে প্রথম মার্সেলিসের রেমন্ড একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিওপোল্ড 'কম্পাইলেশিও ডি এস্ট্রোনাম সায়েনশিয়া' (Compilatio de astronum scientia) শিরোনামে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১০ খণ্ডে বিভক্ত এ বইটি লিখার জন্য লিওপোল্ড জারকালির কাছে বহুলাংশে ঋণী। খ্রিস্টান রাজা দশম আলফন্সো জারকালির গ্রন্থ অনুসরণে 'টেবলাস আলফনসিনাস' (Tablas alfonsinas) শিরোনামে একটি গ্রন্থ লিখেন। ১১৪৯ সালে চেস্টারের রবার্টের একটি গ্রন্থ সংকলিত হয়। এ বইটি তিনি লিখেছিলেন আল-জারকালির জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তালিকা অবলম্বনে।

জারকালির গ্রন্থাবলী ইবনে বাজ্জাহ, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশদ, ইবনে আল-কামাদ, ইবনে আল-হাইম আল-ইশবিলি, আবু হাসান আল-মারাকাশি, ইবনে আল-বান্না ও নূরুদ্দিন আল-বিত্রুজির মতো মুসলিম বিজ্ঞানীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তার গ্রন্থ ষোড়শ এমনকি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে মুদ্রিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে অভিযাত্রীরা অক্ষাংশ নির্ধারণে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আব্রাহাম যাকুটের সৌর ডেক্লিনেশন তালিকা ব্যবহার করতেন। এই আব্রাহাম যাকুট গ্রহ, নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডলীর গতি সম্পর্কে জারকালিকে অনুসরণ করেছেন।

সম্মান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল-জারকালির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৫ সালে তার নামে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ১৮ দশমিক ২ এস দ্রাঘিমাংশ এবং এক দশমিক ৯ ডব্লিউ অক্ষাংশে আরজাচেল গহ্বরের দৈর্ঘ্য ৯৬ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

মানব জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণেতা আবুল ফিদা

বিখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবুল ফিদার পূর্ণ নাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তাকিউদ্দিন ওমর ইবনে শাহান শাহ ইবনে আইয়ুব আল-মালিকুল মুয়ায়েদ ইমাদউদ্দিন আল-আইসুরি। এত লম্বাচুরা নাম হলেও তিনি সংক্ষেপে 'আবুল ফিদা' নামে পরিচিত। আবুল ফিদা হলেন মানব জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণেতা। তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে প্রাক-ইসলাম ও ইসলাম পরবর্তী এবং ১৩২৯ সাল পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস রচনা করেন। আবুল ফিদা ক্রুসেড বিখ্যাত বীর সালাহউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবী রাজপরিবারের হামা শাখার অন্যতম সদস্য। ১২৭৩ সালের নভেম্বরে দামেস্কে তার জন্ম। এ সময়ে হামা পরিবার মোঙ্গলদের ভয়ে হামা থেকে দামেস্কে গিয়ে বাস করছিল। পরিবারটি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও ফিদার শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তারা ছিল পূর্ণ মনোযোগী। তাকে অল্প বয়সেই পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। আবুল ফিদা ক্রুসেড বিরোধী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালে পিতা ও চাচাতো ভাই হামার অধিপতি আল-মালিকুল মোজাফফর দ্বিতীয় মাহমুদের নেতৃত্বে সেন্ট জনের নাইটদের শক্তঘাটিতে অভিযানের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিপোলি, আক্রা ও কালাত আল-রুম অবরোধ ও অধিকারের সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন। তার বয়স ছিল তখন মাত্র ১২ বছর।

ক্রুসেড পরবর্তী অভিযানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১২৯১ সালে হামায় আইয়ুবী শাসনের অবসান হলেও তিনি সেখানকার মামলুক শাসনকর্তাদের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি মামলুক সুলতান নাসিব মোহাম্মদ ইবনে কালাউনের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। তবে আবুল ফিদা হামার শাসনভার লাভে সচেষ্ট থাকলেও সফল হননি। পরে ফজল পরিবারের শেখ মোহান্নার সুপারিশে ১৩০০ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি হামার গভর্নর নিযুক্ত হন। এভাবে তিনি পিতৃপুরুষের রাজ্যটি ফিরে পান। ১৩১২ সালে তাকে আজীবনের জন্য শাসক ঘোষণা করা হয়। তবে দু'বছর পরই অন্যান্য শাসনকর্তার সঙ্গে তাকে সরাসরি দামেস্কের গভর্নর তানকিযের অধীনস্থ করে দেয়া হয়। তাতে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। পরবর্তী বছরগুলোয় তিনি তার ক্ষমতা সংহত করেন। ১৩১৯-২০ সালে তিনি সুলতান মোহাম্মদের সঙ্গে হজ করতে মক্কা যান। হজ শেষে তারা কায়রো ফিরে আসেন। ১৩২০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাকে 'নিশানাত-ই সালতানাত' এবং 'আল-মালিকুল মুয়ায়েদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। একইসঙ্গে তাকে সিরিয়ার সব গর্ভনরের ওপর স্থান দেয়া হয়।

আবুল ফিদা জ্ঞান ও সাহিত্যের শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নয়, নিজে পণ্ডিত ও লেখক হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক তার সব রচনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি তার দু'টি গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। একটি হলো 'তারিখুল মুখতাছার ফি আখবারিল-বাশার' এবং অন্যটি হলো 'তাকবিমুল বুলদান'।

www.pathagar.com

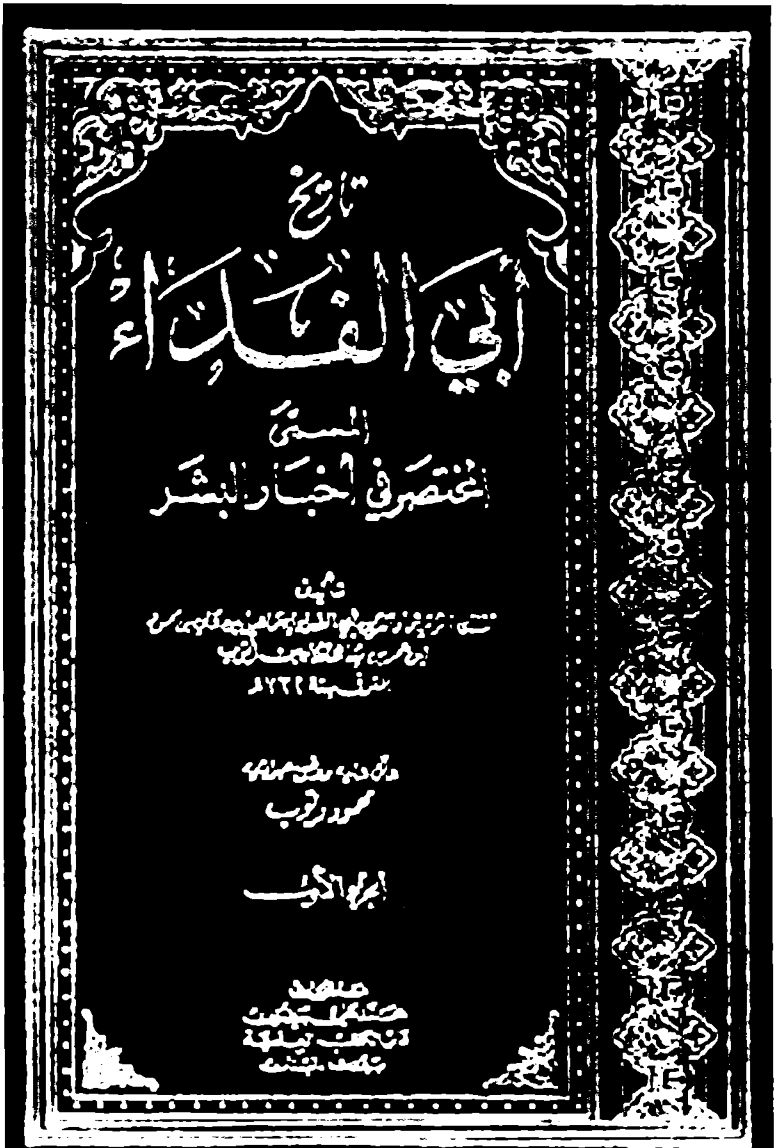

আবুল ফিদা রচিত বিশ্বকোষ তারিখুল মুখতাছারের প্রচ্ছদ

www.pathagar.com

বিশ্ব ইতিহাস রচনা

'তারিখুল মুখতাছার ফি আখবারিল-বাশার' (The Concise History of Humanity) বা 'তারিখ আবু আল-ফিদা' (History of Abu al-Fida) বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৩২৫ সালে আবুল ফিদা গ্রন্থটি প্রণয়ন শুরু করেন। এতে পৃথিবীর সূচনা থেকে ১৩২৯ সাল পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় ১৪ বছরে তিনি গ্রন্থটি লিখেন। গ্রন্থটির প্রথম অংশ প্রধানত ইবনুল আছিরের ইতিহাস গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। তবে আবুল ফিদা এতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। হামায় তার প্রাসাদের বিরাট লাইব্রেরিতে সংগৃহীত গ্রন্থাবলী থেকে তিনি নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থটিতে তিনি সমসাময়িক তথ্যাবলী সন্নিবেশ করেছেন। যুদ্ধ ও রাজনীতি এবং আফ্রিকা ভ্রমণের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তার বইকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ তার গ্রন্থটি সমাদরের সঙ্গে লুফে নেন এবং নিজেরা বইটিকে আরো উন্নত করেন। ইবনুল ওয়ারদি ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত বইটিতে নতুন তথ্য সংযোজন করেন। তারপর ইবনে হাবিব ১৩৭৫ সাল পর্যন্ত এবং ইবনুল শিহানা আল-হালাবি ১৪০৩ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস সংযোজিত করেন। পাশ্চাত্যেও আবুল ফিদার গ্রন্থটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ঐতিহাসিক তাবারি এবং ইবনুল আছিরের গ্রন্থ ইউরোপীয়দের মনোযোগ আকৃষ্ট করার আগে আবুল ফিদার গ্রন্থ তাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। তার আগে আবুল ফারাজের গ্রন্থ পাশ্চাত্যের গোচরীভূত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থটি প্রাচ্য বিষয়ক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। মূল বইটি প্রথমবার ইস্তাম্বুল থেকে দু'খণ্ডে ১৮৬৯-৭০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭২৩ সালে জন গ্যাগনিয়ার বিশ্বনবীর (সা.) জীবনী অংশটুকু আরবী ও ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। জ্যাকব গিওর ক্রিশ্চিয়ান এডলার তার পূর্বসূরি জোহান জ্যাকব রাইসকি সম্পাদিত গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের আরবী ও ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন।

তাকবিমুল বুলদান

আবুল ফিদা ১৩১৬ সালে তার ভূগোল গ্রন্থ 'তাকবিমুল বুলদান' লেখা শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৩২১ সালে। তার নিজেব সংশোধিত একটি সংস্করণ লন্ডনের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। ভূগোল বিষয়ক এ গ্রন্থে পৃথিবীর আকার, সাতটি আকলিম, সমুদ্র, হ্রদ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও গাণিতিক তথ্য ছক আকারে সংযোজন করা হয়েছে। বইটি লিখায় টলেমি, দশম শতাব্দীর কিতাবুল আতওয়াব, আল-বেরুনি এবং ইবনে সাইদ আল-মাগরেবির গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। বইটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এক একটি পরিচ্ছেদে পৃথিবীর একেক অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হলো যথাক্রমে (১) আরব (২) মিসর (৩) মাগরিব (৪) বিষুবীয় আফ্রিকা (৫) স্পেন (৬) ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ (৭) ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাঞ্চল (৮) সিরিয়া (৯) জাজিরা (১০) ইরাক (১১) খুজিস্তান (১২) ফারস (১৩) কিরমান (১৪) সিজিস্তান (১৫) সিন্ধু

www.pathagar.com

(১৬) হিন্দ (১৭) চীন (১৮) পূর্বদিকের দ্বীপ (১৯) এশিয়া মাইনর (২০) আর্মেনিয়া হাররান এবং আজারবাইজান (২১) জিবাল (২২) দায়লাম ও জিলান (২৩) তাবারিস্তান মুজান্দারান ও কুমিস (২৪) খোরাসান (২৫) জাবুলিস্তান (২৬) তুখারিস্তান ও বাদাখশান (২৭) খাওয়ারিজম (২৮) মাওয়ারালন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)।

এমন ভাগ করে আলোচনা করা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীকে ২৮টি ভাগে ভাগ করে নিতেন। আবুল ফিদাও একইভাবে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। উল্লেখিত পরিচ্ছেদগুলো সমান নয়। কোনোটি বেশ বড় আবার কোনোটি ছোট। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ দু'অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সংশ্লিষ্ট দেশটির সাধারণ বর্ণনা দেয়া হয়। যেমনঃ সীমারেখা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক এবং জাতিগত বিভাগ, আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি, পাহাড়- পর্বত, বড় বড় রাস্তা ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় অংশে ছক কাটাভাবে বড় বড় শহরের নাম, দেশটি সম্পর্কে সংগৃহীত খবরের উৎস, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, গাণিতিক আবহাওয়া অর্থাৎ স্থানাঙ্ক অনুসারে আবহাওয়া, প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা আঞ্চলিক আবহাওয়া, বিশুদ্ধ বানান এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আবুল ফিদা অনেক জায়গায় পরস্পরবিরোধী স্থানাঙ্ক পরিবেশন করেছেন। বর্তমানে জ্ঞাত স্থানাঙ্ক অনুসারে অনেকগুলো সঠিক নয়। তার একটি বিশেষত্ব হলো তিনি স্থানাঙ্কগুলো সংখ্যার পরিবর্তে আবজাদ অর্থাৎ আরবী বর্ণমালায় প্রচলিত কাল্পনিক মান অনুসারে পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় দু'টি বিবরণ দেয়া হয়েছে। একটি হলো সমগ্র পৃথিবীর চারদিক ভ্রমণের সময় একদিন কমে যাওয়া। আরেকটি হলো পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি। তার মতে, পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ মাটি পানি থেকে তিন গুণ ভারি। গ্রন্থটির রিনাউ ও গায়ার্ডের সংস্করণে লবণ খনি, বিটুমিন, পারদ, রূপা, সোনা প্রভৃতি কোথায় কোথায় আছে এবং কিভাবে সেগুলো খনি থেকে উদ্ধার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল ফিদা তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন একাদশ শতাব্দীর ইবনে জাযলার গ্রন্থের নামানুসারে। গ্রন্থের দীর্ঘ পরিচ্ছেদগুলোতে ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশের দেশগুলো এবং সিরিয়া, আরব, মাগরিব, মিসর, নিরক্ষীয় আফ্রিকা, স্পেন, ট্রান্স অক্সিয়ানা, ইরাক, জাজিরাতুল আরব ও পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য পরিচ্ছেদগুলোতে চীন ও ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ট্রান্স অক্সিয়ানার পরিচ্ছেদে সবচেয়ে বিখ্যাত অথচ অত্যন্ত ছোট সুগদ জেলার বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রদেশটির মধ্য দিয়ে সুগদ নদী প্রবাহিত। এ নদীর তীরে বুখারা এবং সমরকন্দ অবস্থিত। সুগদকে বলা হতো পৃথিবীর চারটি বেহেস্ত সদৃশ স্থানের একটি।

আবুল ফিদাকে শুধু মুসলিম ইতিহাস নয়, সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসাবে গণ্য করা যায়। তার ভূগোল গ্রন্থ তাকবিমুল বুলদানে তখনকার দিনের জ্ঞাত পৃথিবীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ার। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ করেন যে, ক্রমাগত সারা পৃথিবী চারদিক ভ্রমণ করলে একদিন কম

www.pathagar.com

বা বেশি হবে। তার গ্রন্থে তিনি প্রত্যেক দেশের বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের বড় বড় শহরের নাম, স্থানাঙ্ক এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক স্থানের দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ বর্ণনা করেছেন হয় নিজে গবেষণা করে অথবা যে স্থানের স্থানাঙ্ক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে সেখান থেকে দূরত্ব নির্ণয় করে। তবে এগুলোর সবই যে নির্ভুল নয় সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন সজাগ এবং এজন্য আগের গ্রন্থগুলোর সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যেসব গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে খলিফা আল-মামুনের জন্য রচিত গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ 'কিতাব রসম আল-রাব আল-মামুন', দশম শতাব্দীর অজ্ঞাত গ্রন্থকারের 'কিতাব আল-আতওয়াল ওয়াল উরুদ', আল-বেরুনির 'কানুন-ই-মাসউদী' প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে পরিবেশিত স্থানাঙ্কগুলোতে প্রচুর গরমিল থাকায় আবুল ফিদা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সবগুলোই উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সারটনের মতে, সব বিষয় বিবেচনা করলে ধর্ম কিংবা জাতিগতভাবে আবুল ফিদাকে তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস ভূগোলবিদ হিসাবে গণ্য করা যায়। তার ভূগোল গ্রন্থে দেশে দেশের খনিজ, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এসব দেশের জলবায়ুর কথাও আলোচনা করা হয়েছে। পশুপাখি ও উদ্ভিদকূলের সঙ্গে আবহাওয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং এগুলো আবহাওয়ার প্রকৃতি জানতে সাহায্য করলেও তিনি সে বিষয়ে মাথা ঘামাননি।

আবুল ফিদার গ্রন্থ থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য ছিল তথ্যসমৃদ্ধ একটি বিশ্বকোষ রচনা করা। এ মনোভাব থেকে তিনি তার গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি পূর্বেকার গ্রন্থগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং গ্রন্থের প্রথমেই সে সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে জায়গাগুলোর নামের বিশুদ্ধ বানান (orthography) এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ (orthophony) নির্ণয় করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে মোহাম্মদ ইবনে আলী সিপাহজাদে তুর্কি ভাষায় 'আউদাহ আল-মাসালিক ইলা মারিফাত আল-বুলদান ওয়াল মামালিক' শিরোনামে তার বইয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বইটির কোনো কোনো অংশের সম্পাদনা ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪০ সালে আই .টি. রিনাউ এবং ব্যারন দ্য স্লেন বইটি সম্পাদনা করে ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করেন। রিনাউ আরেকটি ফরাসি অনুবাদ শুরু করেন এবং স্টেইনলেস গায়ার্ড তা শেষ করেন। ১৮৮৩ সালে সম্পূর্ণ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী

আবুল ফিদা উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও উৎসাহী ছিলেন। তিনি 'কুন্নাশ' নাম দিয়ে পাঁচ খণ্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর একটি বই রচনা। আবুল ফিদা কতগুলো বই লিখেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত তার যে সব বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলোঃ

www.pathagar.com

(১) তারিখুল মুখতাছার ফি আখবারিল-বাশার
(২) তাকবিমুল বুলদান
(৩) আততিব আল-মাসবুক ফি তাওয়ারিখ আকাবির আল-মুলুক
(৪) তাবাকাত আশগুয়ারা
(৫) মুখাতাসার সুনান আল-বায়হাকি
(৬) কুন্নাশ

সম্মান

আবুল ফিদার সম্মানে ১৯৩৫ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ১৪ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ১৪ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ৬৫ কিলোমিটার।

মৃত্যু

আবুল ফিদা ১৩৩১ সালের ২৭ অক্টোবর সিরিয়ার হামাতে পরলোকগমন করেন এবং সেখানেই তার নিজের নির্মিত সমাধি সৌধে তাকে সমাহিত করা হয়। ১৯২৫ সালে ড. তৌফিক নিজ উদ্যোগে ভগ্নপ্রায় সমাধিটি পুনরায় সংস্কার করেন।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অগ্রদূত ইবনে আল-শাতির

ইবনে আল-শাতিরের পূর্ণ নাম আল-আলাদিন আবুল হাসান আলী ইবনে ইব্রাহিম ইবনে আল-শাতির। তার জন্ম ১৩০৪ সালে। তিনি ছিলেন একজন আরব মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, প্রকৌশলী ও আবিষ্কারক। তিনি সিরিয়ার দামেস্কে বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদে 'মুয়াক্কি' বা সময়রক্ষক হিসাবে কাজ করতেন। এ কাজের জন্য তার সময় দেখতে হতো। সময় দেখার জন্য তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হতো। আর এভাবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছিলেন। ইবনে আল-শাতির হলেন জ্যোতির্বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অগ্রদূত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

'কিতাব নিহায়াত আল-সাল ফি তাশহি আল-উসুল' (The Final quest Concerning the Rectification of the planetary Principles) হলো তার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। বইটিতে তিনি নিজস্ব মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রের টলেমি মডেল ব্যাপকভাবে সংশোধন করেন। ইবনে আল-শাতির তার মডেলে এপিসাইকেল বা বৃহত্তর বৃত্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্তের ভেতর নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহগুলোর আবর্তনের ধারণা পরিত্যাগ করেন। 'তুসি কাপল'-এর মধ্য দিয়ে তিনি বহুকেন্দ্রিকতা ও ইক্যুয়ান্ট প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়া তিনি লিউনার মডেলের সব বহুকেন্দ্রিকতা, এপিসাইকেল ও ইক্যুয়ান্ট বর্জন করেন। পূর্ববর্তী মারাগা মানমন্দিরের মডেল ছিল টলেমি মডেলের মতো নির্ভুল। কিন্তু আল-শাতিরের জ্যামিতিক মডেল ছিল টলেমির মডেলের চেয়ে সত্যিকারভাবে উন্নততর। তিনি বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। দার্শনিক যুক্তির পরিবর্তে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে টলেমি মডেল বর্জন করা ছিল আল-শাতিরের আরেকটি সাফল্য। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করতেন। অন্যদিকে ইবনে আল-শাতির এসব নীতি অনুসরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এরিস্টোটলীয় পদার্থ বিজ্ঞানের নীতিমালাও তিনি অনুসরণ করেননি। বরং তিনি এমন একটি মডেল উদ্ভাবন করেন যা ছিল বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তার প্রণীত গ্রন্থ জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। যাকে রেনেসাঁ পূর্ব একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

শাতির একটি জিজ তৈরির মধ্য দিয়ে সৌরমণ্ডলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর কাজ শুরু করেছিলেন। টলেমির সৌরমণ্ডলীয় থিওরির ওপর রচিত এ জিজের অস্তিত্ব বিলীন

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তিনি যেসব পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি নয়া সৌরমণ্ডলীয় মডেল নির্মাণ করেছিলেন 'তালিক আল-আরশাদ' শিরোনামে একটি গ্রন্থে তার বর্ণনা দেন। এ গ্রন্থটিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে অন্য কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে শাতিরের 'আল-জিজ আল-জাদিদ' (The New astronomical handbook) সংরক্ষিত। এসব পাণ্ডুলিপিতে তার একগুচ্ছ নয়া সৌরমণ্ডলীয় তালিকা খুঁজে পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মারাগা মানমন্দিরের কয়েকজন পণ্ডিতের রচনাবলীতে শাতিরের গ্রন্থের সূচনা উল্লেখ করা হয়।

টলেমির মডেল প্রত্যাখ্যান

ইবনে আল-শাতির পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতো ছিলেন না। টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তার কোনো দার্শনিক আপত্তি ছিল না। তবে টলেমি মডেলকে কিভাবে তার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায় তাই ছিল তার একমাত্র চ্যালেঞ্জ। শাতির বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে টলেমি মডেল পরীক্ষায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাসার্ধ পর্যবেক্ষণ করেন। চন্দ্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সূর্যের ব্যাসার্ধের আকার নির্ধারণে টলেমি মডেলের মান পরীক্ষা করেন। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর রচিত তার গ্রন্থটির অস্তিত্ব নেই। তবে তিনি 'কিতাব আল-সাল ফি তাশহি আল-উসুল'-এ সেই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি টলেমির মডেল সংশোধন করে নিজস্ব মডেল প্রণয়ন করেন। সূর্যের ব্যাসার্ধ পর্যবেক্ষণ তাকে টলেমির এপিসাইকেল এবং ইক্যুয়ান্ট সৌর মডেল প্রতিস্থাপনে সহায়তা করে। এ কাজে তিনি তিনটি গোলকের একটি মডেল ব্যবহার করেন। একটি মডেল ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশাল মডেল যাকে তিনি 'পারেক্লিপটিক' হিসাবে আখ্যায়িত করতেন। দ্বিতীয় গোলকটি ছিল পারেক্লিপটিক চালিত যাকে তিনি ডিফারেন্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং আরেকটি ছিল ডিফারেন্ট চালিত। ডিফারেন্ট চালিত গোলককে তিনি ডিরেক্টর বা পরিচালক হিসাবে আখ্যা দেন। তার পর্যবেক্ষণে সূর্য ছিল ডিরেক্টর চালিত একটি গোলক।

আবিষ্কার

ইবনে আল-শাতির একটি বিস্ময়কর অনুভূমিক সূর্যঘড়ি তৈরি করেছিলেন। ঘড়িটি দামেস্কে উমাইয়া মসজিদের উত্তর মিনারে বসানো হয়েছিল। ঘড়িটির মূল যন্ত্রপাতি দামেস্কের জাতীয় জাদুঘরের বাগানে সংরক্ষিত। এ সূর্যঘড়ি দেখে মুয়াজ্জিন আজান দিতেন। মূল্যবান মার্বেল পাথরে তৈরি ঘড়িটির আকার ছিল ২মিটার.x ১ মিটার। শাতির আরেকটি ছোট ঘড়িও তৈরি করেছিলেন। এ ঘড়িটি আলেপ্পোতে সংরক্ষিত। 'সানডুক আল-ইয়াওয়াকু' (রত্ন বাক্স) নামে একটি বাক্সে ঘড়িটি রাখা হতো। এ ঘড়িটির আয়তন ছিল ১২ সেন্টিমিটার x ১২ সেন্টিমিটার x ৩ সেন্টিমিটার। জোহর ও আছরের নামাজ আদায়, স্থানীয় সময় এবং কেবলা নির্ধারণে ঘড়িটি ব্যবহার করা হতো। শাতির একটি চৌম্বকীয় কম্পাসও তৈরি করেছিলেন। ইবনে আল-শাতির প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বহুমুখী কম্পেনডিয়াম (Compendium) নির্মাণ করেছিলেন। তার কম্পেনডিয়ামে অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্র এলহাইডাড (Alhidade) এবং সূর্যঘড়ি। ইউরোপে রেনেসাঁ যুগে এ কম্পেনডিয়াম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

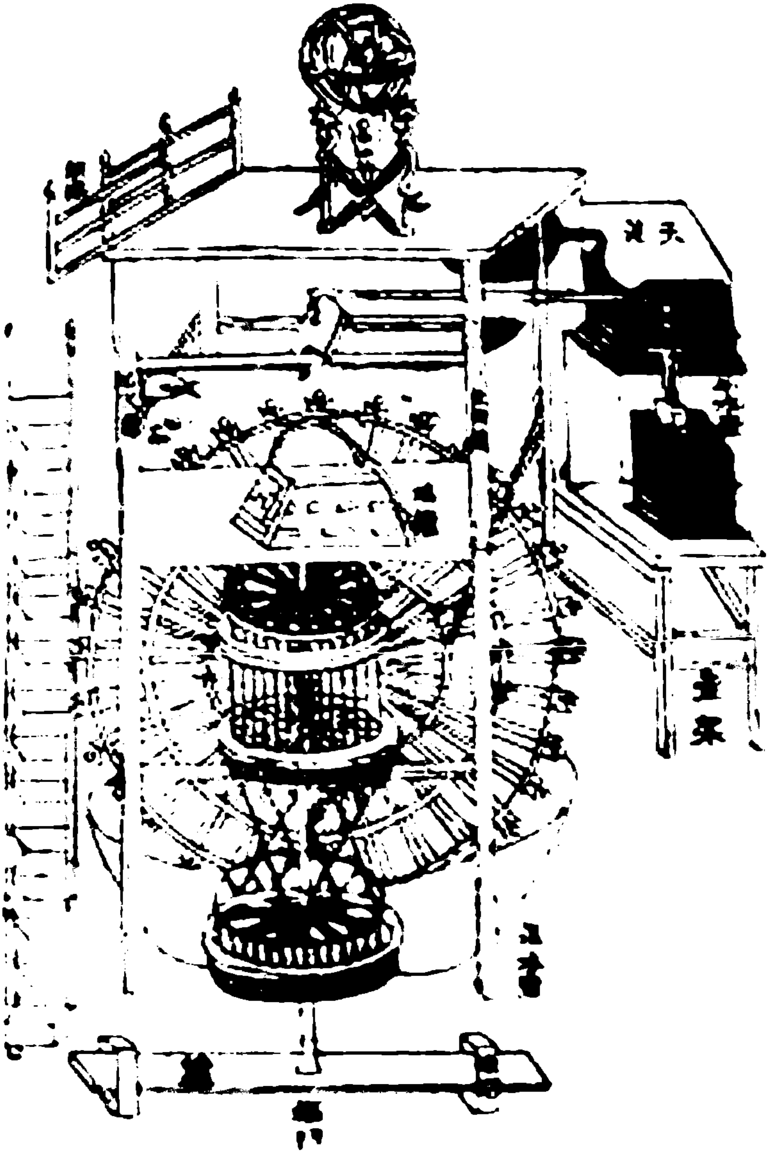

দামেস্ক মসজিদের শীর্ষে স্থাপিত আল-শাতিরের আবিষ্কৃত সূর্যঘড়ি

www.pathagar.com

ইউনিভার্সেল যন্ত্রপাতি

ইবনে আল-শাতির তার 'আল-আশিয়া আল-লামিয়া ফিল-আমল বিল আলা আল-জামিয়া'য় (Rays of light on operations with the Universal instrument) আরেকটি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এ যন্ত্রকে তিনি ইউনিভার্সেল বা সর্বজনীন যন্ত্র হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। অটোমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী তকি আল-দীন 'কিতাব আল-ছিমার আল-ইয়ানিয়া আন কুতাফ আল-আলা' (Book of Ripe Fruits from Clusters of Universal Instrument) শিরোনামে শাতিরের এই গ্রন্থটির ওপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। তকি আল-দীন ১৫৭৭-১৫৮০ সালে ইস্তাম্বুলে তার নামানুসারে নির্মিত একটি মানমন্দিরে এ যন্ত্রটি ব্যবহার করেন।

যুগে যুগে মহাকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা

প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে, দূরবর্তী তারকাগুলো পৃথিবীকেন্দ্রিক একটি স্বচ্ছ বৃত্তের ভেতর অবস্থান করছে এবং অভিন্ন গতিতে ঘুরছে। তাদের আলো স্থির উজ্জ্বল। তবে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলো ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে এবং তাদের গতি অভিন্ন নয়। এজন্য গ্রহগুলোর আলোতে তারতম্য ঘটে। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে গ্রহগুলোর দূরত্ব স্থির নয়। তারা এসব গ্রহের কক্ষপথকে বৃত্তাকার হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। এমনকি সূর্যের বার্ষিক গতির ব্যাখা দিতে গিয়ে তারা ধারণা করেছিলেন, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সূর্য বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। এ বিন্দুকে তারা 'একসেন্ট্রিক' হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। একসেন্ট্রিকের দূরত্ব পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সূর্যের বৃত্তাকার কক্ষপথকে তারা 'ডিফারেন্ট' হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ, কক্ষপথের গতি এবং একসেন্ট্রিকের সমন্বয়ে এ মডেলে সূর্যের গতির একটি মোটামুটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ মডেল গ্রহগুলোর গতির ভিন্নতার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। গ্রহগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকাশে উদিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি গ্রহ সাময়িকভাবে নিজস্ব গতিতে চলে। স্পষ্টত এ ধরনের গতি একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে অভিন্ন গতির প্রমাণ বহন করে না। এমনকি বৃত্তটি একসেন্ট্রিক হলেও নয়। বৃত্তগুলো সম্পর্কে ইউক্লিডের প্রাথমিক জ্যামিতিক গণনা অথবা নিগূঢ় ধারণার প্রতি অটল থাকায় গ্রীকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, গ্রহগুলো বৃত্তাকার গতিতে ঘুরছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সালের দিকে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপারকাস গ্রহগুলোর ভিন্ন ভিন্ন গতির ব্যাখ্যা দানে একটি মডেল উদ্ভাবন করেন। তিনি তার মডেলে মত প্রকাশ করেন যে, প্রতিটি গ্রহ 'এপিসাইকেল' নামে একটি বৃত্তের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে এবং এপিসাইকেলের কেন্দ্র একই গতিতে ডিফারেন্টের চারদিকে ঘুরছে। হিপারকাসের এ মডেল প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং ১৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ মডেল গ্রহগুলোর গতির ধারণায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল। একই সময়ে আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমি দেখতে পান যে, হিপারকাসের মডেল সর্বশেষ ও সর্বোত্তম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই নয়। এ ধারণা তাকে আরেকটি মডেল

www.pathagar.com

উপস্থাপনে উৎসাহিত করে। তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমাগেস্ট'- এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। টলেমির পর্যবেক্ষণে বলা হয়, এপিসাইকেলের কেন্দ্র অবশ্যই ডিফারেন্টের চারদিকে স্থির গতিতে ঘুরতে পারে না। পৃথিবীর নিকটতর হলে তার কেন্দ্রের গতি হবে দ্রুততর এবং বহু দূরবর্তী হলে গতি হবে মন্থর। মনে হচ্ছে তিনি অভিন্ন বৃত্তাকার গতিতে আবর্তনের পূর্ববর্তী ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন। পূর্ববর্তী ধারণা পরিত্যাগ করায় তিনি চাতুর্যের সঙ্গে আরেকটি ধারণা উদ্ভাবন করেন। এ ধারণা অনুযায়ী তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এপিসাইকেলের কেন্দ্রের গতি বৃত্তাকার ও স্থির। এ দাবি করে তিনি বলেন, এপিসাইকেলের কেন্দ্রের পথ একটি বিন্দুতে বৃত্তাকার এবং আরেকটি বিন্দুতে স্থির। এই নয়া বিন্দুকে তিনি 'ইক্যুয়ান্ট' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইক্যুয়ান্টের অবস্থান একসেন্ট্রিকের বিপরীতে। পৃথিবী থেকে একসেন্ট্রিকের দূরত্ব যতটুকু ইক্যুয়ান্টের দূরত্বও তাই। একসেন্ট্রিক থেকে একটি স্থির দূরত্বে এপিসাইকেলের কেন্দ্র ঘুরছে।

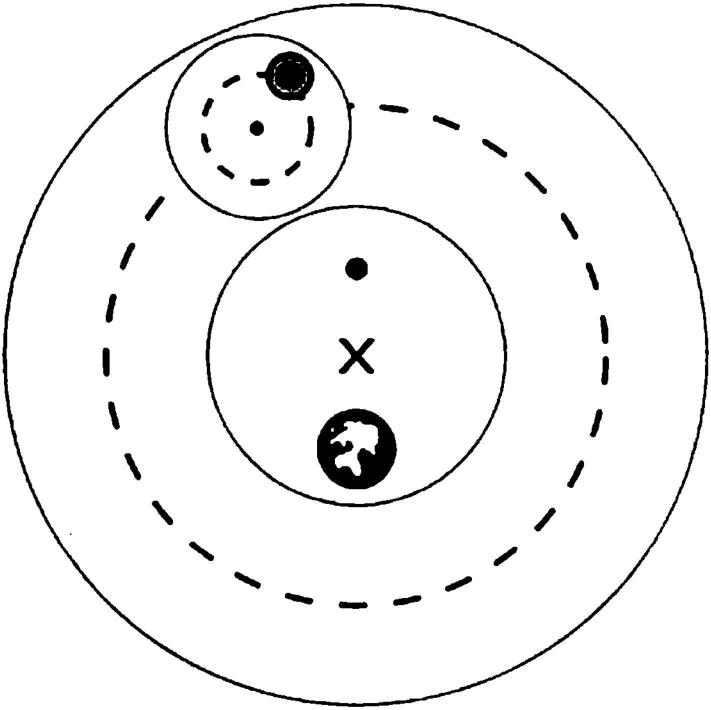

টলেমির কল্পিত ইকুয়্যান্ট

মধ্যযুগে টলেমির এ মতবাদকে 'জিওসেন্ট্রিক' বা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনের মডেল হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। এ মতবাদে বলা হয়েছিল যে, পৃথিবী হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং সব গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। 'জিওসেন্ট্রিক' মতবাদে আরো বলা হয়েছিল, প্রতিদিন সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলো পৃথিবীকে একবার করে প্রদক্ষিণ করছে।

অন্যদিকে 'হেলিওসেন্ট্রিক' (Heliocentric) মডেল হলো 'জিওসেন্ট্রিক' মডেলের পুরোপুরি পরিপন্থী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বশেষ মতবাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডি রেভলিউশনিবাস অরবিয়াম কোয়েলেসটিয়াম'-এ এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রথম একটি পাণ্ডুলিপিতে এ মতবাদ প্রকাশ করেন। তার প্রচারিত মতবাদ ছিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত ধারণার বিপরীত। তাই তিনি বইটি প্রকাশে বিলম্ব করতে থাকেন। ১৫৪৩ সালে তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বইটি প্রকাশিত হয়। ১৫৪৩ সালের ২৪ মে কোপার্নিকাস পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর দিন তার হাতে বইটির একটি কপি তুলে দেয়া হয়। তিনি ছিলেন তখন অচেতন। এ অবস্থায় তিনি একবার চোখ মেলে বইটির দিকে তাকান। তারপর চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করেন।

কোপার্নিকাসের প্রচারিত 'হেলিওসেন্ট্রিক' হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বশেষ মডেল এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা। সূর্যকে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। টলেমির তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, বরং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

কোপার্নিকাসের ওপর শাতিরের প্রভাব

আল-শাতির তার সৌরমণ্ডলের মডেলে টলেমির কয়েকটি মডেল সংশোধন করেন। তিনি টলেমির 'ইক্যুয়ান্ট' ও 'একসেন্ট্রিক' মডেল পরিত্যাগ করেন। শাতিরের মডেলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনের ধারণা ব্যক্ত করা হলেও পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস হুবহু তার মডেল ব্যবহার করেছিলেন। শাতিরের মডেলের গাণিতিক বিশ্লেষণ ছিল কোপার্নিকাসের 'ডি রেভলিউশনিবাস' (De revolutionibus)-এ বর্ণিত বিশ্লেষণের অনুরূপ। তার ব্যবহৃত চান্দ্র মডেলের সঙ্গে কোপার্নিকাসের ব্যবহৃত চান্দ্র মডেলের কোনো পার্থক্য ছিল না। ১৯৫০-এর দশকে প্রথম ইবনে আল-শাতিরের মডেল নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়, তার মডেলগুলো হলো গাণিতিকভাবে কোপার্নিকাসের সমতুল্য। এ ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিধাল গুসুম 'ডাস দ্য কোপার্নিকান রেভলিউশন হেভ ইসলামিক রুট?' শিরোনামে এক গবেষণাধর্মী গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'The Arab Muslim 14th century Damascene astronomer Ala din Ibn Al-Shatir and his important works were only discovered in the 1950's by Kennedy and Roberts. It was quickly realized that he was an*

www.pathagar.com

accomplised astronomer, able to make sophisticated calculations based on old and new models, construct instruments and performed detailed observations.'

অর্থাৎ *'১৯৫০-এর দশকে প্রথম ই. এস. কেনেডি ও রবার্টস দামেস্কের চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলাউদ্দিন ইবনে আল-শাতির এবং তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর সন্ধান পান। তখন দ্রুত উপলব্ধি হয় যে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পুরনো ও নতুন মডেলের ভিত্তিতে জটিল গণনা এবং যন্ত্রপাতি তৈরিতে ছিলেন সক্ষম এবং বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন।'*

কোপার্নিকাসের বুধ গ্রহের মডেল ছিল মূলত ইবনে শাতিরের এবং এ মডেল সম্পর্কে তার নিজের কোনো ধারণা ছিল না। তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাতিরের মডেল ইউরোপে পৌঁছেছিল। ঐতিহাসিকরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, কোপার্নিকাস তার কাছে ঋণী। তিনি তার মডেল হুবহু অনুকরণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে ই. এস. কেনেডি লিখেছেন, *'What is most interesting, however, is that Arab astronomer of the fourteenth century Ibn al-Shatir's luner theory, except for trivial differences in parameters, is identical with that of Copernicus.'* অর্থাৎ *'সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, বৈশিষ্ট্যে কয়েকটি তুচ্ছ পার্থক্য ছাড়া ইবনে আল-শাতিরের চান্দ্র মডেল হলো কোপার্নিকাসের মডেলের অনুরূপ।'*

ওয়াই. এম. ফারুকী তার 'কন্ট্রিবিউশন্স অব ইসলামিক স্কলার্স টু দ্য সায়েন্টিফিক এন্টারপ্রাইজ'-এর ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন, *'Ibn al-Shatir's theory of lunar motion was very similar to that attributed to Copernicus some 150 years later. Whereas Ibn al-Shatir's concept of planetary motion was conceived in order to play an important role in an earth-centred planetary model. Copernicus used the same concept of motion to present his sun-centred planetary model. Thus the development of alternative models took place that permitted an empirical testing of the models'*

অর্থাৎ *'চাঁদের গতি সম্পর্কে ইবনে আল-শাতিরের তত্ত্ব ছিল এ গতি সম্পর্কে ১৫০ বছরের পরবর্তী কোপার্নিকাসের তত্ত্বের অত্যন্ত কাছাকাছি। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনে কোপার্নিকাসের ধারণায় ইবনে আল-শাতিরের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলোর আবর্তনের গতি সম্পর্কে মডেল উপস্থাপনে কোপার্নিকাস একই ধারণা ব্যবহার করেন। এভাবে বিকল্প মডেলগুলো বিকশিত হয়। পরে এসব মডেল নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুযোগ তৈরি হয়।'*

বিজ্ঞানের ঐতিসিক ড. ইলিয়াস ফারনিনি-ও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অ্যা বিবলিওগ্রাফি অব স্কলার্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম'-এ তিনি লিখেছেন, *'The achievements of Muslim scientists in astronomy, physics, biology, medicine, chemistry and mathematics are poorly known. Many of the known achievements are attributed to Western scientists. For example, the discovery and the whole concept of planetary motion is attributed to Cepler and Copernicus while not crediting the contribution of Ibn Al- Shatir, the*

www.pathagar.com

Damascene astronomer who, among his works, wrote a major book entitled `Kitab Nihayat al-Sul fi Tashih al-Usul' on a theory which departs largely from the Ptolemic system known at that time.'

অর্থাৎ *'জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন ও গণিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাফল্য খুব কমই জানা গেছে। তাদের বহু আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের। উদাহরণস্বরূপ, দামেস্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে আল-শাতিরের অবদান স্বীকার না করে মহাকাশে গ্রহগুলোর গতি আবিষ্কার এবং এ সংক্রান্ত গোটা ধারণা আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে কেপলার ও কোপার্নিকাসকে। 'কিতাব নিহায়াত আল-সুল ফি তাশহি আল-উসুল' শিরোনামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হলো ইবনে আল-শাতিরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর অন্যতম। তিনি তার বইয়ে এমন একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন যা ছিল ঐ সময় জ্ঞাত টলেমির পদ্ধতি থেকে অনেকাংশে ভিন্ন।'*

উপরে উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইবনে আল-শাতিরের মডেল হেলিওসেন্ট্রিক বা সূর্যকেন্দ্রিক মডেল গঠনে কোপার্নিকাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে কিভাবে তাই হলো প্রশ্ন। আলোচনা করলে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইবনে আল-শাতিরের ব্যবহৃত তুসি কাপল সম্বলিত বাইজান্টাইন গ্রীক পাণ্ডুলিপি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে গিয়ে পৌছায়। আরো জানা গেছে, পয়েন্ট নির্দেশকসহ কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের ডায়াগ্রাম ছিল ইবনে আল-শাতিরের জিওসেন্ট্রিক মডেলে ব্যবহৃত ডায়াগ্রাম ও নির্দেশকের সমরূপ। এভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, ইবনে শাতিরের কর্ম সম্পর্কে কোপার্নিকাস সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

www.pathagar.com

ভূগোলে বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-বাকরি

ভূগোলের বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-বাকরির পূর্ণ নাম আবু উবায়েদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে মোহাম্মদ আল-বাকরি। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম ভূগোলবিদ, কবি ও দার্শনিক। তার পিতা ইয়াজুদৌলা আবদুল আজিজ আল-বাকরি ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেনের ক্ষুদ্র রাজ্য হুলভা ও সালটেসের দ্বিতীয় শাসক। ইয়াজুদৌলা তার পিতা আবু মুসা মোহাম্মদ ইবনে আইয়ুবের পর এ রাজ্যের অধিপতি হন। কর্ডোভার মারওয়ানি বংশের পতনের পর আইবেরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ১০১২ সালে এ ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যটি ছিল নিয়েবলার (লাবলা) সামান্য পশ্চিমে। ১০৫১ সালে ইয়াজুদৌলা সেভিলকে তার নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাদিদ বাকরির পিতা ইয়াজুদৌলাকে বরখাস্ত করলে পিতার সঙ্গে তিনি কর্ডোভায় স্থানান্তরিত হন। তারপর থেকে তিনি তার পিতার সঙ্গে কর্ডোভাতেই বসবাস করতেন। এসময় কর্ডোভার অধিপতি ছিলেন আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে শাহওয়ার। আল-বাকরির পিতা কর্ডোভার অধিপতির আশ্রয়ে আমৃত্যু সেখানে বাস করেন। তিনি ১০৬৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ

কর্ডোভায় আল-বাকরি ভূগোলবিদ আল-উর্দি এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ানের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তিনি তার গোটা জীবন কাটিয়েছেন আল-আন্দালুসে বিশেষ করে সেভিল ও আলমারিয়ায়। ধীরে ধীরে আল-বাকরি লেখক হিসাবে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। এক পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে ঘোরাফেরা শুরু করেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় আলমারিয়ার রাজদরবারের সদস্য ছিলেন। শেষ জীবনে বাকরি বিখ্যাত লেখক ইবনে খাগানের সঙ্গে পরিচিত হন। বাকরির জীবদ্দশায় আলমোরাভীয়রা স্পেনে তাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং মুলুক আল-তোয়ায়েফদের অপসারণ করে। স্পেনের উত্থান পতনের এসব দিনে আল-বাকরি তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অনেকগুলো গ্রন্থ লিখে ফেলেন।

বাকরির জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিভ্রাট

অধ্যাপক ব্রাকলম্যানের মতে, ১০৪০ সালে আল-বাকারি স্পেনের হুলভা বা সালটেসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৯৪ সালের নভেম্বরে কর্ডোভায় ইন্তেকাল করেন। অধ্যাপক

www.pathagar.com

জি. সারটন তার জন্ম তারিখ উল্লেখ না করলেও বলেছেন, তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে ১০৯৪ সালে ইন্তেকাল করেছেন। জন্ম তারিখ ১০৪০ সাল মেনে নিলে অধ্যাপক সারটনের বর্ণনা মেনে নেয়া যায় না। অধ্যাপক ই. লেভি প্রভিন্সালের মতে, ১০৫১ সালে তার পিতা যখন নিজের ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছরের কাছাকাছি। সে হিসাবে তার জন্ম তারিখ আনুমানিক ১০২১ সাল। এ অনুমান সঠিক হলে আল-বাকরি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ভূগোলে অবদান

ভূগোল বিজ্ঞানে আল-বাকরি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার মাত্র দু'টি বই টিকে আছে। এ দু'টি ভূগোল বইয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত। তার একটি বইয়ের নাম 'মুজাম মাইসতাজাম' এবং আরেকটির নাম 'কিতাব আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' (Book of Highways and Kingdoms)। চার খণ্ডে লিখিত মুজাম মাইসতাজামে তিনি জাজিরাতুল আরবের বহু জায়গার নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের কবিতা এবং পবিত্র হাদিছে এসব জায়গার নামের উল্লেখ দেখা যায়। সাহিত্যে জায়গাগুলোর নামের বানান নিয়ে বেশ বিভ্রাট লক্ষ্য করা যায়। বাকরির বইয়ে এ বিভ্রাট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জায়গাগুলোর নামের তালিকার সঙ্গে পুরনো আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেখানে বসবাসকারী গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

১০৬৮ সালে সমাপ্ত তিনি তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কিতাব আল-মাসালিক'কে ভূগোল বিষয়ক একটি বিশ্বকোষে রূপ দিয়েছিলেন। আল-বাকরির ভূগোল বিষয়ক এই বইটির নামের সঙ্গে ইবনে খুরাদাদবিহ্‌র একটি বইয়ের নাম গুলিয়ে ফেলা হয়। নবম শতাব্দীর পার্সী ভূগোলবিদ আবুল কাসিম ওবায়দুল্লাহ ইবনে খুরাদাদবিহ্ ভূগোল বিষয়ক একই নামের আরেকটি বই লিখেছিলেন। যেসব দেশ নিয়ে বাকরির আলোচ্য বইটি লেখা হয়েছে তিনি সেসব দেশ কখনো ভ্রমণ করেননি। পর্যটক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি 'কিতাব আল-মাসালিক' লিখেছেন। অধ্যাপক নাফিসের মতে, আল-বাকরি 'মাসালিক ওয়াল মামালিক' রচনায় স্পেনের মুসলিম ভূগোলবিদ মোহাম্মদ আততারিকের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তিনি কর্ডোভা বা সেভিলে তার নিজের ঘরে বসেই মাগরিবে যেসব লোক ভ্রমণ করেছিলেন তাদের কাছ থেকে আফ্রিকার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারদের গ্রন্থ থেকেও তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ওয়ারাকের একটি বইয়ের কথা তার বইয়ের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এ বইটি ছিল আফ্রিকা সম্পর্কে তার ভৌগোলিক বর্ণনার মূল উৎস। আল-ওয়ারাক খলিফা দ্বিতীয় আল-হাকিমের রাজত্বকালে তার আমন্ত্রণে কর্ডোভায় এসে বসতি স্থাপন করেন। আল-বাকরি তার গ্রন্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এ গ্রন্থ থেকে তিনি আফ্রিকার সব জায়গার দশম শতাব্দীর বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং তার ভূগোল বইয়ে সন্নিবেশ করেন। ইব্রাহিম

www.pathagar.com

ইবনে ইয়াকুব আল-ইসরাইলি আল-তারতুসি নামে এক ইহুদী ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি সংগ্রহ করেন। দাস ব্যবসায়ী ইব্রাহিম জার্মানি ও স্লাভদেশে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণ করতেন। স্পেনের খ্রিস্টান ও ইউরোপের অবশিষ্ট অংশের বিবরণ দিতে গিয়ে আল-বাকরি ইব্রাহিম ইবনে ইয়াকুবের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি কর্ডোভার আর্কাইভে রক্ষিত সরকারি নথিপত্র থেকেও বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বারগাবাতায় একটা ধর্মদ্রোহী গোত্রের বিবরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তিনি আলমোরাভীয়দের স্পেন অভিযানের কোনো উল্লেখ করেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ১০৬৮ সালের মধ্যে বইটি শেষ করেছেন। অর্থাৎ আল-যারল্লাকার যুদ্ধের প্রায় ১৮ বৎসর আগে বইটি লিখা শেষ হয়।

'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক'-এর আরেকটি উৎস হলো আল-বাকরির অন্যতম শিক্ষক আহমদ ইবনে ওমর আল-ওজরির লিখা 'নিযাম আল-মারজান'। এ বই থেকে বাকরি বহু ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি আল-কাযবিনীর একটি বইয়ের সহায়তাও গ্রহণ করেছেন। এই বইটিতে যেসব আশ্চর্য বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে আল-বাকরিও যত্নের সঙ্গে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

'কিতাব আল-মাসালিক'-এ তিনি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। বইটির পুরো অংশ পাওয়া যায়নি। খণ্ড খণ্ডভাবে অনেকগুলো অংশ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা, মিসর এবং স্পেনের ওপর লিখিত কিছুটা অংশ পাওয়া গেছে। এটুকুও সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়নি। বইটির উপক্রমনিকার কিছুটা অংশ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সাধারণ ভৌগোলিক বিবরণ এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৭৮ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে রাশিয়া ও স্লাভদের অংশ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে ব্যারন দ্য শ্লেইন আফ্রিকাসহ পাশ্চাত্যের মুসলিম অংশ সম্পাদনাসহ ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার আগে অধ্যাপক ই. লেভি প্রভিনসাল আন্দালুস অংশ সম্পাদনা করে সঠিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

জ্ঞানের সব শাখায় বিচরণ

অধ্যাপক ই. লেভি প্রভিনসালের মতে, আল-বাকরির প্রণীত গ্রন্থগুলোর আলোকে তাকে ঐতিহাসিক মুশারিকের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। তিনি সে সময়কার প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন মূলত ভূগোল বিজ্ঞানী। তবে তিনি ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। আল-বাকরির কোনো কোনো জীবনীকার সুরা নিয়ে তার কয়েকটি কবিতার সন্ধান পেয়েছেন। তাদের ভাষায় তিনি ছিলেন সুরাসক্ত। বাকরি ছিলেন গ্রন্থপ্রিয় মানুষ। তিনি তার বইয়ের পাণ্ডুলিপিগুলো সুন্দর কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখতেন।

www.pathagar.com

রচনাবলী

আল-বাকরি উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়েও আলোচনা করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে তার বইয়ের নাম 'কিতাব আন নাবাত'। বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তবে ইবনে খায়েরের 'ফাহ্‌রামা' এমনকি আল-বাকরির 'ইসামিলী' শিরোনামে একটি গ্রন্থেও এ বইটি সম্পর্কে জানা যায়। বইটিতে আন্দালুসিয়ার উদ্ভিদ সম্পর্কে বর্ণানুক্রমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনে আবদুল আল-ইসবিলি তার 'উমাদাত আত তাবিব ফি শারক আল-আশাবদ' গ্রন্থে আল-বাকরির বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ধর্ম নিয়ে আল-বাকরি ৪টি বই লিখেছেন। এগুলো হলো (১) ফি আলাম আনবুওয়াত নাবিইয়ানা (২) আল-তানবিহ্ আলা আওহাম আবি আলী ফি কিতাব আল-ওয়াজিব (৩) সিমত আল-লায়লী ফি শারহ্ আল-আমালি (৪) সিলাত আল-মাফসুল।

আরবদের বিভিন্ন গোত্রের নামের ইতিহাস নিয়ে তার অন্য একটি গ্রন্থের কথাও জানা গেছে। বইটির নাম 'আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ'। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বইটি লিখা হয়েছে। তবে বইটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিচে আল-বাকরির প্রাপ্ত আরো কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলো:

(১) ফসল আল-মাকাল ফি শারহ্ কিতাব আল-আমছাল

(২) মুজাম মাইসতাজাম

(৩) মাজুমা আল-মুফতাবাক।

(৪) কিতাব আইয়ানুন নাবাত ওয়াল শাযরিয়াতুল আন্দালুসিয়া

সম্মান

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু উবায়েদ আল-বাকরির সম্মানে ১৯৭৬ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে। ১৪ দশমিক ৩ এন দ্রাঘিমাংশ এবং ২০ দশমিক ২ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক শূন্য পাঁচ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

প্ল্যানেটারি কম্পিউটার আবিষ্কারক আল-কাশি

প্ল্যানেটারি কম্পিউটারের আবিষ্কারক আল-কাশির পূর্ণ নাম গিয়াসউদ্দিন জামশেদ মাসুদ আল-কাশি। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। ঐতিহাসিকরা তাকে 'দ্বিতীয় টলেমি' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক সৈয়দ রকিম তাকে 'মাওলানা-ই-আলম' বা সারা বিশ্বের জ্ঞানী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ১৩৮০ সালে মধ্য ইরানের কাশানে তার জন্ম। কাশানে জন্ম গ্রহণ করায় তিনি ইতিহাসে কাশি নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে কাশির শৈশব শুরু হয়। তার জীবদ্দশায় তৈমুর লংয়ের উত্থান ঘটে। তৈমুর ১৩৭০ সালে সমরকন্দে নিজেকে স্বাধীন এবং মোঙ্গল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারকারী হিসাবে ঘোষণা করেন। আধুনিক উজবেকিস্তানের সমরকন্দ তার সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ১৩৮৩ সালে তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাত দখল করার মধ্য দিয়ে ইরানে তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন। কাশির জন্মস্থান কাশানেও তৈমুরের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়।

তৈমুর লং একটির পর একটি সামরিক অভিযান চালাতে থাকায় তার সাম্রাজ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য দেখা দেয়। নিজ দেশে ভিন দেশী নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ায় ভাগ্যান্বেষণে কাশি এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এ সময় তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে চিকিৎসক হিসাবে তিনি তার দ্বিতীয় পেশাও অব্যাহত রাখেন। তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র শাহরুখ শাসনভার গ্রহণ করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। তিনি তার রাজ্যে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনেন। শাহরুখ ও তার পার্সী স্ত্রী রাজকুমারী গৌহরশাদ বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে যেতে থাকেন। শাহরুখ নিজের পুত্র উলুগ বেগকে সমরকন্দের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেন। উলুগ বেগ ছিলেন একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি সমরকন্দকে সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত করার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

উলুগ বেগের সঙ্গে কাশির ঘনিষ্ঠতা

সুলতান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের ৮ বছর পর ১৪২০ সালে উলুগ বেগ ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান অধ্যয়নে সমরকন্দের রাজিস্তান চত্বরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং তার বাইরের ছাত্ররা এখানে ভিড় করে। এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তিনি সেরা বিজ্ঞানীদের সহায়তা কামনা করেন। তখনকার দিনে রাজা, বাদশাহ ও শাসকদের কাছ

www.pathagar.com

থেকে বিজ্ঞানীরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাশির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটে। উলুগ বেগ কাজী জাদাসহ ৬০ জন বিজ্ঞানীকে সমরকন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। আল-কাশিও ছিলেন তাদের একজন। কাশি সমরকন্দের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। উলুগ বেগের কাছ থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা পেতে থাকেন। তার দরবারে তিনি তার শ্রেষ্ঠ বইগুলো রচনা করেন। উলুগ বেগ ছিলেন তার শিক্ষক। কাশি তার সব ক'টি বই শাসকদের উৎসর্গ করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। তিনি তার জীবনের সব ঘটনা লিখে রাখতেন। আল-কাশি সমরকন্দ থেকে কাশানে তার পিতার কাছে চিঠি লিখতেন। এসব চিঠিতে তিনি সমরকন্দের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক বর্ণনা উল্লেখ করতেন। কালের সাক্ষী হিসাবে চিঠিগুলো রক্ষা পাওয়ায় ঐতিহাসিকরা তার জীবনের ঘটনাগুলো নির্ভুলভাবে উল্লেখ করতে পেরেছেন। কাশির চিঠিগুলোতে উলুগ বেগের গাণিতিক যোগ্যতার প্রশংসা করা হতো। কাজী জাদা ছাড়া সমরকন্দের আর কোনো বিজ্ঞানী তার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি। উলুগ বেগ সমরকন্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকতেন। খোলামেলা আলোচনা করা হতো। কাশি ও কাজী জাদা ছাড়া আর কেউ জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা সমাধানে কাশি সফল হতেন। তাতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন সমরকন্দের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং উলুগ বেগের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কাশি রাজদরবারের আদব কায়দা না জানলেও উলুগ বেগ তাকে অসম্ভব সম্মান করতেন। কাশি ইন্তেকাল করলে তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক বাণীতে লিখেছিলেন, *'a remarkable scientist, one of the most famous in the world, who had a perfect command of the science of the ancients, who contributed to its development, and who could solve the most difficult problems.'*

অর্থাৎ 'তিনি ছিলেন একজন স্মরণীয় এবং বিশ্বের অতি খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, প্রাচীন বিজ্ঞানের ওপর যার দখল ছিল পরিপূর্ণ এবং যিনি এ বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন এবং যিনি অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন।'

মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের মধ্যে উলুগ বেগ ছাড়া আর কেউ বিজ্ঞানী ছিলেন না। ১৪২৪ সালে তিনি সমরকন্দে টাইকো ব্রাহির মানমন্দিরের অনুরূপ 'গুরখানি জিজ' নামে পরিচিত একটি বিশাল মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাতে ছিল একটি বিরাট মধ্যরেখা। মধ্যরেখা বরাবর পাহাড়ে ২ মিটার প্রশস্ত একটি গর্ত খনন করা হয়। টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ করার সুযোগ না থাকায় বেগ ফাখরি সেক্সট্যান্ট নামে পরিচিত তার নিজস্ব যন্ত্র নিয়ে কাজ করতেন। এ সেক্সট্যান্টের ব্যাসার্ধ ছিল ৪০ দশমিক ৪ মিটার। উলুগ বেগের মানমন্দিরের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছিল ভূগর্ভে। ১৯০৮ সালে খনন কাজ চালিয়ে এ মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুগ বেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৬১ সালে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়। ৩২ দশমিক ৭ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৮১ দশমিক ৯ ডব্লিউ অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য ৫৪ দশমিক শূন্য ৫ পাঁচ

www.pathagar.com

কিলোমিটার। এ মহান মুসলিম শাসক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুগ বেগ নিহত হয়েছিলেন তার জ্যেষ্ঠ ছেলে আবদুল লতিফের নির্দেশে। পবিত্র হজ পালনে মক্কা শরীফে যাবার পথে আবুদল লতিফের নির্দেশে এক ঘাতক তার শিরশ্ছেদ করে।

প্ল্যানেটারি কম্পিউটার আবিষ্কার

কাশি ১৪১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'কাশান নুজহা আল-আদায়েক' (The Garden Excursion) শিরোনামে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই লিখা শেষ করেন। বইটিতে তিনি একটি প্ল্যানেটারি কম্পিউটারের বর্ণনা দেন। তিনি এ কম্পিউটারের নাম দিয়েছিলেন 'প্লেট অব জোন্স' (Plate of Zones)। যন্ত্রটিকে 'প্লেট অব হেভেন্স' (Plate of Heavens) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এ কম্পিউটার চিত্র অঙ্কন করে চন্দ্র ও সূর্য এবং গ্রহগুলোর দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের সত্যিকার অবস্থানের পূর্বাভাসসহ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বহু সমস্যার সমাধান দিতে পারতো। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কেও আভাস দিতে পারতো। দূরবর্তী বস্তু নিরীক্ষণে ব্যবহৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্র আলহাইডাড (Alhidade) এবং রুলারের সাহায্যে এ কম্পিউটার নির্মাণ করা হয়েছিল। আল-কাশি একটি ডাবল কোয়াড্রান্ট আজিমাথ এলটিচিউড যন্ত্র এবং এলহাইডাড সজ্জিত ক্ষুদ্র একটি আর্মিলারি স্ফিয়ারও উদ্ভাবন করেছিলেন।

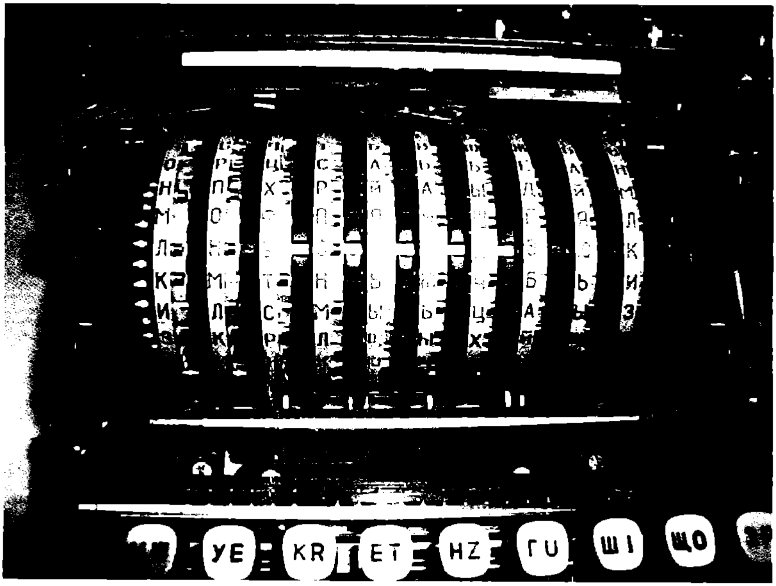

আল-কাশি আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের নমুনা

www.pathagar.com

প্লেট অব কনজাংশন উদ্ভাবন

আল-কাশি তার 'কাশান নুজহা আল-আদায়েক'-এ গ্রহ নক্ষত্রের সংযোগ ঘটার সময় নির্ধারণ এবং লীনিয়ার ইন্টারপোলেশনের জন্য ব্যবহৃত গণনকারী যন্ত্র 'প্লেট অব কনজাংশন'-এর বর্ণনা দেন। ১৪০৬ সালের ২ জুন তিনি কাশানে প্রথম চন্দ্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন।

খাকানি জিজ

আল-কাশি নাসিরুদ্দিন আল-তুসির 'জিজ-ই-ইলখানি'র ভিত্তিতে ১৪২৪ সালের জুলাইয়ে এ জিজ তৈরি করেন। খাকানি জিজে আল-কাশি তৈমুরীয় সুলতান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুগ বেগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। বইটির ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, তার সহযোগিতা ছাড়া তিনি তা লিখতে পারতেন না। উলুগ বেগ আল-কাশিকে তার মানমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উলুগ বেগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও ইসলামী বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। কাশির আমলে গণিতে সেক্সাজেসিম্যাল বা ৬০ ভিত্তিক সংখ্য প্রণালী চালু ছিল। এতে রয়েছে ১২ টি বিভাজক। বিভাজকগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০। এসব বিভাজকের মধ্যে ২, ৩ ও ৫ হলো অখণ্ড সংখ্যা। আল-কাশি ত্রিকোণমিত্রিক তালিকায় প্রতিটি ডিগ্রির জন্য নির্ভুলভাবে চার সেক্সাজেসিম্যাল ডিজিটের (আট অঙ্কের সমান) সাইন তালিকা তৈরি করেন এবং প্রত্যেক মিনিটের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করেন।

ট্রীটিজ অন এস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট

আল-কাশি ১৪১৬ সালের জানুয়ারিতে 'রিসালা দার শাব-ই-আলাত-ই-রাসদ' (Treatise on astronomical Observational Instrument) শিরোনামে গ্রন্থটি লিখা শেষ করেন। বইটিতে তিনি টলেমি বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্র ট্রাইকুয়েট্রাম ও আর্মিলারি স্ফিয়ার, মহিউদ্দিন উর্দির বিষুবীয় আর্মিলারি ও সলসটিক্যাল আর্মিলারি, উর্দির সাইন ও ভারসাইন যন্ত্র, আল-খুজান্দির সেক্সট্যান্ট, সমরকন্দ মানমন্দিরের ফাখরি সেক্সটান্টসহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির বিবরণ দিয়েছিলেন।

সুলাম আল-সামা

সমরকন্দে উলুগ বেগের সঙ্গে যোগদান করার আগে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখা শেষ করলেও আল-কাশি এ শহরেই ১৪০৭ সালের ১ মার্চ তার শ্রেষ্ঠ কর্ম 'সুলাম আল-সামা' (Astronomical Treatise on the size and distance of heavenly bodies) সম্পন্ন করেছিলেন। 'সুলাম আল-সামা' (Sullam al-Sama) বা 'রেসালেহ-ই-কামালিয়া' হলো কাশির অনবদ্য সৃষ্টি। বইটির শিরোনামের অর্থ হলো 'আকাশের মই'। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কামালউদ্দিন মাহমুদকে। গ্রন্থটিতে তিনি খ গোলকের ভিত্তিতে স্থানাঙ্কের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে চন্দ্র, সূর্য

www.pathagar.com

ও গ্রহগুলোর দ্রাঘিমাংশীয় গতির বিস্তারিত তালিকা ছিল। চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব ও আকার নির্ধারণে কাশি বইটি লিখেছেন। তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অক্ষাংশের জন্য দ্রাঘিমাংশীয় ও অক্ষাংশীয় লম্বন, গ্রহণ এবং চাঁদের দৃশ্যমানতার তালিকা প্রদান করেন। এ গ্রন্থে তিনি 2π কে ৯ অঙ্ক পর্যন্ত গণনা করেন এবং তাকে ১৬ অঙ্কে রূপান্তরিত করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনারা ৭ অঙ্ক পর্যন্ত গণনা করতে সক্ষম হয়েছিল। ২ শ' বছর পর জার্মান গণিতজ্ঞ লুডলফ ভ্যান কুলেন ২০অঙ্ক পর্যন্ত গণনা করে কাশিকে অতিক্রম করে যান।

'সুলাম আল-সামা'র পাণ্ডুলিপি এখনো সংরক্ষিত। 'মেফতাহ আল-হিসাব' (The Key to Arithmetic) নামে অন্য একটি বইয়ের ভূমিকায় কাশি 'সুলাম আল-সামা' লিখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমার পূর্বেকার সব বিজ্ঞানীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর লিখা সব বই আমি অধ্যয়ন করেছি। এসব বই অধ্যয়ন করে বুঝতে পেরেছি যে, তাদের অনেক ঘাটতি ছিল এবং বুধ অথবা শনি থেকে শুরু করে সূর্য পর্যন্ত জ্যোর্তিমণ্ডলীয় বস্তুগুলোর আকার ও দূরত্ব নির্ণয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাদের মধ্যে এ ধরনের মতভেদ থাকায় আমি এ বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং জ্ঞানীদের দিকনির্দেশনা হিসাবে বইটির নাম দিয়েছি সুলাম আল-সামা।'

২০০৮ সালে আল-কাশির জীবনী অবলম্বনে ইরানে ১৫ খণ্ডের একটি টিভি সিরিয়াল প্রচার করা হয়। প্রতিটি পর্বের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৫ মিনিট। টিভি সিরিয়ালে বইটির নাম দেয়া হয়েছিল 'দ্য ল্যাডার অব দ্য স্কাই' (The Laddar of the Sky) বা 'নারদিবাম-ই-আসমান'। মোহাম্মদ হোসেন লতিফ ছবিটি পরিচালনা এবং মোহসিন আলী আকবরী প্রযোজনা করেছিলেন। ছবিতে পরিণত বয়স্ক জামশেদ আল-কাশির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ভাহিদ জলিলবান্দ। ২০০৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পবিত্র রমজানে ইরানের আইআরআইবি'র চ্যানেল ওয়ানে ছবিটি প্রদর্শন করা হয়।

গণিত

গণিতে কাশির অবদান চিরস্মরণীয়। 'দ্য কি টু এরিথমেটিক' (The Key to Arithmetic) হলো গণিতের ওপর তার শ্রেষ্ঠ কর্ম। ১৪২৭ সালের ২ মার্চ তিনি বইটি লিখা শেষ করেন। আল-কাশির এ বইটি ছিল সমরকন্দের ছাত্রদের মূল পাঠ্যপুস্তক। যেসব ছাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান, জরিপ, স্থাপত্য, হিসাব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অধ্যয়ন করতো তিনি তাদেরকে এ গাণিতিক শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রথম ট্রাইঅ্যাংগলেশনের জন্য উপযুক্ত কোসাইনের ল'র স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছিলেন। বইটিতে তিনি মসজিদ বা প্রাসাদের মতো ভবনের সংযুক্তি ও প্রান্ত আড়ালে ব্যবহৃত মুকারানার মোট দৃশ্যমান অংশ গণনায় দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করেছিলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাজারের কুব্বার গম্বুজের আকার ও পরিমাণ নির্ধারণে কাশি একটি চমৎকার পদ্ধতি বের করছিলেন। গণিতে অসামান্য অবদান রাখায় ফ্রান্সে তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হয়েছে। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে সে দেশে কোসাইনের ল'র নামকরণ করা হয়েছে 'থিওরেমি দা আল-কাশি' (The'or'eme d'Al-Kashi) বা আল-কাশির উপপাদ্য।

www.pathagar.com

রিসালা আল-ওয়াতার ওয়াল-জাইব

উপরে উল্লেখিত গ্রন্থটি হলো কাশির একটি অসম্পূর্ণ বই। বইটির মানে দাঁড়ায় 'দ্য ট্রীটিজ অন দ্য কর্ড এন্ড সাইন' (The Treaties on the Chord and Sine)। মৃত্যু হওয়ায় তিনি বইটি শেষ করতে পারেননি। কাজী জাদা বইটি লিখা শেষ করেন। আল-কাশি অন্য বইয়ে যেভাবে নির্ভুলতার সঙ্গে π এর মান বের করেছিলেন ঠিক সেভাবে তিনি এ বইয়ে সাইন 1^0 এর মান নির্ধারণ করেন। কাশির সময়ে তার নির্ধারিত সাইন 1^0 এর মানই ছিল সর্বাধিক নির্ভুল। ষোড়শ শতাব্দীতে তাকি আল-দীন ছাড়া আর কারো মান তার মতো এত নির্ভুল ছিল না। তিনি ঘন সমীকরণ নামে পরিচিত একটি কোণ ত্রিখণ্ডিত করার সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আল-কাশির আগে আল-বেরুনিও এ সমীকরণের সমাধান দিয়েছিলেন। তবে বীজগণিত ও সংখ্যা প্রণালী বিশ্লেষণে ঘন সমীকরণ সমাধানে তিনিই প্রথম ইটার‍্যাটিভ বা পুনরুক্তিকারী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মধ্যযুগীয় বীজগণিতে তার এ উদ্ভাবন ছিল সর্বোত্তম। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ তার ইটার‍্যাটিভ পদ্ধতির কথা জানতো না। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তার এ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

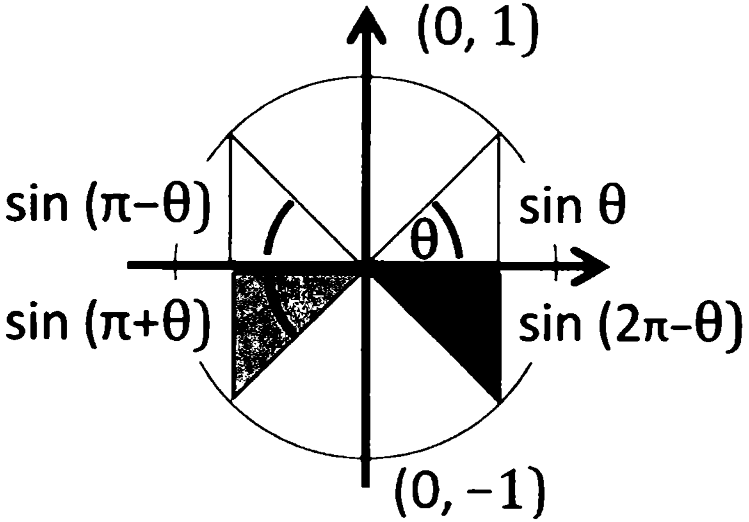

আল-কাশি নিউটনের পদ্ধতির সমতুল্য বীজগণিতের এলগোরিদম পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তার পূর্বসূরি শরাফ আল-তুসিও এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। কাশি $\tilde{n}$ এর মূল বের করার উদ্দেশে $X^p - N = O$ এর সমাধানে এলগোরিদম পদ্ধতি ব্যবহার করার

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে বীজগণিতকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত হেনরি বিগসের ত্রিগোণমিট্রিয়া ব্রিটানিকা'য় অনুরূপ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়। কাশি গাণিতিক শব্দ pi উদ্ভাবন করেন। সাইন 1° মান নির্ধারণে তিনি নিচে উল্লেখিত এ ফর্মুলা উদ্ভাবন করেন।

সাইন 3Ø = 3 সাইন Ø- 4 সাইন ^{3Ø}

π গণনা

কাশি তার π এর একটি নিউমারিক্যাল এপ্রক্সিমেশনে নির্ভুলভাবে 2π কে ৯ অঙ্ক পর্যন্ত গণনা করেন। গণিতজ্ঞ রুফিন ও হর্নার কয়েক শ' বছর পর এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। নির্ভুলতায় 2π এর এপ্রক্সিমেশন ১৬ দশমিক স্থানের সমান। গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস π এর মান ৩ দশমিক, চীনা গণিতজ্ঞ ঝু চংকি ৭ দশমিক এবং ভারতীয় গণিতজ্ঞ মাধব ১১ দশমিক স্থান পর্যন্ত গণনা করেছিলেন।

দশমিক ভগ্নাংশ

গণিতে দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার কাশির অবদান। এ ভগ্নাংশের ব্যবহার তাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচার করা হতো যে, সাইমন স্টেভিন প্রথম দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করেন। ১৯৪৮ সালে পি. লাকি তা মিথ্যা প্রমাণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, কাশি তার দ্য কি টু এরিথমেটিকে দশমিক ভগ্নাংশের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ ডার্ক জান স্ট্রুইক তার 'অ্যা সোর্স বুক ইন ম্যাথমেটিক্স'-এর ৭ পৃষ্ঠায় দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহারে কাশির কৃতিত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, '*The introduction of decimal fractions as a common computational practice can be dated back to the Flemish pamphlet De Thiende, published at Leyden in 1585, together with a French translation, La Disme, by the Flemish mathematician Simon Stevin (1548-1620), then settled in the Northern* Netherlands. It is true that decimal fractions were used by the Chinese many centuries before Stevin and that the Persian astronomer Al-Kashi used both decimal and sexagesimal fractions with great ease in his The Key to Arithmetic (Samarkand, early fifteenth century).'

অর্থাৎ '*সাধারণ গণনার রীতি হিসাবে দশমিক ভগ্নাংশ ১৫৮৫ সালে লাইডেনে প্রকাশিত ফরাসি অনুবাদ লা ডিসমেসহ বেলজীয় গণিতজ্ঞ সাইমন স্টেভিনের (১৫৪৮-১৬২০) বেলজীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্য থাইয়েনডিতে দেখা যায় এবং পরে তা উত্তর নেদারল্যান্ডে নির্দিষ্ট রূপ নেয়। একথা সত্য যে, স্টেভিনের কয়েক শতাব্দী আগে চীনারা দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করছে। তবে পার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-কাশি তার দ্য কি টু এরিথমেটিকে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সমরকন্দে) দশমিক এবং সেক্সাজেসিম্যাল উভয় ভগ্নাংশ ব্যবহার করেছেন।*'

www.pathagar.com

খৈয়ামের ট্রাইঅ্যাংগল

পারস্যে প্যাসকেলের ট্রাইঅ্যাংগল বা ত্রিভুজকে ওমর খৈয়ামের নামানুসারে 'খৈয়াম ট্রাইঅ্যাংগল' বা খৈয়ামের ত্রিভুজ নামে আখ্যায়িত করা হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি গণিতজ্ঞ ব্লেইজ প্যাসকেল তার গ্রন্থ ট্রীটিজ অন দ্য এরিথমেটিক্যাল ট্রাইঅ্যাংগল'-এ দ্বিপদ থিওরেম নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম আলোচনা না করলেও গণিতের এ তত্ত্ব তার নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এলিমেন্টারি বীজগণিতে বাইনোমিয়াল থিওরাম অনুযায়ী (x+y)ñ এর পাওয়ার $ax^b y^c$ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

খৈয়ামের ট্রাইঅ্যাংগল বলতে মূলত দ্বিপদ সহগ সংখ্যাগুলোর সমন্বয়ে ত্রিভুজ আকৃতির একটি বিন্যাসকে বুঝায়। আল-কাশি তার গণিত বিষয়ক বইয়ে এ ট্রাইঅ্যাংগল নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্যাসকেলের ত্রিভুজে তিনটি বাহুতে সমান সমান দ্বিপদ সহগ সংখ্যা থাকতে হবে। শীর্ষ থেকে নিচের দিকে সারিগুলো গুণলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি সারিতে ক্রমান্বয়ে একটি করে সংখ্যা বাড়ছে। একইভাবে নিচে থেকে ওপরের দিকে সারিগুলো গুণলে দেখা যাবে একটি করে সংখ্যা কমছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

ধরা যাক- ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১, ১, ২, ৩, ৩, ৪, ৪, ৫, ৫, ৬, ১০, ১০-এই একুশটি দ্বিপদ সংখ্যার সাহায্যে প্যাসকেলের একটি ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। প্রথমেই ত্রিভুজের ডান বাহুর জন্য ১, ১, ১, ১, ১, ১-এই ছয়টি সংখ্যা নেয়া হলো। একইভাবে বাম বাহুর জন্য নেয়া হলো ১, ১, ১, ১, ১- এই পাঁচটি রাশি। এবার ভূমির জন্য নেয়া হলো ৫, ১০, ১০, ৫-এই চারটি রাশি। ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেলো। তবে ভেতরে কিছু কাজ বাকি আছে। অবশিষ্ট ২, ৩, ৩, ৪, ৪, ৬-এই পাঁচটি সংখ্যার মধ্যে ৪, ৬ ও ৪-এ তিনটি সংখ্যা ভূমির ওপরে দ্বিতীয় সারিতে বসিয়ে দেয়া গেলো। এভাবে ওপরের দিকে তৃতীয় সারিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো ৩ ও ৩-এ দু'টি সংখ্যা। তার ওপরে চতুর্থ সারিতে বসিয়ে দেয়া হলো ২-কে। সবগুলো সংখ্যা বসিয়ে দেয়া হলো। এবার ত্রিভুজ বা পিরামিড আকৃতির এ কাঠামোর ভূমিতে দেখা যাবে ১, ৫, ১০, ১০, ৫, ১-এই ছয়টি সংখ্যা। ঠিক তার ওপরে দ্বিতীয় সারিতে দেখা যাবে ১, ৪, ৬, ৪, ১-এই পাঁচটি সংখ্যা। তার ওপরে তৃতীয় সারিতে দেখা যাবে ১, ৩, ৩, ১-এই চারটি সংখ্যা। ওপরের দিকে চতুর্থ সারিতে দেখা যাবে ১, ২, ১-এই তিনটি সংখ্যা। ওপরের দিকে পঞ্চম সারিতে দেখা যাবে ১ ও ১-কে। শীর্ষ সারিতে দেখা যাবে শুধু ১-কে। এই হলো প্যাসকেলের ত্রিভুজ।

ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ ডার্ক জান স্ট্রুইক তার 'অ্যা সোর্স বুক ইন ম্যাথমেটিক্স'-এ লিখেছেন, '*The Pascal triangle appears for the first time (so far as we know at present) in a book of 1261 written by Yang Hui, one of the mathematicians of the Sung dynasty in China. The properties of binomial coefficients were discussed by the Persian mathematician Jamshid al-Kashi in his The Key to Arithmetic of c. 1425. Both in China and Persia the knowledge of these properties may be much older. This knowledge was shared by some of the Renaissance mathematicians, and we see Pascal's*

www.pathagar.com

triangle on the title page of Peter Apian's German arithmetic of 1527. After this we find the triangle and the properties of binomial coefficients in several other authors.'

অর্থাৎ *'১২৬১ সালে চীনের সাং রাজবংশের গণিতজ্ঞ ইয়াং হুইয়ের লিখা একটি বইয়ে আমরা প্রথম (আমরা এখন পর্যন্ত যতদূর জানি) প্যাসকেলের ত্রিভুজ দেখতে পাই। ১৪২৫ সালে পার্সী গণিতজ্ঞ জামশেদ আল-কাশি তার দ্য কি টু এরিথমেটিকে দ্বিপদ সহগের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। চীন ও পারস্য উভয় দেশে দ্বিপদ সহগের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অনেক পুরনো। রেনেসাঁ যুগের কয়েকজন গণিতজ্ঞ এ জ্ঞান আহরণ করেন এবং আমরা ১৫২৭ সালে পিটার এপিয়ানের জার্মান এরিথমেটিকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্যাসকেলের ট্রাইঅ্যাংগল খুঁজে পাই। তারপর আমরা আরো কয়েকজন গ্রন্থকারের গ্রন্থে দ্বিপদ সহগের ধর্ম নিয়ে আলোচনা দেখতে পাই।'*

মৃত্যু

গিয়াসউদ্দিন জামশেদ আল-কাশি ১৪২৯ সালে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি 'রিসালা আল-ওয়াতার ওয়াল-জাইব' বইটি লিখছিলেন। তিনি কিভাবে মারা যান তা স্পষ্ট নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিশ্বাস করছেন, উলুগ বেগ তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে অন্যরা বলছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

বীজগণিতের প্রতীক উদ্ভাবক আল-কালাসাদি

বীজগণিতের প্রতীক উদ্ভাবক ও প্রথম ব্যবহারকারী আল-কালাসাদির পূর্ণ নাম আবুল হাসান আলিব মোহাম্মদ আলী আল-কুরাশি আল-বাস্তি আল-কালাসাদি। বর্তমান স্পেনের অংশ আন্দালুসিয়ার মুরিশ শহর বাজাহয় ১৪১২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাজাহয় জন্মগ্রহণ করায় তার নামের সঙ্গে বাস্তি শব্দটি যুক্ত হয়। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম গণিতজ্ঞ, আইনশাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত। গ্রানাডায় তিনি আবু ইসহাক ইব্রাহিম এবং ইমাম আবদুল্লাহ আল-সারকুস্তির কাছে শিক্ষা লাভ করেন। আবু ইসহাক তাকে শিক্ষা দিতেন দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব। আর আল-সারকুস্তি তাকে শিক্ষা দিতেন মুসলিম আইন। শিক্ষা লাভের সময় কালাসাদি বাজাহয় তার পরিবারকে সহায়তাও করতেন। আন্দালুসিয়ার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল।

আরবী আল-আন্দালুস থেকে আন্দালুসিয়া শব্দটির উৎপত্তি। বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালকে মুসলমানরা আন্দালুসিয়া নামে আখ্যায়িত করতো। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা স্পেন দখল করে নিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টানরা উত্তর পূর্বদিক থেকে ধীরে ধীরে স্পেন পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হয়। মুসলিম শাসনাধীন বাদবাকি স্পেন আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত হয়ে উঠে। ইউরোপীয়রা আফ্রিকার মুসলমানদেরকে মুর নামে আখ্যায়িত করতো। স্পেন পুনরুদ্ধারে খ্রিস্টানদের চার শ' বছর লেগেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আন্দালুসিয়ার সমৃদ্ধি ঘটে। গ্রানাডার মুসলিম শাসকরা বিস্ময়কর প্রাসাদ ও দুর্গ আল-হামরা তৈরি করে। ১৩৬০ সালের মধ্যে এ প্রাসাদ তৈরি শেষ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্য কাস্টিল গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকায় আন্দালুসিয়া সমৃদ্ধি লাভ করার সুযোগ পায়। আল-কালাসাদির জন্মের পাঁচ বছর আগে ১৪০৭ সালে খ্রিস্টান রাজ্য কাস্টিল গোটা স্পেন ও পর্তুগাল পুনরুদ্ধারে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করে। মুসলিম বিজ্ঞানী আল-কালাসাদি গ্রানাডা নগরীর উত্তর পূর্বদিকে বাজাহয় লালিত পালিত হন। খ্রিস্টান রাজ্য কাস্টিলের উপর্যুপরি অভিযানে বাজাহয় বসবাস করা ছিল দুরূহ। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আল-কালাসাদি বাজাহয় লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আইনশাস্ত্র, পবিত্র কোরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। যুদ্ধাঞ্চল ছেড়ে তিনি দক্ষিণের গ্রানাডায় স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি তার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন।

ভ্রমণ

ইসলামী বিশ্ব ভ্রমণে আল-কালাসাদি গ্রানাডা ত্যাগ করেন এবং ব্যাপকভাবে ইসলামী বিশ্ব ভ্রমণ করেন। উত্তর আফ্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। মুসলিম

www.pathagar.com

দেশগুলোতে তিনি বসবাস করতে থাকেন। সে সময় মুসলিম বিশ্ব খ্রিস্টানদের হামলার বিরুদ্ধে মুসলিম স্পেনকে রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছিল। আল-কালাসাদি মরক্কো সীমান্তে বর্তমান উত্তর-পূর্ব আলজেরিয়ার তালিমসিনে ৭ বছর অবস্থান করেন। এখানে আল-কাসিম সাইদ আল-উকবানি এবং মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জঘুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কালাসাদির ওপর এ দুই পণ্ডিতের প্রভাব ছিল অসামান্য। তারা তাকে গণিত এবং বাস্তব জীবনের সমস্যায় গণিতের ধারণা প্রয়োগ করার শিক্ষা দেন। ১৪০৭ সালের ৩০ মে তালিমসিন থেকে কালাসাদি যান মিসরে। এখানে তিনি ইবনে হাজাব আল-আসকালানির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। একসময় হজ পালনে তিনি মক্কা শরীফ যান এবং হজ পালন শেষে কিছুদিন কায়রো অবস্থান করেন। কায়রোয় শিক্ষকতায় যোগ দেন। এখানে শামসুদ্দিন আল-সমরকন্দির মতো পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৪৪৯ সালে তিনি কায়রো ত্যাগ করে গ্রানাডায় ফিরে যান। ১৪৫১ সালে কালাসাদি তার নিজ গ্রাম বাজাহয় আসেন। এখান থেকে যান গ্রানাডায়। এ শহরে এসেও শিক্ষকতায় যোগ দেন। গ্রানাডায় তিনি ৩০ বছর অবস্থান করেন। কালাসাদি এখানে ইব্রাহিম ইবনে ফতুর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন। তার যেসব ছাত্র ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন তারা হলেন আবু আবদুল্লাহ আল-মালালি, আবু আবদুল্লাহ আল-সানুসি ও আহমদ ইবনে আলী আল-বালাবি। ইতিমধ্যে গ্রানাডায় মুসলিম শাসনের আরো অবনতি ঘটে। আরাগন ও কাস্টিলের খ্রিস্টানরা মুসলিম শাসনাধীন বাদবাকি স্পেনের ওপর ক্রমাগত হামলা চালাতে থাকে। দুঃসময়ে কালাসাদি হাল ছাড়েননি। এসময় তিনি তার শ্রেষ্ঠ বইগুলোর কয়েকটি রচনা করেন। খ্রিস্টানরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ১৪৮০ সালে রাজা ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার নেতৃত্বে খ্রিস্টান বাহিনী গ্রানাডায় হামলা চালায়। আল-কালাসাদি বাজাহর উপকণ্ঠে দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৪৮৩ সালে তিনি চিরদিনের জন্য আন্দালুস ত্যাগ করেন। শিগগির তাকে আন্দালুসীয় শরণার্থীদের দলে যোগ দিতে হয়। এসব শরণার্থী উত্তর আফ্রিকায় এসে আশ্রয় নেয়। আফ্রিকার তিউনিসিয়ার বেজায় ১৪৮৬ সালের ১০ ডিসেম্বর কালাসাদি ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের ৬ বছর পর ১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার বাহিনী বাজাহ অবরোধ করে শহরবাসীদের হত্যা করে।

ক্রিপটোগ্রাফি

ক্রিপটোগ্রাফি বা গোপন বার্তার পাঠোদ্ধারে আল-কিন্দির পরে যার নাম আসে তিনি হলেন আল-কালাসাদি। এ বিষয়ের ওপর তিনি 'সুলেহ আল-আ'শা' শিরোনামে ১৪ খণ্ডে বিভক্ত একটি বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। তিনি তার এ বিশ্বকোষ রচনায় তাজউদ্দিন আলী ইবনে আদ-দুরাহিম বিন মোহাম্মদ আস-আলিবি আল-মাসুদির একটি বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করেন। মাসুদির বইটি হারিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আল-কালাসাদির গাণিতিক রচনাগুলো অখণ্ড ও অমূলদ সংখ্যা, ভগ্নাংশ এবং সঠিক অথবা কাছাকাছি বর্গমূল নির্ণয় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার ও ইবনে আল-বান্নার গ্রন্থের মধ্যে চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কালাসাদি নিজেও স্বীকার করেছেন, তার কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী লেখকদের বইয়ের আলোচনার পরবর্তী উন্নততর সংস্করণ অথবা ভাষ্য। ভতিনি গণিত ও বীজগণিতের ওপর প্রচুর বই লিখেছেন। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল-তাবছিরা ফিল মাল-হিসাব' (Clarification of the science of arithmetic), 'কানন আল-হিসাব' (Canon of Mathematics) এবং 'ইনকিশাফ আল-জিলবাব আন কুয়ানুন আল-হিসাব' (Explaining the canon of Mathematics) প্রভৃতি। তিনি গণিতের ওপর আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আল-কুল্লিয়াত ফি আল-ফারায়িদ' এবং 'রিসালা ফি দাওয়াত আল-আসমা ওয়াল মুনফাসিলাত'। কালাসাদি 'আল-কুল্লিয়াত ফি আল-ফারায়িদ'-এর পাশাপাশি এ বইটির ওপর একটি ভাষ্যও লিখেছিলেন। ১৪৪৭ সালে তিউনিসিয়া সীমান্তে অবস্থানকালে লিখেছিলেন 'রিসালা ফি দাওয়াত আল-আসমা ওয়াল মুনফাসিলাত' এবং মক্কায় অবস্থানকালে লিখেছিলেন ইবনে হাজিবের ফারায়িদের ওপর ভাষ্য। তিনি ইবনে আল-বান্নার 'তালখিস আমল আল-হিসাব'-এর (Summary of Arithmetical Operations) ওপর আরেকটি ভাষ্য লিখেছিলেন। ১৪৪৫ সালে লিখিত এ সহজ ভাষ্যকে তিনি 'কাশফ আল-জিলবাব আন ইলম আল-হিসাব' (Unveiling the science of arithmetic) নামে আখ্যায়িত করেন। এ ভাষ্যটি তিনি নিজেও শিক্ষা দানের জন্য কঠিন বলে মনে করতেন। তাই তিনি তৃতীয় একটি ভাষ্য লিখেন। এ ভাষ্যটির নাম দেন 'কাশফ আল-আসরার আন ইলম আল-হিসাব' (Unfolding the secrets of the use of dust letters)। ভাষ্যটির এ ধরনের নামকরণের একটি ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

হিন্দু সংখ্যা লিখন পদ্ধতিতে একটি ডাস্ট বোর্ড ব্যবহার করা হতো। অঙ্ক করার সময় বারবার সংখ্যা পরিবর্তন করতে হতো। কখনো কখনো সংখ্যা মুছে ফেলতে হতো। ব্ল্যাকবোর্ড, চক ও ডাস্টার যেভাবে ব্যবহার করতে হয় সেভাবে ডাস্ট বোর্ড ব্যবহার করা হতো। দশম শতাব্দীতে আল-উকলিদিসি সংখ্যা সংশোধনে ডাস্ট বোর্ডের পরিবর্তে কিভাবে কাগজ ও কলম ব্যবহার করতে হয় তা দেখিয়েছিলেন। ভাষ্য দু'টিতে আল-কালাসাদি {n2 Ges{n3 গণনা করেছিলেন এবং বর্গমূল নির্ণয়ে পর পর কাছাকাছি ফল বের করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আল-কালাসাদির দু'টি ভাষ্য উত্তর আফ্রিকায় গণিত শিক্ষা দানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এক শ' বছরের অধিক চালু ছিল। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ এফ. উইপিক ১৮৫৮-১৮৫৯ সালে 'কাশফ আল-আসরার আন ইলম আল-হিসাব' অনুসরণে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে বান্না ছিলেন মরক্কোর একজন গণিতজ্ঞ। তিনি নিজেও তার বইয়ের ভাষ্য লিখেছিলেন। আল-কালাসাদির জন্মের এক শ' বছর আগে তার মৃত্যু হয়। ইবনে আল-বান্নার গ্রন্থের আলোকে কালাসাদি 'আল-তাবছিরা ফিল মাল-হিসাব' রচনা

www.pathagar.com

করেন। তার এ মৌলিক গ্রন্থটি বেশ জটিল। অজানা রাশি ধরে অঙ্ক করার রীতি তিনিই চালু করেন। আজকাল অজানা রাশি হিসাবে সাধারণত ব্যবহার করা হয় 'x' নয়তো 'ক'। আল-কালাসাদি ব্যবহার করতেন আরবী 'শাই' শব্দ। ধারাবাহিক বীজগণিতের অগ্রদূতও তিনি। ধারাবাহিক বীজগণিত বলতে বুঝায় গাণিতিক বিষয় ও ধারণাগুলোকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। তিনি হলেন বীজগণিতে ব্যবহৃত প্রতীকের উদ্ভাবক।

তবে আল-কালাসাদির দুই শ' বছর আগে গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেন্টাস এবং প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মগুপ্তের মতো ইবনে আল-বান্নাও বীজগণিতে প্রতীক ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। 'আল-উরজুযা আল-ইয়াসমিনিয়া' হলো বীজগণিতের ওপর কালাসাদির একটি ভাষ্য। ১২০৪ সালে আল-ইয়াসমিন 'আল-উরজুযা আল-ইয়াসমিনিয়া' শিরোনামের এই বইটি লিখেছিলেন। ভাষ্যটিতে আল-কালাসাদি সংক্ষিপ্ত আরবী শব্দ অথবা আরবী শব্দের প্রথম অক্ষরের সাহায্যে গাণিতিক প্রতীকগুলো ব্যবহার করেন। যেমন-

+ এর জন্য ব্যবহার করতেন আরবী ওয়াও অক্ষর। এ অক্ষরের মানে হলো 'এবং'।

- এর জন্য ব্যবহার করতেন আরবী ইলা শব্দ। এ শব্দটির মানে হলো 'কম'।

× জন্য ব্যবহার করতেন আরবী ফি শব্দ। এ শব্দটির মানে হলো 'বহু গুণ'।

÷ জন্য ব্যবহার করতেন আরবী আলা শব্দ। এ শব্দটির মানে হলো 'ওপরে'।

'মূল' শব্দটি বুঝাতে ব্যবহার করতেন আরবী জিধার শব্দের প্রথম অক্ষর জিম।

'বর্গ' শব্দটি বুঝাতে ব্যবহার করতেন আরবী শাই শব্দটির প্রথম অক্ষর শিন।

x^2 জন্য ব্যবহার করতেন আরবী মাল শব্দটির প্রথম অক্ষর মিম।

x^3 জন্য ব্যবহার করতেন আরবী কাব শব্দটির প্রথম অক্ষর কাপ।

= জন্য ব্যবহার করতেন আরবী ইয়াদিলু শব্দের প্রথম অক্ষর ইয়া।

কালাসাদির অবদানকে খাটো করার চেষ্টা

গণিতে আল-কালাসাদির অবদানকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার বিরোধিতাকারীদের যুক্তি অভিন্ন নয়। একটি ভাষ্যে দাবি করা হচ্ছে, বীজগণিতে প্রথম প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন মরক্কোর ইয়াকুব ইবনে আইয়ুব। আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ দাবি করছেন, $\{n^2$ এবং$\{n^3$ এর পর্যায়ক্রম নিয়ে আল-সামাওয়াল এবং আল-বাগদাদী গবেষণা করেছিলেন এবং বেবিলনীয়দের বর্গমূল বের করার পদ্ধতি অজানা ছিল না। এসব ঐতিহাসিক বীজগণিতে প্রতীক ব্যবহারে কালাসাদির কৃতিত্ব অস্বীকার করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত মুসলিম গণিতজ্ঞ সামাওয়াল, বাগদাদী ও ইবনে আইয়ুবকে কৃতিত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা আরো বলছেন, উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ প্রথম মুসলিম গণিতজ্ঞদের অবদানের পরিধি নির্ধারণের চেষ্টা করেন। অজ্ঞতার জন্য তারা কালাসাদির কৃতিত্বের ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। কালাসাদিকে বর্গমূলের প্রথম প্রতীক ব্যবহারকারী ও উদ্ভাবক হিসাবে সাক্ষ্য দেয়ায় গণিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এফ. উইপিকের সমালোচনা করে গণিতের আরেক ঐতিহাসিক জে. সামসো-মোয়া লিখেছেন, '*The author analyses the work of the mathematicians of the Maghrib as if they were entirely independent of their predecessors in*

www.pathagar.com

Eastern Islam. This leads him to stress the importance of the algebraic symbolism used by al-Qalasadi without taking into consideration similar previous attempts both in Eastern and Western Islam, a fact which was already known in the second half of the 19th century by F. Woepcke.'

অর্থাৎ '*এ গ্রন্থকার উত্তর আফ্রিকার গণিতজ্ঞদের গ্রন্থগুলো এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেন* তারা পূর্বাঞ্চলে তাদের ইসলামী পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পুরোপুরিভাবে স্বাধীন ছিলেন। *এ ধরনের বিশ্লেষণ তাকে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের ইসলামী গণিতজ্ঞদের অনুরূপ প্রচেষ্টা বিবেচনায় না নিয়ে আল-কালাসাদি ব্যবহৃত বীজগাণিতিক প্রতীকের গুরুত্বের ওপর জোর দিতে উৎসাহিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এফ. উইপিকেরও এ সত্য জানা ছিল।'*

তিনি আরো লিখেছেন, '*The author seems to believe that algebraic symbolism was first developed by the Spanish-Arabic mathematicians Ibn al-Banna and al-Qalasadi; the extreme rarity of algebraical symbolism in the parts dedicated to algebra in medieval Italian books on the abacus and arithmetic is possibly due to the fact that Leonardo Fibonacci whose `Liber abaci' was extremely influnced in medieval Italy, was not aware of the work of Andalusian mathematicians.'*

অর্থাৎ '*মনে হচ্ছে গ্রন্থকার বিশ্বাস করছেন যে,স্প্যানিশ-আরব গণিতজ্ঞ ইবনে আল-বান্না এবং আল-কালাসাাদি ইসলামে প্রথম বীজগণিতীয় প্রতীক উদ্ভাবন করেছেন। মধ্যযুগের ইতালিতে এবাকাস এবং লিওনার্ডো ফিবোনাসির 'লাইবার আবাসি'র মতো গণিতের ওপর প্রণীত অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থগুলোতে বীজগণিতীয় প্রতীক খুব সামান্য খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত এ কারণে যে, লিওনার্ডো ফিবোনাসি আন্দালুসীয় গণিতজ্ঞদের কর্ম সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞাত।'*

আরো দু'জন ঐতিহসিক জে. জে. ওসিকোনার এবং ই. এফ. রবার্টসনও কালাসাদির অবদানকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন। তবে সামসো-মোয়া বীজগণিতে প্রথম প্রতীক ব্যবহারকারী হিসাবে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, এ দু'জন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন অন্যদের নাম। নিচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড মেডিসিন' শিরোনামে পুস্তকের ৮৩১ পৃষ্ঠায় ওসিকোনার এবং রবার্টসন লিখেছেন, '*For a long time the invention of symbolism was attributed to Qalasadi. But the results of recent research now permit us to affirm that this same algebraic symbolism was already in existence in the twelfth century, particularly in the work of Ibn al-Yasmin entilled Talqish al-afkar and it was widely in use in the fourteenth century in particular by Ibn Qunfudh. The work of al-Qalasadi bears witness to the persistence of that symbols and of their widespread use throughout the Maghreb.'*

অর্থাৎ '*দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতীক উদ্ভাবনের জন্য কালাসাদিকে কৃতিত্ব দেয়া হতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণা আমাদেরকে নিশ্চিত করছে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে*

www.pathagar.com

ইবনে আল-ইয়াসমিনের তালকিশ আল-আখকার শিরোনামে একটি গ্রন্থে অনুরূপ প্রতীকের অস্তিত্ব ছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে কুনফুধ ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করেছেন। আল-কালাসাদির গ্রন্থ এসব প্রতীকের ব্যবহার অব্যাহত রাখার এবং গোটা উত্তর আফ্রিকা জুড়ে এগুলোর ব্যাপক প্রয়োগের প্রমাণ দিচ্ছে।'

অন্যদিকে 'গ্রেট ওয়ার্ক অব ইসলাম' শিরোনামে একটি নিবন্ধে বীজগণিতের প্রতীক উদ্ভাবনে কালাসাদির অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখা হয়, *'Throughout their time in power before the fall of Islamic civilization, the Arabs used a fully rhetorical algebra where sometimes even the numbers were spelled out in words. The Arabs would eventually replace spelled out numbers with Arabic numerals, but the Arabs never adopted or developed a syncopated or symbolic algebra until the work of Ibn al-Banna al-Marrakushi in the* 13^{th} *century and Abu al-Hasan Ibn Ali al-Qalasadi in the* 15^{th} *century.'*

অর্থাৎ *'ইসলামী সভ্যতার পতনের আগে ক্ষমতায় থাকার পুরো সময়ে আরবরা পুরোপুরিভাবে আলঙ্করিক বীজগণিত ব্যবহার করতো। এমনকি কখনো কখনো সংখ্যাগুলো কথায় প্রকাশ করা হতো। আরবরা পর্যায়ক্রমে কথায় লেখা সংখ্যার স্থলে আরবী সংখ্যা প্রতিস্থাপন করে। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইবনে আল-বান্না আল-মারাকুশি এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবুল-হাসান ইবনে আলী আল-কালাসাদির রচনা প্রকাশিত হওয়া নাগাদ আরবরা কখনো সংক্ষিপ্ত অথবা প্রতীকী বীজগণিত গ্রহণ অথবা উদ্ভাবন করেনি।'*

www.pathagar.com

এশিয়া ও আফ্রিকা সফরকারী নাসির-ই-খসরু

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে দুই ব্যক্তি ভূগোল বিজ্ঞানে অবদানের জন্য খ্যাতি লাভ করেন তাদের একজন হলেন আল-বাকরি এবং অন্যজন হলেন নাসির-ই-খসরু। খসরু ছিলেন একাদশ শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং শিয়া ইসমাঈলীয় ধর্ম প্রচারক। তার পিতা ছিলেন বলখের শহরতলীর একজন ক্ষুদে জমিদার। শৈশবকাল থেকে তিনি জ্ঞানান্বেষণ করতেন। ত্রিশ বছর তিনি শিক্ষা লাভ করেন। খসরু জ্ঞানের সব শাখায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পবিত্র কোরআন হেফজ করেন এবং কোরআনের ভাষ্য প্রদানে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। ইসলামী সাহিত্য ছাড়াও তিনি ইঞ্জিল ও যবুর কিতাবে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি টলেমির আলমাগেস্ট, ইউক্লিডের জ্যামিতি, আলকেমি, পদার্থবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, সঙ্গীত, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষী ইত্যাদিও অধ্যয়ন করেন। সাহিত্যে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি আরবী, ফারসি, তুর্কি ও গ্রীক ভাষা ছাড়াও হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষাও জানতেন। খসরু সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটলের দর্শন শিক্ষা লাভ করেন এবং আল-কিন্দি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার ভাষ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞান অর্জনে তার পিপাসা সম্পর্কে তিনি তার 'দিওয়ান'-এ মন্তব্য করেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো জ্ঞান নেই যেখান থেকে আমি কম বেশি উপকৃত হইনি। ভ্রমণকারী হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারক হিসাবে খসরু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। অধ্যাপক ব্রাউন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে তার একটি আত্মজীবনী সংরক্ষিত বলে উল্লেখ করেছেন। তার আত্মজীবনীতে দেখা যায়, তিনি তার ধর্মীয় মতবাদের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন।

নাসির-ই-খসরুর পূর্ণ নাম আবু মইনউদ্দিন নাসির ইবনে খসরু ইবনে হারিছ আল-কুবা জিয়ানি। তিনি 'সফরনামা' গ্রন্থে তার এই নামের সঙ্গে আল-মারওয়াজি শব্দটিও জুড়ে দিয়েছেন। মারওয়াজি বলতে বুঝায় মারওয়ার বা মার্ভের অধিবাসী। মারওয়া হলো মার্ভ প্রদেশে তিরমিজের কাছে অক্সাস নদীর তীরের একটি শহর ও সেনানিবাস। ১০০৩ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালে অক্সাস নদীর তীরে বলখের কুবাদিয়ানে এক জমিদার পরিবারে তার জন্ম। তার আমলে ইরানে অন্য যেসব বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ওমর খৈয়াম, হাসান বিন সাবাহ ও আল-মুয়ায়িদ আস শিরাজী। নাসিরের পরিবার ছিল স্থানীয় গজনীর রাজদরবারের বিশিষ্ট সদস্য অথবা কর্মচারি। তার মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। কবিতায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতো প্রথম জীবনে গজনীর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

নাসির-ই-খসরু

www.pathagar.com

১৩৪১ সালের দিকে সেলজুকরা গজনীর সুলতানকে বিতাড়িত করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করলে খসরু সেলজুকদের অধীনে মার্ভে প্রশাসনিক কর্মচারি হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তার ভাইও এখানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার নিজের কথায় তিনি খোরাসানে সেলজুক নৃপতি চাগরি বেগ দাউদের সচিব এবং রাজস্ব পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

ধর্মমত নিয়ে বিতর্ক

নাসির-ই-খসরুর প্রকৃত ধর্মমত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলছেন, তিনি ছিলেন শিয়া ধর্মমতের অনুসারী। আবার নাসির নিজে তার দিওয়ানের দু'টি অধ্যায়ে নিজেকে আলাভি হিসাবে পরিচিয় দিয়েছেন। নাসিরের এ উক্তি থেকে ঐতিহাসিক ড. ইভানভ এ উপসংহারে পৌঁছান যে, আলাভির একমাত্র মানে শিয়া নয়। এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তিনি ছিলেন 'সৈয়দ'। তবে তিনি ধর্মীয় উদার মত পোষণ এবং নিজের সন্তুষ্টি অনুযায়ী ধর্ম পালন করায় এটা প্রমাণ করা কঠিন যে, তিনি ছিলেন সৈয়দ। নাসিরের জীবনের শেষ আবাসস্থল ইয়ুমগাঁয়ের বাসিন্দারা নিজেদেরকে সৈয়দ এবং নাসির-ই-খসরুর বংশধর হিসাবে দাবি করে। ইয়ুমগাঁয়ের অধিবাসীরা গোঁড়া সুন্নি এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ নাসির ছিলেন একজন সুফি পীর।

মানসিক পরিবর্তন

চাকরিরত অবস্থায় খসরুর বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি তার 'সফরনামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১০৪৫ সালের শরৎকালে ঘুমের মধ্যে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। এ সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। স্বপ্নে তাকে মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয় এবং ধর্ম কর্মের দিকে মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। স্বপ্নে তিনি কাকে দেখেছিলেন তা প্রকাশ করেননি। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি স্বয়ং বিশ্বনবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তার আগে তিনি মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি উঠে ভালোভাবে অজু করে মসজিদে যান। এ সময় তিনি জুযজানে বাস করছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, তার এই হঠাৎ পরিবর্তন মার্ভে বেপরোয়া জীবন যাপনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন ত্যাগ করেন এবং ইসমাঈলীয় শিয়াদের প্রধান কেন্দ্র কায়রোর দিকে রওনা হন। অন্যদের মতে, তিনি প্রথম জীবন থেকেই ইসমাঈলীয় মতবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তার এ তথাকথিত স্বপ্ন দর্শন রূপক মাত্র। এ সময়ে তার মানস জগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তিনি কায়রোর ফাতেমীয় দরবারে ধর্মপ্রচারক হিসাবে যোগদান করেন।

ভ্রমণ

খসরু ১০৪৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ১০৫২ সালের ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ বার হজ পালন করেন। তিনি মার্ভে তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিশাপুর গমন করেন। সঙ্গে ছিলেন তার ভাই আবু সাঈদ ও একজন ভারতীয় চাকর। নিশাপুরে তিনি খাজা মুওয়াফফিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুমিসে সুফি সাধক বায়েজিদ বোস্তামির মাজার জিয়ারত করে দামগান হয়ে সামনানে পৌঁছান। এখানে ইবনে সিনার শিষ্য ওস্তাদ আলী

www.pathagar.com

নিসাইয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং গণিত, জ্যামিতি ও চিকিৎসাবিদ্যার ওপর ভাষণ দেন। খসরু এখান থেকে যান কাজবিন। সেখান থেকে ১০৪৬ সালের ২৬ আগস্ট পৌছান তাবরিজে। এখানে কবি ওত্রানের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তার সঙ্গে তিনি কবি দাকিকী এবং মাউজিকের কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাবরিজ থেকে তিনি ভান, আখিয়াত, বিটলিস, আরজান, মায়ফারকিন, আমিদ ও আলেপ্পো হয়ে মারাতুন নুমানে পৌছান। মারাতুন নুমানে বিখ্যাত আরব দার্শনিক কবি আবুল আলা আল-মারির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। খসরু এ দার্শনিক কবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এখান থেকে তিনি হামা, ত্রিপোলি, বৈরুত, সিডন, টায়ার ও আক্রা হয়ে হাইফায় পৌছান। বেথলেহাম ও জেরুজালেমসহ পবিত্রতম স্থানগুলো পরিদর্শন এবং নবীদের মাজার জিয়ারতে তিনি কিছুদিন সিরিয়ায় অবস্থান করেন। জেরুজালেম থেকে দামেস্ক যাবার পথে ১০৪৭ সালে তিনি প্রথমবার হজ পালন করেন। একই বছর মক্কা থেকে দামেস্ক হয়ে জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে স্থলপথে তিনি মিসরে গিয়ে হাজির হন।

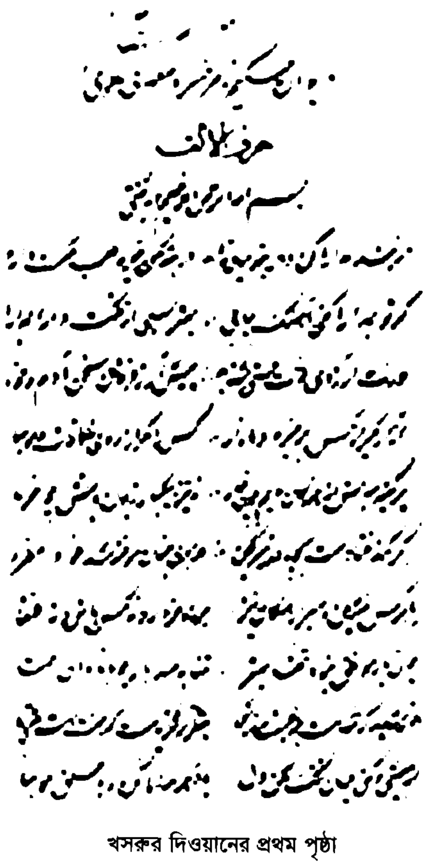

খসরুর দিওয়ানের প্রথম পৃষ্ঠা

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের মতে, নাসির-ই-খসরু এক কঠিন সময়ে পারস্য ত্যাগ করেন। সে সময় রাজা বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধে যুদ্ধে পারস্য বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেসব মুসলিম দেশ সফর করেন সেসব দেশের চিত্রও ছিল অভিন্ন। একমাত্র মিসরকে তার ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। সেখানে তিনি সমৃদ্ধি, সম্পদশালী বাজার, ঐক্য ও শান্তি দেখতে পান। ঐ সময়ে মিসরে ফাতেমীয় বংশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় নাসির মনে করতেন যে, ইসলাম সত্যিকার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং একমাত্র ইসমাঈলীয় মতবাদ মুসলমানদের অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে।

খসরু ত্রিপোলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ত্রিপোলির উপকণ্ঠ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ছিল দোলায়মান শস্য ক্ষেত্র, হাস্যময়ী আঙ্গুরের বাগান, বর্ধিষ্ণু আখ ক্ষেত এবং কমলা লেবু, সাইট্রাস, খেজুর ও অন্যান্য ফলের বাগান। এখানে ছিল পাঁচ এমনকি ছয় তলা উঁচু অট্টালিকা, বড় বড় দোকান, নানা প্রকার বিলাস সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর বাজার। এছাড়া ছিল মুক্ত জায়গা এবং পানির ফোয়ারা। এখানকার জামে মসজিদ ছিল মর্মর প্রস্তর নির্মিত। আরো ছিল একটি সুবৃহৎ পাঠাগার, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি কাগজের কারখানা। কারখানাটিতে সমরকন্দের মতো উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। খসরু তার গ্রন্থে জেরুজালেমের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ফ্রাঙ্কদের কিছুকাল আগে ফাতেমীয়রা জেরুজালেম পুনরাধিকার করেছিল। মক্কা থেকে তিনি দামেস্ক হয়ে জেরুজালেম ফিরে আসেন। খসরু শেষ পর্যন্ত হেজাজ থেকে তিহামা, ইয়েমেন, লাহম ও কাতিফ হয়ে বসরায় আসেন। বসরায় তিনি দু'মাস অবস্থান করেন। সেখান থেকে আররাজান, ইস্পাহান, নাইন, তাবাস, তুন ও সারাখস হয়ে মার্ভে প্রত্যাবর্তন করেন। এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি তার 'সফরনামা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ভ্রমণ বৃত্তান্তই ভূগোল বিজ্ঞানে তার প্রধান অবদান। প্রায় ৭ বছর ভ্রমণ শেষ করে তিনি ১০৫২ সালে বলখে এসে পৌছান। এখান থেকে তার জীবনের নতুন পর্যায় শুরু হয়। তিনি ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় থেকে খসরু নিজেকে খোরাসানের 'হুজ্জাত' বলে প্রচার করতেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রচার কাজে প্রধান ব্যক্তি। তিনি তার 'দিওয়ান' কাব্যগ্রন্থে নিজের জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন। তিনি কিভাবে পরিণত বয়সে শিয়া ইসমাঈলীয় মতবাদে দীক্ষিত হলেন এবং কিভাবে সুন্নিদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তার বর্ণনাও দিয়েছেন। তবে খসরু তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার পরিজনের কথা খুব কমই বলেছেন। মাত্র দু'এক জায়গায় তার পুত্র, পিতামাতা এবং ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বলখে তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন বলে মনে হয়। খসরু নিজেকে এখানে মহাপ্লাবনের সময় নৌকার মধ্যে পঙ্গপাল বেষ্টিত হযরত নূহের (আ.) মতো অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন। তার কথায়, এখানকার লোকেরা ছিল অত্যন্ত বদ এবং শাসন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। তার দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে স্থানটি ছিল লবণ মরুভূমি। এসব কারণে এখানে তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। বলখ থেকে তিনি যান ইয়ুমগাঁয়ে। অধ্যাপক আজিম নাজনীর মতে, সেলজুকদের অধীনে সুন্নি প্রধান বলখে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্টে বাস করেছিলেন এবং সে জন্য ইসমাঈলীয় শাসকের অধীনস্থ

www.pathagar.com

বাদাখশানের ইয়ুমগাঁয়ে পালিয়ে যান। অধ্যাপক ব্রাউনের মতে, বলখে তিনি ১৫ বছর বাস করেন। খসরু এখানে অনেকটা নিঃসঙ্গ ছিলেন এবং বোধ হয় একাকী বাস করতেন। নিজেকে কখনো বন্দি এবং কখনো স্বাধীন নৃপতি বলে বর্ণনা করেছেন। এক পর্যায়ে তার সাহিত্য কর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অধ্যাপক ব্রাউনের বর্ণনা থেকে তার মানসিক দোদুল্যমান অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এ সময় তিনি কয়েকটি কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তার সফরনামা'য় যেসব জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ছিল বাগদাদ, বলখ, মিসর, গোরগাঁও, গজনী, ভারতবর্ষ, কাল্পনিক নগর জাবুলকা ও জাবুল, খাওয়ারিজম, খাতলান, খোরাসান, মাজিন্দারান, অক্সাস নদী, কিপচাক, সমতলভূমি, রাই, সিন্ধু, সিস্তান, ইস্পাহান, শুশতার, সডোম, তিরাখ, তুন, ইয়ুমগাঁও ও জাবুলিস্তান।

মিসর ভ্রমণ

সমুদ্র যাত্রার জন্য আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় খসরু স্থলপথে কায়রো ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ১০৪৭ সালের ৩ আগস্ট তিনি কায়রো পৌছান। তিনি মিসরে ৭ বছর অবস্থান করেন। প্রতি বছর হজ করে তিনি মিসরে ফিরে আসতেন। ফাতেমীয় খলিফা মুনতাসির বিল্লাহর উদারতা দেখে তার প্রতি তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এখানেই তিনি ইসমাঈলীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ মতে দীক্ষিত হন। তার সফরকালে মিসরে ফাতেমীয় শাসন উৎকর্ষতার শীর্ষ শিখরে পৌছে। কায়রো সফরকালে নাসির ফাতেমীয় খলিফা ইমাম আল-মুনতাসির বিল্লাহর দরবারে যান। খলিফার দরবারে দাইয়ুদ দুয়াত ও কূটনীতিক খাজা আল-মুয়ায়িদ উদ্দিন আল-শিরাজির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আল-মুয়ায়িদ উদ্দিন ছিলেন ১২ জন হুজ্জাতের অন্যতম। খসরু তার সঙ্গে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা এবং শরিয়তের গোপন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তার কাছ থেকে তিনি দর্শনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। নাসির-ই-খসরু কায়রোর জামিয়া আজহারে দর্শন শিক্ষা লাভ করেন এবং দারুল হিকমাহয় ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। আল-মুয়ায়িদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি ফাতেমীয় খলিফা মুনতাসির বিল্লাহকে পূর্ণাঙ্গ কামেল ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পান এবং তাকে তিনি তার ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেন। উজির আবু নাসত্রি সাদকা ইবনে ইউসূফ তাকে ইমাম মুনতাসির বিল্লাহর কাছে নিয়ে যান। ফাতেমীয় দরবারে তিনি খলিফার বিপুল আর্শীবাদ লাভ করেন। খলিফা তাকে 'দাইয়ুদ দুয়াত' খেতাব দেন। নিজ দেশে যাত্রা করার আগে তাকে বহু জায়গায় পাঠানো হয়। তাকে তার দেশে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। সৈয়দ নাসির ইমামের সেবায় তিন থেকে পাঁচ বছর কাটান এবং তাকে খোরাসানে দাওয়াত প্রচারে নিযুক্ত করা হয়। তাকে 'হুজ্জাতুল খোরাসান' খেতাব প্রদান করা হলে তিনি ইমাম মুনতাসির বিল্লাহর দরবারের ১২ জন হুজ্জাতের অন্যতম ব্যক্তিতে পরিণত হন। খসরু জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দিওয়ানে তার শিক্ষক আল-মুয়ায়িদের প্রশংসা করেন। তিনি লিখেছেন, *'আল-মুয়ায়িদের হৃদয়ে আল্লাহ জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছেন। খাজা তার সঠিক যুক্তি দিয়ে আমার অন্ধকারময় দিনগুলোকে উজ্জ্বল আলোয় ভরে দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে দু'টি জগৎ দেখিয়েছেন। একটি দেখিয়েছেন প্রকাশ্যে এবং আরেকটি দেখিয়েছেন গোপনে।'*

www.pathagar.com

খসরু তার সফরনামা'তে ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে কোনো আলোচনা না করলেও ফাতেমীয় খলিফাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি কায়রোর আল-আজহার মসজিদ, ১০টি মহল্লা, এখানকার বাগান ও দালান কোঠার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। খসরু ফাতেমীয় রাজ্য পরিচালনার সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি এ রাজ্যের সৈন্যদের শৃঙ্খলা এবং যথাযথভাবে তাদের বেতন দেয়ার দৃষ্টান্ত দেখে অভিভূত হন। তিনি ফাতেমীয়দের সৈন্য সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৫ হাজার। তাদের মধ্যে কায়রোয়ানি অশ্বারোহী সৈন্য ছিল ২০ হাজার, বাতিলি (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার) ১৫ হাজার, হেজাজের বেদুইন ৫০ হাজার এবং বিদেশী বেতনভুক ৩০ হাজার, পদাতিক সৈন্য ছিল ২০ হাজার, কৃষ্ণকায় সামুদ (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার) ১০ হাজার, প্রাচ্য দেশীয় (মাশরেকি তুর্কি ও পারসিক) ৩০ হাজার, ক্রীতদাস এবং প্রাসাদ রক্ষক ১০ হাজার। বিদেশী সৈন্য ছিল একজন পৃথক সেনাপতির অধীনে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল ৩০ হাজার যাজ বা ইথিওপীয় সৈন্য।

বাজারের দ্রব্য সম্ভার দেখে খসরু বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেখে। নিরাপত্তা এত উঁচু মানের ছিল যে, দোকানদাররা তাদের দোকান ও গুদাম বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করতো না। খসরু তার গ্রন্থে লিখেছেন *'আমি ১০৪৭-৪৮ সালে যখন কায়রোতে ছিলাম তখন খলিফার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তিনি উৎসব করার আদেশ দেন। গোটা নগরী ও বাজার এমনভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল যে, তা বর্ণনাতীত। আমি বর্ণনা করলেও অনেকে তা বিশ্বাস করবে না বরং সন্দেহ প্রকাশ করবে। সোনা দানা, অলঙ্কার, নানা দেশী অর্থ, সোনালী সূচি শিল্প, সাটিনের পোশাক, দোকানের কর্মচারি ইত্যাদিতে বাজারের দোকানগুলো এত ভরপুর যে, বসার জায়গা পাওয়াই মুস্কিল। খলিফার শাসনে সবাই নির্ভয়ে কাজ কারবার করে, চলাফেরা করে, দুর্বৃত্ত কিংবা গোয়েন্দাদের কোনো ঝামেলা নেই। সবাই বিশ্বাস করে যে, খলিফার শাসন ব্যবস্থায় কারো ওপর কোনো অত্যাচার হবে না, কেউ অন্যের বিষয় সম্পত্তিতে লোভ করবে না।*

আমি সেখানে সাধারণ লোকদেরকে এমন সম্পদশালী দেখেছি যে, সে কথা বললে বা লিখলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। আমি লোকদের ধন সম্পদের পরিমাণ অনুমান করতে অপারগ। আমি এমনটি আর কোথাও দেখিনি। উদাহরণস্বরূপ, আমি এখানে একজন খ্রিস্টানকে দেখেছি যিনি ছিলেন কায়রোর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তার এত জাহাজ, ধনরত্ন এবং জায়গা জমি ছিল যে, বলা হয় তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এক বছর নীল নদে বন্যা হওয়ায় শস্যের দাম বেশ বৃদ্ধি পায়। খলিফা তার প্রধানমন্ত্রীকে এই খ্রিস্টানের কাছে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেন, এ বছর খাদ্য পরিস্থিতি ভালো নয়। খলিফা তার প্রজাদের দুর্দশায় খুবই ব্যথিত। আপনি আমাদের কিছু নগদ অর্থ ধার দিন। খ্রিস্টান লোকটি তাকে বললেন, খলিফা ও তার মন্ত্রীর দোয়ায় তার কাছে এত শস্য জমা আছে যে, তিনি কায়রোর লোকদের ৬ বছর খাওয়াতে পারবেন। কায়রোয় তখন এত লোক যে, নিশাপুরের জাকজমকের সময়ও তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক ছিল না। এ থেকেই অনুমান করা যায় এ লোকটির কত ধনরত্ন এবং শস্য ছিল। এখানে সুবিচার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত কঠোর ছিল যে, লোকেরা তাদের অফুরন্ত ধন-সম্পদ নিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করতো।'

www.pathagar.com

দেশে প্রত্যাবর্তন

খসরু সাত বছর নানা দেশ ভ্রমণ করে নিজ দেশ খোরাসানে ফিরে আসেন। সকল বিলাসিতা ত্যাগ করে তিনি ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। বলখ থেকে তিনি তার মিশন শুরু করেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশে সহযোগীদের প্রেরণ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুপণ্ডিত হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। আলেমদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। মিসরের ফাতেমীয় খলিফার গৌরবের প্রশংসা করতেন। ফাতেমীয় ইমামের অনুসারী হওয়ার জন গর্ব বোধ করতেন এবং নিজেকে একজন ফাতেমীয় হিসাবে পরিচয় দিতেন। তাতে ফাতেমীয়দের শত্রু আব্বাসীয়দের সঙ্গে তার মারাত্মক বিরোধ বাধে। আব্বাসীয়দের অনুসারী আলেমরা লোকজনকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। খোরাসানে সেলজুকদের শাসন কায়েম হলে তারা খসরুর কার্যকলাপকে তাদের প্রতি গুরুতর হুমকি হিসাবে বিবেচনা করে। তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তিনি বলখ থেকে পালিয়ে মাজিনদারানে আশ্রয় নেন। এখানেও তিনি ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেন। তাতে বলখে তার অবস্থা যা হয়েছিল এখানেও তাই হয়। প্রতিকূলতার মুখে তিনি বলখের পথে আবার পা বাড়ান এবং নিশাপুরে প্রবেশ করেন। বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তিনি বাদাখসানের পথে যাত্রা করেন এবং ইয়ুমগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। ইয়ুমগাঁকে তিনি তার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলেন। প্রতি বছর তিনি নিজ হাতে বই লিখে প্রতিটি প্রদেশে প্রতিনিধি পাঠাতেন। ইয়ুমগাঁয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তার অনুকূলে ছিল না। এ জায়গাটি তার কাছে কারাগারতুল্য বলে মনে হচ্ছিল। সবশেষে মৃত্যু তাকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়।

উপাখ্যানে খসরু

নাসির-ই-খসরুকে নিয়ে বহু উপাখ্যানের জন্ম হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভূগোলবিদ কাজবিনীর মতে, তিনি ছিলেন বলখের অধিপতি। প্রজারা খসরুর মতবাদের জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তিনি ইয়ুমগাঁয়ে পালিয়ে যান। তিনি সেখানে সুন্দর হাম্মাম বা গোসলখানা, বাগান, জাদুকরী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নানা বস্তু তৈরি করেন। সেগুলোর দিকে কেউ তাকালে পাগল হয়ে যাবে এমন ভয়ে কেউ তাকাতো না। এ সবের মধ্যে হাম্মামগুলো কাজবিনীর সময় পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল। তিনি হাম্মামগুলোর বর্ণনাও দিয়েছেন।

সব ধর্ম ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা

গোঁড়া শিয়া ইসমাঈলীয় মতবাদের অনুসারী হলেও নাসির অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তার রচনাবলীতে ইহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু, দ্বৈতবাদী, মাজিয়ান, মানিকিয়ান, সাবিয়ান, জিন্দিক প্রভৃতি ধর্ম নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বাইবেলের অনেক বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার রচনাবলীতে মুসলমানদের বিভিন্ন মতবাদ হানাফী, মালিকী, শায়েফী, হারুরী, কিরামী, লিয়ালী, কারমাইসী, বাতেনী, মুলহিদ প্রভৃতিও উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মৃত্যু

হেকিম নাসির খসরুর মৃত্যু নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যায়। তার অনুগামীদের মতে, ১৪০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর জ্বিনেরা তাকে কবর দেয়। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ অভিমত দিয়েছেন যে, তিনি ৮৭ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। হাজী খলিফা তার 'তাকীন আত-তাওয়ারিখ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, এ মহান হেকিম ৪৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত তাকি জাদাও হাজী খলিফার সঙ্গে একমত পোষণ করছেন। আবার অধ্যাপক আজিম নাজনীর মতে, তিনি ১০৭২ এবং ১০৭৪ সালের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। ইয়ুমগাঁয়ে এক অনাড়ম্বর কবরে তাকে সমাহিত করা হয়। বাদাখসানে তার সমাধি এখন এক শ্রেণীর মুসলমানের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

রচনাবলী

নাসির-ই-খসরু আরবী ও ফারসিতে বহু কবিতা লিখেছিলেন। তিনি বলতেন, তোতা পাখির মতো আরবীতে কোরআন আবৃত্তি করে কোনো লাভ নেই। অধ্যাপক ব্রাউন 'অ্যা লিটারেরি হিস্টরি অব পার্সিয়া'য় খসরুর 'দিওয়ান' নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি তার সফরনামা 'স্ট্রেঞ্জ' (Strange) শিরোনামে অনুবাদ করেন। নাসির-ই-খসরুর রচনাবলী একাদশ শতাব্দীর পারস্য মুসলিম সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি কতগুলো বই লিখেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত তার যেসব বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো:

(১) সফরনামা
(২) দিওয়ান
(৩) রওশনাই নামা
(৪) ওয়াজিহ দ্বীন
(৫) গুশাইশ ওয়া বাহাইশ
(৬) খান-ই-এখওয়ান
(৭) যাদ আল-মুসাফিরিন
(৮) জামি আল-হিক মাতাইন
(৯) শীশ ফসল
(১০) সাদাত নামা
(১১) ইকসিরি আদহাম
(১২) কানযুল হাকায়েক
(১৩) দস্তুরী আদহাম
(১৪) আল-মুসতাওফী

www.pathagar.com

অঙ্কনে ব্যবহৃত কম্পাসের উদ্ভাবক আল-কুহি

জ্যামিতির অঙ্কন প্রণালীতে ব্যবহৃত কম্পাসের উদ্ভাবক আল-কুহির পূর্ণ নাম আবু সহল ওয়াইজান ইবনে রুস্তম আল-কুহি। ৯৪০ সালে ইরানের তাবারিস্তানের কুহি নামে একটি গ্রামে তার জন্ম এবং ১০০০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ গ্রামের নামানুসারে তিনি ইতিহাসে 'আল-কুহি' নামে পরিচিত। তার নামের সঙ্গে 'রুস্তম' শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, তিনি পারস্যের বিখ্যাত বীর রুস্তমের বংশধর। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল জ্যামিতি। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাকে সর্বোত্তম জ্যামিতজ্ঞ এবং ওমর খৈয়াম তাকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসাবে বিবেচনা করতেন। কুহি তার রচনাবলীতে জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তার জ্যামিতিক সমাধান দিকনির্দেশনা হিসাবে কাজ করে।

ইরানে বুয়েদীয় বংশের শাসন কায়েম হওয়ার সময় তিনি বড় হয়ে উঠছিলেন। বুয়েদীয় বংশ ৯৪৫ থেকে ১০৫৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইরান ও ইরাক শাসন করে। ৯৪৫ সালে আহমদ বুয়ে আব্বাসীয় বংশের রাজধানী বাগদাদ দখল করেন। ৯৪৯ থেকে ৯৪৩ সাল পর্যন্ত আদুদ আদ-দৌলার রাজত্বকালে বুয়েদীয় বংশের শাসন উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহন করে। বাগদাদ থেকে তিনি ইরানের গোটা দক্ষিণাঞ্চল এবং বর্তমান ইরাকের অধিকাংশ শাসন করতেন। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিরাট পৃষ্ঠপোষক আদুদ অদ-দৌলা বাগদাদে তার রাজদরবারে আল কুহি, আবুল ওয়াফা ও আল-সিজ্জিসহ বেশ কিছু গণিতজ্ঞকে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

রাজদরবারের মানমন্দিরে নিযুক্তি

৯৬৯ সালে আদুদ আদ-দৌলা শিরাজে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন। ৯৬৯/৯৭০ সালে আল-কুহি, আল সিজ্জি এবং অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শিরাজে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি পর্যবেক্ষণ করেন। আদুদ অদ-দৌলার পুত্র শরাফ উদ-দৌলা ৯৮৩ সালে খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতি সহায়তা অব্যাহত রাখায় আল-কুহি বাগদাদে নয়া খলিফার জন্য কাজ করার সুযোগ পান। খলিফা শরাফ উদ-দৌলা জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-কুহিকে ৭টি গ্রহ পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন। এজন্য বাগদাদের রাজদরবারে আল-কুহির জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করা হয়। কুহির ডিজাইন অনুযায়ী মানমন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় এবং ভবন নির্মাণ শেষ হলে সেখানে সেগুলো স্থাপন করা হয়। আল-কুহিকে মানমন্দিরের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ৯৮৮ সালের জুনে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে মানমন্দির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেশ ক'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবুল ওয়াফা ছিলেন অন্যতম। শরাফ উদ-দৌলার রাজদরবারে তাকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মানমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরেকজন যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন আবু ইসহাক আল-সাবি। আল-সাবি ছিলেন বাগদাদের দরবারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন গণিতে আগ্রহী। ৯৮৮ সালে কুহি বাগদাদে শরাফ উদ-দৌলার প্রাসাদের বাগানে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণকালে আরো কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। ৯৮৯ সালে শরাফ উদ-দৌলার মৃত্যু হলে বাগদাদের মানমন্দিরের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এসময় বুয়েদীয় সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ শাসকের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে ভাটার টান লাগে।

কম্পাস উদ্ভাবন

আল-কুহি হলেন জ্যামিতির অঙ্কন প্রণালীতে ব্যবহৃত কম্পাসের উদ্ভাবক। 'রিসালা ফিল বারকার আল-তাম' (On the perfect Compass)-এ তিনি প্রথম কণিক কম্পাসের বর্ণনা দেন। কুহি প্রথম এক পা বিশিষ্ট এ কম্পাসের সাহায্যে সরল রেখা, বৃত্ত ও কোণ অঙ্কন করেন। গ্রন্থটিতে তিনি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির কলাকৌশল ব্যক্ত করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, যে কেউ সহজে এস্ট্রোল্যাব, সূর্যঘড়ি ও অনুরূপ যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বেরুনি কুহির গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য তার শিক্ষক আবু নাসের মনসূর ইবনে ইরাককে অনুরোধ করেন। আবু মনসূর তার বন্ধু ইবনে আল-হোসেনের দ্বারস্থ হন। ইবনে আল-হোসেন অন্য একটি বইয়ে কুহির গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখতে পান। কিন্তু মূল গ্রন্থটি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। কুহির গ্রন্থের কোনো কপি না পেয়ে অবশেষে তিনি নিজেই আল-বেরুনির জন্য একটি বই লিখেন। তবে তার বইয়ের মান ছিল নিচু। আল-কুহি তার 'রিসালা ফিল বারকার আল-তাম'-এর একটি অংশে এস্ট্রোল্যাব নির্মাণের সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা করেছেন। তার উল্লেখিত বইটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে রয়েছে চারটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয়াংশে সাতটি। আল-কুহি তার গ্রন্থে মানচিত্র অঙ্কনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

গণিত

আল কুহি গ্রীকদের উচ্চতর জ্যামিতিকে ইসলামী বিশ্বে পুনরুজ্জীবিত এবং চালু করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি জ্যামিতিতে দ্বিঘাত ও ঘন সমীকরণের সমাধান দিয়েছেন। কুহি তার গ্রন্থে জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর যে সমাধান দিয়েছেন সেগুলোর একটি সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আল-তুসি লিখেছেন, *'To construct a sphere segment equal in volume to a given sphere segment and equal in area to a second sphere segment- a problem similar to but more diffficult than related problems solved by Archimedes- Al-Quhi constructed the two unknown lengths by intersecting an equilateral hyperbola with a parabola and rigorously discussed the conditions under which the problems is soluble.'*

www.pathagar.com

আল কুহির কম্পাস

www.pathagar.com

অর্থাৎ *'কোনো একটি নির্দিষ্ট বৃত্তাংশের সম পরিমাণ এবং দ্বিতীয় আরেকটি বৃত্তাংশের আয়তনের সমান একটি বৃত্তাংশ অঙ্কনের সমস্যা অভিন্ন। তবে আর্কিমিডিস সংশ্লিষ্ট সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন এ সমাধান ছিল তার চেয়ে আরো কঠিন। আল-কুহি* একটি অধিবৃত্তের সহায়তায় একটি সমকোণী পরাবৃত্ত দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে দু'টি *অজ্ঞাত দৈর্ঘ্য অঙ্কন করেন এবং যেসব শর্তে এ সমস্যার সমাধান করেছেন সেগুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন।'*

ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস', এপোলনিয়াসের 'কনিক্স' এবং আর্কিমিডিসের 'অন দ্য স্ফিয়ার এন্ড সিলিন্ডার'-এর ফলাফল ব্যবহার করে উল্লেখিত এ জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান বের করা ছিল একটি ক্লাসিক রীতি। আল-কুহি প্রমাণ করেছেন যে, কোনো সমাধানের অস্তিত্ব থেকে থাকলে তার স্থানাঙ্ক থাকতে হবে। স্থানাঙ্কগুলোর অবস্থান হবে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কিত আয়তাকার পরাবৃত্তের মধ্যে। নিশ্চয়ই আল-কুহি আধুনিক শাব্দিক অর্থে তার গাণিতিক ধারণা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি প্রাচীন গ্রীক গণিতের প্রচলিত ক্লাসিক্যাল জ্যামিতিতে তার ধারণা প্রকাশ করেছেন। কুহি তলের কোণ প্রবর্তন করেন। তাতে দেখানো হয় যে, অধিবৃত্তের স্থানাঙ্কের মধ্যে তার সমাধান নিহিত। পরবর্তীতে দু'টি বক্র রেখা দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে এ সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। কুহি তার বইয়ে মানচিত্র অঙ্কনের বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। বর্ণনাত্মক জ্যামিতিক পদ্ধতির সদৃশ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি গোলককে বৃত্ত অঙ্কন করেন। কুহি তার 'রিসালা ফি কিসমত আল-জাবিয়া'য় (On the Trisection of the Angle) একটি অধিবৃত্তের সহায়তায় একটি কোণকে ত্রিখণ্ডিত করার ইসলামী সমাধান দেন। গণিতজ্ঞ আল-সিজ্জি তার এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কুহির 'রিসালা ফি ইসতিখারাজ দিল আল-মুসাব্বা আল-মুতাসাবিল-আদলা'য় (On the construction of the Regular Heptagon) কোণ ত্রিখণ্ডিত করার অঙ্কন পদ্ধতি ছিল আর্কিমিডিসের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। ১:২:৩ অনুপাতের একটি কোণের সহায়তায় তিনি একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করেন। কুহি একটি অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্ত দ্বিখণ্ডিত করে সমান প্যারামিটারে উল্লেখিত অনুপাতের বাহুগুলো অঙ্কন করেন। আল-সিজ্জি তার এ পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করেন। 'রিসালা ফি আমল মুখামাস মুতাসাবিল আল-আদলা ফি মুরাব্বা মালুম' (On the construction of an equilateral pentagon in a known square)-এ আল-কুহি দু'টি কোণ দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রে একটি সমকোণী পঞ্চভুজ অঙ্কনের সমস্যা সমাধান করেন। এবার তিনি সহায়তা নেন দু'টি অধিবৃত্তের। কুহি ইউক্লিডের এলিমেন্টসের প্রথম থেকে পঞ্চম অধ্যায়, ইউক্লিডের ডাটা এবং এপোলনিয়াসের কনিক্সের প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের অংশবিশেষের সহায়তায় পঞ্চভুজ অঙ্কনের সমাধান বের করেন। অধিবৃত্তের মূল ডাইরেক্ট্রিজের ধর্ম প্রমাণ করায় কুহির এ অঙ্কন তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি স্বাধীনভাবে অধিবৃত্তের ডাইরেক্ট্রিজের ধর্ম উদ্ভাবন ও প্রমাণ করেন এবং এপোলনিয়াসের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যান। 'রিসালা ফি ইসতিখরাজ মিসাহাত আল-মুজাসসাম আল-মুকাফি'তে (On measuring the

www.pathagar.com

Parabolic Body) কুহি আর্কিমিডিসের চেয়ে সহজ ও স্পষ্ট সমাধান দিয়েছেন। একটি বর্গক্ষেত্রে একটি পঞ্চভুজ অঙ্কন করা অসম্ভব হলেও দু'টি উপায়ে সমকোণী পঞ্চভুজ অঙ্কন করা যেতে পারে। প্রথম উপায়টি হলো 'দ্বিঘাত সমীকরণ'। নবম শতাব্দীতে আবু কামিল এ উপায়ে সমাধান করতেন। দ্বিতীয় উপায়টি হলো 'ঘন সমীকরণ'। আল-কুহি দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করেছিলেন। কুহির 'রিসালা ফি ইসতিখরাজ মিসাহাত আল-মুজাসসাম আল-মুকাফি' ১৯৪৮ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং থেকে প্রকাশ করা হয়।

আল-সাবির সঙ্গে কুহির পত্র বিনিময়

আল-কুহি ও আল-সাবির মধ্যে পত্র যোগাযোগ হতো। তাদের মধ্যে ৬টি পত্র বিনিময় হলেও চারটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তাদের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। একটি পত্রে কুহি লিখেছিলেন, *'মনে করো একটি বৃত্ত এবং l ও m দু'টি পরস্পরছেদী সরল রেখা দেয়া হলো। মনে করো বৃত্তের কোনো একটি বিন্দুতে l বিন্দুতে L-এর সঙ্গে টানজেন্ট মিলিত হলো এবং m মিলিত হলো M-এর সঙ্গে। তাহলে কিভাবে T বেছে নিলে TL: TM একটি নির্দিষ্ট অনুপাত হবে?'* পত্রগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এ পত্রে কুহি বিভিন্ন ফিগারের কেন্দ্রবিন্দু সংক্রান্ত ৬টি স্বতঃসিদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। ৬টির মধ্যে পাঁচটির ফল সঠিক। তবে ষষ্ঠটির ভুল। এতে বলা হয়েছিল, একটি অর্ধবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু 3:7 অনুপাতে একটি ব্যাসার্ধকে বিভক্ত করেছে। এ ভুল ফল থেকে আল-কুহি একই ভুল সিদ্ধান্তে পৌছান যে, $\tilde{n} = {}^{28}/_{9}$। তাতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞরাও ভুল করতে পারেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা

পৃথিবীর ইতিহাসে ভ্রমণকারী হিসাবে যে ক'জন ব্যক্তি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ইবনে বতুতা হলেন তাদের অন্যতম। তার জন্ম ১৩০৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে। তার পূর্ণ নাম শরফুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আবু আবদুল্লাহ আল-লাওয়াতি আত-তানজি ইবনে বতুতা। স্থল ও জলপথ মিলিয়ে তিনি ৩০ বছরে মোট ৭৫ হাজার মাইল ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে ঝুঁকি এড়াতে তিনি কোনো না কোনো কাফেলার সঙ্গে যোগদান করতেন। তার ভ্রমণ পথ ছিল ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কো পলোর চেয়ে দীর্ঘ। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগ শুরু হওয়া নাগাদ সাড়ে ৪ শ' বছরের মধ্যে অন্য কেউ ভ্রমণে তার রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারেননি। তার রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে সমৃদ্ধ। ইবনে বতুতা গোটা ইসলামী বিশ্ব, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ এবং সুদূর চীন পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনী 'রিহালা' নামে একটি গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণের কাহিনীও তিনি তার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তার বর্ণনায় ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। ইবনে বতুতার রিহালা গ্রন্থটি ইংরেজিতে 'ট্রাভেলার্স' নামে অনুবাদ করা হয়।

ইবনে বতুতাই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি বর্তমান পারস্য উপসাগরীয় দেশ ওমানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। দক্ষিণ রাশিয়ার কিপচাক সম্পর্কে তার বর্ণনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। পূর্ব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে খ্রিস্টান সম্রাটের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। গ্রীক ভাষা না জানলেও তাকে কন্সটান্টিনোপলে খ্রিস্টান পরিব্রাজকদের চেয়ে বেশি সম্মান দেখানো হয়। সিংহলের প্রাচীন নাম ছিল সরন্দীপ। সরন্দীপের একটি পর্বত শৃঙ্গের নাম আদম শৃঙ্গ। বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার কয়েক শত বছর পর এ পর্বত শৃঙ্গে মা হাওয়ার সঙ্গে বাবা আদমের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এজন্য এ শৃঙ্গের নাম 'আদম শৃঙ্গ' (Adam's Peak)। ইবনে বতুতা এ আদম শৃঙ্গ পরিদর্শন করেন এবং এ শৃঙ্গের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

সফরের ব্যাপ্তি

ইবনে বতুতা বহু দেশ ও অঞ্চল সফর করেন। মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অঞ্চল তিনি সফর করেছেন সেগুলোর মধ্যে ছিল তাঞ্জিয়ার, ফেজ, মারাকাশ,

www.pathagar.com

তালিসমিন, মিলিয়ানা, আলজিয়ার্স, জুরজুরা পর্বত, বেজায়া, আনবা, তিউনিস, সুসা, সাফেক্স ও গাবিস। সোমালিয়ার মোগাদিসু এবং যেলাও তিনি সফর করেন। আফ্রিকার সোয়াহিলি উপকূলে তিনি সফর করেন কিলওয়া, মোম্বাসা, মালির তিম্বকতু, গাও, তেকাদা ও মৌরিতানিয়ার ওয়ালাতা। লিবিয়ায় তিনি সফর করেন সে দেশের বর্তমান রাজধানী ত্রিপোলি। মামলুক সাম্রাজ্যে ইবনে বতুতা সফর করেন কায়রো, আলেক্সান্দ্রিয়া, জেরুজালেম, বেথলেহাম, হেবরন, দামেস্ক, লাটাকিয়া, মিসর ও সিরিয়া। আরব উপদ্বীপের যেসব অঞ্চল তিনি সফর করেন সেগুলোর মধ্যে ছিল মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, রবিগ, ওমান, যোহর, বাহরাইন, আল-হাসা, হরমুজ প্রণালী, ইয়েমেন ও কাতিফ। মুসলিম স্পেনে তিনি সফর করেন গ্রানাডা ও ভেলেসিয়া। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ইবনে বতুতা সফর করেন কুনিয়া, আনাতোলিয়া, বুলগেরিয়া, আজব, কাজান, ভলগা নদী ও কন্সটান্টিনোপল। মধ্য এশিয়ায় তিনি সফর করেন খাওয়ারিজম, খোরাসান, বুখারা, সমরকন্দ এবং আফগানিস্তানের পশতুভাষী অঞ্চল। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি সফর করেন পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কা, কোঝিকোডে, মালাবার, বর্তমান বাংলাদেশ, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী এবং সিলেট। মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, চীনের গুয়াংঝু, হাংঝু, বেইজিং, বার্মা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ এবং ফিলিপাইনও তিনি সফর করেছিলেন।

প্রথম দফা ভ্রমণ

২২ বছর বয়সে ১৩২৫ সালে তিনি হজ উপলক্ষে প্রথম ভ্রমণে বরে হন। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার তাঞ্জিয়ার, বর্তমান মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর আলেক্সান্দ্রিয়া এবং রাজধানী কায়রো হয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরের তীরে আইদাব পৌছান। তারপর তিনি সেখান থেকে নীল নদের তীরে এডফুতে উপস্থিত হন। এডফু থেকে পুনরায় কায়রো ফিরে এসে বর্তমান ফিলিস্তিনের গাজা, জেরুজালেম, সিরিয়ার হামা ও আলেপ্পো হয়ে দামেস্কে পৌছান। এখান থেকে সিরিয়ার এক কাফেলার সঙ্গে মদিনা হয়ে মক্কা পৌছান। মক্কা থেকে তিনি আবার মদিনায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে খোরাসানের মাশহাদে গিয়ে পৌছান। এখানে তার প্রথম দফা ভ্রমণ শেষ হয়।

দ্বিতীয় দফা ভ্রমণ

তার দ্বিতীয় দফা ভ্রমণ শুরু হয় বসরা থেকে। বসরা থেকে পারস্য ভ্রমণ করে ইরাকে ফিরে আসেন ইবনে বতুতা। ইরাকের কুফা, মসুল এবং বর্তমান তুরস্কের দিয়ারবাকির সফর করে বাগদাদে এসে পৌছান। বাগদাদ থেকে হজ করতে যান মক্কায়। হজ পালন শেষে তিনি ইয়েমেন, পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল যেলা, বর্তমান সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু, কেনিয়ার মোম্বাসা ও কিলওয়া হয়ে আবার ফিরে আসেন

www.pathagar.com

ইয়েমেনে। ইয়েমেন থেকে ওমান, হরমুজ প্রণালী, ফারস প্রদেশ ও বাহ্‌রাইন হয়ে ১৩৩২ সালে ফিরে আসেন মক্কা শরীফে। মক্কায় হজ সম্পন্ন করে তিনি মিসর ও সিরিয়া হয়ে লাটাকিয়া বন্দরে পৌঁছান। লাটাকিয়া থেকে ইতালির জেনোয়ার একটি জাহাজে করে তিনি তুরস্কের আলানয়ায় পৌঁছান। এখান থেকে ভ্রমণ করতে করতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে সানুবে গিয়ে পৌঁছান। সানুব থেকে একটি গ্রীক জাহাজে করে ইবনে বতুতা যান কাফফায়। তারপর আজব সাগর পাড়ি দিয়ে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় কিপচাকের খাড়িতে যান। মোঙ্গলদের শেষ সাম্রাজ্যের নাম ছিল কিপচাক খানা। ইবনে বতুতা বুলগার থেকে ভলগা এবং কামা নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখান থেকে ফিরে আসেন আস্তরখানে। আস্তরখানে সুলতান মোহাম্মদ উজবেকের গ্রীক পত্নী প্রিন্সেস বায়ালনুকে সন্তান প্রসবের জন্য কন্সটান্টিনোপলে তার পিতৃগৃহে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজ দুহিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কন্সটান্টিনোপলে গিয়ে হাজির হন। কন্সটান্টিনোপলে তখন রাজত্ব করছিলেন তৃতীয় এন্ড্রোনিকস। এন্ড্রোনিকসের পিতা দ্বিতীয় এন্ড্রোনিকস গ্রীক গীর্জা হাগিয়া সোফিয়ায় সাধুদের সঙ্গে বাস করছিলেন। ইবনে বতুতা এ অবসরগ্রহণকারী রাজার সঙ্গে তার আশ্রমে গিয়ে দেখা করেন। কন্সটান্টিনোপলে এক মাস অবস্থান করে ইবনে বতুতা আস্তরখানের রাজধানী সারি আল-জাদিদে সুলতান উজবেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কন্সটান্টিনোপলে তার সফর বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করেন। তিনি বর্তমান ইরানের প্রাচীন প্রদেশ খাওয়ারিজম ও তুস, বর্তমান উজবেকিস্তানের রাজধানী বুখারা ও ঐতিহাসিক নগরী সমরকন্দ এবং বলখ, নিশাপুর, গজনী ও বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল হয়ে ভারত যাত্রা করেন।

হিন্দুকুশ নামকরণের মধ্যে হিন্দু হত্যাকাণ্ডের কল্পিত উপাখ্যান

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণের সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্বতমালার নাম জড়িত। তিনি এ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। আফগানিস্তান ও বর্তমান পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের মধ্যবর্তী জায়গায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ এবং চার শ' মাইল প্রশস্ত সুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর নাম হিন্দুকুশ। ১৩৩৩ সালে ইবনে বতুতা তার গ্রন্থ রিহালা'য় এ পর্বতের নামকরণ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, *'Another reason of our halt was fear of snow, for upon the road there was a mountain called Hindu Kush, which means slayer of Indians, because the slave boys and girls who were brought from India die there in large numbers as a result of the extreme cold and the quantity of snow.'*

অর্থাৎ *'বরফের ভয় ছিল আমাদের থামার আরেকটি কারণ। আমাদের পথের সামনে হিন্দুকুশ নামে পরিচিত একটি পর্বত ছিল। হিন্দুকুশ মানে হলো ভারতীয় হত্যাকারী। কেননা ভারত থেকে যেসব ক্রীতদাস বালক ও মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা হতো তীব্র ঠাণ্ডা এবং অত্যধিক বরফপাতে তাদের বেশির ভাগের মৃত্যু ঘটতো।'*

www.pathagar.com

মুসলমানদের শত্রুরা ইবনে বতুতার এ উদ্ধৃতিকে সম্বল করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, মধ্যযুগে মুসলিম সৈন্যরা আফগানিস্তানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুকুশ পর্বতমালায় পাইকারীভাবে হিন্দু নিধন করেছে। আর সেই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে এ পর্বতমালার নামকরণ করা হয়েছে হিন্দুকুশ বা হিন্দু নিধনকারী। ইবনে বতুতা হিন্দুকুশ শব্দটি ব্যবহার করলেও একথা বলেননি যে, মুসলমানরা এ পর্বতমালায় হিন্দুদের হত্যা করতো এবং হিন্দু হত্যাকাণ্ড থেকে এ পর্বতের নামকরণ করা হয়েছে হিন্দুকুশ। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেছেন, যেসব ভারতীয় ক্রীতদাস ছেলে ও মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা হতো তীব্র ঠাণ্ডা ও তুষারপাতে তাদের মৃত্যু ঘটতো। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'র বর্ণনায় আরেকটু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, *'The name Hindu Kush literally means `kills the Hindus'; a reminder of the days when (Hindu) slaves from Indian sub-continent died in harsh Afghan mountains while being transported to Muslim courts of central Asia.'*

অর্থাৎ *'আক্ষরিকভাবে হিন্দুকুশ শব্দটির অর্থ হলো হিন্দু হত্যাকাণ্ড। হিন্দু হত্যাকাণ্ড হচ্ছে এমন একটি সময়ের স্মারক যখন ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সংগৃহীত (হিন্দু) ক্রীতদাসদের মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজদরবারে স্থানান্তর করার সময় আফগানিস্তানের বৈরি আবহাওয়ায় মৃত্যু ঘটতো।'*

এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'র বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মধ্য এশিয়ার বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার জন্য যেসব ভারতীয় অসহায় নর-নারীকে ক্রয় করে হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পাচার করার চেষ্টা করা হতো পার্বত্যাঞ্চলের তীব্র শীত ও তুষারপাতে তাদের মৃত্যু ঘটতো। মুসলমানদের ভারত অভিযানে কোনো হিন্দু নিহত হয়নি এমন কথা বলা সম্ভব নয়। বিনা রক্তপাতে আফগানিস্তান পদানত করা বোধ হয় সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম সৈন্যরা কেবল হিন্দুকুশে কেন হিন্দুদের হত্যা করতে গেলো। যুক্তির খাতিরে এটাই বলতে হয় যে, হত্যাকাণ্ড চালানো যদি মুসলিম সৈন্যদের সাধারণ ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে শুধু হিন্দুকুশ নয়, গোটা ভারতবর্ষ হিন্দুদের রক্তে লাল হয়ে যেতো। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে, মুসলিম সৈন্য বা শাসকরা রক্তপাতকে প্রশ্রয় দিতেন। আক্রান্ত হলে তারা জবাব দিতেন। ইসলামের যুদ্ধ রীতি অন্যান্য জাতির যুদ্ধ রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ রীতি সমর্থন করে না। মুসলিম সৈন্যরা প্রতিটি যুদ্ধে এ আদর্শ বজায় রেখেছে। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর ব্যতিক্রম হলেও আফগানিস্তানে কোনো হিন্দু নিহত হওয়ার কথা নয়। দশম শতাব্দীতে মুসলিম অগ্রাভিযানকালে আফগানিস্তানের জনসংখ্যার সিংহভাগ ছিল প্রকৃতি পূজারী, জরোস্ট্রীয় অথবা বৌদ্ধ। হিন্দু যে ছিল না তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুকুশে হিন্দু হত্যাকাণ্ড মেনে নেয়া যায় না। আফগানিস্তানে হিন্দু যুগ শেষ হওয়ার পর শুরু হয় বৌদ্ধ যুগ। বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসাবশেষের ওপর

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। হিন্দুকুশে হিন্দুরা হত্যাকাণ্ডের শিকার না হলেও মুসলমানরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী হিন্দুকুশসহ গোটা অঞ্চলকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করে ভারতে লুণ্ঠন চালায়। হিন্দুকুশে হিন্দু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকলে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলোতে এ পর্বতকে পরীযাত্রা হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো না। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কুশ শুধু হিন্দুকুশ পর্বতের ক্ষেত্রে নয়, আশপাশের আরো বহু পাহাড় ও জায়গার নামের সঙ্গেও এ শব্দটি যুক্ত।

মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখকরা উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা না করায় শত শত বছর এ ভুল ধারণা মানব জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে বিভ্রান্ত করছে। নরওয়ের অ্যান্ডার্স বেহরিং ব্রেভিক হলো তাদের একজন। ৩০ বছরের ব্রেভিক ২০১১ সালের ২২ জুলাই এক ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেশের রাজধানী অসলোতে প্রধানমন্ত্রী জেন্স স্টোলটেনবার্গের অফিস এবং উটোয়া দ্বীপে ক্ষমতাসীন দলের যুব সম্মেলনে বোমা ফাটিয়ে ও গুলিবর্ষণ করে ৬৮ জনকে হত্যা করে। ইউরোপ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে সে এ হামলা চালায়। হামলা চালানোর পূর্বক্ষণে ব্রেভিক ইন্টারনেটে দেড় হাজার পৃষ্ঠার একটি মেনিফেস্টো ছড়িয়ে দেয়। সে তার মেনিফেস্টোতে হিন্দুকুশ পর্বতের নাম পরিবর্তনে ভারত সরকার কোনো ভূমিকা পালন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। সে এ পর্বতে হিন্দু হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত ইহুদী হত্যাযজ্ঞ হলোকাস্টের সঙ্গে তুলনা করে।

হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অভিমতও ব্রেভিকের অনুরূপ। হিন্দু রেভলিউশন নামে একটি ওয়েবসাইটে 'হিন্দুকুশঃ হোয়ার দ্য মুসলিমস স্লটার দ্য হিন্দু' শিরোনামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে লিখা হয়েছে, *'All standard reference books agree that the name `Hindu Kush' of the mountain range in Eastern Afghanistan means Hindu slaughter or Hindu killer. History also reveals that until 1000 A.D. the area of Hindu Kush was a full part of Hindu cradle. More likely, the mountain range was deliberately named as `Hindu slaughter' by the Muslim conquerors as a lesson to the future generation of Indians. However Indians in general, and Hindus in particular are completely oblivious to this tragic genocide.'*

অর্থাৎ *'সকল মানসম্পন্ন ঐতিহাসিক দলিলপত্র এ বিষয়ে একমত যে, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের পর্বত শ্রেণী 'হিন্দুকুশ' নামের অর্থ হলো হিন্দু হত্যাকারী বা হিন্দু ঘাতক। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, দশম শতাব্দী নাগাদ হিন্দুকুশ অঞ্চলটি ছিল হিন্দু সভ্যতার পরিপূর্ণ একটি অংশ। সম্ভবত ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি হুঁশিয়ারি হিসাবে বিজয়ী মুসলমানরা পরিকল্পিতভাবে এ পর্বত শ্রেণীর নামকরণ করেছে 'হিন্দু হত্যাকারী।'* সাধারণভাবে ভারতীয়রা এবং বিশেষ করে হিন্দুরা এ মর্মান্তিক গণহত্যা সম্পর্কে বিস্মৃত।'

www.pathagar.com

হিন্দুকুশ শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়েছেন। ঐতিহাসিকগণ হিন্দুকুশ পর্বতের প্রাচীন নাম ককাসাস ইন্ডিকাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের মতে, ককাসাস ইন্ডিকাসের ভুল উচ্চারণ থেকে হিন্দুকুশ শব্দটি উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। ককাসাস একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ পাহাড়। ৩২৯ সালে সম্রাট আলেক্সান্ডার এ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। তখন থেকে পরবর্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক শাসনামলে হিন্দুকুশ পর্বতের নাম ছিল ককাসাস ইন্ডিকাস। গ্রীকদের পরে কুশান নামে একটি রাজবংশ হিন্দুকুশ অঞ্চল শাসন করতো। এ রাজবংশের রাজধানী ছিল আধুনিক কাবুলের আশপাশে। কুশান রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটলে এ অঞ্চল পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাসানীয় আমলে কুশান শাহ নামে পরিচিত এক শাসনকর্তা হিন্দুকুশ অঞ্চল শাসন করতেন। সাসানীয় আমলে সিন্ধু নদের আশপাশের এবং বাইরের অঞ্চলে বসবাসকারী সব লোককে হিন্দু বলা হতো। এসব হিন্দুর মধ্যে হিন্দুস্তানের সনাতন হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও ছিল।

১৭৯৩ সালে ঐতিহাসিক রিনাল এ পর্বত শ্রেণীকে 'হিন্দো-খো' (Hindoo-Kho) এবং 'হিন্দুকুশ' (Hindu Kush) উভয় নামে আখ্যায়িত করেন। ইরানি ভাষায় 'হিন্দো-খো' শব্দের অর্থ 'ভারতের পাহাড়' এবং 'হিন্দুকুশ' শব্দের অর্থ 'সিন্ধুর পাহাড়'। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলছেন, হিন্দুকুশের মূল কুশ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত কুশা অথবা কুশিকা থেকে। হিন্দুকুশ পর্বত শ্রেণী থেকে উত্তর পূর্বদিকে হিন্দু জাতির বসবাসের প্রতি ইঙ্গিত করে তারা আরো বলছেন, হিন্দু ভূখণ্ডের শুরুসহ কুশ শব্দটির অনেক অর্থ দাঁড়ায়। ভারতে মুসলিম যুগ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত হিন্দুকুশের নাম ছিল শুধু কুশ। তবে কোনো কোনো সময় এ ঐতিহাসিক পর্বতকে কুহি হিন্দ নামেও আখ্যায়িত করা হতো। কুহি শব্দটির মানে হলো পর্বত। কুহি হিন্দের পূর্ণ মানে দাঁড়ায় 'হিন্দুস্তানের পর্বত'। কোনো কোনো ঐতিহাসিক 'হিন্দুকুশ' শব্দটি ইরানি শব্দ 'হিন্দু কোহ'র ভুল উচ্চারণ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করছেন। তারা বলছেন, ফারসি 'কোহ' শব্দের মানে হলো 'পাহাড়'। পশতু ভাষায় 'হিন্দু কোহ' শব্দটির মানে 'হিন্দুস্তানের পর্বত'। ঐতিহাসিক রাজেশ সিনহার মতে, আরবীতে ভারতের পাহাড় বলতে বুঝায় হিন্দুকুশ এবং এখান থেকেই হিন্দুকুশ শব্দটির উৎপত্তি।

ভারত ভ্রমণ

ইবনে বতুতা ভারতে যাত্রা করেছিলেন কাবুল থেকে। কাবুল থেকে পৌঁছান কারমাশ। এখানে দু'টি পাহাড়ের মাঝে আফগানদের একটি দুর্গ ছিল। আফগানরা পথচারীদের উত্যক্ত করতো। ইবনে বতুতার কাফেলার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধেছিল। ইবনে বতুতার কাফেলা তীর ছুঁড়তেই তারা পালিয়ে যায়। তার কাফেলায় ছিল প্রায় ৪ হাজার ঘোড়া। ইবনে বতুতার বাহন উট হওয়ায় তিনি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি অনেক জিনিস ফেলে রেখে দ্রুত কাফেলার সঙ্গে মিলিত হন। কাফেলার সঙ্গে

www.pathagar.com

তিনি শাশানগড়ে রাত কাটান। এখান থেকে রওনা হয়ে তিনি একটি বিশাল মরুভূমিতে গিয়ে পড়েন। এ মরুভূমি ছিল ১৫ দিনের পথ। মরুভূমিতে সাইমুম ঝড় বইতো। ইবনে বতুতা নিরাপদে সিন্ধু নদের কাছে এসে পৌছান। ১৩৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি পৌছান সিন্ধুতে। এখানে পৌছার পর গোয়েন্দারা ভারতের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কাছে তাদের আগমনের সংবাদ পাঠায়। তখনকার দিনে সিন্ধু থেকে দিল্লি ছিল পদব্রজে ৫০ দিনের পথ। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুলতানের কাছে গোয়েন্দাদের চিঠি ৫ দিনে পৌছে যায়। এখানে দু'প্রকার ডাক ব্যবস্থা ছিল। এক. ঘোড়সওয়ারী দূতের সাহায্যে এবং আরেক পদব্রজে। প্রতি চার মাইল অন্তর এক দূতের সঙ্গে আরেক দূতের বদলি হতো। পদব্রজে চালিত ডাক প্রতি মাইলের তিন ভাগের একাংশ গেলেই ডাক হরকরা বদলি হতো। হরকরার হাতে থাকতো দেড় গজ লম্বা লাঠি। আগের লোকটি পৌছা মাত্র তার কাছ থেকে ডাক ছিনিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় লোকটি দৌড়াতে থাকতো। এমনি করে ডাক গন্তব্যস্থলে পৌছতো। অনেক সময় এ উপায়ে সুলতানের জন্য খোরাসান থেকে ভারতবর্ষে ফল আমদানি করা হতো। সুলতান যখন দৌলতাবাদ থাকতেন তখন গঙ্গা নদী থেকে তার বাহকরা এভাবে পানি নিয়ে আসতো।

সিন্ধুর রাজধানী মুলতানে পৌঁছে সুলতানের অনুমতি পত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। কাকে কতটুকু আতিথেয়তা দেখাতে হবে অনুমতি পত্রের সঙ্গে তারও নির্দেশ আসতো। বিদেশী লোকদের মর্যাদা ঠিক করা হতো তার কাজ কর্ম ও চলাফেরার হাবভাব দেখে। সুলতানের দরবারে হাজির হলেই তাকে কিছু উপঢৌকন দিতে হতো। প্রতিদানে সুলতান সেই উপঢৌকনের বহু গুণ ফিরিয়ে দিতেন। ভারত ও সিন্ধুর মহাজনগণ এ প্রথার সুযোগ গ্রহণ করে বেশ লাভজনক ব্যবসা করতো। তারা দর্শনার্থীকে উপঢৌকন দ্রব্য ধার দিতো এবং দর্শনার্থী যা ফিরতী উপহার পেতো তা নিয়ে নিতো। সিন্ধুতে পৌছে ইবনে বতুতাও এ প্রথা অনুসরণ করেন। এক মহাজন একমাত্র তাকে দিয়েই বহু অর্থ মুনাফা করে। তিনি মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে এখানকার সুলতানের সঙ্গে দেখা করেন।

সিন্ধু নদ পার হলে নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে তাদের পথ আরম্ভ হয়। এ বনেই জীবনে প্রথম তিনি একটি গণ্ডার দেখতে পান। ক্রমাগত দু'দিন হাঁটার পর তিনি এসে পৌছান জানানি নামে একটি শহরে। সিন্ধু তীরে জানানি ছিল সুন্দর একটি শহর। শহরের অধিবাসীদের বলা হতো সামিরা। ৭১২ সালে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের সময় থেকে তাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে বাস করছিল। তারা কারো সঙ্গে কখনো একসঙ্গে আহার করতো না। এমনকি আহারের সময় কাউকে দেখাও দিতো না। এছাড়া নিজেদের গণ্ডির বাইরে বিয়ে থা করতে বা দিতে রাজি হতো না। জানানি ছেড়ে ইবনে বতুতা গিয়ে পৌছান সিওয়াসিতান নামে এক বড় শহরে। শহরটির বাইরে ছিল বালুকাময় মরুভূমি। একমাত্র বাবলা জাতীয় গাছ ছাড়া আর কোনো গাছপালার চিহ্ন ছিল না। এখানকার নদীর তীরে লাউ ছাড়া অন্য কিছু ফলতো না। অধিবাসীদের প্রধান

www.pathagar.com

খাদ্য ছিল জোয়ার ও মটরের তৈরি রুটি। তবে এখানে প্রচুর মাছ ও মহিষের দুধ পাওয়া যেতো। এখানকার অধিবাসীরা একপ্রকার টিকটিকি জাতীয় জীবের মাংস খেতো। ইবনে বতুতার খুব ঘৃণা হতো। এ জীবের মাংস তিনি কখনো খেতে রাজি হননি।

গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরমে তিনি সিওয়াসিতানে গিয়ে পৌছান। অসহ্য গরম। তার সঙ্গীরা প্রায় উলঙ্গ হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। এ শহরে তিনি খোরাসানের বিখ্যাত চিকিৎসক আলা আল-মুলুকের দেখা পান। তিনি ছিলেন হিরাতের কাজী। সেখান থেকে ভারতে আসেন এবং সিন্ধুর লাহারি (লাহোর) শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তার ছিল ১৫টি জাহাজ। নিজের লাটবহর এবং লোকজন নিয়ে তিনি এ সব জাহাজে নদী পথে যাতায়াত করতেন। জাহাজগুলোর একটির নাম ছিল আওয়াড়া।

আওয়াড়ার সঙ্গে দু'পাশে চলতে থাকতো ৪টি জাহাজ। তার দু'টি জাহাজে থাকতো পতাকা, দামামা, শিঙ্গা, বাদ্যযন্ত্র ও গায়কের দল। প্রথমেই বেজে উঠতো দামামা আর শিঙ্গা। তারপর শুরু হতো গান। শাসনকর্তার আহারের সময় পর্যন্ত চলতে থাকতো। তার আহারের পর অন্য সবাই আহার করতো। তারপর জাহাজ চলতে থাকতো সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা হলে নদীর তীরে তাবু খাটানো হতো। তীরে অবতরণ করে নৈশ আহারের আয়োজন হতো। নৈশ আহারে দলের প্রায় সবাই তার সঙ্গে যোগদান করতো। এশার নামাজের পর তাবুতে পালা করে প্রহরীদল মোতায়েন করা হতো। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠতো দামামা আর শিঙ্গা। ফজরের নামাজ শেষ হলেই আহারের পর আবার যাত্রা শুরু হতো। ইবনে বতুতা আলা আল-মুলুকের সঙ্গে এ অঞ্চল ভ্রমণ করেন।

সিওয়াসিতান থেকে পাঁচ দিন চলার পর তিনি এসে পৌছান আলা আল-মুলুকের এলাকা লাহারি শহরে। সিন্ধু নদের মোহনায় লাহারি ছিল একটি চমৎকার শহর। এখানে একটি পোতাশ্রয় ছিল। ইয়েমেন, ফারস এবং অন্যান্য বহু দেশের লোকজন সবসময় এখানে যাতায়াত করতো। এজন্য এখানকার আয় ছিল খুব বেশি। লাহারি অবস্থানকালে তিনি এখান থেকে এক শ' মাইল দূরে তারানো নামে এক সমতল ভূমিতে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন জানোয়ার ও মানুষের অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি দেখতে পান।

লাহারিতে পাঁচ দিন কাটানোর পর ইবনে বতুতা রওনা হন বাকার নামে একটি জায়গার উদ্দেশে। বাকার ছিল একটি সুন্দর শহর। সিন্ধু নদের একটি খাল বাকার শহরকে বিভক্ত করেছিল। বাকার ছেড়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হন উজ শহরে। শহরটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। সে সময় শরীফ জালালউদ্দিন আল-কিজি ছিলেন এখানকার শাসনকর্তা। উজ থেকে তিনি গিয়ে হাজির হন মুলতানে। মুলতান ছিল সিন্ধুর রাজধানী এবং প্রধান আমিরের বাসস্থান। মুলতান থেকে ১০ মাইল দূরে ছিল একটি নদী। নাম ছিল খসরু আবাদ। মুলতান থেকে ইবনে বতুতা দিল্লি যাত্রার আয়োজন করেন। মুলতান থেকে দিল্লি ছিল বিভিন্ন জনপদের মধ্য দিয়ে একটানা ৪০ দিনের পথ।

www.pathagar.com

মুলতান থেকে রওনা হয়ে তিনি এসে পৌছান আবুহার নামে একটি শহরে। ভারতের প্রবেশমুখে এটাই ছিল প্রথম শহর। এ শহরের পরে ছিল বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। সমতল ভূমির শেষপ্রান্তে ছিল দূরতিক্রম্য পর্বত শ্রেণী। এখানে ছিল হিন্দুদের বসতি। সমতল ভূমিতে পৌছানোর পথে ৮০ জন বিধর্মী ইবনে বতুতার কাফেলার ওপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধে বিপক্ষের একজন ঘোড়সওয়ার এবং ১২ জন পদাতিক মারা যায়। শত্রুপক্ষের একটি তীরে তিনি নিজে এবং আরেকটি তীরে তার ঘোড়া আহত হয়। আহত ঘোড়াটি হত্যা করে দলের তুর্কিদের খেতে দেয়া হয়।

আবুহার ত্যাগ করে দু'দিন পর তিনি গিয়ে হাজির হন আজুহাদা নামে একটি শহরে। ছোট এই শহরটির মালিক ছিলেন ধর্মপ্রাণ শেখ ফরিদউদ্দিন। এখানে ইবনে বতুতা সতীদাহ দেখতে পান। একজন মৃত হিন্দুর সঙ্গে তার স্ত্রীকেও দাহ করা হয়। তার সঙ্গীরা এসে বললো যে, নারীটি শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত মৃতদেহ আলিঙ্গন করেছিল। একবার আমজরি নামে একটি শহরে তিনি তিনজন বিধবার সহমরণ দেখেছিলেন। বিধবারা মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি দ্রব্য মেখে দাহ করার স্থানে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা জলাশয়ে নেমে জামা কাপড় ও গহনা খুলে ফেলে। সেগুলো দুঃস্থদের মধ্যে দান করা হয়। তারপর প্রত্যেকে একটি করে মোটা কাপড় পরে। তারা এ কাপড়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক তখন একসঙ্গে জয়ঢাক, দামামা আর শিঙ্গা বেজে উঠে। প্রথমে চিতার ওপর সরু কাঠ নিক্ষেপ করা হয়। তারপর অনেকগুলো মোটা কাঠ বিধবাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা নড়াচড়া করতে না পারে। সবাই শোরগোল করে উঠে। ইবনে বতুতার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি তার মুখে পানি ছিটিয়ে না দিলে তিনি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যেতেন। তারপর সেখান থেকে তিনি বিদায় নেন।

আবুহার থেকে রওনা হয়ে চার দিন চলার পর তিনি এসে পৌছান সিরসা শহরে। এখানে উৎকৃষ্ট চাল পাওয়া যেতো। এ শহরে রাজস্ব আয় ছিল খুব বেশি। এখান থেকে তিনি যান হানসিতে। হানসি ছিল জনবহুল একটি চমৎকার শহর। শহরটি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দু'দিন পরে হানসি থেকে তিনি পৌছান মাসুদাবাদে। মাসুদাবাদ ছিল দিল্লি থেকে ১০ দিনের পথ। মাসুদাবাদে তিন দিন কাটিয়ে তিনি দিল্লির পথে রওনা হয়ে পালাম নামে একটি গ্রামের কাছে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। পর দিন পৌছান দিল্লিতে। আশপাশের চারটি শহর নিয়ে দিল্লি নগরী গড়ে উঠেছিল। প্রথমটি ছিল হিন্দুদের তৈরি খাঁটি দিল্লি। দ্বিতীয় শহরটির নাম ছিল সিরি। তৃতীয় শহরটির নাম তোঘলকাবাদ এবং চতুর্থ শহরটির নাম জাহানপানা। সুলতানের ইচ্ছে ছিল একটি প্রাচীর দিয়ে চারটি শহর ঘিরে ফেলা। বিপুল ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করে তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করেন। ইবনে বতুতা দিল্লির প্রসিদ্ধ মসজিদের বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদের দেয়াল, ছাদ ও মেঝে ছিল মার্বেল পাথরে তৈরি। চৌকোণা করে কাটা পাথরগুলো ছিল সীসা দিয়ে আঁটা। মসজিদের সবই ছিল পাথরে তৈরি। কোথাও কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। মসজিদের মিম্বর ও ১৩ টি গম্বুজ ছিল পাথরে নির্মিত। পূর্বদিকের

www.pathagar.com

প্রবেশ পথে দু'টি পিতলের মূর্তি ফেলে রাখা হয়েছিল। মসজিদে ঢুকতে বা বের হতে গেলে মূর্তিগুলোর ওপর পা ফেলতে হতো। মসজিদের উত্তরাংশে ছিল মিনার। এমন মিনার মুসলিম জগতে আর কোথাও ছিল না। সুউচ্চ এ মিনারটি ছিল লাল পাথর দিয়ে তৈরি। এটি ছিল কারুকার্যময় লিপি শোভিত। মিনারের মাথার গোলকটি ছিল শ্বেতপাথরে নির্মিত। ওপরের গোলকটি ছিল সোনার। সিঁড়িটি ছিল বেশ প্রশস্ত। সুলতান কুতুবউদ্দীন মসজিদের পশ্চিমাংশে তার চেয়েও উঁচু একটি মিনার তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশ তৈরি হতেই তিনি পরলোকগমন করেন। এ মিনারটি পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়। মিনারের সিঁড়ি দিয়ে ৩টি হাতি পাশাপাশি উপরে উঠে যেতে পারতো। এই অসমাপ্ত মিনারের এক-তৃতীয়াংশই ছিল উচ্চতায় অপর মিনারটির সমান।

দিল্লির বাইরে ছিল লালমিশের নামে দু'মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া একটি প্রকাণ্ড জলাশয়। দিল্লির লোকেরা এখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করতো। জলাশয়ের মধ্যস্থলে ছিল একটি অট্টালিকা। চৌকোণা পাথরে তৈরি দোতলা। জলাশয়টি যখন পরিপূর্ণ থাকতো তখন শুধু নৌকা যোগে অট্টালিকায় যাওয়া যেতো। তার ভেতরে ছিল একটি মসজিদ। জলাশয়ের পাড়গুলো শুকিয়ে গেলে এখানে শশা, আখ, লাউ, তরমুজ প্রভৃতি লাগানো হতো। তরমুজ ও লাউগুলো আকারে হতো ছোট। কিন্তু খেতে ছিল মিষ্টি। দিল্লি ও সুলতানের আবাসস্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় বৃহত্তর আরো একটি জলাশয় ছিল। তার চারদিকের ৪০টি অট্টালিকায় গায়ক ও বাদকরা বাস করতো। ইবনে বতুতা দিল্লির ইমাম কামালউদ্দিনের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন। ইমাম মাসে ১০ দিন রোজা রাখতেন এবং রাতের অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে এবাদত করতেন। এ সময় ইবনে বতুতার এক ক্রীতদাস পালিয়ে এক তুর্কির ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তিনি তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে কামালউদ্দিন তাকে বারণ করেন। তুর্কি তাকে এক শ' দিনার দিয়ে ক্রীতদাসকে নিজের কাছে রেখে দেন। ৬ মাস পর ক্রীতদাস তার তুর্কি মনিবকে হত্যা করে। ইমাম সাহেবের অলৌকিক শক্তি দেখে ইবনে বতুতা বিস্মিত হন এবং তার প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

৯ বছর কাটানোর পর ইবনে বতুতা ১৩৪২ সালে দিল্লি ত্যাগ করেন। ভারতের ঐতিহাসিক নগরী আলীগড়ের ১১ মাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে জালালিতে একদল বিধর্মী ইবনে বতুতার কাফেলার ওপর আক্রমণ চালায়। সুদীর্ঘ চলার পথে তার কাফেলার ওপর এখানেই প্রথম হামলা হয়। আক্রান্ত হয়ে ইবনে বতুতা দিকপরিবর্তন করেন। তারপর তিনি পশ্চিম ভারতের গোয়ালিয়র, প্রাচীন নগরী উজ্জায়ন, দৌলতাবাদ ও ক্যাম্বে হয়ে মালাবার উপকূলে পৌছান। মালাবার থেকে যান ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ মালদ্বীপে।

সিংহল যাত্রা

মালদ্বীপে ১৮ মাস কাটানোর পর ইবনে বতুতা সিংহলে যান। এখানে তিনি আদম শৃঙ্গ পরিদর্শন করেন। স্থানীয়ভাবে আদম শৃঙ্গ শ্রীপদ্ম নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রধান প্রধান

www.pathagar.com

ধর্মের অনুসারীদের কাছে তা পবিত্র স্থান হিসাবে স্বীকৃত। তবে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে। বৌদ্ধরা মনে করে শ্রীপদ্ম হলো গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ। হিন্দুদের মতে, শিবের। আবার মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মতে, হযরত আদমের (আ.) পায়ের ছাপ। ২ হাজার ২৪৩ মিটার উঁচু পবর্ত চূড়ায় এ পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ৮ মিটার বা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি। ৯ দিনের পথ দূর থেকেই আদম শৃঙ্গ ইবনে বতুতার চোখে পড়েছিল। তিনি পাহাড়ের ওপর হযরত আদমের (আ.) কদম পর্যন্ত দু'টি পথ দেখতে পান। একটির নাম 'বাবা পথ' এবং আরেকটির নাম 'মামা পথ'। অর্থাৎ বাবা আদম ও মা হওয়ার পথ।

শ্রীলঙ্কায় ইবনে বতুতার দেখা আদমশৃঙ্গ

পাহাড়ের গায়ে একটি সিঁড়ি ইবনে বতুতার চোখে পড়ে। তিনি লোকজনের উঠানামা করার জন্য সিঁড়িতে ১০টি শিকল দেখতে পান। তিনি আরো দেখতে পান যে, দশম শিকল থেকে ৭ মাইল দূরে হযরত খিজিরের (আ.) গুহা। গুহাটি একটি বিশাল মালভূমির মধ্যে। ইবনে বতুতা দেখতে পান যে, হযরত খিজিরের (আ.) পবিত্র কদম মোবারক একটি প্রশস্ত মালভূমিতে উঁচু কালো প্রস্তর খণ্ডে অঙ্কিত। মাটি গভীরভাবে বসে যাওয়ায় ছাপটি প্রায় অস্পষ্ট। তার পদ চিহ্নটি ১১বিঘৎ লম্বা। প্রাচীনকালে চীনারা এসে তার বুড়ো আঙ্গুলের ছাপসহ পাথরের কিছু অংশ কেটে নিয়ে যায়। পাথরটি জয়তুনের একটি মন্দিরে রক্ষিত। দূর দূরান্তের লোকেরা জিয়ারত করার জন্য এখানে ছুটে আসতো। ইবনে বতুতা সংশ্লিষ্ট পাহাড়ে ৯টি গর্ত দেখতে পান। এসব গর্তে তীর্থযাত্রীরা স্বর্ণ, মূল্যবান মুনিমুক্তা ও অলঙ্কারাদি রেখে যেতো। হযরত খিজিরের (আ.) গুহায় তিন দিন সকাল ও বিকালে তার কদম মোবারক জিয়ারত করতে হয়। ইবনে বতুতা তিন দিন এখানে কাটানোর পর মামা পথে অগ্রসর হন।

সম্মান

ইবনে বতুতার প্রতি সম্মান জানিয়ে চাঁদের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। ৬ দশমিক ৯ এস দ্রাঘিমাংশ এবং ৫০ দশমিক ৪ ই অক্ষাংশে এ গহ্বরের দৈর্ঘ্য

www.pathagar.com

১১ কিলোমিটার। তাঞ্জিয়ার থেকে চীন পর্যন্ত ইবনে বতুতার ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে ২০০৭ সালে বিবিসি টেলিভিশনে 'ট্রাভেলস উইথ অ্যা টানজেরাইন' শিরোনামে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ২০০৯ সালে 'নিনজা এসাসিন' শিরোনামে আরেকটি ছবিতে ইবনে বতুতার চরিত্রে অভিনয় করেন রিচার্ড ভন ওয়েডেন। 'ইবনে বতুতা পেহেন কি জুতা' ছিল কবি সারবেশ্বর দয়াল সাক্সেনার লিখিত সত্তর দশকে ভারতে শিশুদের একটি জনপ্রিয় গান। ২০১০ সালে বলিউডে ইবনে বতুতার স্মরণে 'ইশকিয়া' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। আমেরিকা তো তখন আবিষ্কার করাই হয়নি। তখন ইউরোপ ছিল ঘোর অন্ধকারে। চার থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ইউরোপে অন্ধকার যুগ অব্যাহত ছিল। ইউরোপের এ যুগকে বলা হয় 'ডার্ক এজ'। ৪৭৬ সালে পশ্চিম রোমান সম্রাট রমুলাস অগাস্টাসের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইউরোপে অন্ধকার যুগ। সত্যি ইউরোপে ডার্ক এজে জ্ঞানের কোনো আলো অথবা কোনো স্কুল কলেজ কিংবা শহর ছিল না। খ্রিস্টান গীর্জাগুলো মানুষের চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতো। জ্ঞান চর্চা ছিল গীর্জায় সীমাবদ্ধ। রোমান আমলের যৎসামান্য জ্ঞান সঞ্চিত ছিল গীর্জায়। ৫০০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে ছিল কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ। প্লেগের মতো মহামারীতে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু হওয়ায় ইউরোপ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। বৈরি আবহাওয়ায় ফসল উৎপাদন হতো না বললেই চলে। সামন্ত প্রভুরা ছিল সমাজের নিয়ন্তা। প্যারিস, অক্সফোর্ড ও রোমের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীকভাষী গণিতজ্ঞ ইউক্লিডের নাম ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছু জানতো না। এমন ঘোর দুর্দিনে মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করেছে। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ইউরোপকে জাগিয়ে তোলে। তারই ধারাবাহিকতায় এ মহাদেশে পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁর সূচনা হয় এবং শিল্প বিপ্লব ঘটে।

ইউরোপে মুসলিম জ্ঞান পৌঁছার রুট

ইউরোপে কিভাবে মুসলিম জ্ঞান প্রবেশ করেছে তা আলোচনা করা উচিত। আলোচনা করলে দেখা যাবে জ্ঞান বিজ্ঞান কখনো কোনো জাতির একক অধিকারে ছিল না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভ্যতায় ধীরে ধীরে জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিজ্ঞান মানব জাতির অভিন্ন সম্পদ। দীর্ঘ পথ বেয়ে এক হাত থেকে আরেক হাত হয়ে প্রাচীন জ্ঞান ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে কোনো জ্ঞানই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত রুটের বাইরে ইউরোপে পৌঁছাতে পারেনি। প্রথমে চীন, ভারত ও গ্রীসের প্রাচীন বিজ্ঞান মুসলমানদের কাছে সঞ্চিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন রুট বেয়ে সর্বশেষ ইউরোপে গিয়ে পৌঁছায়। মুসলিম নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রগুলোতে কখনো জ্ঞান পৌঁছেছে একটি মাধ্যমে কখনো বা একাধিক মাধ্যমে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী ৫০০ সাল পর্যন্ত চীন থেকে ভারত এবং একইভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী ৭৫০ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে চীনে জ্ঞান পাচার হয়। এ দু'টি সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের পরবর্তী ধাপে মুসলিম সভ্যতার কাছে জ্ঞান পৌঁছে। ৪৫০ থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত বর্তমান ইরানের

www.pathagar.com

খুজিস্তানের জুন্দি-শাহপুরে গ্রীস, চীন ও ভারত থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান হস্তান্তরিত হয় ৮৭০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত জুন্দি-শাহপুর, ভারত, চীন ও গ্রীস থেকে বাগদাদে জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকে। ৯০০ থেকে ১০১৩ সাল পর্যন্ত এ জ্ঞান বাগদাদ থেকে মিসরের কায়রো, স্পেনের কর্ডোভা ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলিতে গিয়ে পৌঁছায়। ১০৮৫ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত স্পেনের কর্ডোভা থেকে একই ভূখণ্ডের টলেডো ও সিসিলিতে জ্ঞান বিজ্ঞান পাড়ি জামায়। সর্বশেষ ১২০০ থেকে ১৫৫০ সাল পর্যন্ত টলেডো, কর্ডোভা ও সিসিলি থেকে খোদ পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞান পাচার হয়।

মুসলিম রেনেসাঁ যুগে ইউরোপের দুর্দশা

মুসলিম রেনেসাঁ যুগে ইউরোপের দুর্দশার অন্ত ছিল না। রোম সম্রাট প্রথম কন্সটান্টাইনের আমলে পৌত্তলিক সম্রাটদের নির্মিত সাধারণ লাইব্রেরিগুলো ধ্বংস করা হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানকে জাদুমন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং শিক্ষিত লোকদের শাস্তি দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। মহান পোপ গ্রেগরির আমলে রোমে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমতি দেয়া হতো না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ করা হয়। অগাস্টাস সিজারের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলা হয়। অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতা ছিল ইউরোপের পুরোপুরি বিপরীত। ঐতিহাসিকরা নিঃসংকোচে ইউরোপের তুলনায় ইসলামী বিশ্ব বা নিকটপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছেন। এ প্রসঙ্গে চার্লস সিঙ্গারের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গার তার 'অ্যা হিস্টরি অব টেকনোলজি'র দ্বিতীয় ভলিউমের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*The Near East was superior to the West. For nearly all branches of technology, the best products available to the West were those of the Near East. Technologically, the West had little to bring to the East.Technological movement was in the other direction.*' অর্থাৎ '*নিকটপ্রাচ্য ছিল পাশ্চাত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কেননা প্রযুক্তির প্রায় সকল ক্ষেত্রে নিকটপ্রাচ্যে উৎপাদিত পণ্য পাশ্চাত্যের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত হতো। প্রযুক্তিগতভাবে প্রাচ্যকে দেয়ার মতো পাশ্চাত্যের কিছু ছিল না। প্রযুক্তিগত আন্দোলন চলছিল ভিন্ন দিকে।*'

এখানে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাংবাদিক জোনাথন লিয়ন্সের লেখা 'দ্য হাউজ অব উয়িজডম: হাউ দি অ্যারাবস ট্রান্সফরমড দ্য ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক লিয়ন্স পেশাগত প্রয়োজনে মিসরে কয়েক বছর অবস্থান করেন। তখনি তিনি ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হন। ব্যাপক পড়াশোনা করে তিনি উল্লেখিত বইটি লিখেছেন। জোনাথন লিয়ন্স তার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, '*For centuries following the fall of Rome, Western Europe was backward and benighted, locked into the Dark Ages and barely able to tell the time of the day. Arab culture, however, was thriving and had become a power house of intellectual exploration and discussion that dazzled the person like British adventurer Adelard of Bath. The Arabs could*

www.pathagar.com

measure the earth's circumference (a feat not matched in the West for eight hundred years); they discovered algebra; were adept at astronomy and navigation; developed the astrolabe, translated all the Greek scientific and philosophical texts including, importantly, those of Aristotle. Without them and the knowledge that travelers like Adelard brought back, the Western Europe would have been a very different place over the last millenium.'অর্থাৎ *'রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ ছিল পশ্চাৎপদ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অন্ধকার যুগে আবদ্ধ। ইউরোপীয়রা কদাচিৎ দিনের সময় বলতে সক্ষম ছিল। অন্যদিকে আরব সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটছিল এবং এ সংস্কৃতি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ও আলোচনার একটি শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়। আরবদের এ সমৃদ্ধি বাথের ব্রিটিশ অভিযাত্রী এডিলার্ডের মতো ব্যক্তিদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আরবরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করতে পারতো (আট শত বছরের আগে পশ্চিম ইউরোপে এমন সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় না); তারা বীজগণিত আবিষ্কার করেছিল; জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নৌবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল; এস্ট্রোল্যাব উদ্ভাবন করেছিল; এরিস্টোটলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসহ সকল গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেছিল। তাদের অবদান এবং এডিলার্ডের মতো অভিযাত্রীগণের আহরিত জ্ঞান ছাড়া বিগত সহস্রাব্দে পশ্চিম ইউরোপের স্থান হতো সম্পূর্ণ ভিন্নতর।'*

মুসলিম ঐতিহাসিক আহসান মাসুদের একটি উক্তিও উল্লেখ করার দাবি রাখে। তিনি তার 'সায়েন্স এন্ড ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, *'In 410 CE, Alarec, the Germanic king of Visigoths, swept into Rome and sacked the great city in a three-day of rampage. Sixty six years later, Romulus Augustus, the last Roman emperor of the West was deposed and the regalia of empire was rudely despatched to Constantinople. With that the lights went out on civilization and the Western world was plunged into on the age of darkness- a night in which there was no scholarship, literacy or even civilized life. Only 1000 years later did the world finally rediscover classical learning and bring the world's night of darkness to an end with the bright new dawn of the Renaissance.'*

অর্থাৎ *'৪১০ সালে জার্মান ভিসিগথ রাজা আলারেস ঝঞ্ঝার বেগে রোম আক্রমণ করেন এবং তিনদিনের এক অভিযানে তিনি এ মহান নগরী লুণ্ঠন করেন। ৬০ বছর পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রমুলাস অগাস্টাসকে* ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং অত্যন্ত অপমানজনকভাবে *কন্সটান্টিনোপলে তার রাজমুকুট পাঠানো হয়। সম্রাট অগাস্টাসের পতনের মধ্য দিয়ে রোমান সভ্যতার আলো নিভে যায় এবং পশ্চিম দুনিয়া অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত হয়। এ অন্ধকার যুগ ছিল এমন এক রাত যেখানে কোনো জ্ঞান, কোনো শিক্ষা এমনকি সভ্য জীবন পর্যন্ত ছিল না। অবশেষে এক হাজার বছর পর পশ্চিম দুনিয়া প্রাচীন জ্ঞান পুনরুদ্ধার করে এবং রেনেসাঁর নতুন প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মধ্য দিয়ে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করে।'*

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক সিঙ্গার, সাংবাদিক জোনাথন লিয়ন্স এবং ঐতিহাসিক আহসান মাসুদ সত্যি কথাই বলেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপে শিল্প, স্থাপত্য, চিকিৎসা, কৃষি, সঙ্গীত, ভাষা, শিক্ষা, আইন ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ইসলামী সভ্যতার কাছ থেকে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করে। ইতালির নগর রাষ্ট্র এ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। সিরিয়ার এন্টিয়কের মতো নগরীগুলোতে আরব ও ল্যাটিন সংস্কৃতির ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটে।

মধ্যযুগে মুসলমানরা গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলসহ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের বইগুলো আরবীতে অনুবাদ করে। আরবীতে অনূদিত তাদের বইগুলো ইউরোপে পৌঁছে। অগণিত পণ্ডিত সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য ও সৌন্দর্য বিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রগুলোতে মুসলিম সভ্যতার প্রভাব অপরিসীম। ইসলামী বিশ্বের প্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং রেনেসাঁ যুগ শুরু হয়।

মুসলিম স্পেন থেকে ইউরোপে জ্ঞান স্থানান্তর

মধ্যযুগে ইউরোপ ও মুসলিম জগতের মধ্যে বহু বিষয়ে যোগাযোগ ঘটে। স্পেন ও পর্তুগাল নিয়ে গঠিত আইবেরীয় উপদ্বীপ ছিল পাশ্চাত্যে ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুট। উমাইয়া খলিফা ও তাদের উত্তরসূরিরা আইবেরীয় উপদ্বীপে সহনশীল শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক সহনশীলতা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। খ্রিস্টান শাসিত স্পেনের পশ্চিমাংশ ছিল বরাবরই প্রযুক্তির আমদানিকারক। ১০৮৫ সালে টলেডোর পতন ঘটার পর প্রযুক্তির রপ্তানিকারক হয়ে দাঁড়ায় স্পেনে বসবাসকারী খ্রিস্টানরা। এসব খ্রিস্টানকে বলা হতো 'মোজারাব'। মোজারাব নামে পরিচিত খ্রিস্টানরা আরবী ভাষায় কথা বলতো। তাদের সংস্কৃতি ছিল আরবী। ইতিপূর্বে মুসলিম বিজয়ের মধ্য দিয়ে আরবী পশ্চিম ইউরোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। দ্রুত এ ভাষা উন্নত সংস্কৃতি এবং মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। স্পেনের দু'টি অংশে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা বসবাস করলেও তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। শিল্পীদের অভিবাসনের মধ্য দিয়ে স্পেনের খ্রিস্টান শহরগুলোতে নতুন নতুন কৌশল স্থানান্তরিত হতে থাকে। মোজারাবরা স্পেনে খ্রিস্টান নিয়ন্ত্রিত অংশে আরব সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকৃত ভূখণ্ডগুলোকে সাফল্যের সঙ্গে উপনিবেশে পরিণত করায় খ্রিস্টান রাজ্যগুলো সম্প্রসারিত হয়। বিজিত ভূখণ্ডগুলোকে কার্যত মুসলিম জনশূন্য করা হয়। পরে এসব ভূখণ্ডে নতুন করে বসতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বসতি স্থাপনে আরব শাসিত আল-আন্দালুসের মোজারাব অভিবাসীদের আকৃষ্ট করা হয়। এ নীতি অবলম্বন করে খ্রিস্টান রাজা তৃতীয় আলফনসো বিজিত ভূখণ্ডগুলো উপনিবেশে পরিণত করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

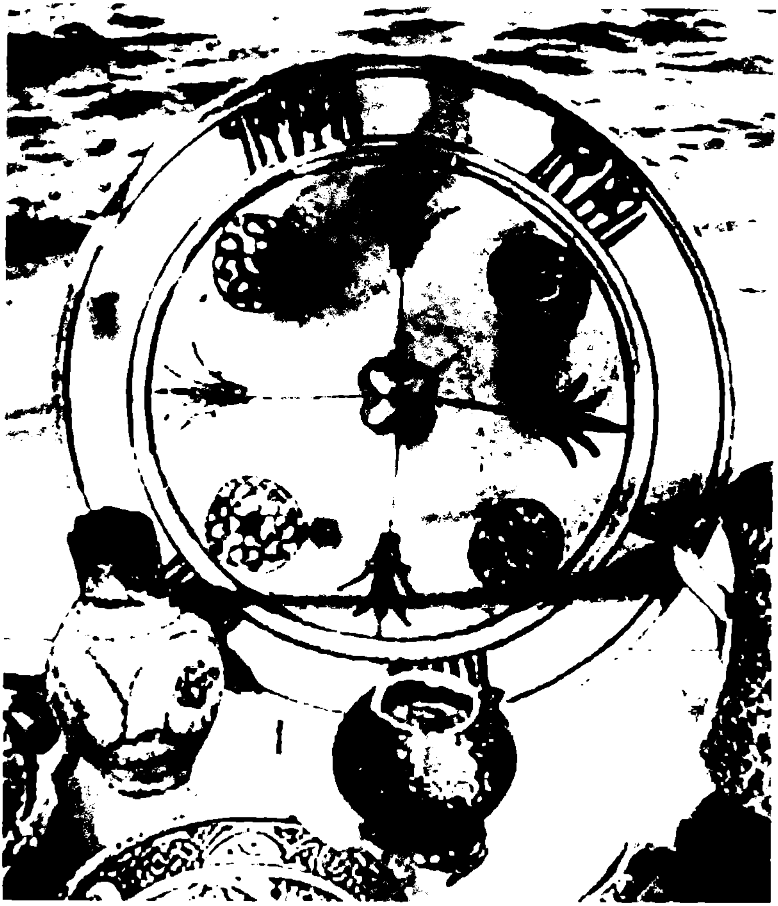
আরবি বর্ণমালা সম্বলিত একটি আন্দালুসীয় থালা

মোজারাবরা আরব স্থাপত্য রীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভবন, গীর্জা ও দুর্গ নির্মাণে সহযোগিতা করে। খ্রিস্টান ভূখণ্ডে অভিবাসনকারী মোজারাবরা আরবী পাণ্ডুলিপি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদে সক্ষম হয়। তারা টলেডোর অনুবাদ কেন্দ্রগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এভাবে খ্রিস্টান শাসিত স্পেনে ইসলামী কৌশল, প্রকৌশল ও প্রশাসনিক দক্ষতা চালু হয়। মোজারাবরা খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে আরবীকরণে শক্তিশালী অবদান রাখে। কৃষি, সেচ, হাইড্রোলিক প্রকৌশল ও পণ্য উৎপাদনের কৌশল আইবেরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য

www.pathagar.com

অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম কলা কৌশল স্পেন থেকে ইতালি এবং ইতালি থেকে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে। স্পেনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড সত্ত্বেও প্রযুক্তি হস্তান্তরে ব্যাঘাত ঘটেনি। বরং মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে খ্রিস্টানদের আধিপত্য কায়েম হলে প্রযুক্তি হস্তান্তরের গতি আরো বেগবান হয়।

সিসিলি ও টলেডোর মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, মুসলমান বিশেষ করে স্পেন ও সিসিলির কাছ থেকে তারা সে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। এসব পণ্ডিত আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শনের পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজান্টিয়ামে মূল আরবী পাণ্ডুলিপিগুলো নকল ও সংরক্ষণ করা হয়।

খ্রিস্টান ইউরোপে প্রাচীন জ্ঞান স্থানান্তরে মুসলমানদের অমূল্য অবদান স্বীকার করতে গিয়ে গণিতের ঐতিহাসিক জর্জ সারটন 'এ গাইড টু দ্য হিস্টরি অব সায়েন্স'-এ লিখেছেন, *'Latin translation of the 12^{th} century were spurred by a major search by European scholars for new learning unavailable in Christian Europe at the time; their search led them to areas of southern Europe, particularly in central Spain and Sicily, which recently had come under Christian rule following their reconquest in the late 11^{th} century. These areas had been under a more knowledgeable Muslim rule for considarable time and still had substantial Arabic-speaking populations to support their search. The combination of Muslim accumulated knowledge, substantial numbers of Arabic-speaking scholars and the new Christian rulers made these areas intellectually attractive as well as culturally and politically accessible to Latin scholars.'*

অর্থাৎ *'দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান ইউরোপে নতুন নতুন জ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ না থাকায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৃহত্তর জ্ঞানান্বেষণে বের হলে সে সময় ল্যাটিন অনুবাদে গতি সঞ্চারিত হয়। জ্ঞানের এ অনুসন্ধান খ্রিস্টান পণ্ডিতদেরকে দক্ষিণ ইউরোপ বিশেষ করে মধ্য স্পেন ও সিসিলিতে প্রবেশের পথ দেখায়। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে খ্রিস্টানদের পুনরাভিযানে স্পেন ও সিসিলিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সময় এসব অঞ্চল ছিল অধিকতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ মুসলিম শাসনাধীনে। তবে তখনো সেখানে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের জ্ঞান অনুসন্ধানে সহায়তা করার মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবীভাষী জনগোষ্ঠী ছিল। মুসলমানদের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবীভাষী পণ্ডিত এবং নয়া খ্রিস্টান শাসকদের সমন্বয়ে এসব অঞ্চল বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে এবং ল্যাটিন পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রবেশ সহজতর করে তোলে।'*

৯৬৫ সালে মুসলিম বিজয়ের পর সিসিলিতে আরব ও নরম্যান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের মতো শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যোগাযোগ আরো জোরদার হয়। দ্বিতীয় রজারের অধীনে মুসলিম সৈন্য, কবি ও বিজ্ঞানীগণ কাজ

www.pathagar.com

করেছেন। মরক্কোর মোহাম্মদ আল-ইদ্রিসী ১১৫৪ সালে দ্বিতীয় রজারের জন্য 'তাবুলা রোজারিয়ানা' রচনা করেন। তাবুলা রোজারিয়ানা হচ্ছে মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠতম মানচিত্র সম্বলিত গ্রন্থ।

মধ্যযুগের সূচনা লগ্নে ইউরোপীয়রা প্রাচীনকালের বহু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলে। তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভকারী নেস্টোরীয়, মালকাইট ও জ্যাকোবাইট সন্ন্যাসীরা এরিস্টোটলের মতো বহু গ্রীক পণ্ডিতের পাণ্ডুলিপি গ্রীক ভাষা থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফা মামুন আল-রশীদ প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহর মতো মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো সংরক্ষণ ও অনুবাদ করা হয় এবং এগুলোর উন্নয়ন ঘটানো হয়। ৮৩২ সাল নাগাদ হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব ছিল। মধ্যযুগে এসব পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের খ্রিস্টান বিশেষ করে বাগদাদের ক্রিশ্চিয়ান এরিস্টোটেলিশিয়ান স্কুল গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের অনূদিত গ্রন্থ পরে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ইতালীয় আইনজ্ঞ পিসার বারগুনডি এন্টিয়কে এরিস্টোটলের হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইসলাম শুধু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করেছে তাই নয়, এলজাব্রা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও গোলাকার ত্রিকোণমতির মতো নিজস্ব বিজ্ঞানও উদ্ভাবন করেছে। পরবর্তীতে মুসলমানদের উদ্ভাবিত এসব জ্ঞান বিজ্ঞান পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১১২৭ সালে পাইসির স্টেফান একটি আরবীয় চিকিৎসা বিষয়ক বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। নবম শতাব্দীতে পার্সী গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমি আরবী ও ভারতীয় সংখ্যায় গাণিতিক সমাধানে এলগোরিদম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং পরে ইতালীয় গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাসি এ পদ্ধতি ইউরোপে চালু করেন। ইবনে আল-হাইছাম আলোক বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই সংকলন করেন। স্যার আইজাক নিউটন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জনক রেনি ডেসকার্টেস এসব বই রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতেন। ক্রুসেডাররা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মুসলমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিপুল উৎকর্ষ সাধন করেছেন। বহুবার ক্রুসেডাররা আরব চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়েছেন। ফরাসি বিশপ জ্যাঁ দ্য জয়েনভাইল সাক্ষ্য দিয়েছেন, ১২৫০ সালে একজন আরব চিকিৎসক তার প্রাণ রক্ষা করেন।

ইসলামী বিশ্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভিড়

দশম শতাব্দীতে অধ্যয়নের জন্য বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত স্পেনসহ ইসলামী বিশ্ব চেষে বেড়ান। আরবীভাষী খ্রিস্টান মোজারাব অধ্যুষিত টলেডো ছিল শিক্ষার অন্যতম একটি কেন্দ্র। ইউরোপের অন্য কোনো জায়গায় আরবী পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় দশম শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এ ঐতিহাসিক শহরে এসে ভিড় জমান। ইউরোপে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান স্থানান্তরে যার নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন

www.pathagar.com

ক্রিমোনার গেরার্ড। ইতালির এ বিখ্যাত অনুবাদক আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় ৮৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

ক্রিমোনার গেরার্ড কিভাবে আরবী গ্রন্থ অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে সি. বারনেল 'অ্যারাবিক-ল্যাটিন ট্র্যান্সলেশন প্রোগ্রাম ইন টলেডো' শিরোনামে বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Because of his love for Almagest, Gerard of Cremona did not find at all amongst the Latin. Then he made his way to Toledo, where seeing an abundance of books in Arabic on every subject and pitying the poverty he had experienced among the Latins concerning these subjects, out of his desire to translate he thoroughly learnt the Arabic language.'*

অর্থাৎ 'আলমাগেস্টের প্রতি ভালোবাসা থেকে ক্রিমোনার গেরার্ড ল্যাটিনবাসীদের মধ্যে বইটি খুঁজে আদৌ পাননি। তারপর তিনি টলেডো যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর আরবীতে প্রচুর বইপত্র দেখতে পান এবং প্রতিটি বিষয়ে ল্যাটিনবাসীদের দৈন্যতা দেখে দয়াপরবশ হয়ে বইগুলো অনুবাদ করার আগ্রহ থেকে তিনি আগাগোড়া আরবী ভাষা শিখে ফেলেন।'

কার্থেজের কন্সটান্টাইন দি আফ্রিকান-ও ক্রিমোনার গেরার্ডকে অনুসরণ করেছিলেন। তার জন্ম তিউনিসে। ১০৮৭ সালে তিনি ইতালির মন্টি ক্যাসিনোতে পরলোকগমন করেন। একজন বণিক হিসাবে তিনি ইতালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসা বিদ্যার দুর্দশা দেখে তার হৃদয় কেঁদে উঠে। ব্যথিত হয়ে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেন। জন্মভূমি তিউনিসে তিনি তিন বছর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসা বিষয়ক কয়েকটি আরবী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তিনি ইতালিতে ফিরে যান। তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। প্রথমে তিনি সালারনোতে বসবাস শুরু করেন। পরে বসবাস করেন মন্টি ক্যাসিনোতে। মন্টি ক্যাসিনোতে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। একসময় তিনি মন্টি ক্যাসিনো গীর্জার যাজকে পরিণত হন। তিনি তার সময়ে জ্ঞাত চিকিৎসা বিষয়ক সব আরবী পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন। প্রথমে তিনি নিজের নামে বইগুলো চালিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মূল আরবী লেখকের নাম ও শিরোনাম ব্যবহার করা হয়।

ক্রিমোনার গেরার্ড ও কন্সটান্টাইন দি আফ্রিকানের পর যাকে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন ফ্রান্সের গারবার্ট ডি অরিলাক। পরবর্তীতে তিনি পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। ফরাসি গারবার্ট স্পেনের বার্সিলোনায় আরবী গণিতে শিক্ষা লাভ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন আগ্রহী। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রেইমসের গীর্জায় শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন। তিনি ক্যাথেড্রাল স্কুল পুনর্গঠন করেন। গারবার্ট ইউরোপে গণিত ও জ্যামিতি চালু করেন। স্পেন থেকে তিনি এস্ট্রোলাব তৈরির জ্ঞান বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন গণিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এস্ট্রোল্যাবের জ্ঞান থাকায় এবং গণিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় অনেকে তাকে সন্দেহ করতো। ভাবতো তিনি জাদুকর। তার সঙ্গে দুষ্টআত্মার যোগাযোগ আছে।

www.pathagar.com

লিওনার্দো ফিবোনাসি-ও ছিলেন গারবার্টের মতো একজন পণ্ডিত। তিনি ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছেন। ১১৮০ সালে তার জন্ম। ১২ বছর বয়সে তিনি আলজেরিয়ার বুগিয়াতে নিজ পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। আরব শিক্ষকের অধীনে তিনি গণিত ও আরবী অধ্যয়ন করেন। ফিবোনাসি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শিক্ষানবিশ হিসাবে সিরিয়া, মিসর, গ্রীস, সিসিলি ও প্রোভেন্স ভ্রমণ করেন। এসব দেশ ভ্রমণকালে তিনি আরবী পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান। ১২২৮ সালে তিনি তার বিশ্ব বিখ্যাত বই 'লাইবার আবাসি' রচনা করেন।

প্যাট্রিয়ার্ক নিমেহ হলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৫৭৭ সালে তিনি উত্তর মেসোপটেমিয়ার দিয়ার বাকির থেকে ইতালিতে অভিবাসন করেন। মেসোপটেমিয়া থেকে ইতালিতে অভিবাসনকালে তিনি তার লাইব্রেরি সঙ্গে করে নিয়ে যান। ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তাকে মেডিসি ওরিয়েন্টাল প্রেসের এডিটরিয়াল বোর্ডে নিয়োগ দেয়া হয়। ইতালির ফ্লোরেন্সের লরেন্সিয়া লাইব্রেরিতে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি এখনো সংরক্ষিত।

জ্যাকব গোলিয়াস ছিলেন ইউরোপে মুসলিম জ্ঞান পাচারে আরেকটি মাধ্যম। তাকে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি দেয়া হয়। নিয়োগ লাভের পর তিনি ১৬২৫ থেকে ১৬২৯ সাল নাগাদ নিকটপ্রাচ্যে অবস্থান করেন। এবং তিন শো আরবী, তুর্কি ও ফারসি পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে ইউরোপে পাড়ি জমান। তিনি ছিলেন আরবীতে দক্ষ এবং একজন বিজ্ঞানী।

বাথের এডিলার্ড ছিলেন অন্যতম মাধ্যম। ১১১৬ থেকে ১১৪২ সাল পর্যন্ত তিনি আরবী গ্রন্থ অনুবাদে সক্রিয় ছিলেন। তিনি সিসিলি ও সিরিয়ায় ৭ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি আরবী শিখেন এবং আরবী জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করা ছাড়াও তিনি ইউরোপে ইসলামী প্রযুক্তি স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গিলাউম পোস্টাল ছিলেন একজন ফরাসি পণ্ডিত। ১৫১০ সালে তার জন্ম এবং ১৫৮১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি আরবী ও অন্যান্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বর্তমান তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী ইস্তাম্বুলে তিনি দু'দফা ভ্রমণ করেন। ফ্রান্সের রাজার পক্ষ থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তিনি ১৫৩৬ সালে প্রথমবার ইস্তাম্বুল সফর করেন। ভ্রমণকালে তিনি প্রচুর আরবী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। আরবী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তিনি ১৫৪৮ থেকে ১৫৫১ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণের পর তাকে রয়্যাল কলেজে গণিত ও প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনাল ও ভ্যাটিকানে তার সংগৃহীত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক দু'টি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। এ দু'টি পাণ্ডুলিপিতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন তুসির জ্যোতির্মণ্ডলীয় তত্ত্ব বিদ্যমান। তুসির তত্ত্বের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে পোস্টালের নিজস্ব ভাষ্য ও নোট।

www.pathagar.com

ল্যাটিন ভাষায় আরবী বই অনুবাদ

মধ্যযুগের ইউরোপে আজকের মতো ইংরেজির একচেটিয়া দাপট ছিল না। সে সময় ল্যাটিন ছিল ইউরোপের অভিন্ন ভাষা। তাই আরবী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলো অনুবাদের ইতিহাসে ল্যাটিন ভাষার নাম উচ্চারিত হয়। প্রথমেই আরবী থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয় 'দ্য ম্যাথেসিস অব ফারমিকাস ম্যাটারনাস'। তারপর বন্যার মতো শুরু হয় ল্যাটিন ভাষায় আরবী গ্রন্থ অনুবাদের কাজ। ১০৮৫ সালে খ্রিস্টানরা টলেডো পুনর্দখল করা নাগাদ স্পেনে আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়নি।

টলেডোতে খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্পেনে প্রাপ্ত আরবী গ্রন্থগুলো অনুবাদের গুরুত্ব কতটুকু ছিল সাংবাদিক জোনাথন লিয়ন্স তার 'দ্য হাউজ অব উয়িজডম: হাউ দি অ্যারাবস ট্রান্সফরমড দ্য ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ে তা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক লেখক ফ্রান্সিস ও জোসেফের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার বইয়ের ১২ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'It was the Muslim-assisted translation of Aristotle followed by Galen, Euclid, Ptolemy and other Greek authorities and their integration into the university cirriculam that created what historians have called `the scientific Renaissance in the 12th century'. Certainly the completion of the double, sometimes triple translation (Greek into Arabic, Arabic into Latin, often with an intermediate Castilian Spanish) is one of the most fruitful scholarly enterprises ever undertaken. Two chief sources of translation were Spain and Sicily, regions where Arabs, Europeans and Jewish scholars freely mingled. In Spain the main center was Toledo, where Archbishop Raymond established a college specifically for making Arabs knowledge available to Europe.'*

অর্থাৎ *'এটা ছিল মুসলমানদের সহযোগিতায় এরিস্টোটল, গালেন, ইউক্লিড, টলেমি এবং অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতের গ্রন্থগুলো অনুবাদ এবং অনূদিত গ্রন্থগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা যাকে ঐতিহাসিকরা 'দ্বাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। নিশ্চিতভাবে দু'বার, কখনো বা তিনবার (গ্রীক থেকে আরবীতে, আরবী থেকে ল্যাটিন, আবার ল্যাটিন থেকে স্পেনের কাস্টিলিয়ান ভাষায়) অনুবাদ করার কর্ম সম্পন্ন করা ছিল ইতিহাসের অতুলনীয় একটি সফল বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ। স্পেন ও সিসিলি ছিল অনুবাদের দু'টি প্রধান সূত্র। এ দু'টি জায়গায় আরব, ইউরোপীয় ও ইহুদীরা খোলাখুলি মেলামেশা করতো। টলেডো ছিল স্পেনের একটি প্রধান অনুবাদ কেন্দ্র। সেখানে আর্চবিশপ রেমন্ড ইউরোপে প্রাপ্ত আরবী জ্ঞান অনুবাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'*

প্রাথমিকভাবে স্পেনে বিজ্ঞান বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ওপর জোর দেয়া হয়। পরবর্তী আকর্ষণ ছিল কোরআন ও ইসলামী বই পুস্তক। ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আরবী শেখা জরুরি হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েকটি অনুবাদ প্রকল্প স্থাপন করা হয়। এসব অনুবাদ প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পিটার দ্য ভেনারেবলের প্রকল্প। ১১৪২ সালে পিটার দ্য

www.pathagar.com

ভেনারেবল কোরআনের ল্যাটিন অনুবাদ করার জন্য কিটনের রবার্ট, করিন্থিয়ার হেরম্যান, পোয়েটিয়ার্সের জন এবং মোহাম্মদ নামে পরিচিত একজন মুসলমানকে অনুরোধ করেন।

টলেডোর বিশাল গীর্জার লাইব্রেরি ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ কেন্দ্র। টলেডোর আর্চবিশপ রেমন্ড এ লাইব্রেরিতে প্রথম অনুবাদ কর্মের কাজ শুরু করেন। তার নেতৃত্বাধীন অনুবাদক টীমে ছিলেন টলেডোর আরবীভাষী খ্রিস্টান, ইহুদী পণ্ডিত, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ধর্মযাজক। এসব পণ্ডিত প্রথমে কাস্টিলিয়ান ভাষায় এবং পরে ল্যাটিন ভাষায় আরবী পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি আরবী অথবা গ্রীক ভাষায়ও আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করা হতো। টলেডোর রেমন্ড এরিস্টোটলের জ্ঞান পুনরুদ্ধারে যেসব আরবী ও হিব্রু গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছিলেন তিনি সেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। অনুবাদ কর্মের ধুম পড়ে যাওয়ায় এ গীর্জা 'এসকিউলা ডি ট্রাডাকটুরেস ডি টলেডো' (Escuela de Traductores de Toledo) হিসাবে পরিচিত একটি অনুবাদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইউরোপীয় ইতিহাসে এ অনুবাদ কেন্দ্রের আয়তন ও গুরুত্ব ছিল নজিরবিহীন।

ক্রিমোনার গেরার্ডের অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমির 'আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা', জাবির ইবনে আফলার 'এলিমেন্টা এস্ট্রোনমিকা', আল-কিন্দির 'অপটিক্স', আহমেদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির আল-ফরগানির 'এলিমেন্টস অব এস্ট্রোনমি অন দ্য সেলেসশিয়াল মোশন্স', আল-ফারাবির 'দ্য ক্লাসিফিকেশন অব সায়েন্সেস', মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজির রসায়ন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বই, ছাবেত ইবনে কোরা ও হুনায়ন ইবনে ইসহাকের পুস্তকাদি, আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহিয়া আল-নাকাশ আল-জারকালি, বানু মুসা, আবু কামিল শুজা ইবনে আসলাম, আবু আল-কাসিম এবং ইবনে আল-হাইছামের পুস্তকাদি।

কন্সটান্টাইন দি আফ্রিকান যাদের বই অনুবাদ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন পার্সী চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী ইবনে মাসুদি, বিখ্যাত আরবী অনুবাদক হুনায়ন ইবনে ইসহাক ও তার ভাগিনা হুবায়েশ ইবনে আল-হাসান, মিসরীয় দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আইজাক ইসরাইল ইবনে সলোমন, ইসহাক ইবনে ইমরান, আল-জাজারি প্রমুখ।

পিস্টোজার একিউরসিয়াস যাদের পাণ্ডুলিপি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন গালেন ও হুনায়ন ইবনে ইসহাক। গেরার্ড ডি সাবলোনিটা ইবনে সিনার 'ক্যানন অব মেডিসিন' এবং আল-রাজির 'আল-মনসুর' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১২০২ সালে লিওনার্দো ফিবোনাসি তার 'লাইবার আবাসি'তে ইউরোপে প্রথম আরবী সূত্র থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ হিন্দু-আরব সংখ্যা লিখন প্রণালী চালু করেন। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইতালীতে অজ্ঞাতনামা অনুবাদক জুন্দি-শাহপুর মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউহান্না ইবনে মাসিয়াহর 'এফোরিজমি' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাদুয়ার বোনাকোসা 'কলিজেট' শিরোনামে ইবনে রুশদের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল-কুল্লিয়াত' এবং কাপুয়ার জন 'থাইসির' শিরোনামে ইবনে জোহরের

www.pathagar.com

'কিতাব আল-তাইসির' অনুবাদ করেন। একই শতাব্দীতে সিসিলির ফারাজ ইবনে সালিম 'কন্টিনেন্স' শিরোনামে আল-রাজির 'কিতাব আল-হাবি' এবং ইবনে বুলতানের আরেকটি বই 'টাকিউনাম সানিটাটিস' শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। জেনোয়ার সাইমন ও আব্রাহাম টোরটোয়েনসিস ইতালীতে 'লাইবার সারভাইটোরিস' শিরোনামে আবুল কাসিসের 'আল-তাসরিফ' অনুবাদ করেন।

আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করায় সভ্যতার চেহারা পাল্টে যায়। এ ব্যাপারে জোসে মারিয়া মিলাস 'এ শেয়ার্ড লেগ্যাসিঃ ইসলামিক সায়েন্স ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'These early Arabic-based Latin exerted a remarkable influence on scholars beyond Spain, in France, Southern Germany and England. The fame of the Arabic science spread and in the twelfth century the main period of translation developed in Spain. Now the greatest number of texts in various branches of the sciences were translated in mathematics, astronomy, astrology, medicine, pharmacology, philosophy, alchemy, magic and divination and more. The so-called translators came from various parts of Europe. They were active in several places among which also Barcelona. The greatest fame gained Toledo, because here Gerard of Cremona was at work, the most prolific of all translators.'*

অর্থাৎ *'আরবীভিত্তিক এসব প্রাথমিক অনুবাদ কর্ম স্পেনের বাইরে ফ্রান্স, দক্ষিণাঞ্চলীয় জার্মানি ও ইংল্যান্ডের পণ্ডিতদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। আরবী বিজ্ঞানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনে অনুবাদের চূড়ান্ত পর্ব বিকশিত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ফার্মাকোলজি, দর্শন, অপরসায়ন, জাদুবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরো বিষয়ে অনুবাদ করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে তথাকথিত অনুবাদকগণ এসে ভিড় জমান। তারা বহু জায়গায় সক্রিয় ছিলেন। এসব জায়গার মধ্যে বার্সিলোনা ছিল অন্যতম। টলেডো সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করে। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক ক্রিমোনার গেরার্ড সেখানে অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত ছিলেন।'*

রসায়ন

মুসলমানরাই রসায়নে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালু করেন। মুসলিম রসায়নবিদরা কমপক্ষে ২ হাজার ওষুধের উপাদান আবিষ্কার ও উৎপাদন করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন রসায়নের জনক। দ্বাদশ শতাব্দীতে তার রসায়ন ও অপরসায়ন বিষয়ক বইগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ইউরোপীয় রসায়নবিদদের জন্য মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত হয়। ১১৪৪ সালে ইংরেজ আরবী অনুবাদক চেস্টারের রবার্ট 'কিতাব আল-কিমিয়া' এবং ১১৮৭ সালে ক্রিমোনার গেরার্ড 'কিতাব আল-সাবিন' অনুবাদ করেন। ফরাসি রসায়নবিদ মঁসিয়ে পিয়েরে বার্থেলট 'বুক অব দ্য কিংডম', 'বুক অব দ্য ব্যালেন্সেস' এবং 'বুক অব মারকিউরি'

www.pathagar.com

প্রভৃতি শিরোনামে জাবির ইবনে হাইয়ানের কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। জাবির ইবনে হাইয়ানের ব্যবহৃত এলিক্সার, এলকোহল ও আলকালি'র মতো বহু টেকনিক্যাল আরবী শব্দ ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় এবং এসব শব্দ বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি ও ইবনে সিনার রসায়ন ও অপরসায়ন বিষয়ক কয়েকটি বইও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

মুসলমানদের মাধ্যমেই ইউরোপে আলকেমি বা রসায়নের জ্ঞান পৌছেছে। ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে তা স্বীকার করছেন। লরেন ডানেলা 'দি অরিজিন্স অব আলকেমি' শিরোনামে বইয়ে লিখেছেন, *'The Arabs brought the ideas of alchemy to Spain and from there the concepts of alchemy spread into Europe. In fact, Pope Silverter 11 was one such instrumental person in bringing the Islamic teachings of alchemy to Europe during the Middle Ages.'* অর্থাৎ *'আরবরা স্পেনে আলকেমির ধারণা বয়ে নিয়ে এসেছিল এবং সেখান থেকে আলকেমির ধারণা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পোপ দ্বিতীয় সিলভারটার হলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি যিনি মধ্যযুগে ইউরোপে আলকেমির ইসলামী শিক্ষা আমদানি করেছিলেন।'*

রসায়নে ইউরোপের তুলনায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা কতটুকু অগ্রসর ছিলেন ঐতিহাসিক হেনরি মার্শাল লিচেস্টারের একটি উক্তি উল্লেখ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। লিচেস্টার 'দ্য হিস্টরিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড অব কেমিস্ট্রি' শিরোনামে বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *'Thus it was on the whole that the Muslim alchemists were enlarging and organising alchemy in a very significant way, the Byzantine alchemists were merely coping or commenting on the alchemical manuscripts of earlier days.'* অর্থাৎ *'মুসলিম আলকেমিস্টরা যেখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলকেমিকে সুসংগঠিত করছিলেন এবং তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলছিলেন, ঠিক তখন বাইজান্টাইন আলকেমিস্টরা বিগত দিনের আলকেমিকেল পাণ্ডুলিপিগুলো হয়তো নকল করছিলেন নতুবা মন্তব্য তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন।'*

এলজাব্রা

রেনেসাঁ যুগে ইউরোপীয়রা জানতে পারে যে, এলজাব্রা শুধু একটি আরবী শব্দ নয় বরং গণিতের এ শাখা হচ্ছে মুসলমানদের সৃষ্টি। শুরুতে ইউরোপে এলজাব্রা বিষয়ক বইগুলোতে স্বীকার করে নেয়া হয়, এ মহাদেশের প্রথম এলজাব্রা বিষয়ক বইটি ছিল আল-খাওয়ারিজমি এবং আরবীয় পণ্ডিতদের অনূদিত গ্রন্থ। ইউরোপ একথাও জানতে পারে, সমতল ও গোলাকার ত্রিকোণমতির জন্য মানব সভ্যতা মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে ঋণী। দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় আরবীতে লিখিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের বইগুলো অনুবাদ করা হয়। যেসব আরবী লেখকদের বই অনুবাদ করা হয় তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহাম্মদ ইবনে জাবির আল-হাররানি আল-বাত্তানি এবং মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি। এ প্রসঙ্গে এলজাব্রা বিষয়ক আরবী পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে 'দ্য কম্পেন্ডিয়াস বুক অন ক্যালকুলেশন বাই কমপ্লিশন এন্ড ব্যালেন্সিং' এবং মোহাম্মদ আল-ফাজারির পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে 'গ্রেট সাইন্ডহিন্ড' নামের বই দু'টি উল্লেখযোগ্য।

গণিতে মুসলমানদের অবদান এত বেশি যে, তাদের সমতুল্য আর কেউ নয়। এ শাস্ত্রের ইতিহাস থেকে হিন্দু ও চীনাদের অবদান বাদ দিলেও চলে। কিন্তু মুসলমানদের অবদান বাদ দিলে গণিতের পুরো ইতিহাসই ধ্বংস হয়ে যাবে। গণিতের ইতিহাসের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক কত নিবিড় বিল শিপলারের একটি উক্তি তার প্রমাণ। শিপলার তার 'আল-বেরুনি: মাস্টার এস্ট্রোনমার এন্ড মুসলিম স্কলার অব ইলিভেন্থ সেঞ্চুরি' শিরোনামে বইয়ের ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Mathematic disciplines such as algebra and trigonometry, for example, are fundamental to accurate calculations in the field of astronomy. Both disciplines originated in Muslim lands.*' অর্থাৎ '*উদাহরণস্বরূপ, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির মতো গণিতের দু'টি শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞানে নির্ভুল গণনার জন্য অপরিহার্য। উভয় শাখার উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম ভূখণ্ডে।*'

মুসলমানদের কাছ থেকে গণিতের জ্ঞান লাভ করলেও খ্রিস্টান ইউরোপ এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করছে। এ প্রসঙ্গে আলী আবদুল্লাহ আল-দাফার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ড. দাফা তার 'দ্য মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স'-এর ১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Muslims have provided considarable knowledge about mathematics, yet many Americans and Europeans do not acknowledge from what storehouse the Christian world acquired the tools without which western civilization could not have reached its present level.*' অর্থাৎ 'মুসলমানরা ইউরোপকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গাণিতিক জ্ঞান দিয়েছে। *কিন্তু যে জ্ঞান ছাড়া পশ্চিমা সভ্যতা তাদের সমৃদ্ধির বর্তমান স্তরে পৌঁছতে পারতো না, কোন ভাণ্ডার থেকে খ্রিস্টান বিশ্ব এ জ্ঞান অর্জন করেছে অধিকাংশ আমেরিকান ও ইউরোপীয় তা স্বীকার করছে না।*'

এখানে মোহাইনি মোহামেদের একটি উক্তিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, গণিতের ইতিহাস থেকে মুসলমানদের অবদান বাদ দেয়ার হীন চক্রান্ত চলছে। রেনেসাঁ যুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে এ মানসিকতার জন্ম হয়। রেনেসাঁ পরবর্তী পাশ্চাত্যের লেখক ও ঐতিহাসিকগণ বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের অবদান বাদ দিয়ে আলোচনা করেন। ঐতিহাসিক মোহাইনি একথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি তার 'গ্রেট মুসলিম ম্যাথমেটিশিয়ান' শিরোনামে বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, '*Most books on the history of mathematics give very little reference to the mathematics of the Orient, especially Islamic mathematics. Some books such as by Bell*

www.pathagar.com

(1937) and Hooper (1948) proceed with an account of the mathematics of the Greeks i.e. Pythagoras, Archemedes and Euclid and then make a quantum leap to discuss on the mathematics of the Renaissance period such as those of Copernicus, Newton, Liebniz and Gauss.'

অর্থাৎ *'গণিতের ইতিহাসের অধিকাংশ বইয়ে প্রাচ্যের গণিত বিশেষ করে ইসলামী গণিতের ইতিহাস খুব কমই উল্লেখ করা হয়। বেল (১৯৩৭) এবং হুপারের (১৯৪৮) মতো লেখকদের কয়েকটি বইয়ে পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস ও ইউক্লিডের মতো গ্রীকদের গণিতের বিবরণ দিয়ে আলোচনা দিয়ে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে একটি বিরাট লাফ দিয়ে কোপার্নিকাস, নিউটন, লিবনিজ ও গসের মতো রেনেসাঁ যুগের গণিতজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যতগুলো শাখায় মুসলমানরা অবদান রেখেছে সেগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উৎস হলো ইসলামী বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন এবং 'মুমতাহান' নামে একটি পুস্তকে পর্যবেক্ষণের ফলাফল সংরক্ষণ করতেন। ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য বই আজো বিদ্যমান। সারাবিশ্বে প্রায় ১০ হাজার ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাইজান্টাইনীয় গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রেগরী চোনিয়াডস গ্রীক ভাষায় আল-খাজিনির 'জিজ আস সাঞ্জারী' অনুবাদ করেন এবং বাইজান্টাইনীয় সাম্রাজ্যে বইটি অধ্যয়ন করা হতো। আল-বাত্তানি এবং ইবনে রুশদ জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির মডেল সংশোধন করেন এবং মহিউদ্দিন উর্দি, নাসিরুদ্দিন তুসি ও ইবনে আল-শাতির নন-টলেমিক মডেল উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে তাদের উদ্ভাবিত মডেল নিকোলাস কোপার্নিকাস উদ্ভাবিত জ্যোতির্মণ্ডল বিষয়ক মডেলে রূপান্তরিত হয়। আবু আল-রায়হান আল-বেরুনির 'তারিখ আল-হিন্দ' এবং 'কিতাব আল-কানুন' যথাক্রমে 'ইন্ডিকা' ও 'কানন মাসুদিকাস' নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

আল-জায়ানির গোলাকার ত্রিকোণমিতির ওপর লিখিত প্রথম বই 'দ্য বুক অব আননোওন আর্কস অব অ্যা স্ফিয়ার' ইউরোপীয় গাণিতিক জগৎকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। সংখ্যা হিসাবে তার অনুপাতের সংজ্ঞা এবং সব বাহু অজানা থাকা অবস্থায় একটি গোলাকার ত্রিভুজ অঙ্কনে তার সমাধান জার্মান গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস মুলার ভন রিগিওমন্টানাসকে প্রভাবিত করেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী গিরিলামো কার্ডানো স্বীকার করেছেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে জাবির ইবনে আফলার লেখা বই অবলম্বনে রিগিওমন্টানাস 'অন ট্রায়াঙ্গলস' শিরোনামে গোলাকার ত্রিকোণমিতির ওপর বই লিখতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

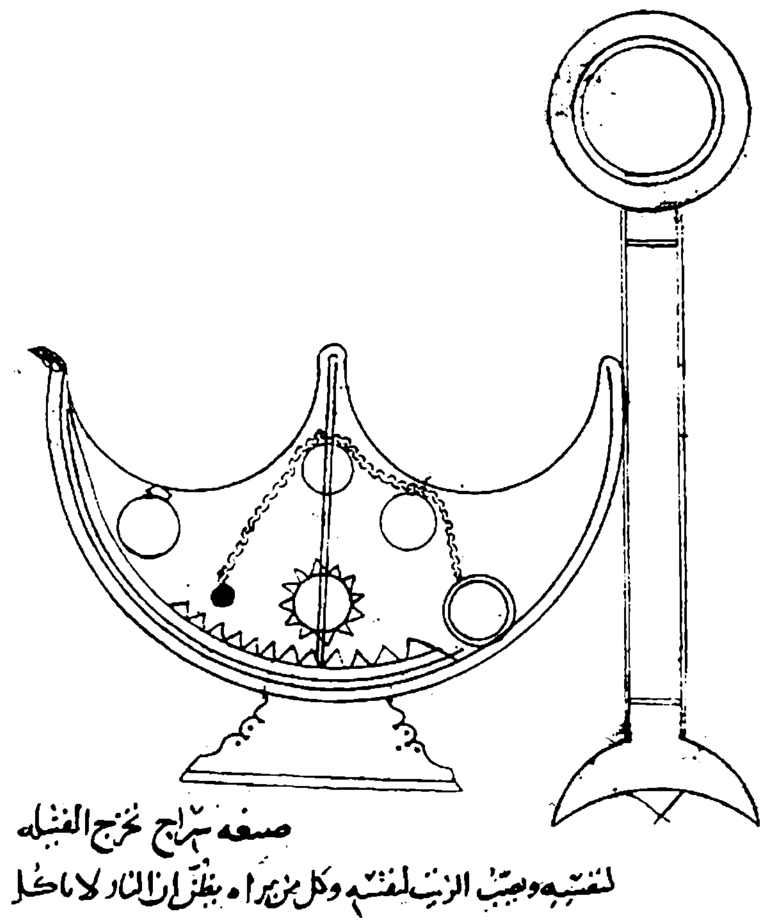

ইউরোপে স্থানান্তরিত একটি মুসলিম প্রযুক্তি

জ্যামিতি

নাসির আল-দীন আল-তুসির ছেলে সদর আল-তুসির সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক একটি বই ১৫৯৪ সালে রোমে ল্যাটিন শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি তার পিতার চিন্তাধারার ভিত্তিতে বইটি লিখেছিলেন। বইটিতে সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধের ব্যাপারে ইউক্লিডের ধারণার বিপরীত তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। ইংল্যান্ডে ইংরেজ গণিতজ্ঞ জন ওয়ালিস বইটি অধ্যয়ন করেন এবং স্বতঃসিদ্ধের ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তাভাবনা উপস্থাপনে বইটির সহায়তা গ্রহণ করেন। ওয়ালিসের ৬ শ' বছর আগে আরবীয় গণিতবিদ ছাবেত ইবনে কোরা সব ত্রিভুজে প্রযোজ্য পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সরলীকরণ উদ্ভাবন করেন। উপপাদ্য প্রমাণের কৃতিত্ব ওয়ালিসের হলেও তিনি ছাবেতের কাছে ঋণী।

www.pathagar.com

ইবনে আল-হাইছাম, ওমর খৈয়াম ও নাসির আল-দীন আল-তুসির এলজাব্রা ও জ্যামিতি বইগুলোর অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তীকালে ইউরোপে ইউক্লিডের প্রভাবমুক্ত জ্যামিতির উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

ক্রিমোনার গেরার্ড বিজ্ঞানী ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি ও ইবনে সিনার মতো আরবীয় পণ্ডিতদের অসংখ্য বই অনুবাদ করেছেন। তিনি রাজির বই অনুবাদ করে নামকরণ করেন 'রেসিউল দ্যাস ট্রেইটিস দ্য মেডিসিন'। হাম ও বসন্তের বিবরণ সম্বলিত আল-রাজির 'কম্প্রিহেনসিভ বুক অব মেডিসিন' নামের বইটিও ছিল ইউরোপে বিপুল জনপ্রিয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ক্রুসেড থেকে দেশে ফিরে এসে প্যারিসে 'লা কুইনজি ভিনজট' নামে প্রথম একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১০২৪ সালে ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ বই 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে বইটি ল্যাটিন ভাষায়ও অনুবাদ করা হয় এবং গোটা ইউরোপে মুদ্রিত হয়। ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনাকাল পর্যন্ত বইটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি মানসম্মত টেক্সট বই হিসাবে স্বীকৃত ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন' ৩৫ বারের বেশি প্রকাশিত হয়। বইটিতে সংক্রামক ব্যাধির ছোঁয়াচে প্রকৃতি, কোয়ারান্টাইন পদ্ধতি, গবেষণামূলক চিকিৎসা এবং ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইবনে সিনার 'দ্য বুক হীলিং' নামে বইটি ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের একটি সাধারণ এনসাইক্লোপিডিয়া হিসাবে স্বীকৃত। এ বইটিও ইউরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ডোমিঙ্গো গুন্দিসালভোর সহযোগিতায় আব্রাহাম ইবনে দাউদ বইটি অনুবাদ করেন। আবু আল-কাসিম আল-জাহরাবির 'কিতাব আল-তাসরিফ' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বইটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের মেডিকেল স্কুলে পাঠ্য ছিল। ১৫২২ সালে আঁন্দ্রে আলপাগো ইবনে আল-নাফিসের 'কমেন্টারি অন কম্পাউন্ড ড্রাগস' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তার 'কমেন্টারি অন দি এনাটমি অব ক্যানন অব আবিসিনা' নামে আরেকটি বইও অনুবাদ করেন। এ বইটিতে প্রথম হৃদযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্পেনীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী মাইকেল সারভিটাস ও ইতালীয় সার্জন রিয়ালডো কলম্বোকে বইটি বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইবনে আল-হাইছামের 'বুক অব অপটিক্স' আলোক বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব সাধন করে এবং চোখের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত ঘটায়। এজন্য ইবনে আল-হাইছামকে আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের জনক এবং প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যার রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ প্রসঙ্গে জোনাথন লিয়ন্স 'দ্য হাউজ অব উয়িজডম: হাউ দি এরাবস ট্রান্সফরমড দ্য ওয়েস্ট' শিরোনামে বইয়ের ১৪

www.pathagar.com

নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '*Universities in Paris, France, Oxford and Cambridge in England were founded. A college at Bologna specialized in law and another at Salerno taught the Arabic medical knowledge.*'

অর্থাৎ '*ফ্রান্সের প্যারিস এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বলোগনায় আইনের একটি বিশেষ কলেজ* এবং সালারনোর আরেকটি কলেজে আরবী চিকিৎসা *বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা দান করতো।*'

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইউরোপকে এতকিছু দিয়েও মুসলমানরা স্বীকৃতি পায়নি। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হামিদ আহমেদ আদ ১৯৯৮ সালের ৮ আগস্ট জার্মানির হাইডেলবার্গে এক ভাষণে দুঃখ করে বলেছিলেন, '*The West has not done justice to the influence of the Muslims on the historical development of medicine. Western writers have given little importance to Islamic scientific and intellectual contributions to this field. But the fact is that the Muslims carried the torch of science and thought in an age when no other civilization was capable of doing so.*'

অর্থাৎ '*পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐতিহাসিক উন্নয়নে মুসলমানদের প্রভাবের প্রতি সুবিচার করেনি। পাশ্চাত্যের লেখকগণ এ ক্ষেত্রে ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে সামান্য গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, মুসলমানরা এমন এক যুগে ইউরোপে জ্ঞানের বাতি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল যখন অন্য কোনো সভ্যতা তা করতে সক্ষম ছিল না।*'

পদার্থবিদ্যা

পদার্থ বিজ্ঞানকে আমরা আজকাল যে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগে তার অবস্থা মোটেও সে রকম ছিল না। প্রাচীনকালে পদার্থ বিজ্ঞানকে মূলত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করা হতো। পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির বিষয়বস্তু হিসাবে জ্ঞান করা হতো। ধীরে ধীরে পদার্থ বিজ্ঞান নিজের পথ করে নিতে থাকে। অপটিক্স, ম্যাগনেটিজম, ডায়ানিক্স, স্টাটিক্স, কাইনমেটিক্স, মোশন প্রভৃতি ধাপ পেরিয়ে পদার্থ বিজ্ঞান নিজের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেলেসকে পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর অতিপ্রাকৃত, ধর্মীয় ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, প্রতিটি ঘটনার জন্য প্রাকৃতিক কারণ দায়ী। স্বর্ণযুগে প্রাচীন পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞান হারিয়ে যায়। তবে সুপরিচিত পণ্ডিতদের ছিঁটেফোটা কর্ম অবশিষ্ট ছিল। এরিস্টোটলের ১৫০টি বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৩০টির অস্তিত্ব ছিল। আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম বিজ্ঞানী আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল-হাইছাম ও আল-

www.pathagar.com

বেরুনি ইসলামী জ্ঞানের আলোকে প্রাচীন গ্রীক চিন্তাগুলোকে পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। এরিস্টোটলের 'ফিজিক্স' (Physics) এবং অজ্ঞাতনামা আরেকজন গ্রীক পণ্ডিতের লেখা আরো দু'টি বই 'স্পিরিচুয়াল ট্রিক্স এন্ড ওয়েট লিফটিং' (Spiritual tricks and weight lifting) এবং 'রিজনেটিং মেশিন্স এট সিক্সটি মাইলস এওয়ে' (Resonating machines at 60 miles away) অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইসলামী পদার্থ বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। এস্ট্রোল্যাব, মুরাল কোয়াড্রান্ট ও বালিঘড়ি ছিল বিজ্ঞানে মুসলমানদের প্রথম আবিষ্কার। বিজ্ঞানী আবুল হাসান আলী ঘড়ি নির্মাণের ওপর একটি দুর্লভ বই লিখেন। তিনি ঘড়ি নির্মাণে যে ধারণা ব্যক্ত করেন গ্রীকদের তা জানা ছিল না। তার গবেষণার সূত্র ধরে সূর্যঘড়ি তৈরি করা হয়।

ইবনে সিনা ও আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আল-সায়ি উদ্ভাবিত ইসলামী পদার্থবিদ্যার গতি তত্ত্ব জ্যাঁ বুরিদানের গতি তত্ত্ব এবং ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সংক্রান্ত গ্যালিলিওর কর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া মধ্যযুগের ইউরোপে আবু রায়হান আল-বেরুনির কর্ম এবং মেকানিক্স বিশেষ করে গতিবিদ্যা ও ডায়ানামিক্স সংক্রান্ত আল-খাজিনির কর্ম গ্রহণ করা হয় এবং এগুলো আরো উন্নত করা হয়। তবে স্বর্ণযুগে পদার্থ বিজ্ঞানে ইবনে হাইছামের অবদান অন্য যে কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি। আলোক বিজ্ঞানকে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য ইবনে হাইছামকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলমান বিশেষ করে হাইছামের অবদান নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদি ও. শুরি 'ইসলামিক পজিশন অন ফিজিক্স উইথ রেফারেন্স টু ইবনে আল-হাইছাম' শিরোনামে এক গবেষণাপত্রে লিখেছেন, '*This research contends that the study of the tabi'iyal (physics), in its specific form that we know today, was initially formulated by Muslim scholars. It was the Muslims who engender physics from the Aristotelian general outlines of form and matter. History reveals that Abu Ali al-Hassan ibn al-Hassan ibn al-Haytham was the first scholar to scientifically test the premise of hypothetical questions in research with demonstrable experiments. More than two hundred years later his books were read in Europe.*'

অর্থাৎ '*এ গবেষণায় যুক্তি তর্ক দিয়ে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আমরা আজকাল 'তাবিয়াল'কে (পদার্থ বিজ্ঞান) যে নির্দিষ্ট আকারে দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিকভাবে মুসলিম পণ্ডিতগণই সেই আকার দিয়েছিলেন। মুসলমানরাই পদার্থবিদ্যাকে এরিস্টোটলের পদার্থ ও তার আকারের সাধারণ ধারণা থেকে মুক্ত করেছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, আবু আলী আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-হাইছাম হলেন প্রথম পণ্ডিত যিনি গবেষণায় প্রমাণযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার*

www.pathagar.com

মাধ্যমে কাল্পনিক প্রশ্নগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ২ শ' বছরের অধিক সময় পর ইউরোপে তার বইগুলো পাঠ করা হয়।'

যেসব আরব পণ্ডিতের গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছিল

দ্বাদশ শতাব্দীতে যেসব আরব পণ্ডিতের বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন আল-রাজি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ছাবেত ইবনে কোরা, আল-ফারাবি, আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে কাছির আল-ফরগানি, হুনায়ন ইবনে ইসহাক ও তার ভাগিনা হুবায়াশ ইবনে আল-হাসান, আল-কিন্দি, ইব্রাহিম বার হিয়া, কুস্তা ইবনে লুকা, মাসলামাহ ইবনে আহমদ আল-মাজরিতি, জাফর ইবনে মোহাম্মদ আবু মাশার আল-বলখি, ইমাম গাজ্জালি, নূরুদ্দিন আল বেত্রুজি, আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি, আবু মাশা, মুসা ইবনে ময়মন, ইবনে জাজলা, ইউহান্না ইবনে মাসিয়াহ, ইয়াহিয়া ইবনে সারাফিউন, আল-কিফতি, আল-বেছার, আবু কামিল শুজা ইবনে আসলাম প্রমুখ। ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত আরবী বই 'দ্য প্রোপ্রাইটাটিবাস এলিমেন্টোরাম' শিরোনামে অনুবাদ করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে স্পেনীয় চিকিৎসক টলেডোর মার্ক পবিত্র কোরআন এবং বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ক বই অনুবাদ করেন। ১৬৭১ সালে ইংরেজ পণ্ডিত এডওয়ার্ড পিকক ল্যাটিন ভাষায় এবং পরে ১৭০৮ সালে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ সাইমন ওকলে ইংরেজিতে ইবনে তোফায়েলের 'হায় ইবনে ইয়াকধান' অনুবাদ করেন। যে ক'টি বই বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এ বইটি তাদের অন্যতম। ১৭৫৮ সালে ইবনে আল-বাইতারের 'কিতাব আল-জামি ফি আল আদবিয়া আল-মুফরাদা' ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হলে ইউরোপীয় বোটানিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

কুফি হরফ

মসলিন, চেলি, সাটিন ও স্কার্টসহ কাপড় বুননের অসংখ্য নয়া কৌশলের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ঘটে। শুল্ক, আবগারি, বাজার, ম্যাগাজিন প্রভৃতি এ মহাদেশে চালু করা হয়। আরব-নরম্যান শিল্প ও স্থাপত্য ঐতিহ্যবাহী ইসলামী কারুকাজ ও ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের সমন্বয় সাধন করে। মোজাইক, ধাতুর ইনলে, গজদন্ত ও কঠিন পাথরের ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জের ঢালাই, সিল্কের উৎপাদন প্রভৃতিতে ইসলামী শিল্পকলার কৌশল আরব-নরম্যান শিল্পের ভিত্তি তৈরি করেছে। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার একটি রেশম উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। রেশম উৎপাদনে সিসিলি গোটা ইউরোপে একচেটিয়াত্ব লাভ করে। মধ্য ও রেনেসাঁ যুগে পাশ্চাত্যের কারুকার্যে আরবী কুফি হরফ অনুকরণ করা হতো। লিখন পদ্ধতি ও কাপড়-চোপড়ে কারুকার্য এবং ধর্মীয় বাণী উৎকীর্ণ করতে আরবী কুফি হরফ ব্যবহার করা হতো। গায়াটোর পেইন্টিংয়ে বহু কুফি হরফ দৃশ্যমান। রেনেসাঁ যুগে হযরত দাউদের (আ.) মতো যবুর কিতাবে বর্ণিত

www.pathagar.com

মহাপুরুষদের প্রতিকৃতির পোশাকে কুফি হরফ ব্যবহার করা হতো। ইসলামী স্থাপত্য গথিক স্থাপত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ১০৯৬ সালে ক্রুসেড শুরু হওয়ার পর থেকে ইউরোপে কোণাকার খিলানের ব্যবহার শুরু হয়। স্পেনে মুসলিম শাসন এ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত ডিভাইস ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভাবিত ইসলামী কার্পেট ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় তৈলচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারুকার্য হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে এবং রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ ধরনের কার্পেটকে আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হতো।

বাদ্যযন্ত্র

ইউরোপ ইসলামী বিশ্বের কাছ থেকে সরকারি ও মানসিক হাসপাতাল, গণ ও সাধারণ গ্রন্থাগার, জ্যোতির্মণ্ডলীয় মানমন্দির এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জ্ঞান লাভ করে। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও ইউরোপীয়রা শিখেছে মুসলমানদের কাছ থেকে। আরবী 'অ্যালুদ' শব্দ থেকে এসেছে 'লিউট' (বীণা), 'রিবাব' থেকে এসেছে 'রিবাক', 'কাতারা' থেকে এসেছে 'গিটার', 'নাকাড়া' থেকে এসেছে 'নাকাড়', 'আল-ডিউফ' থেকে এসেছে 'অ্যাডিউফ', 'আল-বাক' থেকে এসেছে 'অ্যালবোকো', 'আল-নাফির' থেকে এসেছে 'আনাফিল', 'আল-শাবাবা' (বাঁশি) থেকে এসেছে 'এক্সাবিবা', 'আল-তবল' খেকে এসেছে 'আটাবাল', 'আল-তিনবাল' থেকে এসেছে 'অ্যাটাম্বাল', 'কাসানটান' থেকে এসেছে 'ক্যাসনানেট', 'সূনুজ আল-সাফির' থেকে এসেছে 'সোনাজাস দ্য অ্যাজোফার', 'সুলামি' থেকে এসেছে 'জেলামি', 'জামার' থেকে এসেছে 'শাউম', 'আল-জুরানা' থেকে এসেছে 'ডুলজাইনা', 'ঘাইটা' থেকে এসেছে 'গাইটা', 'ইরাকায়া' থেকে এসেছে 'র‍্যাকেট', 'কানুন কানোন' থেকে এসেছে 'হার্প' ও 'জাইথার', 'ঘিগাক' থেকে এসেছে 'গাইগি' এবং 'টারাব' শব্দটি এসেছে 'থিওরবো' শব্দটি।

ইংরেজিতে আরবী শব্দ ভাণ্ডার

আধুনিক ইংরেজি ভাষায় কমপক্ষে ৪ শতাংশ শব্দ এসেছে আরবী থেকে। শব্দগুলো আরবী বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক। ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী শব্দগুলো উল্লেখ করা হলো। তবে বাংলা উচ্চারণে হেরফের আছে। শব্দগুলো হলো:

আবা, এবেলমস্ক, এবিউটিলন, আচারনার, আক্রাব, এডোব, এফ্রিট, আলবাকর, এলবাট্রস, আলকালডি, আলকাজার, আলকেমি, এলকোহল, এলকোভ, আলদাবারান, এলেমবিক, আলফালফা, আলফোরজা, আলমুকান্তর, আলগারোবা, এলজাব্রা, এলগোল, এলগোরিজম, আলহাইডাড, আলকালি, আলকানেট, আল্লাহ, আলমানাক, এডমিরাল, এলফাবেট, আলটায়ার, এমালগাম, এম্বার, আমির, এনিলাইন, এন্টিমনি, এপ্রিকোট, আরডেব, আরগন, এরিয়েল, এরাক, এরোবা, আরসেন্যাল, আর্টিকোক,

www.pathagar.com

এসাসিন, এটাবল, আত্তার, আউবারজাইন, এভারেজ, আজিমাথ, এজিউর, এজোর, আধারা, আদিব, আইন, আলবালি, আলখিবা, আলদারমিন, আলফারক, আলজেদি, আলজেনিব, আলজাইবা, আলজেবার, আলগোল, আলগোরাব, আলহিনা, আলকায়েদ, আলকেছ, আলমাইছান, আলনায়ের, আলনিতাক, আলনাছি, বালডাচিন, বেনানা, বারবেরি, বার্ড, বার্ক, বার্ককেনটাইন, বেদুইন, বেনজোয়িন, বাহাম, বারসীম, বেটেলগিজ, বিন্ট, বোস্তাক, বোরাক্স, বাক্রাম, বুলবুল, বারনোস, বেইদ, বেনাটনাছ, ক্যাবল, কুরসা, কাডি, কালাবাশ, ক্যালিবার, ক্যালিফ, ক্যালিফাট, ক্যামেল, কামিজ, ক্যামলেট, ক্যাক্ষুর, ক্যানাল, ক্যান্ডি, কেইন, কাফ, ক্যারাফি, ক্যারাট, ক্যারাভান, ক্যারাওয়ে, কারমাইন, ক্যারব, ক্যারাক, কাজবাহ, কাজিমি, চেক, চেকমেট, শিফন, সিনাবার, সাইফার, সিভেট, কফি, কফার, কফলি, কলকোছার, কোস্ট, কটন, ক্রিমসন, ক্রোকাস, কিউবেব, কিউমিন, কারকিউমা, দাহাবিহ, দামাসিন, দামাস্ক, ডামসন, ডারাবুক্কা, ডেনাব, ডিহাউ, দিনার, দিরহাম, দিজিন, ড্রাগোম্যান, ড্রাব, দুরা, দেনাব, দালফিম, ইনিফ, ইলতানিন, ইজার, এলিক্সার, আমিরাত, ফকির, ফেদাইন, ফেল্লাহ, ফেনিস, ফিলস, ফরমালহাউট, ফিউসটিক, গ্যাবেলি, গালিনগেল, গার্বল, গজ, গ্যাজেল, জেনেট, জিনি, ঘিবলি, ঘৌল, জিব্রাল্টার, জিঞ্জার, জিরাফ, গ্র্যাব, গিটার, গুন্ডি, জিপসাম, হাইক, হজ, হাজি, হাকিম, হালভা, হামাল, হারদিম, হেরেম, হাশিশ, হ্যাজার্ড, হিজরি, হেনা, হুকাহ, হাউরি, হাওদাহ, ইমাম, ইমামেত, ইমারত, জার, জেসমিন, জেবেল, জেরবো, জিরীড, জিসামাইন, জিহাদ, জিন, জুব্বা, জুলিপ, কাবা, কাবোব, কাবিলি, কাফির, কান্তার, কাফ, কাত, কেফ, কারমেস, খামসিন, খান, খঞ্জর, কিসমত, কোহল, কোরআন, লিকার, লেক, লাপিসলাজুলি, লাটাকিয়া, লেবান, লিমন, লিলাক, লাইম, লিউট, ম্যাগাজিন, মাহদি, মাজুন, মানকাস, মারাবাউট, মারকাসাইট, মারজিপান, মাসকারা, মাস্ক, ম্যাসেজ, মাস্তাবা, মেট, ম্যাট্রেজ, মেক্কা, মাজিরন, মিনারেট, মিজার, মিজান, মোচা, মোহায়ের, মনসুন, মস্ক, মোয়াজ্জিন, মুফতি, মোল্লা, মাম্মি, মুসলিম, মসলিন, মুসলমান, মার্থ, মাজ, মাতার, মাগরেজ, মেনকার, মিরাক, মিজার, মিরফাক, নাবব, নাকায়ার, নাদির, নাট্রন, নিজাম, নোরিয়া, নুচা, নুচাল, ওকা, অলিবানাম, অরেঞ্জ, অটোমান, ঔদ, প্যান্ডোর, পিসটাসিও, ফারকার্ড, পপিনজয়, কিন্তার, কুইন্টাল, র‍্যাকেট, রীয়েলগার, রীম, রেবেক, রিটিম, রেটিনা, রিয়াল, রিবস, রিগ্যাল, রাইস, রিস্ক, রিয়াল, রাব, রক, রুক, রোটল, সাফারি, সাফফ্লাওয়ার, স্যাফ্রেন, সাহারা, সাহেল, সাহিব, সাকের, সালাম, সালামনিয়াক, সালেপ, সালুপ, সালুকি, স্যাম্বল, সান্তির, সফেনা, সাশ, সাটিন, সায়িদ, স্কালিয়ন, সেনা, সিকুইন, সারেনডিপিটি, সিসিম, শ্যাডুফ, শয়তান, শ্যালট, শরীফ, শেখ, শরবত, শারবার্ট, শেরিফ, শিশ-কাবাব, শ্রাব, হামাল, হেকা, হোমাম, সাইমুম, সিনলোগ, সিরিকো, সিরাপ, স্কুপ, সোডা, সোফা, স্পিনাচ, সুড, সুফি, সুফিজম, সুগার, সুলতান, সুলতানা,

www.pathagar.com

সালতানাত, সুমাক, সুম্বাল, সুরা, সোয়াহিলি, সাইচ, ট্যাবি, তবলা, ট্যাবর, টাফেটা, টল্ক, তালিসমান, টামারিন্ড, টাম্বার, টাম্বারাইন, টানজেরাইন, টারক্স্রাকাম, টারবুশ, টায়ার, টেরিফ, টারাগন, তাজা, টিম্বাল, ট্রাফিক, টাট্টি, টাইফুন, ওলামা, উজা, উজির, বাদী, জেবা, জেবিক, ইয়াসমাক, জাফরি, জেরাবা, জেনিথ, জিরো, জিবেট ইত্যাদি।

সামরিক ব্যান্ড

বিশ্ব সামরিক ব্যান্ড বা রণসঙ্গীতের ধারণা পেয়েছে মুসলমানদের কাছ থেকে। অটোমান সাম্রাজ্যে প্রথম সামরিক ব্যান্ডের প্রচলন করা হয়। অটোমান সাম্রাজ্যে এ ব্যান্ড 'মেহতারান' নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যে মাঝে মধ্যে এ ব্যান্ডকে 'জানিসারি' (Janissary) ব্যান্ড বা রণবাদ্য হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। জানিসারি ছিল অটোমান সামরিক বাহিনীর উৎকৃষ্ট অংশ। তাদের মনোবল উজ্জীবিত করতে রণবাদ্য বাজানো হতো। সেলজুক সুলতান তৃতীয় আলাউদ্দিন কায়কোবাদ অটোমান সম্রাট প্রথম ওসমানের কাছে সম্মানসূচক একটি চিঠিসহ প্রথম মেহতার পাঠিয়েছিলেন। সেদিন থেকে প্রতিদিন আছরের নামাজ শেষে অটোমান সম্রাটের প্রতি সম্মান জানাতে মেহতার বাজানো হতো। সামরিক বাহিনীতে এটাই প্রথম মেহতার বা বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার। ধীরে ধীরে অটোমান সামরিক বাহিনীর এ ধারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রীয় গীতিকার জোসেফ হাইডেন, উলফগ্যাং আমাদিউস মোজার্ট এবং লুডউইং ভন বিটোফেন মেহতারের অনুকরণে রণসঙ্গীত রচনা করেন।

সঙ্গীত

অনেকেই বিশ্বাস করেন, একাদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় গীতিকবি ট্রুবাডুর হলেন আরব বংশোদ্ভূত। আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ড ট্রুবাডুরের রচিত গানের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, একুয়াটাইনের উইলিয়াম গীতিকারসহ এ গান স্পেনের বাইরে নিয়ে এসেছেন। লেভি প্রোভেনসাল গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন, উইলিয়ামের পাণ্ডুলিপিতে চারটি আরবীয়-হিস্পানিক গান পুরোপুরি নকল করা হয়েছে। উইলিয়ামের পিতা অষ্টম উইলিয়াম শত শত মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে পোয়িটিয়ার্সে নিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক ট্রেন্ড স্বীকার করেছেন, ট্রুবাডুর এসব আন্দালুসীয় যুদ্ধবন্দি মুসলমানের কাছ থেকে কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। জানা গেছে যে, স্পেন পুনর্দখলে আফ্রিকান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় উইলিয়াম তাদের কাছ থেকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তার অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ট্রুবাডুর সঙ্গীতের ঐতিহ্য গড়ে উঠে। বিংশ শতাব্দীতে স্পেনীয় ঐতিহাসিক র‍্যামন মেনেন্ডেজ পিডাল সঙ্গীতের এ ধারা অনুসরণ করেন। পাশ্চাত্যে সলফেজ সঙ্গীতের উৎস হলো আরবীয়।

www.pathagar.com

সলফেজ সঙ্গীতের দো, রি, মি, ফা, সোল, লা, টি প্রভৃতি ধ্বনিগুলো এসেছে দাল, রা, মিম, ফাম, সাদ, লাম প্রভৃতি আরবী ধ্বনি থেকে। এ তত্ত্ব প্রথম সমর্থন করেন মেনিনস্কি এবং পরে ল্যাবোর্ডে।

প্রযুক্তি

মুসলিম বিশ্বে উদ্ভাবিত বহু প্রযুক্তি মধ্যযুগের ইউরোপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত এস্ট্রোল্যাব এবং কোণ পরিমাপক যন্ত্রের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি, কোয়াড্রান্স নোভাস, কোবওয়ার্ক (তাবিয়া), স্ট্রীট ল্যাম্প, ওয়েস্ট কন্টেইনার, ওজন চালিত যান্ত্রিক ঘড়ি, ঘূর্ণায়মান গীয়ার, ডিস্টিল্ড এলকোহল (ইথানল), অস্ত্রোপচারের ২শ' সাজসরঞ্জাম, বিস্ফোরক গোলাবারুদ, নটিক্যাল এস্ট্রোলজিতে ব্যবহৃত ব্যাকিউলাস, সেক্সট্যান্ট প্রভৃতি। সেক্সট্যান্ট আবিষ্কার করেছিলেন আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-জারকালি। ইউরোপে এ যন্ত্র 'সাফিয়া' নামে পরিচিত ছিল। মুসলিম বিশ্বে উদ্ভাবিত লেন্সবিহীন পর্যবেক্ষণ টিউব টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে। রেনেসাঁ যুগে ইউরোপে মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যদেশ থেকে ইতিহাসের বৃহত্তম প্রযুক্তি স্থানান্তরের ঘটনা ঘটে। মুসলিম বিশ্বের কৃষি বিপ্লব ইউরোপে বহুমুখী ফসল উৎপাদনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এসময় ইউরোপে গম ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপাদন করা হতো না। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে যেসব ফলমূল ও ফসল রপ্তানি করা হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল শাক সবজি, বেগুন, খোবানি, পিচ, আখ, চাল, সিট্রাস, জাফরান, লেবু, কমলা, তুলা, মণ্ড, প্রশাধনী, রেশম ইত্যাদি। এসব ফলমূল ও ফসল স্পেনের উপকূল থেকে পাশ্চাত্যে স্পেনীয় উপনিবেশে রপ্তানি করা হতো। মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে রেশম শিল্প গড়ে উঠে। শণ উৎপন্ন শুরু হয় এবং লিনেন রপ্তানি করা হয়।

ঘাস জাতীয় গুল্ম সংগ্রহ করে এগুলোকে অন্যান্য সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সালফার ও এমোনিয়ার মতো খনিজ সম্পদও ইউরোপে রপ্তানি করা হতো। ফুলিং মিল, গ্রিস্টমিল, হুলার ও চিনিকলের মতো কলকারখানাও মুসলিম বিশ্ব থেকে ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়। আল-জাজারির উদ্ভাবিত সাকশন, নোরিয়া ও চেইন পাম্প ইউরোপের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। মুসলিম বিশ্বে এসব যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হওয়ার আগে মধ্যযুগের ইউরোপে শিল্প ও কৃষিকার্যে কায়িক শ্রম ও পশু ছিল একমাত্র সম্বল।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মধ্যযুগে ইউরোপে কোনো স্কুল-কলেজ ছিল না। মাদ্রাসা ছিল বিশ্বের প্রথম আইন শাস্ত্র বিষয়ক স্কুল এবং ইউরোপে কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বসূরি। মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় সাধারণত ইসলামী আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়া হতো। আরবীতে ছাত্রকে

www.pathagar.com

বলা হতো 'সাহিব'। ল্যাটিন ভাষায় সাহিব শব্দের সরাসরি অনুবাদ করা হয় 'সোসিয়াস'। ইংল্যান্ডে ইন্স অব কোর্ট হিসাবে পরিচিত আইন শাস্ত্র বিষয়ক স্কুলগুলো মাদ্রাসার অনুকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলিম বিশ্বে নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত জামিয়া'র আদলে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৮৫৯ সালে তিউনিসীয় ধনাঢ্য মহিলা ফাতিমা আল ফিহরির অর্থায়নে মরক্কোর ফেজ নগরীতে আল-কারুয়িন নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস 'আল-কারুয়িন'কে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রাসার পার্থক্য ছিল। যেমন- মাদ্রাসা থেকে যে ডিগ্রি দেয়া হতো তাকে বলা হতো 'ইজাজা' বা লাইসেন্স। এ লাইসেন্সে স্বাক্ষর করতেন একজন শিক্ষক। মাদ্রাসার নামে শিক্ষাগত যোগ্যতার লাইসেন্স দেয়া হতো না। অন্যকথায়, এ লাইসেন্স বা অনুমোদন দিতেন একজন অধ্যাপক। ক্রুসেডের সময় মুসলিম স্পেন, সিসিলি আমিরাত এবং মধ্যপ্রাচ্যের মাদ্রাসাগুলো ইউরোপে প্রথম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আলোক বর্তিকা হিসাবে কাজ করেছে। আরবী শব্দ 'ইজাজত আত্তাদ্রিজ ওয়াল ইফটা' থেকে 'ডক্টরেট' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। নবম শতাব্দীতে আইনে ডক্টরেট ডিগ্রির সমতুল্য 'ইজাজত আত্তাদ্রিজ ওয়াল ইফটা'র উন্নয়ন ঘটানো হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনে একজন ছাত্রকে আইনের একটি গিল্ড স্কুলে চার বছরে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করতে হতো। প্রার্থীর সন্দর্ভের মৌলিকত্ব এবং তার সন্দর্ভের বিরুদ্ধে সব আপত্তি খণ্ডনে তার ক্ষমতা যাচাইয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদের ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হতো। ডক্টরেট ডিগ্রিধারীরা 'ফকিহ' বা আইনে মাস্টার্স, মুফতি বা আইনগত মতামত প্রদানে অধ্যাপক এবং মুদাররিস বা শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করতেন। 'ফকিহ' শব্দকে ল্যাটিন ভাষায় 'ম্যাজিস্টার' (Magister), মুফতি'কে 'প্রফেসর' এবং মুদাররিস'কে 'ডক্টর' হিসাবে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজিতে 'ডক্টরেট' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'লাইসেনশিয়া ডসেন্ডি' (Licentia docendi) বা সংক্ষেপে 'ডসিয়ার' শব্দ থেকে। আরবী 'ইজাজত আত্তাদ্রিজ'কে ল্যাটিন ভাষায় 'লাইসেনশিয়া ডসেন্ডি' হিসাবে অনুবাদ করা হয়। আরবী 'ইজাজত আত্তাদ্রিজ' এবং ল্যাটিন 'লাইসেনশিয়া ডসেন্ডি' শব্দের অর্থ অভিন্ন। শিক্ষা প্রদানে সক্ষম ইসলামী পণ্ডিতদের 'ইজাজত আত্তাদ্রিজ' খেতাব দেয়া হতো। ল্যাটিন ডক্টর এবং আরবী মুদাররিস শব্দের অর্থও একই। শিক্ষিত ইসলামী পণ্ডিতদের মুদাররিস খেতাব দেয়া হতো। আরবী ডিগ্রি 'বাই হক আল রাবায়া'র (অন্যের কর্তৃত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দানের অধিকার) ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় 'বাককালাউরিয়াস' (Bachelor of Arts) হিসাবে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহৃত বহু শব্দ এসেছে মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোনো একটি নির্দিষ্ট চেয়ারে বসা এবং তার

www.pathagar.com

চারদিকে ছাত্রদের আসন গ্রহণের রীতিও এসেছে ইসলামী রীতি থেকে। শিক্ষকের চারপাশে চক্রাকারে ছাত্রদের বসার রীতি থেকে 'একাডেমিক সার্কেল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ছাত্র শব্দটিও এসেছে আরবী 'আসহাব' শব্দ থেকে। আসহাব শব্দের অর্থ 'সাথী' বা সতীর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উদ্বোধনী লেকচার, লম্বা আলখাল্লা পরিধান, থিসিস বা সন্দর্ভ উপস্থাপনের মাধ্যমে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন এবং এমনকি শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের স্বাধীনতা ভোগ করার মতো রীতিও এসেছে ইসলামী আদর্শ থেকে। আরবী 'ফতোয়া' শব্দের অর্থ হলো 'আইনগত মতামত' এবং ইজমা'র অর্থ হলো 'আইনগত সমঝোতা'। এ দু'টি শব্দ পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃত্তি প্রদানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। তারই ভিত্তিতে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ প্রদান করা হচ্ছে। নর্থ ক্যারোলিনা ল' রিভিউতে আইন বিশেষজ্ঞ জন মাকডেসির 'দি ইসলামিক অরিজিন্স অব দ্য কমন ল' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ইসলামী আইন ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনকে প্রভাবিত করেছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বেশ কয়েকজন পন্ডিত স্বীকার করেছেন, নরম্যানরা সিসিলি আমিরাত দখল করে নেয়ার পর তারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেখানকার ইসলামী প্রশাসনিক আইন লাভ করে এবং তাদের হাতে ইংল্যান্ডের পতন ঘটলে নরম্যানরা সে দেশে ইসলামী আইন ও ফিকাহ্‌র আলোকে কয়েকটি মৌলিক আইনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ১৯৯৯ সালে বিশেষজ্ঞ মাকডেসি রাজকীয় 'ইংলিশ কন্ট্রাক্ট' বা চুক্তির সঙ্গে ইসলামের 'আখদ', ইংরেজি 'এসাইজ অব নভেল ডিসাইসিন'-এর (দখলচ্যুত সম্পত্তিতে বিবাদীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা) সঙ্গে ইসলামী 'ইশতিকাক', ইংরেজি জুরির সঙ্গে মালিকী মাযহাবের লাফিফের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, নরম্যানদের মাধ্যমে এসব ইসলামী আইন-কানুন ইংল্যান্ডে প্রবেশ করেছে। মাকডেসি আরো স্বীকার করেছেন, স্কলাশটিক পদ্ধতি, শিক্ষা দানের লাইসেন্স, ইংল্যান্ডে ইন্স অব কোর্ট হিসাবে পরিচিত ল' স্কুল এবং ইউরোপীয় কমেন্ডা'র (সীমিত অংশীদারিত্ব) উৎপত্তি হয়েছে ইসলামী আইন থেকে। তিনি আরো বলেছেন, বিচারে আইনগত নজির এবং কিয়াস ইসলামী আইন ও সাধারণ আইন উভয় ব্যবস্থায় অভিন্ন। আইন বিশেষজ্ঞ মাকডেসি প্রবলভাবে বিশ্বাস করছেন, এসব সাদৃশ্য ও প্রভাব একথাই প্রমাণ করছে যে, ইসলামী আইন ইংল্যান্ডে সাধারণ আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

আইন

মনিকা গাউদিওসি, গামাল মুরসি বাদার এবং এ. হাডসনের মতো পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন, ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনে ট্রাস্ট ও এজেন্সী'র মতো সংস্থাগুলো ক্রুসেডাররা চালু করেন এবং আরবী ওয়াকফ ও হাওয়ালা বা হুন্ডির অনুকরণে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা

www.pathagar.com

হয়। ড. পল ব্রান্ড ওয়াকফ এবং মেট্রন কলেজে ইংল্যান্ডের রচেস্টারের যাজক ওয়াল্টার ডি. মার্টন প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নাইটস টেম্পলার' বা বীরত্বসূচক পদকপ্রাপ্ত সৈনিকদের সঙ্গে ওয়াল্টার ডি. মার্টনের যোগাযোগ ছিল এবং নাইটস টেম্পলার মুসলমানদের কাছ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করেছেন। মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে বেশকিছু দেওয়ানী আইন ইসলামী আইন ও ফিকাহর অনুরূপ আইন-কানুন থেকে গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী হাওয়ালা ইতালীয় দেওয়ানী আইনে অ্যাভালো এবং ফরাসি দেওয়ানী আইনে অ্যাভাল-এর উন্নয়নে সহায়তা করেছে। ইউরোপীয় দেওয়ানী আইনে ব্যবহৃত 'কমেন্ডা' ইসলামী আইনের 'কিরাদ' (লভ্যাংশ বণ্টনে পারস্পরিক চুক্তি) ও 'মুদারাবা' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রোমান আইনে ঋণ হস্তান্তর অনুমোদনযোগ্য না হলেও আধুনিক দেওয়ানী আইনে তার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ আইনের উৎস ইসলামী আইন। রোমান আইনে এজেন্সী'র ধারণাও ছিল অজ্ঞাত। রোমান আইনের আওতায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কন্ট্রাক্টে স্বাক্ষর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইসলামী আইনের অনুকরণে কমেন্ডা চালু হওয়ায় তা সম্ভব হয়।

পাশ্চাত্য ইক্যুয়িটি ও বিশ্বস্ততার মতো দু'টি মৌলিক নীতি গ্রহণ করেছে মুসলমানদের কাছ থেকে। এ দু'টি নীতির ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে ভবিষ্যৎ আইনের কাঠামো দাঁড় করানো হয়। ইক্যুয়িটি ও বিশ্বস্ততা হলো দেওয়ানী ও আন্তর্জাতিক আইনের ধারণার উত্তরসূরি। 'প্রিজাম্পশন অব ইনোসেন্স' (দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কাউকে নির্দোষ হিসাবে গণ্য করা) নামে আরেকটি দেওয়ানী আইনকে ইসলামী আইন প্রভাবিত করেছে। ফিলিস্তিনে ক্রুসেডে যোগদান শেষে ফেরার পর ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ইউরোপে এ আইন চালু করেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রা.) ঘোষিত ন্যায়নীতি ছিল ইসলামী আইনে 'প্রিজাম্পসন অব ইনোসেন্স'-এর ভিত্তি।

প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ক্রুসেড, নরম্যানদের সিসিলি বিজয় এবং আল-আন্দালুস পুনর্দখলের মতো ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রাথমিক আন্তর্জাতিক আইন ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। বিশেষ করে স্পেনীয় আইনজ্ঞ ফ্রান্সিসকো দ্য ভিক্টোরিয়া এবং তার উত্তরসূরি গ্রোটিয়াস ১২৬৩ সালে প্রকাশিত 'সিয়াত পার্টিডাস অব আলফনসো'র (জার্মানির রাজা আলফনসোর ৭ খণ্ডের আইন) মতো ইসলামী প্রকাশনায় প্রবলভাবে আলোড়িত হন। সে সময় ইউরোপে 'টেন্থ সাইটি পার্টিডাস অব আলফনসো'কে আইন বিজ্ঞানের একটি স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে প্রকাশিত ইসলামী আইনী পুস্তক 'বিলায়েত' ইউরোপকে প্রভাবিত করেছে। দাতব্য ট্রাস্ট, সম্পত্তির ট্রাস্টিশীপ, মানুষ ও শ্রমের মর্যাদা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা, প্রিজাম্পসন অব ইনোসেন্স, সেবা, মহিলাদের অধিকার, গোপনীয়তা রক্ষা, বিচারকদের নিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা,

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, সীমিত সার্বভৌমত্ব ও সহিষ্ণুতার মতো ইসলামী আইনের ধারণাগুলো ইউরোপীয় আইনী ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

ইসলামের মহান সামরিক মতবাদও ইউরোপকে প্রভাবিত করেছে। ক্রুসেডকালে আইউবীয় সুলতান আল-কামিল ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করার পর অলিভার স্কলাশটিকাস ইসলামী সামরিক আইনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিজয়ী সুলতান আল-কামিল কিভাবে বিজিত ফ্রাঙ্কদের কাছে খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, *'কে বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে এ ধরনের মহত্ত্ব, বন্ধুত্ব ও করুণা আসতে পারে? আমাদের হাতে যাদের পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা ও ভাই-বোন নিহত হয়েছে, আমরা যাদের হাত কেটে নিয়েছি, যাদেরকে আমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে উলঙ্গ অবস্থায় বিতাড়িত করেছি, সে সব লোক আমরা যখন অনাহারে মৃত্যুপথযাত্রী ছিলাম তখন আমাদেরকে নিজেদের খাবার খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনকি আমরা যখন তাদের দয়ার পাত্র তখনো আমাদের প্রতি সীমাহীন মহানুভবতা দেখিয়েছে।'*

আন্তর্জাতিক নৌ আইনে ইসলামী আইন গৃহীত হওয়ায় রোমান ও বাইজান্টাইনীয় আইন পরিত্যক্ত হয়। মুসলিম নৌ সেনাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অগ্রিম বেতন দেয়া হতো। তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বলা হতো যে, দলত্যাগ করলে অথবা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হলে প্রদত্ত অগ্রিম বেতন ঋণ হিসাবে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে, রোমান ও বাইজান্টাইনীয় আইনে সমুদ্র অভিযাত্রায় নৌ সেনারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মজুরি লাভ করতো। সমুদ্র অভিযান সফল হলে ক্যাপ্টেন ও ক্রু'র মধ্যে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হতো। পক্ষান্তরে, মুসলিম আইনজ্ঞরা গভীর সমুদ্র যাত্রা এবং উপকূলে পণ্যবাহী নৌ যাত্রার মধ্যে পার্থক্য করতেন এবং তারা ভাড়া প্রদানের জন্য জাহাজের মালিককে দায়ী করতেন। ইসলামী আইন ক্রীতদাসদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করার 'জাস্টিনিয়ান ডাইজেস্ট' (রোমান আইন) এবং 'নমোস রোডিয়ন নাউটিকোস' আইন পরিত্যাগ করে। এছাড়া ইসলামী 'কিরাদ' ছিল ইউরোপীয় 'কমেন্ডা' বা সীমিত অংশীদারিত্বের পূর্বসূরি। এভাবে ইসলামী আইন আন্তর্জাতিক নৌ আইনের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

মুদ্রা

অষ্টম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা মার্সিয়ার ওফা আব্বাসীয় দিনারের অবিকল মুদ্রা চালু করেন। এ মুদ্রার মাঝখানে অঙ্কিত ছিল ওফা রেক্স। ৭৭৪ সালে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর এ মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যবহারকারীদের আরবী সম্পর্কে খুব সামান্য জ্ঞান থাকলেও মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য এ ধরনের মুদ্রা চালু করা হয়েছিল। ৯১৩ সাল থেকে নরম্যান, জার্মানির হোহেনস্টাউফেন্স ও সিসিলির

www.pathagar.com

আঞ্জেভিন্স শাসকগণ যথাক্রমে সিসিলি, মাল্টা ও দক্ষিণ ইতালিতে ইসলামী মুদ্রার অনুকরণে বিপুল পরিমাণ খাঁটি সোনার মুদ্রা চালু করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে নরম্যানরা সিসিলি আক্রমণ করার সময় তারা আরবী ও ল্যাটিন কিংবদন্তী অঙ্কিত খাঁটি সোনার মুদ্রা ইস্যু করে। খাঁটি সোনার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, দক্ষিণ ইতালিতে জাল মুদ্রা বের করা হয়। এসব জাল মুদ্রায় অপাঠ্য আরবী কুফি অক্ষর ব্যবহার করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এমনকি ভারতে আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাইজান্টাইন ও মিসরে চালু স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করা হতো। ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পর ইতালির ফ্লোরেন্স ও জেনোয়ার মতো কয়েকটি নগরী তাদের নিজস্ব মুদ্রা চালু করে। এসব মুদ্রা মুসলিম মুদ্রার বিকল্প হিসাবে চালু করা হয়।

সাহিত্য

ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে সুপরিচিত সাহিত্য কর্মের নাম 'এক হাজার এক রাত্রি' বা আরব্য রজনী। আরব্য রজনী হচ্ছে প্রাচীনকালের উপকথার একটি সংকলন। পার্সী কবি আল-জাহশিয়ারি ভারতের কয়েকটি গল্প অবলম্বনে 'হাজার আফসানা' রচনা করেছিলেন। 'হাজার আফসানা' অবলম্বনে আরবীতে 'কিতাব আলিফ লায়লা ওয়া-লায়লা' লিখা হয়। দশম শতাব্দীতে এ মহাকাব্য লিখা শুরু হয় এবং শেষ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। প্রতি রাতে রানী শেহরাজাদ তার স্বামী বাদশাহ শেহরায়েরকে গল্প শোনাতেন। এমনি হাজার রাতের গল্প নিয়ে আরব্য রজনী রচনা করা হয়। গল্পের ধরন ও সংখ্যা একেক পাণ্ডুলিপিতে একেক রকম। ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের পর 'এক হাজার এক রাত্রি'তে থাক বা না-ই থাক, সব ধরনের আরবীয় রূপকথাকে আরব্য রজনী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আরবী পাণ্ডুলিপিতে অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও ইউরোপে যে কোনো আরবী সংস্করণ এবং বেশকিছু গল্প 'আরব্য রজনী' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি প্রাচ্যবিদ এন্টোইন গ্যালন্ড অনুবাদ করা মাত্র এ মহাকাব্য ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফ্রান্সে বইটির বহু নকল সংস্করণ বের করা হয়। উইলিয়াম লেন ও জন পাইন ইংরেজি ভাষায় বইটি অনুবাদ করেন। ইহুদী লেখক পেট্রাস আলফনসি আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় ৩৩টি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি যেসব গল্প সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে ছিল 'সিন্দবাদ' ও আরব্য রজনীর মতো গল্প। সিন্দবাদের অনুকরণে জোনাথন সুইফট রচনা করে 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস', ফরাসি চিন্তাবিদ ভলটেয়ার লিখেছেন 'জাদিক' এবং ইংরেজ কবি স্যামুয়েল জনসন লিখেছেন 'রোজালেস'। পাশ্চাত্য জগতে আলাদিন, সিন্দবাদ ও আলী বাবার মতো বহু চরিত্র সাংস্কৃতিক চরিত্রে পরিণত হয়। মধ্যযুগের কোনো আরবীয় সূত্রে আলাদিন চরিত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া না গেলেও ফরাসি অনুবাদক এন্টোইন

www.pathagar.com

গ্যালন্ডের 'এক হাজার এক রাত্রি'র অনুবাদে এ চরিত্র স্থান পেয়েছে। এন্টোইন গ্যালন্ড আলেপ্পোতে একজন সিরীয় গল্পকারের কাছ থেকে আলাদিনের নাম শুনেছিলেন। আধুনিক রূপকথায় আরবী ও ফারসি পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত জ্বীন, দৈত্য, জাদুই চেরাগ ও ম্যাজিক কার্পেটের মতো উপাদান ভুরি ভুরি খুঁজে পাওয়া যায়।

'লায়লী-মজনু' হলো আরবী ও ফারসি রোমান্টিক কাব্যের বিখ্যাত উদাহরণ। সপ্তম শতাব্দীতে উমাইয়া শাসনামলে এ রোমান্টিক সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি হয়। রোমিও-জুলিয়েটের মতো লাইলী-মজনুর প্রেম কাহিনীও অমর। লাইলী-মজনুর ল্যাটিন অনুবাদ রোমিও-জুলিয়েট প্রেম কাহিনী সৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ইবনে তোফায়েল হলেন দার্শনিক উপন্যাসের অগ্রপুরুষ। তিনি প্রথম আরবী উপন্যাস 'হায় ইবনে ইয়াকধান' (ফিলসোফার্স অটোডিডাকটাস) রচনা করেন। এ উপন্যাসে জনমানবহীন মরুভূমিতে 'হায়' নামে একটি নিঃসঙ্গ শিশুর করুণ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ১৬৭১ সালে এডওয়ার্ড পিকক দ্য জুনিয়র 'হায় ইবনে ইয়াকধান'-এর ল্যাটিন এবং ১৭০৮ সালে সাইমন ওকলে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। একই সময় জার্মান ও ওলন্দাজ অনুবাদও বের হয়। এসব অনুবাদ ইংরেজ উপন্যাসিক ডানিয়েল ডেফোকে 'রবিনসন ক্রুসো' লিখতে অনুপ্রাণিত করে। রবিনসন ক্রুসো হলো ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। ফিলসোফার্স অটোডিডাকটাস রবার্ট বয়েলকে তার দার্শনিক উপন্যাস 'দি এসপায়ারিং ন্যাচারালিস্ট' লিখতে উৎসাহিত করে।

আরবী সাহিত্যে বেশ কয়েকটি রাজকীয় গোপন প্রেমের উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর পার্সী মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক ইবনে সিনার 'রিসালা ফিল ইসক'-এ অভিজাত প্রেমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইতালির বিশ্ববিখ্যাত কবি দান্তের ডিভাইন কমেডি'কে ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তার ডিভাইন কমেডিতে পবিত্র আল-হাদিস এবং 'কিতাব আল-মিরাজ'-এ বর্ণিত ইহ ও পারলৌকিক জীবনের বহু ঘটনা ও উপাখ্যান গ্রহণ করেছেন। ১২৬৪ সালে কিতাব আল-মিরাজ 'লাইবার স্কেল ম্যাচোমেটি' শিরোনামে এবং ইবনে আরাবীর আধ্যাত্মিক রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কালজয়ী ইংরেজ নাট্যকার ও সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়র ও জর্জ পীলের রচনাবলীতেও আফ্রিকান মুসলমানদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'টিটাস এন্ড্রুনিকাস' এবং 'ওথেলো'তে মুসলমানদের চরিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ওথেলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র ওথেলো হলেন একজন আফ্রিকান মুসলমান। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের রাজদরবারে মরক্কোর প্রতিনিধি দলের সফর ইউরোপের এসব সাহিত্য কর্মকে প্রভাবিত করেছে। আরবী সাহিত্য ইংরেজ কবি জর্জ গর্ডন বায়রন, কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এবং আর্জেন্টিনার কবি জর্জ লুই বার্জেজসহ বহু কবি ও সাহিত্যিককে পথ দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

দর্শন

মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে আরবীয় দর্শন সাহিত্য হিব্রু, ল্যাটিন ও ল্যাডিনো ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এসব অনূদিত গ্রন্থ আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ও আল-খাওয়ারিজমির দর্শন ইউরোপকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। ইবনে সিনা তার নিজস্ব দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তার দর্শন ইসলামী ও খ্রিস্টান উভয় ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি এরিস্টোটলীয় যুক্তিবাদের বিরোধিতা করেন এবং 'এমপিরিসিজম' (ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা) এবং 'তাবুলা রাসা' (জন্মগত দুঃখবোধ) মতবাদের উন্নয়ন ঘটান। ল্যাটিন ভাষায় ইবনে সিনার মতবাদে রূহের প্রকৃতি এবং তার অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তবে তার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে স্কলাশটিক ইউরোপে বিতর্ক ও সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে প্যারিসে বিতর্ক তুঙ্গে উঠে। সেখানে ১২১০ সালে ইবনে সিনার মতবাদ নিষিদ্ধ করা হলেও ফরাসি যাজক উইলিয়াম এবং জার্মান বিশপ আলবার্টাস ম্যাগনাসের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীতে খ্রিস্ট ধর্মে ইবনে সিনার মতবাদ ইবনে রুশদের মতবাদের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। ইবনে রুশদ হলেন পাশ্চাত্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলিম দার্শনিক। তার দর্শন ও ভাষ্য পশ্চিম ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার উত্থান ঘটাতে সহায়তা করে এবং তিনি 'এক্সিসটেন্স প্রেসিডস এসেন্স' (অস্তিত্ববাদ) ধারণার উন্নয়ন সাধন করে।

ইমাম গাজ্জালি (র.) মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিস্টান দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেন। মার্গারেট স্মিথের ভাষায়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম গাজ্জালির দর্শন প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তার দর্শনে যেসব মহান খ্রিস্টান লেখক প্রভাবিত হয়েছিলেন সেন্ট টমাস একুইনাস হলেন তাদের অন্যতম। সেন্ট টমাস মুসলিম লেখকদের নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তিনি তাদের কাছে ঋণী। তিনি ইতালির নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরাট প্রভাব ছিল। ইমাম গাজ্জালির কর্মের সঙ্গে রেনি ডেসকার্টেসের কর্মের বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের দর্শন আধুনিক ইউরোপকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। তার দার্শনিক উপন্যাস 'হায় ইবনে ইয়াকধান' ১৬৭১ সালে ল্যাটিন ভাষায় 'ফিলসোফার্স অটোডিডাকটাস' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। যেসব ইউরোপীয় পণ্ডিত এ উপন্যাসে প্রভাবিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক, গর্টফ্রিড লিবনিজ, মেলচিসেডেচ থিভেনট, জন ওয়ালিস, ক্রিশ্চিয়ান হিউজন্স, জর্জ কেইথ, রবার্ট বার্সক্লে, দ্য কোয়াকার্স ও স্যামুয়েল হার্টলিব প্রমুখ।

সবশেষে বলতে হয়, স্বর্ণযুগে মুসলমানরা যেভাবে গ্রীকদের কাঁধে দাঁড়িয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, ঠিক সেভাবে আধুনিক যুগে ইউরোপীয়রা

www.pathagar.com

মুসলমানদের কাঁধে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের সেই পতাকা বহন করছে। এ ব্যাপারে 'দ্য ম্যাথমেটিক্যাল লেগ্যাসি অব ইসলাম'-এ ডেভিড এঙ্গেল লিখেছেন, *'Without the dedication and commitment to science by the Islamic scholars of the 9th to 14^{th} century, who both preserved important scientific works and pushed forward the limits of mathematical and scientific knowledge , it is not at all clear that Western Europe would have become the world leader in science and technology. And had it not been the case, it is unlikely that the United States would have inherited that leadership role.'*

অর্থাৎ *'মুসলিম পণ্ডিতগণ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ করেছেন এবং গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছেন। নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞানের প্রতি তাদের ত্যাগ ও অঙ্গীকার ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিম ইউরোপ বিশ্বের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারতো কিনা তা আদৌ স্পষ্ট নয়। মুসলিম পণ্ডিতদের অনুরূপ ত্যাগ ও অঙ্গীকার ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের আসন পেতো কিনা সন্দেহ।'*

তথ্যসূত্র

১. উইকিপিডিয়া: দ্য ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া
২. বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান: এম. আকবর আলী
৩. অ্যা শেয়ার্ড লেগ্যাসি: ইসলামিক সায়েন্স ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট: জোসে মারিয়া মিলাস
৪. আরব জাতির ইতিহাস: অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
৫. হাউ গ্রীক সায়েন্স পাসড টু দি অ্যারাবস: ডি ল্যাসি ও'লীরি ডি. ডি.
৬. অ্যা হিস্টরি অব নন-ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি: বরিস আব্রামোভিচ রোজেনফিল্ড
৭. অ্যা বিবলিওগ্রাফি অব স্কলার্স ইন মেডিয়ীভ্যাল ইসলাম: ড. ইলিয়াস ফারনিনি
৮. দ্য হাউজ অব উয়িজডম: হাউ দি অ্যারাবস ট্রান্সফরমড দ্য ওয়েস্ট: জোনাথন লিয়ন্স
৯. দ্য মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স: ড. আলী আবদুল্লাহ আল-দাফা

www.pathagar.com

সাহাদত হোসেন খান ১৯৫৬ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার কাটাবাড়িয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুর রাজ্জাক খান ১৯৮০ সালে এবং মা শাহেদা খানম ১৯৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

১৯৭২ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, কম (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৭৬ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ডিগ্রি লাভ করেন। সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেন ১৯৮৭ সালে। দৈনিক খবরে তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। পরে দৈনিক আল-আমিন, দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক ইনকিলাবে সাংবাদিকতা শেষে যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলা একাডেমীর সদস্য। এছাড়াও তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নে (ডিইউজে) চার মেয়াদে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com